ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষক
আবু সালেহ
রেজি নং-৫০/২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

আগস্ট ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব আবু সালেহ কর্তৃক উপস্থাপিত "ইসলামে পররাষ্ট্রনীতিঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। আমার জানা মতে এটি গবেষকের একক গবেষণাকর্ম। পাণ্ডুলিপিটি এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

আমি গবেষকের সার্বিক সাফল্য ও উন্নতি কামনা করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে,“ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণার পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশের জন্য কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপেণ্ঢামা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করিনি।

(আবু সালেহ)

এম.ফিল গবেষক

রেজি নং-৫০/২০১৩-২০১৪

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۔

اَمَّا بَعْدُ

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবাণীতে আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অশেষ দরূদ ও সালাম পাঠ করছি সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্ব মানবতার মুক্তির কান্ডারী সাইয়্যেদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবিয়্যিন প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজনে আবদ্ধ হয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবষেণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা অভিসন্দর্ভটিকে মানসম্পন্ন করে তুলেছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি স্যারের প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি স্যারের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

আমার বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিভাগের মরহুম শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মুজতবা হোসাইন স্যারের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য বিশেষ করে দুআ করছি। তিনি ছিলেন আমার এই গবেষণাকর্মের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। ০৫.০১.২০১৬, সকাল ৭.৩০টায় তাঁর আকস্মিক ইন্তেকালের পর আমি যখন অভিভাবকহীন অবস্থায় গবেষণাকর্ম সম্পর্কে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম তখন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যার আমাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করার জন্য গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক স্যারের প্রতি। যিনি আমাকে অত্যন্ড় স্নেহ করেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার আব্বা সিরাজুল ইসলাম ও পরম শ্রদ্ধেয় মা মিনরা বেগমকে। সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যারা তাদের সারাটা জীবনে যে সীমাহীন কষ্ট-ক্লেশ, ত্যাগ-তিতীক্ষা, স্বীকার করেছেন গায়ের চামড়া দিয়ে জুতো বানিয়ে দিলেও তাঁদের ঋণ শোধ হবার নয়। উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁরা সবসময় আমাকে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। আব্বা ও মায়ের উৎসাহ উদ্দীপনা, গবেষণাকর্ম সম্পর্কে খোজ খবর নেয়া, অশেষ দু'আ ও ঐকান্তিক স্নেহকে পাথেয় করে গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছি। পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক ও সাংসারিক দায়িত্ব আমার শ্রদ্ধেয় পিতা স্বীয় স্বন্ধে তুলে নেয়ায় গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতে বেশ সহজতর হয়েছে। মহান আলণ্ঢাহর দরবারে তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমার এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি দেখে যিনি খুব বেশি আনন্দিত হতেন, আমার একমাত্র ভগ্নীপতি বিদ্যুৎসাহী মিজান চৌধুরী যিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক তিন সন্তানকে ইয়াতিম করে আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে ৫ নভেম্বর ২০১৫ সড়ক দূর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

দীর্ঘায়ু কামনা করছি আমার অতি আদরের একমাত্র ছোট বোন আমেনা খাতুন শিল্পীর। আমার উচ্চ শিক্ষা অর্জনের মধ্যে স্বামী হারা শোকাতুর এই বোনটি রিমন (০৮), রাফি (০৫) ও আরিয়ান (০২)-কে নিয়ে ভবিষ্যতের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার চেষ্টায়...। তাঁদের নিস্পাপ চেহারার দিকে তাকালে আমি উৎসাহ পাই।

ছায়ার ন্যায় পাশে থেকে যে আমাকে সর্বক্ষণ উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে সেই প্রিয়তমা জীবন সঙ্গীনী আজমেরী সুলতানা (আলো)-কে এ আনন্দঘন মুহূর্তে জানাই হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দু'আ করি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন।

গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরন করছি আমার শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মহান শিক্ষক হিসেবে যাদের সাহচর্য পেয়ে ধন্য হয়েছি সেসব আলোকবর্তিকাকে। নন্দনপুর স্কুল, পালাখাল ছালেহীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, ছারছীনা দারুস্সুন্নাত জামেয়া-এ-নেছারীয়ায়ে দীনিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দারুন্নাজাত

সিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্রাসা ও সরকারী মাদ্রাসা-ই আলীয়া, ঢাকা; এর সম্মানিত আসাতেজায়ে কেরাম, যারা জীবিত আছেন তাদের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং মরহুমদের জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করছি।

আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নন্দনপুর দারুস্‌সুন্নাত ছালেহীয়া দীনিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে। আমার উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য সবসময় তারা দু'আ করেন।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ভিকার‍ুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে, যারা এম.ফিল কোর্স চালিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করে আমাকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করে দিয়েছেন। আলণ্ডাহর দরবারে স্নেহধন্য ছোট ভাই আ. কাদের (সুজন) ও নাঈম সহ পরিবারের সকল সদস্যের সুখ-শান্ড়ি-উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি। আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য যে সকল বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহাস্পদ এবং আপনজনেরা নানাভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন।

আমার এই গবেষণাকর্মের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও অফিস ব্যবহার করেছি তন্মধ্যে-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, ব্যানবেইস লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, ঢাকা- এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে মহান আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন এ গবেষণাকর্মটি দেশ-জাতি ও মানবতার কল্যানে কবুল করেন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

(আবু সালেহ)

এম.ফিল গবেষক

রেজি নং-৫০/২০১৩-২০১৪

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

১. আল কুরআন, ১০ : ২০ = প্রথম সংখ্যা সূরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
২. ইমাম বুখারী = আবূ 'আব্দিলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল আল বুখারী আল জু'ফি
৩. ইমাম মুসলিম = আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী
৪. ইমাম তিরমিযী = আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী
৫. ইমাম আবু দাউদ = আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আশআছ আস-সিজিস্ড়নী
৬. ইমাম নাসাঈ = আহমদ ইব্‌ন শু'আইব আন-নাসাঈ
৭. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ = আবু 'আব্দুলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজিদ ইব্‌ন মাজাহ আল-কাযবীনী
৮. ইমাম আহমাদ = আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল
৯. ইমাম ত্বহাবী = আবু জা'ফর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আত-ত্বহাবী
১০. ইব্‌ন কাছীর = আবূল ফিদা ইমামূদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাছীর
১১. ইব্‌ন জারীর = আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী
১২. ই.ফা.বা = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
১৩. কুরতুবী = আবূ 'আব্দিলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন ফাররাহ আল কুরতুবী
১৪. তাবারানী = সুলায়মান ইব্‌নে আহমাদ ইবনে আইয়ুব আবূল কাশেম আত-তাবারানী
১৫. বায়হাকী = আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী আল-বায়হাকী
১৬. যাহাবী = ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন উসমান আয-যাহাবী
১৭. রাযী = আবূ 'আব্দিলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌নুল হাসান ইবনুল হুসায়ন আত-তামিযী ফখরুদ্দীন আর-রাযী
১৮. অনু = অনুবাদ
অনূ = অনূদিত
১৯. আ. = আরবী
২০. (আ.) = আলাইহিস্ সালাম
২২. ইং = ইংরেজি
২৩. খ্রি. = খ্রিস্টাব্দ
২৪. খৃ.পৃ. = খৃস্টপূর্ব
২৫. জ. = জন্ম
২৬. ড. = ডক্টর (পি.এইচ.ডি)
২৭. ডা. = ডাক্তার
২৮. তা.বি = তারিখ বিহীন
২৯. দ্র. = দ্রষ্টব্য
৩০. পুন. = পুনরায়
৩১. প্রাগুক্ত = পূর্বের উক্তি/পূর্বোক্ত
৩২. পৃ. = পৃষ্ঠা
৩৩. বাং = বাংলা
৩৪. বি. দ্র. = বিস্ড়রিত / বিশেষ দ্রষ্টব্য

৩৫. মৃ. = মৃত; মৃত্যু
৩৬. মাও. = মাওলানা
৩৭. রেজি = রেজিস্টার্ড
৩৮. রা. = রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু
৩৯. রহ. = রাহমাতুল্লাহি আলায়হি
৪০. স./সা. = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
৪১. সম্পা = সম্পাদিত / সম্পাদনা
৪২. হি. = হিজরী
৪৩. ঢাবি= ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪৪. A.H. = হিজরী সন (After Hijrath)
৪৫. A. D = খ্রিস্টাব্দ (Anno Domini) in the year of our Lord
৪৬. P.PP = Page/Pages
৪৭. Ed. = Edition / Editor / Edited
৪৮. Ibid = (Ibidem) in the same place, from the same source.
৪৯. N.B = Note Bene
৫০. N.D = No Date
৫১. Vol = Volume

পরিভাষা (Glossary)

এই অভিসন্দর্ভে প্রায়ই ব্যবহৃত কিছু আরবি শব্দের তালিকা ও অর্থ নিম্নে দেওয়া হল:-

Av‘jt ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার

Avn‘t অঙ্গীকার, চুক্তি

Avnjj wKZvet সহনীয় বলে গণ্য, সম্মানিত ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত লোক, আসমানি গ্রন্থধারী লোক (প্রধানত ইহুদি ও খ্রিষ্টান)।

Avgvbt নিরাপদ আচরণ, নিরাপত্তা চুক্তি

Avgxiæj gÖwgbxbt বিশ্বাসীগণের তথা মুসলমানদের নেতা, খলিফা।

Avmevej bhjt কুরআনের কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য, কারণ, প্রেক্ষাপট বা পটভূমি; শানে নুযুল। (একবচন, সাবাবুন নুযুল)

Avmjt উসূল শব্দের একবচন মূলনীতি, আইনের মূলনীতি;

Avmvit ঐতিহ্য, বর্ণনা; কখনো কখনো হাদীসের সমার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

‘viæj Avn‘ (‘viæm mjn)t ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম রাষ্ট্র (শব্দটি ইমাম শাফী সর্বপ্রথম প্রচলন করেন)।

‘viæj nviet ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অমুসলিম রাষ্ট্র (দারুল ইসলামের বিপরীত)।

‘viæm mjnt দেখুন-দারুল আহ্‌দ।

wR¤§vt ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিক ও ইসলামী সরকারের মধ্যে স্থায়ী সাংবিধানিক ব্যবস্থা, যার আওতায় অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী শাসনের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান ও আনুগত্য প্রকাশ এবং জিযিয়া প্রদানের বিনিময়ে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে।

wRw¤§t যে ব্যক্তি জিম্মা লাভ করে; ইসলামী রাষ্ট্রে বাসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক

dvZI qvt আইনগত মতামত বা ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যা।

wdKnt মুসলিম আইন ব্যবস্থা; কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত বিধিবিধান বা ইসলামের আইনগত সিদ্ধান্ত ও মতামতের সমষ্টি প্রাচীন ও সনাতনপন্থী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারার মূল হাতিয়ার।

nv'xm. হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা, কাজ বা মৌন সম্মতি

nviwet শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিক।

wnjdt মৈত্রী

û'bvnt সাময়িক অস্ত্র বা যুদ্ধ বিরতি

BRgvt ঐক্যমত

BRwZnv't প্রচেষ্টা চালানো; শরীআর উৎস গ্রন্থগুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ করা; মৌলিক আইনগত/ফিকাই মতামত

Bgvgt †bZvt Ljxdvt নামাজে নেতৃত্বেদানকারী; ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে রায় প্রদানের ক্ষমতাধারী ধর্মপ্রাণ মুসলিম পন্ডিত।

BgvgZt খেলাফত, ইমামের পদ বা দায়িত্ব।

BmwZnmvbt কয়েকটি আইনগত/ফিকহি মতামতের মধ্যে একটি মতকে অন্য মতের চেয়ে প্রাধান্য দেয়া বা শ্রেয়তর মনে করা।

wRnv't সংগ্রাম; আত্মসংশোধন ও সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পূরণের জন্য একজন মুসলিমের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া; আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কাজ করা বা যুদ্ধ করা।

wRwhqvt রাষ্ট্রীয় সেবাগ্রহণের বিনিময়ে অমুসলিম নাগরিকরা ইসলামী রাষ্ট্রকে যে কর প্রদান করে। এটিকে অনেক সময় পোল ট্যাক্স বলা হয়।

wLjvdZt খলীফার পদ বা দায়িত্ব; পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করার কাজ।

LjxdvZi ivmjjøvnt আল্লাহ্‌র রাসূলের উত্তরাধিকারী খলীফা।

LvivRt অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী রাষ্ট্রকে যে ভূমি রাজস্ব প্রদান করে।

Ljvdv‡q iwk‘vt সঠিকপথের নির্দেশনাপ্রাপ্ত ইসলামের প্রথম চার খলীফা হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)

gvmjvnvnt জনস্বার্থ, গণপূর্ত।

wgmvKt চুক্তিপত্র; চুক্তি; সন্ধি।

gAvnv‘vnt চুক্তি সমঝোতা।

gkwiKt যে আল্লাহ্‌র সাথে শরিক করে; পৌত্তলিক মূর্তি পূজক। বহুবচন-মুশরিকুন।

gmZvgvbt ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিক।

bveRt মুসলিমদের পক্ষ থেকে সমঝোতা বা চুক্তি বাতিল বা অবসান করা।

bvmLt পূর্বে অবতীর্ণ কুরআনের কোনো আয়াত বা আদেশ স্থগিত করা, রহিত করা, বা সাময়িকভাবে বাতিল করা।

bvmt মূল পাঠ্য

wKqvmt পূর্বের কোনো ঘটনা বা সিদ্ধান্তের সাথে তুলনার দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

KiAvbt ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতমগ্রন্থ, আল্লাহ্‌র শ্বাশত বাণী।

KivBkt মক্কার নেতৃস্থানীয় আরব গোত্র।

wiÏvnt স্ব-ধর্ম ত্যাগী।

mMit অপদস্থতা, লাঞ্ছনা।

mnxdvZj gv‘xbvt মদীনার ইহুদি গোত্রগুলোর সাথে নবীজির সাংবিধানিক সমঝোতা; মদীনার সনদ।

kixAvt মানব আচরণের জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, যা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

wmqvit পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে মুসলিমদের অর্জনের বিবরণ; মুসলিম পররাষ্ট্র নীতির আইনগত উৎস।

mjnt সন্ধি চুক্তি; যুদ্ধ বিরতি

mbvnt অনুমোদিত পন্থা; নবীজি (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও সম্মতি; হাদীস

mbxt সনাতনপন্থী মুসলিম; সুন্নাহের ভিত্তিতে বিভক্ত চার মাজহাবের এক মাজহারের অনুসারী; নবীজি (সা.)-এর শুদ্ধ অনুসারী; অধিকাংশ মুসলিম জনসংখ্যা। বিপরীত শিয়া।

ZvjdxKt একত্র করা, চয়ন করা।

ZvKjx'‘t অনুকরণ করা, অনুসরণ করা।

Djvgvt মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী ধর্মপ্রাণ শিক্ষিত ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ; (একবচন-আলিম)।

D¤§vnt সম্প্রদায় লোক, জাতি, একদল লোক।

Didt কোনো সমাজের বিশেষ প্রথা; প্রথাগত আইন।

Dmjt সনাতন মুসলিম আইন ব্যবস্থার উৎস ও পদ্ধতি যথা-KiAvb, mbvn, wKqvm, BRgv এবং BRwZnv‡'i অন্যান্য নিয়মনীতি। (একবচন-আস্‌ল)

Dmji wdKnt দেখুন Dmj

hvKvZt গরিবের পাওনা; মুসলিমগণ তাদের অতিরিক্ত সম্পদের উপর যে বাৎসরিক কর দেয়।

সূচিপত্র

- ঘোষণা পত্র.. I
- প্রত্যয়ন পত্র.. II
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার.. III-IV
- শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা.. V-VI
- পরিভাষা.. VIII-XI
- ভূমিকা ১-৩

প্রথম অধ্যায়
ইসলাম ও পররাষ্ট্রনীতি পরিচিতি

১.১: ইসলাম : নামকরণ ও পরিচয়.. ৪

১.২: ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ.. ৮

১.৩: ইসলামের ভূমিকা,গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ.. ৯

১.৪: পররাষ্ট্রনীতি পরিচিতি ও নির্ধারক সমূহ ১১

১.৫: ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি ও অনুমোদন ১৫

১.৬: কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি.. ১৮

১.৭: ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নৈতিক ভিত্তি.. ৩৩

১.৮: ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা.. ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলাম, কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি

২.১: কূটনীতি: অর্থ ও সংজ্ঞা.. ৪৫

২.২: কূটনীতির গুরুত্ব.. ৪৬

২.৩: কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি.. ৪৯

২.৪: ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ কূটনীতিক ৫৪

২.৫: ইসলামী রাষ্ট্রের সদস্য পদের ভিত্তি.. ৫৬

২.৬: রাষ্ট্রদূত.. ৫৯

২.৭: রাষ্ট্রদূতের অভ্যর্থনা.. ৬৩
২.৮: দূতগণের বিশেষ সুবিধাবলী.. ৬৫
২.৯: কূটনৈতিক মিশনের কার্যাবলী.. ৬৭

তৃতীয় অধ্যায়
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি

৩.১: হিলফুল ফুজুল.. ৭০
৩.২: আবিসিনিয়ায় হিযরত.. ৭১
৩.৩: মদীনায় হিযরত ও রাসূল (সা.)-এর দেশপ্রেম.. ৭২
৩.৪: মদিনা সনদ ও রাসূল (সা.)-এর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা.. ৭৩
৩.৫: বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দী.. ৯১
৩.৬: বনু কুরাইযা ও কুরাইশ সম্প্রদায়.. ৯৮
৩.৭: বিদেশে দূত প্রেরণ ও খ্রিস্টানদের প্রতি সনদ.. ১০১
৩.৮: হুদায়বিয়ার সন্ধিঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পররাষ্ট্রনীতির একটি গৌরবোজ্জ্বল দিক......... ১০৪
৩.৯: সন্ধির আইনগত প্রকৃতি.. ১১৪
৩.১০: সন্ধি বা চুক্তির বিষয়বস্তু.. ১১৭
৩.১১: মহানবী (স.) এর সময় নিরপেক্ষতার চুক্তিসমূহ.. ১১৯
৩.১২: মক্কা বিজয়কালে হযরত মুহাম্মদ (সা.) উদারতা.. ১২৪
৩.১৩: আবিসিনিয়ার শাসকের সাথে রাসূল (সা.) এর পত্রালাপ.. ১২৭

চতুর্থ অধ্যায়
খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি

৪.১: হযরত আবু বকর (রা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি.. ১৩০
৪.২: হযরত উমর (রা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি.. ১৩৫
৪.৩: হযরত উসমান (রা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি.. ১৫২
৪.৪: হযরত আলী (রা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি.. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উমাইয়া যুগের পররাষ্ট্রনীতি

৫.১: ১ম মুয়াবিয়ার শাসনামল........ ১৭৪

৫.২: বাইজান্টিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ: উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে সাম্রাজ্য বিস্তার........ ১৭৭

৫.৩: উমাইয়া খলিফাদের আমলে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ........ ১৭৯

৫.৪: উমাইয়াদের সময় আভ্যন্তরীণ উন্নতি........ ১৮০

৫.৫: দামেস্কে ও স্পেনে উমাইয়া পররাষ্ট্রনীতি........ ১৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

আব্বাসী যুগের পররাষ্ট্রনীতি

৬.১: আব্বাসীয় খলিফাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: খেলাফত ও চুক্তি........ ১৮৯

৬.২: আব্বাসীয় যুগে সমাজ, বানিজ্য, শিল্প ও কৃষি........ ১৯৯

৬.৩: আব্বাসীয় যুগে মুসলিম কূটনীতি ও বিশ্ব রাজনীতি........ ২০০

সপ্তম অধ্যায়

ফাতেমীয় ও উসমানীয় শাসনামলে পররাষ্ট্রনীতি

৭.১: ফাতেমি রাজবংশ ও শাসকদের বংশ তালিকা........ ২১২

৭.২: ফাতেমীয় শাসনামলে মিসর, উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলির সহিত সম্পর্ক........ ২১৪

৭.৩: উসমানীয় সাম্রাজ্য ও সেনাবাহিনী........ ২১৯

৭.৪: উসমানীয়দের কূটনৈতিক ব্যর্থতা ও পতন........ ২২১

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামে যুদ্ধ বিগ্রহ

৮.১: সেনাবিভাগীয় আদালত........ ২২৮

৮.২: স্থল-যুদ্ধ কৌশল ও নিহতদের প্রতি আচরণ........ ২৩০

৮.৩: ইসলাম ও মুসলিম সামদ্রিক আইন........ ২৩৬

৮.৪: নৌ-যুদ্ধের আইন-কানুন........ ২৪১

৮.৫: যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ........ ২৪৫

৮.৬: যুদ্ধমান পক্ষের সঙ্গে অ-বৈরীমূলক যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা........ ২৫৪

৮.৭: যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি (গানিমা, স্থাবর সম্পত্তি ও দাস-দাসী)........ ২৫৬

নবম অধ্যায়

শান্ড়িচুক্তি: স্বরূপ ও আইন

৯.১: শান্ড়িচুক্তির স্বরূপ ও ফলাফল.. ২৬৪

৯.২: ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি.. ২৬৮

৯.৩: ইসলামী প্রবণতার মতবাদ সমূহ.. ২৮২

৯.৪: ইসলাম ও সালিশী.. ২৮৭

৯.৫: আন্ড়র্জাতিক বিতর্কের শান্ড়িপূর্ণ মীমাংসা.. ২৮৮

৯.৬: শত্র্ূদের সঙ্গে আচরণ.. ২৮৯

৯.৭: আশ্রয় দান ও গুপ্তচরবৃত্তি.. ২৯১

৯.৮: আইনের জটিলতা সম্পর্কে ইসলামী ধারণা.. ২৯৪

৯.৯: আইনের আওতাভুক্ত যারা.. ৩০০

৯.১০: রাষ্ট্রপ্রধান (ইমাম).. ৩০৬

৯.১১: মুসলিম অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ.. ৩০৭

৯.১২: মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল (দার্ূল ইসলাম).. ৩১০

৯.১৩: বিদেশী নাগরিক ও মুসলিম আইন.. ৩১৩

৯.১৪: আমান (নিরাপত্তা চুক্তি).. ৩১৫

৯.১৫: অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম.. ৩১৯

৯.১৬: যিম্মিদের মর্যাদা.. ৩২০

দশম অধ্যায়

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতি

১০.১: বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর কূটনৈতিক প্রভাব.. ৩২৫

১০.২: দার্ূল ইসলামের সঙ্গে অমুসলিমদের ব্যবসা বাণিজ্য.................................... ৩২৬

১০.৩: দার্ূল হারবের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য.................................... ৩২৮

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়
বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পররাষ্ট্রনীতি

১১.১	বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়..	৩৩১
১১.২	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি..	৩৩৪
১১.৩	বাংলাদেশের সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতি..	৩৩৭
১১.৪	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি ও নির্ধারকসমূহ..	৩৩৯
১১.৫	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ..	৩৪৩
১১.৬	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও কার্যকরণ..	৩৪৫
১১.৭	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল্যায়ন...	৩৫০
১১.৮	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য..	৩৬১
	মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি..	৩৬১
	বাংলাদেশের ইসলামি সম্মেলন সংস্থায় যোগদান ও বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা........	৩৬৩
	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি...	৩৬৬
	খন্দকার মুশতাক আহমেদের পররাষ্ট্রনীতি...	৩৭৮
	প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি..	৩৮০
	বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের পররাষ্ট্রনীতি...	৩৯১
	পল্লীবন্ধু হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি.................................	৩৯২
	বেগম খালেদা জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি..	৪০০
	বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্রনীতি: একটি সাফল্যময় অধ্যায়	৪০৪

দ্বাদশ অধ্যায়
মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা

১২.১:	বিশ্বায়ন..	৪১৫
১২.২	পশ্চিমা আইন ও ইসলামী চেতনাবোধ..	৪২৭
১২.৩:	সনাতন চিন্তাভাবনা	৪৩৭
১২.৪:	সমস্যাসমূহ..	৪৩৯
১২.৫:	সম্ভাবনা..	৪৪১
১২.৬:	ইসলামী সূত্রসমূহ..	৪৪২
১২.৭:	মুসলমানদের যা করা প্রয়োজন...	৪৪৩
১২.৮:	একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য বর্তমানে যা প্রয়োজন....................................	৪৫২
➢	উপসংহার...	৪৫৪
➢	গ্রন্থপঞ্জি..	৪৫৫

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাবস্ট্রাক্ট (Abstract)

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষক
আবু সালেহ
রেজি নং-৫০/২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

আগস্ট ২০১৭

এ্যাবস্ট্রাক্ট (Abstract)

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবাণীতে আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অশেষ দরুদ ও সালাম পাঠ করছি সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্ব মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী সাইয়্যেদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবিয়্যিন প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

কোন সেই অজানা সময় হতেই মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে এক দেশ হতে অন্য দেশে, এক জনপদ হতে অন্য জনপদে কিংবা তার আবাল্যের পরিচিত এক সমাজ হতে সম্পূর্ণ অন্য এক সমাজে স্থানান্তরিত হচ্ছে, পাড়ি জমাচ্ছে, অভিবাসিত হচ্ছে। কিংবা নিছক জীবন ধারণের তাগিদে, রুজী রোজগারের আশায় চলে যাচ্ছে অন্যত্র, অন্য দেশে। মুসলিম সমাজও ইসলামের সূচনা হতে সমৃদ্ধির সকল পর্যায়েই দেশান্তরিত হয়ে আসছে, হয়ে আসছে স্থানান্তরিত কিংবা অভিবাসিত। নতুন এক পরিবেশে তার অবস্থান, তার আশ্রয়, চালচলন, সে দেশের রীতিনীতি, আচারপ্রথা, আইন-কানুন, সংবিধান ও সরকারি নিয়ন্ত্রণের সাথে তাকে খাপ খাওয়াতে হয়েছে। কখনো তা তার ধর্মবিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে, কখনো বা সঙ্গতি স্থাপন করতে হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধীরে ধীরে তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে এবং নতুন এক সমাজে নিজেদের স্বকীয়তা নিয়ে টিকে থাকার অন্তহীন প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে। এক সময় পরদেশ পরিণত হয়েছে নিজ দেশে। সাধারণ অভিধায় মুসলিম হলেও তাদের গোষ্ঠীগত, মাযহাবগত, ভিন্নধর্মী চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক বিশ্বাসগত কারণে অন্তঃসাম্প্রদায়িক সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে কখনো কখনো।

স্বীয় দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সভ্যতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সংহতি পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে অবশ্যই মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে। সংরক্ষণ করতে হবে তাঁদের মহৎ চিন্তাধারা, পদ্ধতি বিজ্ঞান এবং এসবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে। অন্যদের নিকট নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানিত করার পূর্বে মুসলমানদের অবশ্যই নিজেদেরকে হতে হবে নিজেদের জন্য সত্যবাদী এবং কল্যাণকর। একটি উন্নততর এবং শান্তির পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য রাখতে হবে কার্যকর অবদান।

পররাষ্ট্রনীতি বর্তমান সময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি দেশ কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একা পথ চলতে পারে না। দেশটিকে অবশ্যই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা, ঋণ সংস্থার সদস্য, চুক্তি, আত্মারক্ষা, নিজের দেশের স্বাধীনতা-স্বকীয়তা রক্ষা, আত্মমর্যাদাকে সমুন্নত করা প্রভৃতির মাধ্যমে চলতে হয়। আর ইসলামে এসব বিষয় অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম সার্বজনীন বিশ্বধর্ম। ইসলাম তার অনুপম আদর্শ ও যুগোপযুগী বিধানকে জয় করে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যার কারণে ইসলামের সম্পর্ক মানব জীবনের সর্বত্র। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষকে ইসলামের বিধি বিধান পালন করতে হয়। ইসলাম এমন একটি জীবন বিধানের নাম যার শুরুটা বিশ্বাস দিয়ে এবং যার বাস্তবায়ন হৃদয়ের ঐকান্তিক একাগ্রতা দিয়ে।

ইসলামে তথা কুরআন সুন্নাহে অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হয়েছে, পররাষ্ট্রনীতি দুইটি রাষ্ট্রের পরস্পরিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, রাষ্ট্রদূতদের গুণাবলী ও কার্যাবলী দুইটি রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, শান্তিপূর্ণ আলোচনা, সন্ধি-চুক্তি, সনদ প্রণয়ন, বন্দী বিনিময়, যুদ্ধ বন্দীদের সাথে আচরণ, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। এ কারনেই ইসলামের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ ইসলামের প্রচ্ছন্ন ভাবধারা ও প্রভাব সঞ্চারিত হয়ে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি অঙ্গীভূত হয়ে যেতে দেখা যায়। বস্তুত: ইসলাম একটি অনুপম জীবনাদর্শের নাম। ইসলাম তার অপূর্ব আদর্শিক ও দার্শনিক রূপরেখা নিয়ে সব জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের হৃদয় জয় করতে যেমন সক্ষম হয়েছে তেমনি পররাষ্ট্রনীতির সঠিক রূপরেখা প্রনয়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে ইসলাম বিশ্ব মানবতাকে অনন্তকাল সঠিক ও যথাযথ পথ দেখিয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে যা পেশ করা হয়েছে তা কোন ফতোয়া বা রায় নয়। বরং এগুলো হচ্ছে বিশ্লেষণ এবং মতামত। এসব মতামত নিবেদন করা হয়েছে অন্যদের উদ্দেশ্যে, যে কোন ভ্রান্ত ধারণা নিরসন এবং আরো অধিকতর গতিশীল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আমার এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য হলো মুসলিম, অমুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্ম নিরপেক্ষ নয় এমন বুদ্ধিজীবীদের নিকট ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত তত্ত্বকে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে পেশ করা।

এই অভিসন্দর্ভ দাবী করছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী তত্ত্ব এবং দর্শনই সমকালীন বিশ্বে শান্তির একমাত্র যথার্থ দর্শন। এটাই একমাত্র দর্শন, ধারণা এবং দৃষ্টি ভঙ্গি যা সকল মানুষের উৎপত্তি, স্বার্থ এবং পরিণতি সম্পর্কে অভিন্ন বক্তব্যের উপর জোর দেয়। ইসলাম মনে করে এ নীতিই মানুষের আকৃতি, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক এবং আন্ত:দলীয় সম্পর্ক উপলব্ধির একমাত্র ভিত্তি।

বক্ষমান অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ভাবে উপস্থাপনের জন্য ১২টি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ইসলাম পরিচিতি, ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি, সংশ্লিষ্ট কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা, পররাষ্ট্রনীতি ও ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির তুলনামূলক আলোচনা ও আদর্শ কূটনৈতিকের গুণাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কূটনৈতিক প্রজ্ঞার বিভিন্ন দিক যেমন হিলফুল ফুজুল, আবিসিনিয়ায় হিযরত, মদিনা হিযরত, মদিনা সনদ,

হুদায়বিয়ার সন্ধি, যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ, বন্দি বিনিময়, মক্কা বিজয় ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষমার অপূর্ব দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চুতর্থ-সপ্তম অধ্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদীন (৬৩২ খৃ. - ৬৬১ খৃ.) এবং উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয়, উসমানীয় শাসনামলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, রাজ্য বিস্তার ও পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে ইসলামে যুদ্ধ বিগ্রহ, স্থল, নৌ ও আকাশ যুদ্ধ, গনিমত, যুদ্ধ বন্দী, যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ, নিহতদের প্রতি আচরণ, যুদ্ধমান পক্ষের সঙ্গে অবৈরীমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে শান্তিপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করার জন্য কুরআন-সুন্নাহ কী কী দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে, চুক্তি ভঙ্গকারীর শাস্তির ধরণ, দুটি দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে সালিশী, আন্তর্জাতিক বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, শত্রুদের সাথে আচরণ, গুপ্তচর, আশ্রয়দান, শান্তি সম্বন্ধীয় আলোচনা, ধর্মত্যাগী, দারুল ইসলাম, দারুল হারব, অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম যিম্মিদের মর্যাদা, যিম্মিদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য, বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর কূটনৈতিক প্রভাব, দারুল ইসলামের সাথে অমুসলিমদের, দারুল হারবের সাথে মুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন হবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, পররাষ্ট্রনীতির স্বরূপ, নির্ধারক, মূলনীতি, মূল্যায়ন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস ঐতিহ্য, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ পরবর্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মুশতাক, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আঃ সাত্তার, পল্লীবন্ধু হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা এই শিরোনামে বিশ্বায়ন, পশ্চিমা আইন ও ইসলামী চেতনাবোধ, মুসলমানদের পুরনো ধ্যান-ধারণা মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে বিরাজমান সমস্যা সমূহ ও উত্তরণের পদ্ধতি এবং একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্য মুসলমানদের যা যা করা প্রয়োজন-এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ইসলাম কিরূপ সম্পর্কের দর্শন পেশ করে তার বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিতে আগামী দিনের মানব সভ্যতার জন্য এক নতুন প্রত্যাশাও ব্যক্ত করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে বর্তমান বিশ্বের প্রয়োজন হচ্ছে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী চিন্তা ধারার। শুধু তাই নয়, বিশ্বাস হিসাবেও প্রয়োজন ইসলামেরই। এ জন্য এ অভিসন্দর্ভে আমি সে সব মূল্যবোধ ও ধারণাগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছি, যেগুলো সমকালীন বিশ্বে জাতি সমূহের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো উপহার

দিতে পারে। সমকালীন মুসলমানদের অবস্থার পশ্চাতে কি কারণ বিদ্যমান এবং মুসলমানরা কিভাবে নিজেদের আদর্শকে নিজেরাই বিকৃত করছে, তা অধিকতর বিস্তারিত উপলব্ধির জন্য অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমার উপস্থাপিত গবেষণালব্ধ অত্র অভিসন্দর্ভের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করার জন্য নিবেদন করছি। এতে সমকালীন বিশ্বের ইসলামী মনোভঙ্গি কি তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন। এ উপলব্ধি ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁদের মধ্যে বিরাজমান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বদ্ধ মূল ধারণাগুলোর নিরসন করবে এবং ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধের আলোকে সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য সাধারণ লক্ষ্য নির্ধারণের অংশীদার হিসাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে সাহায্য করবে।

বর্তমান বিশ্বে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যে বৈরী সম্পর্ক বিরাজ করছে তাতে বিশ্ব আজ এক অগ্নিগর্ভের দ্বারপ্রান্তে নিপতিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্তনাদ, বীভৎস মৃত্যু, বিশেষ করে অগণিত মাসুম শিশু, অসহায় নর-নারী ও প্রবীণদের মৃত্যু, শহর-বন্দর, লোকালয়, বনভূমিসহ সর্বত্র যে নিষ্ঠুর ধ্বংস লীলা চলছে তা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব বিনির্মাণে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করা অতি জরুরী সময়ের দাবী।
বক্ষমান অভিসন্দর্ভ ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রকে শান্তিময় বিশ্ব গঠনে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি কার্যকরের প্রেরণা যোগাবে-এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আরো বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। মহান আল্লাহ্ আমাকে ও অভিসন্দর্ভের পাঠককুলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তত্ত্বাবধায়ক	গবেষক
(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ) অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা-১০০০	(আবু সালেহ) রেজি নং-৫০/২০১৩-২০১৪ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা-১০০০

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবাণীতে আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অশেষ দরুদ ও সালাম পাঠ করছি সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্ব মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী সাইয়্যেদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবিয়্যিন প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

কোন সেই অজানা সময় হতেই মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে এক দেশ হতে অন্য দেশে, এক জনপদ হতে অন্য জনপদে কিংবা তার আবাল্যের পরিচিত এক সমাজ হতে সম্পূর্ণ অন্য এক সমাজে স্থানান্তরিত হচ্ছে, পাড়ি জমাচ্ছে, অভিবাসিত হচ্ছে। কিংবা নিছক জীবন ধারণের তাগিদে, রুজী রোজগারের আশায় চলে যাচ্ছে অন্যত্র, অন্য দেশে। মুসলিম সমাজও ইসলামের সূচনা হতে সমৃদ্ধির সকল পর্যায়েই দেশান্তরিত হয়ে আসছে, হয়ে আসছে স্থানান্তরিত কিংবা অভিবাসিত। নতুন এক পরিবেশে তার অবস্থান, তার আশ্রয়, চালচলন, সে দেশের রীতিনীতি, আচারপ্রথা, আইন-কানুন, সংবিধান ও সরকারি নিয়ন্ত্রণের সাথে তাকে খাপ খাওয়াতে হয়েছে। কখনো তা তার ধর্মবিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে, কখনো বা সঙ্গতি স্থাপন করতে হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধীরে ধীরে তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে এবং নতুন এক সমাজে নিজেদের স্বকীয়তা নিয়ে টিকে থাকার অন্তহীন প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে। এক সময় পরদেশ পরিণত হয়েছে নিজ দেশে। সাধারণ অভিধায় মুসলিম হলেও তাদের গোষ্ঠীগত, মাযহাবগত, ভিন্নধর্মী চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক বিশ্বাসগত কারণে অন্তঃসাম্প্রদায়িক সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে কখনো কখনো।

স্বীয় দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সভ্যতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সংহতি পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে অবশ্যই মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে। সংরক্ষণ করতে হবে তাঁদের মহৎ চিন্তাধারা, পদ্ধতি বিজ্ঞান এবং এসবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে। অন্যদের নিকট নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানিত করার পূর্বে মুসলমানদের অবশ্যই নিজেদেরকে হতে হবে নিজেদের জন্য সত্যবাদী এবং কল্যাণকর। একটি উন্নততর এবং শান্তির পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য রাখতে হবে কার্যকর অবদান।

এই অভিসন্দর্ভে যা পেশ করা হয়েছে তা কোন ফতোয়া বা রায় নয়। বরং এগুলো হচ্ছে বিশ্লেষণ এবং মতামত। এসব মতামত নিবেদন করা হয়েছে অন্যদের উদ্দেশ্যে, যে কোন ভ্রান্ত ধারণা নিরসন এবং আরো অধিকতর গতিশীল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আমার এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য হলো

মুসলিম, অমুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্ম নিরপেক্ষ নয় এমন বুদ্ধিজীবীদের নিকট ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত তত্ত্বকে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে পেশ করা।

এই অভিসন্দর্ভ দাবী করছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী তত্ত্ব এবং দর্শনই সমকালীন বিশ্বে শান্তির একমাত্র যথার্থ দর্শন। এটাই একমাত্র দর্শন, ধারণা এবং দৃষ্টি ভঙ্গি যা সকল মানুষের উৎপত্তি, স্বার্থ এবং পরিণতি সম্পর্কে অভিন্ন বক্তব্যের উপর জোর দেয়। ইসলাম মনে করে এ নীতিই মানুষের আকৃতি, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক এবং আন্ত:দলীয় সম্পর্ক উপলব্ধির একমাত্র ভিত্তি।

বক্ষমান অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ভাবে উপস্থাপনের জন্য ১২টি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।
প্রথম অধ্যায়ে ইসলাম পরিচিতি, ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি, সংশ্লিষ্ট কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা, পররাষ্ট্রনীতি ও ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির তুলনামূলক আলোচনা ও আদর্শ কূটনৈতিকের গুণাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কূটনৈতিক প্রজ্ঞার বিভিন্ন দিক যেমন হিলফুল ফুজুল, আবিসিনিয়ায় হিযরত, মদিনা হিযরত, মদিনা সনদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ, বন্দি বিনিময়, মক্কা বিজয় ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্ষমার অপূর্ব দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চুতর্থ-সপ্তম অধ্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদীন (৬৩২ খৃ. - ৬৬১ খৃ.) এবং উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমীয়, উসমানীয় শাসনামলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, রাজ্য বিস্তার ও পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে ইসলামে যুদ্ধ বিগ্রহ, স্থল, নৌ ও আকাশ যুদ্ধ, গনিমত, যুদ্ধ বন্দী, যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ, নিহতদের প্রতি আচরণ, যুদ্ধমান পক্ষের সঙ্গে অবৈরীমূলক আলোচনা করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে শান্তিপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করার জন্য কুরআন-সুন্নাহ কী কী দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে, চুক্তি ভঙ্গকারীর শাস্তির ধরণ, দুটি দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে সালিশী, আন্তর্জাতিক বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, শত্রুদের সাথে আচরণ, গুপ্তচর, আশ্রয়দান, শান্তি সম্বন্ধীয় আলোচনা, ধর্মত্যাগী, দারুল ইসলাম, দারুল হারব, অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম যিম্মিদের মর্যাদা, যিম্মিদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য, বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর কূটনৈতিক প্রভাব, দারুল ইসলামের সাথে অমুসলিমদের, দারুল হারবের সাথে মুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন হবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, পররাষ্ট্রনীতির স্বরূপ, নির্ধারক, মূলনীতি, মূল্যায়ন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস ঐতিহ্য, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ পরবর্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মুশতাক, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আঃ সাত্তার, পল্লীবন্ধু হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা এই শিরোনামে বিশ্বায়ন, পশ্চিমা আইন ও ইসলামী চেতনাবোধ, মুসলমানদের পুরনো ধ্যান-ধারণা মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে বিরাজমান সমস্যা সমূহ ও উত্তরণের পদ্ধতি এবং একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্য মুসলমানদের যা যা করা প্রয়োজন-এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ইসলাম কিরূপ সম্পর্কের দর্শন পেশ করে তার বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিতে আগামী দিনের মানব সভ্যতার জন্য এক নতুন প্রত্যাশাও ব্যক্ত করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে বর্তমান বিশ্বের প্রয়োজন হচ্ছে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী চিন্তা ধারার। শুধু তাই নয়, বিশ্বাস হিসাবেও প্রয়োজন ইসলামেরই। এ জন্য এ অভিসন্দর্ভে আমি সে সব মূল্যবোধ ও ধারণাগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছি, যেগুলো সমকালীন বিশ্বে জাতি সমূহের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো উপহার দিতে পারে। সমকালীন মুসলমানদের অবস্থার পশ্চাতে কি কারণ বিদ্যমান এবং মুসলমানরা কিভাবে নিজেদের আদর্শকে নিজেরাই বিকৃত করছে, তা অধিকতর বিস্তারিত উপলব্ধির জন্য অমুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমার উপস্থাপিত গবেষণালব্ধ অত্র অভিসন্দর্ভের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করার জন্য নিবেদন করছি। এতে সমকালীন বিশ্বের ইসলামী মনোভঙ্গি কি তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন। এ উপলব্ধি ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁদের মধ্যে বিরাজমান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বদ্ধ মূল ধারণাগুলোর নিরসন করবে এবং ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধের আলোকে সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য সাধারণ লক্ষ্য নির্ধারণের অংশীদার হিসাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে সাহায্য করবে।

প্রথম অধ্যায়
ইসলাম ও পররাষ্ট্রনীতি পরিচিতি
১.১: ইসলাম : নামকরণ ও পরিচয়

শাব্দিক অর্থ: ইসলাম (اَلْاِسْلَامُ) আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ হলো আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা,[১] আপোষ করা বা বিরোধ প্রত্যাহার করা, বশ্যতা স্বীকার করা,[২] সন্ধি,[৩] শান্তির পথে চলা ইত্যাদি। এ থেকে নির্গত 'সালমাহ' শব্দের অর্থ দোষক্রুটি থেকে মুক্ত থাকা।[৪] (ইসলাম শব্দটি (سِلْمٌ) (সিলমুন) মূলধাতু হতে নির্গত, সিলমুন অর্থ শান্তি। ইসলাম মানুষকে শান্তির পথে পরিচালনা করে।

ব্যবহারিক অর্থে: আল্লাহ তা'আলা ও রাসুল (স.)-এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে। ইসলামি বিধি-বিধান মেনে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তিময় জীবন লাভ করতে পারে। এ জন্য ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়।

শরিয়তের পরিভাষায়: ইসলাম হলো আল্লাহর কাছে তাওহিদের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়া, শিরক থেকে মুক্তি এবং শিরককারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (١٦٢)لَا شَرِیْکَ لَہٗ ۚ وَ بِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ (١٦٣)

"বলুন: আমার সালাত, আমার ইবাদাত (কুরবানি ও হজ্জ) আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরিক নেই, আর আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলমান"।[৫]

মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ

وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہُ ۚ وَہُوَ فِی الْاٰخِرَۃِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ (٨٥)

---

১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ˆ'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, (ঢাকা : ইফাবা ২০০০), ৪র্থ সং, পৃ. ৩৩
২. ইসমাইল ইবন হাম্মাদ আল জাওহারী, Avq-wmnvn ZvRj jMvZ; (বৈরূত : দারুল 'ইলম, ১৯৮৭), ৪র্থ সং, খ. ৭, পৃ. ২৫৩
৩. ইসমাইল ইবন হাম্মাদ আল জাওহারী, প্রাগুক্ত খ. ৭; পৃ. ২৫৪
৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়া'কুব আল ফিরোজাবাদী, Avj Kvgmj gnxZ, gvI KvÕD Bqvme, খ. ৪, পৃ. ১২৯
৫. আল-কুরআন, ৬ : ১৬২-১৬৩

"আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না, এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।[৬]

শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা, বিনা দ্বিধায় তাঁর যাবতীয় আদেশ নিষেধের আনুগত্য করা এবং তাঁর দেওয়া বিধান ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেখানো পথ অনুসারে জীবনযাপন করাকে ইসলাম বলা হয়।[৭]

হাদিসে, মহানবি (স.) সুন্দরভাবে ইসলামের মূল পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন–

اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِـى الـزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ

অর্থ: ইসলাম হলো– "তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আর হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল। সালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লাহর হজ্ব আদায় করবে।"[৮]

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন। এসব আদেশ-নিষেধ শরিয়ত হিসেবে প্রদান করেছেন। শরিয়তের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ইসলাম। এটি হলো মানবজাতির জন্য নির্দেশিত সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলাম একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা।"[৯]

সুতরাং ইসলাম হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম। আর যিনি ইসলাম অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান।

নামকরণ

---

৬. আল-কুরআন, ৩ : ৮৫

৭. Bmjvgx wek‡Kvl; ঢাকা: ইফাবা; ১৯৯৮, খ.৫, পৃ. ২৯৫

৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী; mnxn gmwjg, (বৈরূত : দারুল ফিকহ, ১৯৮৭), খ.১, পৃ. ২৮, হাদিস নং ১০২

৯. আল-কুরআন, ৩ : ১৯

ইসলাম সর্বজনীন[১০] ধর্ম। এটি কোনো কাল, অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ধর্মের নামকরণ সে সব ধর্মের প্রবর্তক, প্রচারক, অনুসারী কিংবা জাতির নামে করা হয়েছে। যেমন:

ইহুদী ধর্ম

ক. হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র ইয়াহুজা'র নামানুসারে ইয়াহুদী ধর্মেল নামকরণ।

খ. ইয়াহুদী ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ Judaism ইসরাঈলীগণ যেহোভাকে সমগ্র বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর মনে করে। ইয়াহুদী ধর্মের সৃষ্টিকর্তাকে যেহোভা (Jehova) বলা হয়।

গ. হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরে ফিলিস্তিনে যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম ছিল ইয়াহুদী রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রের দিকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়।[১১]

খ্রিস্টধর্ম

ক. খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদেরকে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা:)-এর সুন্নায় নাসারা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে[১২]

খ. নাসারা নামটি 'নাসরানা' নামক জনপদের দিকে সন্বন্ধযুক্ত। যেখানে ঈসা মসীহ আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন[১৩]

গ. এছাড়াও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে 'আহলুল কিতাব' ও 'আহলুল ইঞ্জীল' নামে ভূষিত করেছেন।[১৪]

মাজুসী ধর্ম

মাজুস মূলত ফার্সি শব্দ। আরবিতে এর ব্যবহার আছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ৬টি মৌলিক ধর্মের[১৫] মধ্যে মাজুস ধর্মটি অন্যতম। মাজুস ধর্ম আসলে ভাল ও মন্দ এই দুই শক্তিতে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে এ দুয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব চলছে। বলা হয়ে থাকে, মাজুস নামক এক ব্যক্তির দিকে নির্দেশ করেই এ ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। আবার কারও কারও মতে, এটি পারস্যের কোনো এক গোত্রের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। অথবা এটি অগ্নি উপাসকদের উপাধী।[১৬]

---

১০. বদরুদ্দিন আহমদ, Dcgnv‡`‡ki ivRbwZ I mv¤c`wqKZv, (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক ডিপো,২০০৬), পৃ.৫৪

১১. আবু বকর মো. জাকারিয়া মজুমদার ও মো. আ. কাদের, ZjbvgjK ag I gmwjg gbxlv, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১১, পৃ. ১৯১, ১৯২

১২. আল-কুরআন, ২ : ৬২, ২ : ১১১, ২ : ১১৩

১৩. ড. সাউদ ইবন্ আব্দুল আযীয আল-খালাফ্, w`ivmvZb wdj Av`Bqvb, Avj-Bqvûw`q¨vn Iqvb bvmiwbq¨vn (রিয়াদ: মাকতাবাতু আদওয়াইস সালাফ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি.) পৃ.৩২৮

১৪. আল-কুরআন, ৩ : ৬৪, ৫ : ৪৭

১৫. আল-কুরআন, ৩ : ৬৪ ও ২২ : ১৭

১৬. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল-জুহানী, Avj-gvImAvZj gqvmmvivn wdj Av`Bqvb Iqvj gvhv‡ne Iqvj Avnhve

হিন্দু ধর্ম

আর্যগণ ভারতে এসে প্রথমে ‘সপ্তসিন্ধু’ প্রদেশে বাস করেন। পারসিকগণ সপ্তসিন্ধুকে বলতেন ‘হপ্তহিন্দু’। তাঁরা ‘স’-কে ‘হ’ উচ্চারণ করতেন। তাদের এই ‘হপ্তহিন্দু’ থেকে ভারতীয় আর্যদের নাম হয় ‘হিন্দু’। কাজেই হিন্দু নাম পারসিকদের দেওয়া। বেদ, স্মৃতি, পুরাণে হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। তারপর সপ্তসিন্ধু থেকে আর্যরা ক্রমশ উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে, যাকে তখন ‘আর্যাবত’ নামে অভিহিত করা হত। কালক্রমে হিন্দুধর্ম থেকে দুটি বৃহৎ ধর্মের উদ্ভব ঘটে, জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম।[১৭]

বৌদ্ধ ধর্ম

সিদ্ধার্থ গৌতম বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ অর্থ আলোকিত জন। শিষ্যরা তাকে এ নামেই ডাকতেন। তিনি কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশে মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮]

কনফুসীয় ধর্ম

কনফুসীয় ধর্মটি চীনের অধিবাসীদের ধর্ম বলে সবিশেষ পরিচিত। দার্শনিক কংফু-সু এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করেই এ ধর্মকে কনফুসীয় ধর্ম বলে থাকে।[১৯]

কিন্তু ইসলাম সর্বজনীন[২০] ধর্ম হওয়ার কারণে এর নামকরণ কারও নামে করা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তির পথে জীবন পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এর নামকরণ করা হয়েছে ইসলাম।

Avj-gAvmvivn (রিয়াদ : দারুন নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ হি) পৃ.৩৪২।
১৭. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ag‘kb (কলিকাতা : ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯) পৃ.১০৮।
১৮. জিতেন্দ্র লাল বাড়ুয়া, †eŠ× ‘k‡bi i/c‡iLv (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০১), পৃ. ৪-৫
১৯. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল-জুহানী, cv¸³, পৃ. ৭৫৮
২০. বদরুদ্দিন আহমদ, Dcgnv‡`‡ki ivRbxwZ I mv¤c`wqKZv, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক ডিপো,২০০৬, পৃ.৫৪

১.২: ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলাম সর্বযুগের সমস্ত নবি-রাসূলের দীন। সুতরাং যে দিন থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছে সে দিন থেকেই ইসলামের উৎপত্তি। হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ্ তা'আলা যখন পাঠিয়েছিলেন, তখনই তাঁকে ইসলামসহ পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

نَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ ۔ ّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۔ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ
الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٢١٣)

অর্থাৎ "মানুষ একই দলভুক্ত ছিল, (অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ হলো), তারপর আল্লাহ্ নবিদেরকে সুসংবাদদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করলেন এবং তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন যথাযথভাবে, যাতে তিনি তাদের মধ্যে যাতে মতভেদ হয়েছে তাতে সঠিক ফয়সালা দিতে পারেন।"[২১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশুই ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার পিতা-মাতা তাদেরকে ইয়াহূদী, নাসারা কিংবা মাজুসী বানায়'।[২২]

সুতরাং ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা যা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দিয়েছেন। আর এটিই এমন এক জীবন ব্যবস্থা যার জন্যে তিনি সমস্ত নবি-রাসূলকে পাঠিয়েছেন। আর এটিই তিনি শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে শরিয়ত তথা চলার পথের কিছু পার্থক্য হয়েছে কিন্তু মৌলিক আকিদাহ্ বিশ্বাসে নবিরা সবাই ছিলেন একই মতাদর্শভুক্ত। আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নবিরা হচ্ছেন এমন বৈমাত্রেয় ভাই যাদের পিতা এক, মাতা বিভিন্ন'।[২৩]

---

২১. আল-কুরআন, ২ : ২১৩

২২. আবূ 'আব্দিলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী আল জু'ফি; mnxn eLvix; আল-বৈরুত, ১৯৮৭, খ. ৩; পৃ. ৩৪০;
হাদীস নং ১৩৫৮; বাব : জুমা'আর দিন সুগন্ধি ব্যবহার অধ্যয়;
অনুরূপ– mnxn gmwjg; খ. ৮, পৃ. ৫৩; হাদিস নং ৬৯২৯

২৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, mwnn gmwjg, বাব- হযরত ঈসা (আ.) এর ফজিলত বর্ণনা অধ্যায়, বৈরুতঃ দারুল কিতাব, ১৯৮২ খ.৭, পৃ. ৯৬, হাদিস-৬২৮১

১.৩: ইসলামের ভূমিকা,গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলামের ভূমিকা: ইসলাম হলো আল্লাহ তা'আলার প্রবর্তিত ধর্ম বা জীবন বিধান। এটি মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নিয়ামত। এটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সকল বিষয় ও সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানের দিকনির্দেশনা এতে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ -

অর্থ: “আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেই নি।”[২৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম; আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীতি করলাম।”[২৫]

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতির সকল বিষয়ে ইসলামে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বা পরকালের অবস্থার বর্ণনাও ইসলামে রয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের বিকল্প নেই।

ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব: ইসলাম-শিক্ষা হলো ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। কোনো কিছু বাস্তবায়ন করতে হলে প্রথমে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়। যেমন সাঁতার কাটতে হলে প্রথমে সাঁতার কী, কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় ইত্যাদি শিখতে হয়। গাড়ি চালাতে হলে গাড়ি ও গাড়ি চালানো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ঠিক তেমনি ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর এর প্রধান মাধ্যম হলো ইসলাম শিক্ষা।

ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও আনুগত্য শিখতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, উঠা বসা কীভাবে করতে হবে তা জানতে পারি। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি গুণের অনুশীলন করতে পারি। লোভ, হিংসা, মিথ্যাচার, অহংকার, পরনিন্দা ইত্যাদি

২৪. আল কুরআন, ৬ : ৩৮
২৫. আল কুরআন, ৫ : ৩

খারাপ অভ্যাস পরিহার করে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারি। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে পারি। পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় জানতে পারি। এক কথায় ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা লাভের দিকনির্দেশনা অর্জন করতে পারি।

ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ: ইসলাম হচ্ছে, মনে প্রাণে, মৌখিকভাবে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল। ইসলাম আরও বোঝায় ঈমানের সাতটি মৌলিক বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমল এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ইহসান অবলম্বন।

যেমন হাদিস শরিফে এসেছে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম; এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও মিশমিশে কাল চুলওয়ালা একজন লোক আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার মধ্যে (আগন্তুকের ন্যায়) ভ্রমণের কোন চিহ্নও দেখা যাইতেছিল না, অথচ আমাদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে চিনিতেও পারিতেছিল না। (স্থানীয় হইলে আমরা তাঁহাকে অবশ্যই চিনিতাম)। এমন কি তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বসিলেন। অতঃপর হুযূর (সা.)-এর দুই জানুর সহিত নিজের দুই জানু মিশাইয়া এবং নিজের দুই হাত তাঁহার দুই উরুর উপর রাখিয়া বলিলেন : 'হে মুহাম্মদ (সা.)-এর! আমাকে বলুন ইসলাম সম্বন্ধে- (ইসলাম কি?) হুযূর (সা.)-এর উত্তর করিলেন : 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ (উপাস্য) নাই এবং মুহাম্মদ (সা:) তাঁহার রাসূল। এ ঘোষণা করিবে, নামায কায়েম, করিবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা রাখিবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করিবে- যদি তুমি সেখানে পৌঁছিতে সমর্থ হও,- ইহাই হইল ইসলাম। তিনি বলিলেন, ঠিক বলিয়াছেন! তাঁহার (আচরণে) আমরা আশ্চর্যবোধ করিলাম- (অজ্ঞ লোকের ন্যায়) প্রশ্নও করিতেছেন আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) তাঁহার সমর্থনও করিতেছেন।[২৬]

ইসলামী রিসালাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নঃ

১. মানুষকে তাদের প্রতিপালক প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পরিচিত করা। তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের সাথে সমনামের অধিকারী কেউ নেই, গুণাবলির সাথে কেউ সমকক্ষ নেই। তাঁর হিকমতপূর্ণ কার্যাবলির

২৬.ওলীউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ওরফে খতিব তাবরেযী; ‡gkKvZj gvmvexn, ইন্ডিয়া: আশরাফিয়া বুক ডিপো.দেওবন্দ, সাহরানপুর, ১৯৯১,পৃ.১১

Dhaka University Institutional Repository

সাথে তাঁর কোন শরিক নেই এবং সকল বিষয়ে তাঁর একক অধিকারের সাথে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, এটার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করা।

২. আল্লাহ্ যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং যাঁর কোন শরিক নেই, তাঁর ইবাদাতের প্রতি বান্দাদের আহ্বান করা, তাঁর কিতাব ও তাঁর নবি (সা.)-এর সুন্নাহর মাধ্যমে আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত যে জীবন বিধান তিনি দিয়েছেন তার যথাযথ বাস্তবায়ন। যে জীবন-বিধানে নিহিত রয়েছে মানবজাতির কল্যাণ এবং তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও সৌভাগ্য।

৩. মানুষদেরকে তাদের অবস্থা ও মৃত্যুর পরে তাদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে উপদেশ দেয়া, কবরে অচিরেই তারা কি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশ এবং তাদের আমল-ভালো হলে ভালো, মন্দ হলে মন্দ অনুযায়ী জান্নাত অথবা জাহান্নামে গমন বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া।[২৭]

১.৪: পররাষ্ট্রনীতি পরিচিতি ও নির্ধারক সমূহ

পররাষ্ট্রনীতি কী : আধুনিক বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই এককভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। প্রতিটি রাষ্ট্রই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দ্বারা আবদ্ধ। এই কারণেই প্রতিটি রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্যরূপে রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমেই কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সমাজের ঘটনা ও সমস্যা সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, নিজের আন্তর্জাতিক আচরণের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে।[২৮]

কোন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নীতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

যথা, 'আভ্যন্তরীণ নীতি (domestic policy) ও 'পররাষ্ট্রনীতি' (foreign policy)।

পররাষ্ট্রনীতি বলতে কী বোঝায়, তা জানার জন্য আমাদেরকে

'পররাষ্ট্র' (foreign) ও 'নীতি' (policy) -এ দুটি শব্দের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে।

'নীতি' বলতে সাধারণত আমরা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রণীত কার্যাবলিকে বুঝি।

---

২৭. আবু বকর মো. জাকারিয়া মজুমদার ও মো. আ. কাদের, Zjbvgj K ag I gmwj g gbxlv, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১১, পৃ.১৪৫

২৮. নির্মলকান্ড়ি ঘোষ, AvšRwZK mµúK: ছায়া প্রকাশনী, (কলিকাতা: ১৯৯০), পৃ.১৩৪

অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড (Norman J. Pedelford), লিংকন (George A. Lincoin) ও অলভির (Lee D. Olvey) মতে,

‘নীতি হল কোন প্রক্রিয়ার সম্যক ফল, যার মাধ্যমে উদ্দেশ্যাবলি অর্জন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কোন রাষ্ট্র তার বিস্তৃতভাবে চিন্তিত লক্ষ্য ও স্বার্থকে সুনির্দিষ্ট কার্যে পরিণত করে’ (Policy is the overall result of the process by which a state translates its broadly conceived goals and interests into specific courses of action in order to achieve its objectives and preserve its interests.)[29]

ধারণাগত দিক থেকে (conceptually) দেখতে গেলে বলা যায় যে, পররাষ্ট্রনীতি হল কোন রাষ্ট্রের জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত।

এ-সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রুশিয়ার বিখ্যাত কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদ বিসমার্ক (Prince Otto vo Bismarck) চমৎকারভাবে বলেছেন,

আভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হল পররাষ্ট্রনীতি (The extension of domestic policy is foreign policy.)। পররাষ্ট্রনীতির একটি কার্যকর সংজ্ঞার (operational definition) জন্য আমরা বলতে পারি, পররাষ্ট্রনীতি হল কোন রাষ্ট্রের সে-সব কার্যের ধারা, যা সে-দেশ তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের কারণে তার সীমারেখার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্পাদন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক পটভূমি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। আণবিক মরণাস্ত্রের প্রসার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় নির্ভরশীলতাকে ব্যাপকতর করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজের জাতীয় নীতি, লক্ষ্য এবং স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকে। পররাষ্ট্রনীতি ঐ নীতি, লক্ষ্য এবং স্বার্থ বাস্তবায়নের একটি বিশেষ পদ্ধতিগত মাধ্যম।[৩০]

পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা (Definition of Foreign Policy)

29. Norman J. Pedelford, George A. Lincoln and Lee D. Olvey, *the dynamics of International Politics* (New York : Macmillan Publishing Co, Third edition, 1976,)P. 201
৩০. নির্মলকান্ড়ি ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

পররাষ্ট্রনীতি হল নির্দিষ্ট আন্তঃরাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অনুসরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া-বিশেষ। পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। পররাষ্ট্রনীতি হল বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ত সংবেদন বা প্রতিক্রিয়া। পররাষ্ট্রনীতিবিহীন রাষ্ট্রকে সমুদ্রে নাবিকহীন জাহাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

১. চার্লস বার্টন মার্শাল (Charles Burton Marshall)-এর মতে,

পররাষ্ট্রনীতির সমষ্টি বলতে কোন রাষ্ট্রের লক্ষ্যের সমষ্টিকে বোঝায় না। পররাষ্ট্রনীতি বলতে রাষ্ট্র যে সকল ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করছে অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা করতে চাইছে তাদের সমষ্টিকে বোঝায়।[৩১]

২. যোশেফ ফ্রাঙ্কেলের মতে,

পররাষ্ট্রনীতি বলতে সেই ধরনের সিদ্ধান্ত বা ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিকে বোঝায় যা একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত।[৩২]

৩. সি. ভি. ক্র্যাবে (C. V. Crabbe)-র মতে,

পররাষ্ট্রনীতি দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত : জাতীয় লক্ষ্য (Goal) পূরণ এবং ঐ লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম নির্ধারণ। তার মতে, জাতীয় লক্ষ্য পূরণ এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় কৌশলের এক চিরন্তন বিষয়ে পরিণত হয়েছে।[৩৩]

৪. হলস্‌টি পররাষ্ট্রনীতিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন–[৩৪]

১. পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি (Foreign Policy Orientation)।

২. জাতীয় ভূমিকা (National roles);

৩. লক্ষ্য (Objectives);

৪. ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ (Actions and Behavior);

---

31. C. B. Marshall, *The Limits of Foreign Policy, in Michael Curtis (ed.), The Nature of Politics,* (New York : Macmillan Publishing Co, Third edition, 1976,)P. 582
32. Joseph Frankel, *The making of Foreign Policy,* (New York : Macmillan Publishing Co, Third edition, 1976,)P. 1.
33. C. V. Crabbe, *American Foreign Policy in the Nuclear Age,* (New York : Macmillan Publishing Co, Third edition, 1976,) P. 1
34. K.J. Holsti, *International Politics : A Frame-work For Analysis,* P. 360

Foreign Relations :The image of an independent and sovereign state depends on its foreign relations or foreign policy. However, these relations, which are considered important to a country, are subject to change for the sake of the country's interests.[35]

পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ (Determinants of Foreign Policy)

প্রত্যেক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে। ঐ নীতি এককভাবে নীতি-প্রণেতাদের ইচ্ছা ও বিবেচনার উপর নির্ভরশীল নয়। পররাষ্ট্রনীতির প্রণেতাগণকে বহু বিষয় বিবেচনার পর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। বহু উপাদানের দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হন। যে সব উপাদানের দ্বারা পররাষ্ট্রনীতি প্রভাবিত হয় তাদের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক বলা হয়।

পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহের মধ্যে

* ভৌগোলিক-সামরিক অবস্থান (Geographical strategic location),

* জনসংখ্যা (Population),

* অর্থনৈতিক অগ্রগতি (Economic development),

* মতাদর্শগত পরিবেশ (Ideological environment),

* সামরিক সামর্থ্য (Military capacity),

* ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার (Historical inheritance),

সরকার, জাতীয় নেতৃত্ব এবং কূটনীতির গুণগত মান (Quality of Government, national leadership and diplomacy),

প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সমাজের অন্যান্য সদস্যদের আচরণ (Behavior of the neighbouring states and other members of the international society)

সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে, পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকের সংখ্যা অনেক। কোন বিশেষ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে নির্দিষ্ট উপাদান মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এককভাবে কোন

---

35. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Banglapedia, National Encyclopedia,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003,V.4; P.239

উপাদান পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকে পরিণত হতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে, একাধিক উপাদান পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার মধ্যে কোনটি মূখ্য এবং কোনটি গৌণ উপাদানরূপে বিবেচিত হতে পারে।[৩৬]

১.৫: ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি ও অনুমোদন

মানবজাতির ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বহিঃশত্রুদের আক্রমণের ভয় না থাকলে একটি সভ্যতার মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও জাতির সমন্বয় গড়ে ওঠে। এসব জাতির পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয়ে আচার-ব্যবহারের ভূমিকা সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। গোটা জাতি একই কর্তৃত্ব বা আইন দ্বারা শাসিত হয়, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। সহজেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন নিকট-প্রাচ্য, গ্রীস, রোম, চীন, ইসলামজগত ও পাশ্চাত্য খৃষ্টান রাষ্ট্র গোষ্ঠী; প্রত্যেক দেশে বা অঞ্চলে এক একটা করে স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।[৩৭] শান্তির সময়ে অথবা যুদ্ধকালে একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলো নিয়ম-কানুন ও ব্যবহার বিধি গড়ে ওঠে।

অতীত যুগে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি আধুনিক পররাষ্ট্রনীতির মত বিশ্বব্যাপী বা সর্বজনীন ছিল না। কারণ, তখন আন্তর্জাতিক আইনের কাজ ছিল একটি বিশেষ এলাকার ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও জাতিগুলোর পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ নীতি কেবলমাত্র একটি সভ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন ও প্রাচীন আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, প্রাচীন আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্র ছিল খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কারণ এ আইন-বিধান পৃথিবীর জাতিগুলোর মধ্যে আইনের ব্যাপারে পারস্পরিক সাম্য মেনে নেয় নি। কিন্তু বিভিন্ন জাতির আইনগত সাম্য আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি রচনা করেছে। তাই তখন বিভিন্ন জাতির আন্তর্জাতিক আইন সুসংবদ্ধ ও একত্রিত করে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আইন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি অন্যান্য আইন বিধান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। এ নীতিকে আইনের সাময়িক বিধি-ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়। কিতাবিগণ (খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি) ছাড়া অন্য সব জাতি যতদিন

---

৩৬. নির্মলকান্টি় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

৩৭. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, (অনু. অধ্যাপক মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার), Bmjvg I AvšÍRvwZK
mম্পK, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (BIIT) ২০০২, পৃ. ৪৩

পর্যন্ত মুসলমান না হন, কেবলমাত্র ততদিন পর্যন্তই এ নীতি বলবৎ থাকবে। কাজেই ইসলামের মিশন যদি সফল হয়, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়ের আর প্রয়োজন হবে না।[৩৮] সুতরাং যতদিন পর্যন্ত অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদেরকে বসবাস করতে হবে, ততদিন মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলো নীতির প্রয়োজন রয়েছে।[৩৯]

কয়েকটি জাতি নিয়ে একটি জাতিপুঞ্জের অস্তিত্ব আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত হয়েছে। এক একটি জাতির সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ও সমমর্যাদাও স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল, সমগ্র দুনিয়াকে একই ইমামের অধীনে এবং একই আইন ও ধর্মের আওতায় আনা। প্রাচীন রোম ও মধ্যযুগীয় খৃষ্টান রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থার মতোই মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন সর্বজনীন রাষ্ট্রের প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ প্রদত্ত সর্বজনীন আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে খৃষ্টান রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্র উভয়ই একথা ধরে নিয়েছিল যে, সব মানুষ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এ গোষ্ঠী এক আইন দ্বারা পরিচালিত ও একই শাসকের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার করাই ছিল এর লক্ষ্য। গোষ্ঠীর রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থের ওপরেই এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নির্ভর করত: পারস্পরিক সম্বলিত ও সুযোগ সুবিধা এ আইনের পেছনে খুব বেশী কাজ করে নি।

তাছাড়া ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি প্রযোজ্য হত ব্যক্তির ওপর। আঞ্চলিক গোষ্ঠীর ওপর এ নীতি প্রয়োগ করা চলত না। কারণ, প্রাচীনকালের আইন বিধানগুলোর মত ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির ব্যবস্থা স্থান কেন্দ্রিক ছিল না; এ ছিল একান্তরূপেই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক।

পরিশেষে একথাও মনে রাখা উচিত যে, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন নয়। ইসলামী জগতের ভেতরে-বাইরে মুসলিম অমুসলিমের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আইনের সম্প্রসারণ করেই আন্তর্জাতিক আইনের জন্ম হয়েছে। সূক্ষ্ম বিচারে ধরা পড়বে যে, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনে জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উৎস বা সমর্থন (Sanction) এর ব্যাপারেও কোন বিভিন্নতা নেই। হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ইহুদী আইন-বিধান ও মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন প্রাণবস্তুতে প্রায় একই জিনিস। ইহুদী জাতি ও অইহুদী জাতিদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে এ আইন বলবৎ ছিল। প্রাথমিক যুগে মুসলমান আইনবিদগণ 'জিহাদে'

৩৮. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, Bmj‡g c×Zi ÿ¨ †KŠkj ('হাদীসে দেফা' নামক বিখ্যাত উর্দু গ্রন্থের বাংলা তরজমা), ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮৪, পৃ. ৩০-৩২

৩৯. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধক্ষেত্রে লব্ধ ধনসম্পদ আমান (নিরাপত্তা) ও আলখারাজ, এসব বিষয়ের সঙ্গেই ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি বিষয়টি বিবেচনা করতেন। ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি বিষয়টি পরে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এবং আন্তর্জাতিক আইন বুঝাতে 'আস-সিয়ার' কথাটি প্রচলিত হয়ে যায়। আইনের যে শাখাটি কেবলমাত্র ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি নির্ণয়ে প্রযুক্ত হয়, তারই নাম 'আস-সিয়ার।[৪০]

কোন কোন আইনবিদ অবশ্য 'জিহাদ' কথাটিই চালু রেখেছিলেন।

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি বলতে আমরা যদি অন্যান্য জাতির সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়ের সমগ্র আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থার কথা বলি, তবে আইনের চিরাচরিত মূল (উসুল) ও শরিয়তের উৎস ভিন্ন আরও অনেক জায়গা থেকেই মুসলিম আইনের নজির খুঁজে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কিত চুক্তি, জনসমক্ষে খলিফার উক্তি ও যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত নির্দেশাবলী (যেগুলো আইনবিদগণ পরবর্তী যুগে লিপিবদ্ধ করেন) এবং ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে মুসলিম আইনবিদদের মতামত, অনুশীলন ও ব্যাখ্যা। আধুনিক ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির আলোকে একথা বলা চলে যে, ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি আইন উৎসগুলো আধুনিক যুগের আইনবিদ ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিধি (Statute) সম্মত উৎসগুলোর সঙ্গে একই পর্যায়ে পড়ে। এর মধ্যে আছে ঃ মতৈক্যমূলক চুক্তি (Agreement),আচার-ব্যবহার, চুক্তি ও কর্তৃত্ব।[৪১] আল-কোরআন ও প্রামাণ্য হাদিস কর্তৃত্বের পর্যায়ে, আরবীয় প্রচলিত আইন আচার-বিধির পর্যায়ে, অমুসলিমের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির আইন মতৈক্যমূলক চুক্তির পর্যায়ে আর ফতোয়া, আইন-সম্পর্কিয় তফসীর, কিয়াস ও অন্যান্য প্রামাণ্য সূত্র থেকে লব্ধ আইনের ব্যাখ্যা ও রূপায়ণের ব্যাপারে খলিফাদের বাণী ও অভিমত যুক্তির পর্যায়ে পড়বে। এসব বাণী মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রথম যুগের আইনের তাফসীর ও ফতোয়ার সংকলনের মধ্যে পাওয়া যায়।[৪২]

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অনুমোদন

অধুনা কিছু নতুন বিষয় ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির আওতাভুক্ত হয়েছে। যদিও এসব বিষয় এর কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়নি; তবুও তা উল্লেখযোগ্য। ১৯১৯ সালে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ জাতিপুঞ্জে (League of Nations) যোগদান করে এবং পরবর্তীকালে এর উত্তরসুরী জাতিসংঘে (U.N.), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) ও অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানেও যোগ দেন। বৃটিশ

---

৪০. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান; প্রাগুক্ত, পৃ.৫১

৪১. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩২

৪২. মজিদ কাদ্দুরী, (অনু. অধ্যাপক হাসান জামান), Bmjv‡gi 'wó‡Z kwšÍ I hx, ঢাকাঃ জ্ঞান বিতরণী প্রকাশনী, ২০১০, পৃ.৪৫

কমনওয়েলথ, রুশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফরাসী কমিউনিটির সদস্যপদও উল্লেখযোগ্য। এর ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই তার সার্বভৌম ক্ষমতার কিছু কেবল এসব প্রতিষ্ঠানের কাছেই অর্পণ করতে হয়নি বরং রাষ্ট্রদূত ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি বিশেষকেও কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়েছে। উপরন্তু, আরব রাষ্ট্রপুঞ্জও (The League of Arabs states) বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এর পর্যবেক্ষকগণ সরকারীভাবে জাতিসংঘে প্রবেশাধিকার পায়। পুনরায়, অনেক মুসলিম রাষ্ট্র যেমন মিশর, তুরস্ক, পাকিস্তান প্রভৃতি পোপকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধি আদান-প্রদানের সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।[৪৩]

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অনুমোদন ক্ষেত্রবিশেষ সাধারণ মুসলিম আভ্যন্তরীণ আইনের অনুরূপ, বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের বেলায়। কারো প্রতি অন্যায় করা হলে সরকার বিচার সংস্থার মাধ্যমে এর সুবিচার করেন। জাগতিক বিধি-নিষেধের তুলনায় আধ্যাত্মিক ও বিবেকধর্মী আবেদন ও নিবৃত্তিমূলক উপাদানসমূহ অধিক কার্যকরী। অতএব, শুধু চাপে পড়েই কেউ আইন পালন করে না বরং যেখানে প্রতিশোধ, দুর্নাম এবং অপবাদের ভয় ছাড়া তার ইচ্ছার ওপর অন্য কোন বাধা নেই সেখানেও সে ব্যাক্তি আইন মেনে চলে।

১.৬: কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতির (Foreign Policy) মূলকথা মানবিক ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও সন্ধি। সব মানুষই আদম সন্তান, অতএব সবদেশের মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ পাবার অধিকার সকল মানুষেরই আছে। কখনো কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে কোনরূপ বিবাদ হলে তা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করে নেয়া এবং সন্ধি ও মৈত্রী চুক্তি করা অবশ্যই কাম্য। তাই কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করলে তা যথাসম্ভব রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে ইহাই ঈমানের দাবি।

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আল্লায় তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজিদে বলেন,

وَ اَوۡفُوۡا بِالۡعَہۡدِ ۚ اِنَّ الۡعَہۡدَ کَانَ مَسۡـُٔوۡلًا (৩৪)

অর্থ: "তোমরা পারস্পরিক ওয়াদাসমূহ পূর্ণ কর। কেননা এই ওয়াদা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৪৪]

---

৪৩. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, (অনু. শরীফ আব্দুল্লাহ্ হারুন ও অধ্যাপক গোলাম রসুল), gmwjg ivó cwiPvjb e¨e¯'v, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮১, পৃ. ১৬

৪৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৪

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ(۸)

অর্থ: "এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হচ্ছে সেই সব মুমিন লোক, যারা তাদের আমানতসমূহ এবং তাদের ওয়াদা সতর্কতার সাথে রক্ষা করে।"[৪৫]

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۙ(۱۹)الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۙ(۲۰)

অর্থ: "কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। তারা তো সেই লোক, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে এবং চুক্তি কখনো ভঙ্গ করে না।"[৪৬]

فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (۷)

অর্থ: "দ্বিতীয় পক্ষের লোক যতক্ষণ তোমাদের সাথে অঙ্গীকারে অটল থাকে তোমরাও অটল থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকী, পরহেজগারদের পছন্দ করেন।"[৪৭]

সূরা তাওবার উল্লেখিত আয়তটির ব্যাখ্যায় Zvdmx‡i gv´Av‡idi-কোরআন প্রণেতা বলেন ,

সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত চার আয়াতের প্রথম আয়াতে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার কিছু কারণ দর্শানো হয়। এতে মুশরিকদের দুষ্ট প্রকৃতি এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে, তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশা বাতুলতা মাত্র। তবে মসজিদুল-হারামের পাশে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় তাদের কথা ভিন্ন। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে ওদের অঙ্গীকার বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, যারা একটু সুযোগ পেলেই প্রতিশ্রুতি বা আত্মীয়তা কোনটিরই ধার ধারবে না কারণ, চুক্তি সই করলেও চুক্তি পালনের কোন ইচ্ছা তাদের অন্তরে নেই। তারা শুধু মুখের ভাষায় তোমাদের সন্তুষ্ট করতে চায়। তাদের অধিকাংশই চুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক।

কোরআন মাজীদ মুসলমানদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোন অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন নগণ্য সংখ্যক মুশরিক ছাড়া বাকি সবাই চুক্তিভংগ করেছে। সাধারণত এমতাবস্থায় বাছ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোষ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যাগুরু অবরাধী দলের একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। কিন্তু কোরআন- "তবে যাদের

৪৫. আল-কুরআন, ২৩ : ৮
৪৬. আল-কুরআন, ১৩ : ১৯-২০
৪৭. আল-কুরআন, ৯:৭

সাথে তোমরা মসজিদুল-হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ” বলে ওদের পৃথক করে যে, যারা চুক্তিভংগ করেনি, এবং আদেশ দেয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভংগকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তভঙ্গ করো না। বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশ বশত: এদের কষ্ট দেবে না।[৪৮] অষ্টম আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। যেখানে বলা হয়-

“এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী” অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছুসংখক ভদ্রচিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। কোরআন মজীদ বিষয়টি অপর এক আয়াতে পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে “কোন জাতির শত্রুতা যেন বে-ইনসাফ হতে তোমাদের উদ্বুদ্ধ না করে”।- (মায়েদাহ)।**

চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলো আয়াতে উল্লিখিত আছে, তার সারমর্ম হল, ষষ্ঠ হিজরী সালে রসূলুল্লাহ (সা.) উমরা পালনের নিয়ত করেন। কিন্তু মক্কার কোরাইশ বংশীয় লোকেরা হযরত (সা.) কে মক্কা প্রবেশে বাঁধা দেয়। পরে তাদের সাথে হোদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। এই মেয়াদকাল ছিল Zdmx‡i Ôiæûj-gvÔAvbvÔiÔ বর্ণনা মতে দশ বছর। মক্কার কোরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হোদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার একটি ধারা এও ছিল যে, কোরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কোরাইশদের মিত্র অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিত্র হয়ে তাঁর সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে ‘খোযাআ’ গোত্র রসূলুল্লাহ (সা.)-এর এবং বনুবকর গোত্র কোরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হল, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এদের কারো প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্ত ভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। সপ্তম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সা.) গত বছরের উমরা কাযা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন এব্ং তিনদিন তথায় অবস্থান করে সন্ধি মুতাবিক মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনূবকর গোত্র বনু খোযাআর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কোরাইশরা মনে করে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থান বহু দূরে তদুপরি এ হল নৈশ অভিযান।

৪৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রা.) (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান), Zdmx‡i gvÔAv‡idj-†KviAvb, খ. ৪, ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৬ পৃ.৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌঁছবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনূবকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে, যা কোরাইশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল, হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছর কাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি।

ওদিকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিত্র বনূ খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি কোরাইশদের চুক্তিভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, উহুদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়েবী সাহায্য লাভের বিষয়টি কোরাইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার ওপর চুক্তিভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধপ্রস্তুতির আশংকা বেড়ে গেল। চুক্তিভঙ্গের সংবাদ রাসূল (সা.)-এর কাছে পৌছার পর পূর্ণ নীরবতা লক্ষ্য করে এ আশংকা আরো ঘণিভূত হল। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবূ সুফিয়ানকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মদীনায় প্রেরণ করে। যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধপ্রস্তুতি আঁচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সেই চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন।

আবূ সুফিয়ান মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুদ্ধ-প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণমান্য সাহাবীদের কাছে যান, যাতে তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে চুক্তিটি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলীর তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কথাটি নাকচ করে দেন। ফলে আবূ সুফিয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়ভীতি ছড়িয়ে পরে।[৪৯]

'বিদায়া' ও 'ইবনে কাসীর'-এর বর্ণনা মতে হযরত রসূলে করীম (সা.) অষ্টম হিজরীর দশই রমযান সাহাবায়ে কিরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন,পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়।

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا
فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (۴)

৪৯. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩২

অর্থ: "তোমরা যে মুশরিকদের সাথে চুক্তি করেছ, পরে তারা যদি সেই চুক্তির কিছুই ভঙ্গ না করে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেই সাহায্যও না করে থাকে, তাহলে তাদের সাথে করা ওয়াদা চুক্তিকে তার মেয়াদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর।"[৫০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় Zvdmx‡i dx wh‡jwj †KviAv‡bi ৯ম খন্ডে বলা হয়েছে- মোজাহেদ বলেন, চুক্তিধারীরা হলো মুদাল্লাজ ও আরব, যাদের সাথে তিনি বলেন, রাসূল (সা.) তাবুক অভিযান সেরে ফেরার পথে হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন। পরক্ষণেই বললেন, কাবা শরীফে মুশরিকরা উলংগ হয়ে তওয়াফ করতে আসবে। এটা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি হজ্জ করা পছন্দ করি না। তিনি আবু বকর (রা.) ও আলী (রা.)-কে পাঠালেন। তারা যিলমাজাজে ও অন্য যে সব জায়গায় লোকেরা কেনাবেচা করে, সেখান দিয়ে ও গোটা হজ্ব মওসুম জুড়ে ঘোরাফেরা করলেন। অতপর চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে ঘোষণা করলেন যে, পরবর্তী চার মাস অর্থাৎ যিলহজ্জের শেষ বিশ দিন, মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল সম্পূর্ণ ও রবিউস সানীর দশ তারিখ পর্যন্ত তারা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে। এরপর তাদের সাথে কোনো চুক্তি থাকবে না এরপর ঈমান না আনলে তাদের সাথে যুদ্ধ হবে।[৫১] এরপর তৎক্ষণাত সবাই ঈমান আনলো। কেউ আর ঘোরাফের করলো না।

(6) وَاِنۡ اَحَدٌ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ اسۡتَجَارَكَ فَاَجِرۡهُ حَتّٰى يَسۡمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ

অর্থ: "মুশরিকদের মধ্যে কেহ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দান কর যেন সে আল্লাহর কালাম শুনবার সুযোগ লাভ করতে পারে।"[৫২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় Zvdwm‡i Be‡b Kwm‡i উল্লেখ আছে-

এ আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ (র) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে-যে কেউই তোমার কাছে ধর্মীয় কথা শুনবার জন্যে আসে সে নিরাপত্তা লাভ করবে যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর কালাম না শুনে, অতঃপর যেখান থেকে এসেছিল সেখানে নিরাপদে ফিরে যায়। এজন্যেই, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে দ্বীন বুঝবার জন্যে বা কোন পয়গাম নিয়ে আসতো তাকে তিনি নিরাপত্তা দান করতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর এটাই হয়েছিল। কুরায়েশের যতগুলো দূত এসেছিল তাদের কোন ভয় বা বিপদ ছিল না। উরওয়া

---

৫০. আল-কুরআন, ৯ : ৪

৫১. স্যাইয়েদ কুতুব শহীদ, (অনু. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ), Zvdmxi dx wh‡jwj †KviAvb, খ. ৯, আল-কোরআন একাডেমি লন্ডন, বাংলাদেশ কার্যালয়, মগবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮,

৫২. আল-কুরআন, ৯ : ৬

ইবনে মাসউদ, মাকরাম ইবনে হাফস, সাহল ইবনে আমর প্রমুখ একের পর এক আসতে থাকে। এখানে এসে তাদের ঐ শান শওকত দৃষ্টিগোচর হয় যা রোম সম্রাট কায়সার এবং পারস্য সম্রাট কিসরার দরবারেও তারা দেখতে পায়নি। একথা তারা তাদের কওমের কাছে গিয়ে বর্ণনা করে। সুতরাং এ বিষয়টিও বহু লোকের হিদায়াতের মাধ্যমে হয়েছিল। ভন্ড নবী মুসায়লামা কায্যাবের দূত যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে আগমন করে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি মুসায়লামার রিসালাতকে স্বীকার করছো?” সে উত্তরে বললো “হ্যাঁ”। তখন নবী (সা.) বললেনঃ আমার নিকট দূতকে হত্যা করা যদি নাজায়েয না হতো তবে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। “অবশেষে এ লোকটি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাতে কুফার শাসন ক্ষমতায় থাকার সময় নিহত হয়। লোকটিকে ইবনে নাওয়াহা বলা হতো। ইবনে মাসউদ (রা.) যখন অবহিত হন যে, সে মুসায়লামাকে নবী বলে স্বীকারকারী তখন তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেনঃ “এখন তুমি দূত নও। সুতরাং এখন তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারেকোন প্রতিবন্ধকতা নেই।” অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক!

মোটকথা, যদি কোন অমুসলিম দেশ থেকে কোন দূত বা ব্যবসায়ী অথবা সন্ধি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কিংবা জিযিয়া আনয়নকারী ব্যক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করে এবং ইমাম বা নায়েবে ইমাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন তবে যে পর্যন্ত সে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করবে এবং স্বদেশে না পৌঁছবে সে পর্যন্ত তাকে হত্য করা হারাম। কিন্তু আলেমগণ বলেন যে, এরূপ ব্যক্তিকে বছর ধরে বাস করতে দেয়া চলবে না। বড়জোর তাকে চার মাস পর্যন্ত এখানে বাস করার অধিকার দেয়া যেতে পারে আর চার মাসের অধিক ও এক বছরের কম সময় পর্যন্ত তাকে দারুল ইসলামে বাস কতে দেয়ার ব্যপারে ইমাম শাফিঈ (র.) ও অন্যান্য ইমামদের (র.) দু'টি উক্তি রয়েছে।[৫৩]

وَاِنۡ نَّكَثُوۡۤا اَيۡمَانَهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُوۡا فِىۡ دِيۡنِكُمۡ فَقَاتِلُوۡۤا اَٮِٕمَّةَ الۡكُفۡرِ‌ۙ اِنَّهُمۡ لَاۤ اَيۡمَانَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنۡتَهُوۡنَ (١٢)

অর্থ: “ওরা যদি তাদের ওয়াদা করার পর তাদের কসম ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে গালমন্দ করে, তাহলে তখন কুফরির এই সরদারদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর। কেননা ওদের কসমের কোন মূল্য

৫৩. হাফেজ আল্লামা ইমামুদ্দিন ইবনু কাসীর (র), (অনু. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান), Zvdmx‡i Be‡b Kwmi, ঢাকাঃ ১৯৯৬ পৃ. ৬৪৬-৬৪৭

নেই তাহলে হয়তো ওরা ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকবে।”[৫৪]

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوۡمًا نَّكَثُوٓا أَيۡمَانَهُمۡ

অর্থ: “যে জাতি নিজেদের সন্ধি-চুক্তি এবং শপথ ভঙ্গ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা কর না কোন কারণে?”[৫৫]

فَإِمَّا تَثۡقَفَنَّهُمۡ فِى ٱلۡحَرۡبِ فَشَرِّدۡ بِهِم مَّنۡ خَلۡفَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ (٥٧)وَإِمَّا تَخَافَنَّ
مِن قَوۡمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ (٥٨٪)

অর্থ: “অতএব এই লোকদেরকে যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে ধরে ফেলতে পার, তাহলে তাদের এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যে, অপর যেসব লোক তাদের মত আচরণ করবে, তারা যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।* সন্ধি-চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির (বা রাষ্ট্রের) বিশ্বাসঘাতকতা করার সম্ভাবনা মনে করলে উহার সন্ধি ফেরত দাও (চুক্তি ভেঙ্গে ফেল) ফলে উভয় দলই সমান হবে (উভয়ই জানতে পারবে যে, তাদের মধ্যে কোন সন্ধি নেই-এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর যে কোন সময় আক্রমণ চালাতে পারে) ইহা এই জন্য যে আল্লাহ তা’আলা বিশ্বাসঘাতকদের মোটেই ভালবাসেন না।[৫৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় Zvdwm‡i Be‡b Kwmi প্রণেতা বলেন-

আল্লাহ তা’আলা সংবাদ দিচ্ছেন-ভূষ্ঠে যত প্রাণী চলাফেরা করছে ওদের মধ্যে আল্লাহ তা’আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই যারা বেঈমান ও কাফির, যারা চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে দেয়। এদিকে একটি কথা দিলো, আর ওদিকে তা থেকে ফিরে গেল। এদিকে শপথ করলো, ওদিকে তা ভেঙ্গে দিলো। তাদের না আছে আল্লাহর কোন ভয় এবং না আছে কৃত পাপের কোন পরওয়া। সুতরাং হে মুহাম্মদ (সা.)! যখন তুমি যুদ্ধে তাদের উপর জয়যুক্ত হবে তখন তাদেরকে এমন শাস্তি দিবে যে, যেন তাদের পরবর্তী লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তারাও যেন ভয় পেয়ে যায়। তাহলে হয়তো তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কৃত দুস্কার্য থেকে বিরত থাকবে।

---

৫৪. আল-কুরআন, ৯ : ১২
৫৫. আল-কুরআন, ৯ : ১৩
৫৬. আল-কুরআন, ৮ : ৫৭-৫৮

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সা.)-কে সম্বোধন করে বলছেন-হে নবী (সা.)! যদি কারো সাথে তোমার চুক্তি হয় এবং তোমার ভয় হয় যে, তারা এই চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তবে তোমাকে এ অধিকার দেয়া হচ্ছে যে, তুমি সমতা রক্ষা করে সেই চুক্তিনামা রদ করে দিবে। এ সংবাদ তাদের কানে পৌঁছিয়ে দিতে হবে, যেন তারাও সন্ধির ধারণা ত্যাগ করে। কিছুদিন পূর্বেই তাদেরকে এটা অবশ্যই জানাতে হবে। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ভঙ্গ করা পছন্দ করেন না। সুতরাং কাফিরদের সাথেও তুমি খিয়ানত করো না।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, আমীর মুআ'বিয়া (রা.) স্বীয় সেনাবাহিনী রোম সীমান্তে পাঠাতে শুরু করেন, যেন সন্ধিকাল শেষ হওয়া মাত্রই আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালানো যায়। তখন একজন বৃদ্ধ স্বীয় সওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায় বলতে বলতে আসলেন- আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয় বড়। ওয়াদা-অঙ্গীকার পুরো করুন, বিশ্বাস ভঙ্গ করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "যখন কোন কওমের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে যাবে তখন কোন গিরা খুলো না ও বেঁধো না যে পর্যন্ত না চুক্তিকাল শেষ হয়। কিংবা তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে অঙ্গীকার ও চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলা হয়।" এ খবর মুআ'বিয়া (রা.) এর কানে পৌঁছা মাত্রই তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। এই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন আমর ইবনে আমবাসা (রা.)।[৫৭]

সালমান ফারসী (রা.) একটি শহরের দুর্গের নিকট পৌঁছে স্বীয় সঙ্গীদেরকের বলেনঃ "আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ওদেরকে (ইসলামের) দাওয়াত দেবো,যেমন আমি রাসুল্লাহ (সা.)-কে দাওয়াত দিতে দেখেছি।" অতঃপর তিনি তাদেরকে বলেনঃ "দেখো, আমি তোমাদের মধ্যকারই একজন ছিলাম"। অতঃপর মহা মহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন। যদি তোমরাও মুসলমান হয়ে যাও তবে আমাদের যে হক রয়েছে তোমাদেরও সেই হক হয়ে যাবে এবং আমাদের উপর যা রয়েছে তোমাদের উপরও তাই থাকবে। আর যদি তোমরা এটা্ স্বীকার না কর তবে লাঞ্ছনার সাথে তোমাদেরকে জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে। যদি তোমরা এটাও না মান তবে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো এ কথা তোমাদেরকে এখন থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা ও তোমারা সমান অবস্থায় রয়েছি। আল্লাহ তা'আলা খিয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৫৮] তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে এভাবেই দাওয়াত দিতে

---

৫৭. আবু আব্দুলণ্ঢাহ আহমদ বিন হাম্বাল:gmbv‡' Avngv', বৈরতঃ দারস সাদির, ১৯৬৯ খৃ. হাদিস নং- ৩১১২

৫৮. আলাউদ্দীন আলী আল-মুত্তাকী : Kvbhj D¤§vj, বৈরতঃ মুআসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি. হাদিস নং- ৫৭২

থাকেন। অবশেষে চতুর্থ দিন সকাল হওয়া মাত্রই তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় সাহায্যের মাধ্যমে জয়যুক্ত করেন।[৫৯]

Zvdwm‡i gvhnvix প্রণেতা বলেন-

আলোচ্য আয়াতের নির্দেশটি এ রকম- হে আমার রাসুল (সা.)! আপনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়কে যদি আপনি বিশ্বাসভঙ্গ করবে বলে আশংকা করেন, তবে আপনি যথাযথভাবে ওই চুক্তি বাতিল করে দিন। চুক্তি বাতিল করা হলো- এ রকম সংবাদ আপনি পূর্বাহ্নে তাদেরকে পৌঁছে দিন। এতে করে বিশ্বাসভঙ্গের দায় আপনার উপরে বর্তাবে না। এ কথাও আপনি জেনে রাখুন হে আমার রাসুল (সা.)! আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

জহুরী সূত্রে আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পরই হযরত জিবরাইল (আ.) রাসুল (সা.) কে বললেন, হে সম্মানিত ভ্রাতা! আপনি তো যুদ্ধের সাজ পোশাক খুলে ফেলেছেন। কিন্তু আমরা এখনো সত্য প্রত্যাখানকারীদের পশ্চাদ্ধাবনে রত। আপনিও প্রস্তুত হোন। যুদ্ধ করতে হবে বনী কুরায়জার বিরুদ্ধে। আল্লাহ্পাক আপনাকে বনী কুরায়জা নিধনের অনুমতি প্রদান করেছেন। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণটি সৃষ্টি হয়েছিলো খন্দকের যুদ্ধের পর। হাফেজ মোহাম্মদ ইউসুফ সালেহী তাঁর সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে লিখেছেন, বনী কায়নুকা ও মুসলমানেরা ছিলো পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। পরবর্তীতে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। প্রজ্জলিত করেছিলো হিংসার আগুন। একদিন তাদের বাজারে ঘটলো একটি ঘটনা। আপাদমস্তক আবৃতা এক আরবী রমণী অলংকার ক্রয়ের জন্য তাদের বাজারের এক স্বর্ণকারের দোকানে গেলো। কেউ কেউ উন্মোচিত করতে বললো তার মুখমন্ডরের আবরণ। কিন্তু সে এতে অস্বীকৃত হলো। তখন স্বর্ণকার কেটে নিলো তার আঁচলের কিছু অংশ। উত্তেজিত হলো সে। শুরু করে দিলো চিৎকার। অনেক লোক জড়ো হলো সেখানে। উত্তেজিত রমণীটিকে লক্ষ্য করে তারা শুরু করে দিলো হাসিঠাট্টা। জনৈক সাহাবীও উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি বুঝলেন স্বর্ণকারটিই উত্যক্তকারী। তাই প্রচন্ড ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। স্বর্ণকারটির ছিলো ইহুদী। তাই উপস্থিত ইহুদীরা এক জোট হয়ে হত্যা করে ফেললো ওই সাহাবীকে। এভাবে ভঙ্গ হয়ে গেলো মুসলমান

৫৯. হাফেজ আল্লামা ইমামুদ্দিন ইবনু কাসীর (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩-৬০৫

ও ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তিটি। মুসলমানেরা হলেন বিচারপ্রার্থী। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

রাসুল (সা.) তখন বললেন, বনী কায়নুকা চুক্তিভঙ্গের কারণে বিপদ কবলিত।[৬০] এ কথা বলেই তিনি বনী কাযনুকার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন হযরত হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবকে। মদীনা রক্ষার দায়িত্ব দান করলেন হযরত আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনজিরকে। বনী কায়নুকার লোকেরা দূর্গে আশ্রয় নিলো। দূর্গ অবরোধ করে রইলো মুসলিম বাহিনী। পনের দিন কেটে গেলো এভাবে। আল্লাহ্পাক অবরুদ্ধ ইহুদীদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করলেন। তাই তারা রাসুল (সা.) এর নিকটে এই মর্মে প্রস্তাব পাঠালো যে- আমাদের সকল সম্পদ পরিত্যাগ করতে আমরা রাজি। এখন শুধু রমণী ও শিশুদেরকে নিয়ে আমরা দেশান্তরে গমন করতে চাই। রাসুল (সা.) তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিন দিন পর তারা তাদের সকল সম্পদ ফেলে রেখে পরিবার পরিজনসহ মদীনা থেকে বের হয়ে গেলো। রাসুল (সা.) তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক পঞ্চামাংশ রাখলেন নিজের জন্য। অবশিষ্ট চার পঞ্চামাংশ ভাগ করে দিলেন তাঁর অনুচরবর্গকে। বদর যুদ্ধের পর গণিমত লাভ ও বন্টনের এই ঘটনাটিই ছিলো প্রথম ঘটনা।

শেষে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' বাগবী লিখেছেন, হযরত মুয়াবিয়ার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রোম সাম্রাজ্যের ছিলো অনাক্রমন চুক্তি। হযরত মুয়াবিয়া ঠিক করলেন, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের সাম্রাজ্য আক্রমণ করবেন। বীর বিক্রমে ঢুকে পড়বেন তাদের রাজ্যের অভ্যন্তরে। এমন সময় তিনি দেখেন, এক অশ্বারোহী দ্রুত ছুটে আসছে এবং বলছে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বিশ্বাসভঙ্গ করো না। নিকটবর্তী হতেই চেনা গেলো অশ্বারোহী ব্যক্তিটি হচ্ছেন হযরত আমর ইবনে আমবাসা। হযরত মুয়াবিয়া তাকে কাছে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কী বলতে চান আপনি? তিনি বললেন, আমি রাসুল (সা.) কে ঘোষণা করতে শুনেছি, চুক্তিভঙ্গ করো না- যতক্ষণ চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হয়। অথবা প্রতিপক্ষের দ্বারা চুক্তিভঙ্গের কোনো কারণ সংঘটিত হয়। প্রতিপক্ষ যদি

৬০. আহমদ বিন হুসাইন আল-বায়হাকীঃ ïÔAvej Cgvb, বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি. হাদিস নং-২৪৮৯

চুক্তিভঙ্গ করে, তবেই কেবল চুক্তি বিরোধী কোনো কিছু করা যেতে পারে। হযরত মুয়াবিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁর সেনাবাহিনকে নিয়ে ফিরে এলেন স্বসাম্রাজ্যের সীমানায়।[৬১]

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١)

অর্থ: "তারা যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয়, তাহলে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনেন এবং সব জানেন।"[৬২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় Zvdmx‡i Avkivdx‡Z বলা হয়েছে-

সন্ধি প্রস্তাব গ্রহনের অনুমতি এবং কাফিরদের শঠতা, হইতে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিঃ

তাহারা (অর্থাৎ কাফিরগণ) সন্ধির দিকে অগ্রসর হয়, তবে (আপনাকেও অনুমতি দেওয়া যাইতেছে যে, যদি সেই পরিস্থিতিতে সন্ধি করা কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন, তবে) আপনিও অগ্রসর হউন এবং (যদি কল্যাণকর হওয়া সত্তেও তৎসঙ্গে এরূপ সম্ভাবনা মনে করেন যে, এই সন্ধি-প্রস্তাব প্রতিপক্ষের একটি চালবাজীও হইতে পারে; তবে) আল্লাহ্র উপর ভরাস রাখানু। (এমন অমুলক সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইবেন না।) নিশ্চয়, তিনি খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (তিনি প্রতিপক্ষের কথাবার্তা শ্রবণ করেন এবং তাহাদের গোপন অবস্থা অবগত আছেন। অতএব, তিনিই ইহার প্রতিবিধান করিবেন।) আর যদি (বাস্তবিকপক্ষে আপনার আশঙ্কাই ঠিক হয় এবং) তাহারা (সত্য সত্যই সন্ধির প্রস্তাব দ্বারা) আপনাকে ধোকা দিতে চায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার (সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের) জন্য যথেষ্ট। (যেমন তিনি ইতঃপূর্বেও আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট ছিলেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে এ যাবৎ আপনার সাহায্য করিয়াছেন। স্মরণ করিয়া দেখুন,) তিনিই সেই সত্তা (আল্লাহ্ তা'আলা)-যিনি আপনাকে নিজ (গায়েবী) সাহায্য (স্বরূপ ফিরিশ্তাদের) দ্বারা এবং (বাহ্যিক প্রকাশ্য সাহায্য স্বরূপ) মুসলমানদের দ্বারা শক্তি দান করিয়াছেন। আর (মুসলমানগণ যে আপনার সহায় হইয়াছে তাহাতেও খোদা তা'আলার গুপ্তহস্তের ইশারা রহিয়াছে) তাহাদের অন্তরসমূহে একতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।[৬৩] (ভাবিয়া দেখুন, তাহাদের না, আবহমান কাল হইতে আরববাসীদের মধ্যে যেরূপ আত্মা-প্রাধান্য লিপ্সা, হিংসা ও শত্রুতার প্রাবল্য চলিয়া আসিতেছিল,

---

৬১. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র), (অনু. মাওলানা এ.বি.এম মাঈনুল ইসলাম), Zvdmx‡i gvhnvix, ঢাকাঃ সেরহিন্দ প্রকাশন, ১৯৯৯ পৃ. ১৮৫-১৮৬.

৬২. আল-কুরআন, ৮ : ৬১

৬৩. ইবন হিব্বান :mnxn Beb wneŸvb, বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১২ হি. হাদিস নং-৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

এরূপাবস্থায় তাহাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা এমনই কঠিন কাজ ছিল যে, এই জাতিকে সংঘবদ্ধ করার সাধ্য আপনার ছিল না। এ কাজের জন্য যথাযোগ্য বুদ্ধিমত্তা ও উপায়াবলম্বনের পূর্ণ যোগ্যতা অবশ্যই আপনার রহিয়াছে; কিন্তু আপনি যদি আপনার যোগ্যতাকে কাজে লাগাইতেন এবং তৎসঙ্গে ঐক্য স্থাপনের উপকরণও আপনার নিকট যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত, এমনকি) যদি আপনি (এই সৃষ্টি স্থাপনের জন্য) দুনিয়ার সম্পদসমূহ ব্যয় করিতেন, তবুও তাহাদের অন্তরসমূহে একতা সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। কিন্তু আল্লাহ্ই (এ বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান; তিনিই) তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। নিশ্চয়, তিনি হইতেছেন মহা পরাক্রান্ত, (যাহা চাহেন তাহাই স্বীয় ক্ষমতাবলে অনায়াসে করিতে পারেন এবং তিনি) প্রজ্ঞাময়। (অতএব, যে পন্থায়, সঙ্গত মনে করেন সে উপায়েই তিনি সমাধান করিয়া থাকেন। হে নবী! (যখন আপনি বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণের মারফতে আপনাকে গুপ্তভাবে এবং মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তখন একথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল যে, বাস্তবপক্ষে) আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং যে মু'মুমিনগণ আপনার অনুসরণ করিয়াছে। (বাহ্যতঃ তাহারাই যথেষ্ট।)[৬৪]

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَهَاجَرُوۡا وَجٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَاَنۡفُسِهِمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَالَّذِيۡنَ اٰوَوْا وَّ
نَصَرُوۡۤا اُولٰۤـئِكَ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ‌ ؕ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَلَمۡ يُهَاجِرُوۡا مَا لَكُمۡ مِّنۡ
وَّلَايَتِهِمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوۡا‌ ۚ وَاِنِ اسۡتَـنۡصَرُوۡكُمۡ فِى الدِّيۡنِ فَعَلَيۡكُمُ النَّصۡرُ اِلَّا
عَلٰى قَوۡمٍۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ مِّيۡثَاقٌ‌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ (٧٢)

অর্থ: “যারা ঈমান আনিয়াছে, হিযরত করিয়াছে, নিজেদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়াছে; আর যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে কিন্তু হিযরত করে নাই, হিযরত না করা পর্যন্ত তাহাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নাই; আর দীন সম্বন্ধে যদি তাহারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাহাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রহিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে নয়।

৬৪. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র), Zvdwm‡i AvkiivdxZ(evqvbj KiAv‡bi সরল অনুবাদ), ৬ষ্ঠ পারা, ঢাকাঃ এমাদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ১৯৯৬, পৃ. ৫২৯-৫৩০

তোমরা যাহা কর আল্লাহ উহার সম্যক দ্রষ্টা।"[৬৫]

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ (١٢٦)

অর্থ: "আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে শুধু ততটুকুই গ্রহণ করবে যতখানি তোমাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। আর যদি ধৈর্য ধারণ করতে পার তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য অতীব কল্যাণ রয়েছে।"[৬৬]

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ٭ فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ (٤)

অর্থ: "অতএব এই কাফিরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ-সংঘর্ষ সংঘটিত হবে, তখন প্রথম কাজই হলো গর্দানসমূহ কর্তন করা। এমনকি তোমরা যখন তাদেরকে খুব ভালোভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে, তখন বন্দীদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে অথবা রক্তমূল্য গ্রহণের চুক্তি করবে-যতক্ষণ না যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ করে।"[৬৭]

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَفِ اِذَا وَعَدَ .

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সে যেন ওয়াদা করলে তা পূরণ করে।[৬৮]"

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَبُكُمْ مِنِّىْ غَدًا فِىْ لَمَوْقَفِ اَصْدَقُكُمْ فِى الْحَدِيْثِ وَاَدَا كُمْ لِلْاَمَانَةِ وَاَوْفَا كُمْ بِالْعَهْدِ .

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, কিয়ামতের দিন আমার অতি নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে কথার দিক দিয়ে অতীব সত্যবাদী, আমানতের খুব বেশী আদায়কারী এবং ওয়াদা খুব বেশী

৬৫. আল-কুরআন, ৮ : ৭২
৬৬. আল-কুরআন, ১৬ : ১২৬
৬৭. আল-কুরআন, ৪৭ : ৪
৬৮. আহমদ বিন হুসাইন আল-বায়হাকীঃ ïÕAvej Cgvb, বৈর˜তঃ দার˜ল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি. হাদিস নং- ১৪৮৭

পূরণকারী।[৬৯]"

عَنْ سَلِيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ
بِلَادِهِمْ حَتّى اِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ اَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُ
اَ كْبَرُ اللّٰهُ اَ كْبَرُ وَفَاءٌ وَلَا غَدْرٌ فَنَظَرَ فَاِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَألَه مُعَاوِيَةٌ عَنْ
ذَالِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلَّنَّ
عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَهُ حَتّٰى يَمْضِىَ اَمَدُهُ اَوْ يَنْبِذُ اِلَيْهِمْ عَلى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ
بِالنَّاسِ ۔

অর্থ: "সলীম ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা.) এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিলো। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো এক ঘোড়সওয়ার। তিনি বলছিলেন আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার, চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। তাঁর দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া দেখলেন, তিনি আমর ইবনে আবাসা (রা.)। মুয়াবিয়া বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি রাসূলে পাক (স.)-কে বলতে শুনেছি যার সাথে কোন কওমের চুক্তি হয়। তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। হাদীস শুনে মুয়াবিয়া তাঁর ফৌজ নিয়ে ফিরে আসলেন।"[৭০]

عَنِ الْبَرَءِ بْنِ عَازِبٍ رض قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِىٌّ
بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَسُوْلًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِىِّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِىٌّ مَا اَنَا بِالَّذِىْ
اَمْحَاهُ فَمَاحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلى اَنْ يَّدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ
ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوْهَا اِلَّا بِجُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَسَألُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ
بِمَا فِيْهِ ۔ (بُخَارِى)

৬৯. আবূ 'আব্দিলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী আল জু'ফি, mwnn eLvix, (বৈরুতঃ দারুল ইলেম, ১৯৮৭), খ.৩, পৃ.১৮, হাদিস নং-২৩১৫

৭০. আবূ বকর আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী আল-বায়হাকী, mbv‡b Keiv, (বৈরুতঃ দারুল কিতাব, ১৯৮৭) খ.৯, পৃ.২৩১, হাদিস নং-১৩২০
অনুরূপ- আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্ড়নী, mbv‡b Ave 'vD', বাব- ফিল ইমামে ইয়াকুনু বাইনাহু ওয়া বাইনাল আদুওয়ে ওয়া আহদুল ফা-ইয়াসিরু ইলাইহি, বৈরুতঃ দারুল ফিকহ্, ১৯৮৭, খ.৩, পৃ.৩৮, হাদিস নং-২৭৬১

অর্থ: "বারা'য়া ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) এর হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র আলী (রা.) লেখেন। তিনি লেখেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স.) এই লেখায় মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে, 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ' লেখো না। কেননা যদি তুমি রাসূল হতে (অর্থাৎ আমরা যদি রসূল মেনে নিতাম) তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তিনি আলী (রা.) কে বলেন, শব্দটি মুছে ফেলো। আলী (রা.) বলেন, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (স.) নিজ হাতে শব্দটি মুছে ফেলেন[৭১] এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আগামী বছর তিন দিনের জন্য মক্কায় আসতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কোষবদ্ধ হাতিয়ার থাকবে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, জুলুববান কি? তিনি বললেন, কোষ ও উহার মধ্যে যা থাকে।"[৭২]

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাতের রীতি-নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করলে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

১.৭: ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নৈতিক ভিত্তি

কুরআন মাজিদে বার বার বলা হয়েছে, ওয়াদা রক্ষা করা এবং চুক্তির শর্তাবলী সততার সাথে পূরণ করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভাষায়, মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলে। কিন্তু তাই সব নয়। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য অবিরাম সংগ্রামের নির্দেশ দেয়। যেহেতু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি কুরআন পছন্দ করে না,[৭৩] এবং ধর্মপরায়ণতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য কুরআন মুসলমানদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে সেহেতু শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচারই মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলে :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢)

---

৭১. আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ:mbvbb-bvmvC, দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তাবি. হাদিস নং- ১০৭১

৭২. আবূ 'আব্দিলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী আল জু'ফি, mwnn eLvix, বাব- কাইফা ইয়াকতুবু হাজা মা ছালাহা ফুলান ইব্নে ফুলান, বৈরুতঃ দারুল ইলেম, ১৯৮৭, খ.৫, পৃ.৮, হাদিস নং-২৬৯৮
অনুরূপ- আহমাদ ইব্ন হাম্বল, gmbv‡' Avng', খ. ৩০, পৃ.৫৩৫, হদিস নং-১৮৫৬৭

৭৩. আল-কুরআন, ২ : ২৫৬

"তোমাদিগকে মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়ার জন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পরের সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে : আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" [৭৪]

উল্লেখিত আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে (হউক দারুল হারব বা দারুল ইসলাম) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। অন্যায় বা আগ্রাসনমূলক কাজ কর্ম প্রতিরোধে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির নৈতিক ভিত্তি

আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায় আইনের শাখাসমূহ যখন স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে তখন এরা এদের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করে। এদের বিধানসমূহের জন্য কুরআন, সুন্নাহ বা গোঁড়া পদ্ধতির অনুমোদনের প্রয়োজন হত। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তোয়াক্কা না করে শুধু বিষয়ের খাতিরে আলাদাভাবে কোন বিজ্ঞান চর্চা মূলত মুসলমানেরা করেনি। ইহকালে ও পরকালে মানুষের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সব কিছুকে শরীয়া'র অধীন করা হয়েছে। মধ্যম পন্থাই ইসলামের বিধান[৭৫] خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا

এমনকি মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদী বিজ্ঞানের বেলায়, একথা সত্য। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন সাধারণ আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান হতে বিচ্যুত হলেও মানবীয় স্বার্থে পরিচালিত হয়নি; বরং শাশ্বত কুরআন ও সুন্নাহের মৌলিক ভিত্তিতে অটুট রেখেছে।

বিদেশীদের প্রতি আচরণের প্রশ্নটি মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী গুরুত্বের বিষয়। সর্বকালে সর্বদেশে শত্রু আপনজন হলে বিজয়ীকে কিছুটা সংযত আচরণ করতে দেখা যায়, কিন্তু বিদেশী শত্রুর বেলায় তা নয়। কারো কারো বেলায় গণহত্যা (আমালেকীদের বেলায়) অন্যান্যদের বেলায় অস্পশ্যতা ধর্মীয় আদর্শ ছিল, তথাপি অন্যান্যরা 'চুক্তিভঙ্গ করা পাপ কিন্তু বিধর্মীর সহিত সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করা অধিকতর পাপ' বলে যুক্তির অবতারণা করেছেন। (যেমন আমরা ক্রুসেডেরা[৭৬] শুনেছি)[৭৭]

---

৭৪. আল-কুরআন, ৫ : ২

৭৫. মাজিদুদ্‌দীন আবু সাআদাত আল মোবারক ইব্‌নে মুহাম্মদ আল জাজরী ইবনুল আছির, (মৃ. হি. ৬০৬), RwgDj Dmj wd Avnw'wmi ivmj (mv.), খ. ১, পৃ. ৩১৮, হাদিস নং-১০১

৭৬. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ.৯, পৃ. ৩৭৫

এটা সত্য যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা বিপথগামী। তথাপি দেখা যাক পার্থিব ক্ষমতার শীর্ষকালে আন্তর্জাতিক আইনের পরম ধার্মিক ও চরম গোঁড়া মুসলমান গ্রন্থকারগণ এ সম্পর্কে কি বলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত একটি মূলনীতিতে তাদের সবাই একমত এবং মুসলিম আইনের প্রত্যেক সংক্ষিপ্তসারে বার বার বলা হয়েছে যে, اَلْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ فِىْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا سَوَاءٌ

অর্থ:“এই পৃথিবীর দুঃখদুর্দশায় মুসলিম এবং অমুসলিম সবাই সমান এবং সদৃশ।”[৭৮] অন্যপক্ষ অমুসলিম এই অজুহাতে একজন আইন ও বিবেককে লঙ্ঘন করতে পারে না : তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর একজন কোন অবস্থাতেই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে না। ‘একের অপরাধে অন্যকে শাস্তিদান’ ইসলামে নিষিদ্ধ। শত্রুকে আশ্রয় দেবার ইসলামী রীতি ‘অংশীবাদীদের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে’ এটা কুরআনের নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য অংশীবাদীদের আশ্রয় দানের কথা বলা হয়েছে। কোন আশ্রয়প্রার্থীকে কোনক্রমেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না। বস্তুত মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বিধির গোটা কাঠামো অমুসলিম-উদ্দেশ্য গঠিত। কারণ এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতারা ইসলামী বিশ্বকে একক সম্পূর্ণ বলে গণ্য করত। অমুসলিম ও অপর রাষ্ট্রের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে তা নির্ধারণ করাই ছিল মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য। মুসলমানদের উপর ইসলামের নির্দেশ সে নিজ স্বার্থের পরিপন্থী হলেও পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ দপ্তরসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে হবে

আল্লাহ তা’আলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন,

ا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِ ، وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَ اِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (١٣٥)

অর্থ: “হে মু’মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরুপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও

৭৭. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, ১৯৮১, পৃ.৮২
৭৮. كُنُوْزُ السُّنَّة مِفْتَاحُ এর بَيْعَةٌ অধ্যায় পৃ. ৫৪

না। যদি তোমরা পেঁচানো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ তা তাহার সম্যক খবর রাখেন।”[৭৯]

আরও লক্ষ্যণীয় যে, মুসলিম আইন শাস্ত্রে আন্তর্জাতিক আইনকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মুসলিম আইনবেত্তাদের অটল মনোভাবকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া যায় না। আমি[৮০] বলতে চাই যে, আন্তর্জাতিক ব্যবহার বিধিকে তাঁরা মুসলিম আইনের অংশবিশেষ মনে করেন এবং তাঁরা আন্তর্জাতিক আইনকে শাসকদের ইচ্ছা বা রাজনীতিবিদদের খেয়াল খুশীর উপর ছেড়ে দেন না। আন্তর্জাতিক আইনের এই আইনগত মর্যাদা শুধু বর্তমান নয় বরং বহু পূর্ব থেকেই স্বীকৃত। কারণ, প্রাচীনতম মুসলিম আইন সংহিতা জায়েদ ইবনে আলী (মৃত্যু ১২০ হিঃ) কর্তক রচিত ‘আল মাজমু’ গ্রন্থে আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্তি আমরা দেখতে পাই এবং পরবর্তীকালেও এ নিয়মের কোন পরিবর্তন হয়নি।

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ আদ দাবুসী বলেন,

لِاَنَّ اللّٰهَ مَا فَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِىْ آسْبَابِ آصَابَةِ الدُّنْيَا فَاِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارِ جَزَاءٍ -

যেহেতু আল্লাহ পার্থিক দুঃখ-দুর্দশার কারণসমূহের ব্যাপারে আমাদের এবং তাদের (অমুসলিম) মধ্যে পার্থক্য করেননি; কারণ এই পৃথিবী কর্মফলের ক্ষেত্র নয়।

২. আবু ওবায়েদ তাঁর (كِتَابُ الْاَصْوَالِ) গ্রন্থে নবীর এই হাদীসটি উল্লেখ করেন وفَاءٌ مَوْعِدٌ خَيْرٌ مِنْ غَدرٍ (চুক্তিভঙ্গ করার চেয়ে চুক্তি পালন করা শ্রেয়।)

১.৮: ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মুসলিম উম্মাহ আজ অধঃপতিত, বঞ্চিত, লাঞ্চিত, পদদলিত , নিস্পেষিত। উম্মাহর অধঃপতনের মূল কারণগুলো কি তা উপলব্ধি করা মুসলিমদের জন্য সম্ভব হবে যদি মুসলিম চিন্তা ভাবনার সংস্কার করা সম্ভব হয়। মুসলমানগণ বর্তমানে যে সমস্ত সমস্যায় জর্জরিত সেগুলো থেকে নিজেদেরকে উত্তরণ করা সম্ভব হবে যদি তাঁরা এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন। এটা করতে পারলে তাঁরা নতুন উদ্যোগে গ্রহণ করতে পারবেন, ঐ সমস্ত উদ্যোগ যা তাঁরা আধ্যাত্মিক, বুদ্ধি বৃত্তিক এবং বস্তুগত সম্পদকে কার্যকর ভাবে ইসলামি লক্ষ্য সমূহ অর্জনে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এভাবেই তাঁরা মানব জাতির অবশিষ্টাংশের

৭৯.আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫
৮০.ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩

Dhaka University Institutional Repository

জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন, যেভাবে ইসলাম তার উম্মাহ এবং সামগ্রিক ভাবে সমগ্র সভ্যতার জন্য কাজ করে।

মুসলিম মানসের সংস্কার সাধিত না হলে সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক সাফল্যের মেয়াদ হবে স্বল্পকাল স্থায়ী এবং অকার্যকর।[৮১]

উম্মাহ এর নেতৃবৃন্দের এমন সব ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা রয়েছে যেগুলোকে অবহেলা করা যায় না। মঙ্গলদের, ক্রুসেডারদের, গ্রানাডার এবং জেরুজালেমের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সংস্কার ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। শক্তিমান ছাড়া কেউ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে না। সম্মান, ব্যবসা, সহযোগিতা কেবল তাদেরই জন্য যারা সমমানের এবং অংশীদার।

মুসলিম চিন্তাবিদদের এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, সংস্কার এবং শান্তির বিশ্বজনীন আদর্শ হিসাবে ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করে উম্মাহকে রোগমুক্ত করা তাঁদের দায়িত্ব।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থান হল একটি নতুন সন্ধিক্ষণে এ অবস্থান একে নিয়ে যাবে সংস্কার অথবা সংশোধনের দিকে। অথবা নিয়ে যাবে ধীরে ধীরে সংঘাত এবং ধ্বংসের দিকে। এর অনেক কিছুই নির্মিত হবে ইসলামের বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাবিদগণের দ্বারা। কারণ তাঁরা সংস্কারের পথ ধরে এগোন। একই ভাবে সংস্কারে গতি কি হবে তা নির্মিত হবে উম্মাহর সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা। তা আরও নির্ণিত হবে, বিশেষ করে শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ ভাবে উম্মাহর ক্ষেত্রে, সহযোগিতা এবং সংস্কারের নীতিমালা বাস্তবায়নে তাদের দক্ষতা দ্বারা।[৮২]

দুর্ভাগ্যক্রমে কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গির বশবর্তী হয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য নিষ্ফল এবং বিভ্রান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাঁদের কর্ম এবং নীতিমালা দ্বারা তাঁরা অন্যদের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করেছে। ধ্বংস করেছে মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যকার সহযোগিতার সম্ভাবনাকে। মুসলমানদের অবশ্যই সহনশীলতার শিক্ষা নিতে হবে। সংহতি অর্জন করতে চাইলে তাঁদেরকে পরস্পরের প্রতি হতে হবে শ্রদ্ধাশীল। এসব কিছুর জন্যই সর্বাগ্রে প্রয়োজন, মুসলিম মানস এবং বুদ্ধি বৃত্তির সংস্কার

*** ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী উল্লেখ করেন,[৮৩]

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪
৮২. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৮৩. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯

ইউরোপ পৃথিবীতে ধর্মকে দিল কুৎসিত নাম। ফ্রিডরিক এঞ্জেলস (Fridrich Engels) এবং কার্ল মার্কস দিয়ে (KarlMarx) ধর্মকে জনগণের আফিম নামে অভিহিত করতে সক্ষম হলো। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফ্রিডরিক নীট্জ এবং সিগ্‌মুন্ড ফ্রুয়েড (Sigmund Freud) ধর্মীয় নৈতিকতা এবং মনস্তত্ত্বকে মৃত্যুর সমতুল্য হিসাবে বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা ধর্মকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ (Illusion) হিসাবে অভিহিত করেন এবং এর শেষকৃত্য সমাগত বলে ভবিষ্যত বাণী করেন। তারা ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে বিকৃত করেন।

এ সব কিছু ঘটে ইউরোপে, যেখানে খৃষ্ট ধর্মই ছিল একমাত্র প্রভাব সৃষ্টিকারী ধর্ম। তাঁদের আলোর বাহক পূর্বসূরীদের মত এসব ইউরোপীয় সমালোচকবৃন্দ ধর্ম বলতে ইউরোপীয় খৃষ্টবাদকেই বুঝাতেন। কমিউনিজম এ শক্তিগুলোর মিলন ঘটিয়ে ইউরোপের আভ্যন্তরীণ শক্তিতে প্রচণ্ডতা দান করে।

দুই বিশ্ব যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে দুই পরাশক্তি বৃটেন এবং ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল লীগ অব ন্যাশনস। তারা এর মাধ্যমে বিশ্ব ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। কিন্তু এ সংস্থার পরিচালনায় তারা যা কিছু করছিল সেগুলো ছিল একান্তভাবে আপত্তিকর। কারণ এ দুই পরাশক্তি সংস্থাটিকে এশিয়া এবং আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। সংস্কারবাদী আদর্শবাদ এবং স্বতন্ত্র নীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন। তিনি ইউরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিরক্ত হয়ে লীগ অব নেশনস হতে আমেরিকাকে প্রত্যাহার করে নেন। রাশিয়াকে এর পূর্বেই বিরোধিতা ও সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র নীতির কারণে এ সংস্থা থেকে বাদ দেয়া হয়।

সংজ্ঞা অনুসারে জাতিসংঘ কোন বিশ্ব সরকার নয়। এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আক্রমণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করার জন্য। কিন্তু এ ক্ষুদ্র দায়িত্বের ক্ষেত্রেও এ সংস্থা নিজেকে অক্ষম প্রমাণিত করেছে। এর পূর্বসূরীর মত বিশ্বের বক্তাদের জন্য একটি মঞ্চ হিসেবে সংস্থা তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেখানে, জাতিসংঘের সেখানে ভূমিকা হলো নিছক রাবার ষ্টাম্প অথবা শক্তিহীন দর্শকের মত। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর কিছুকালের জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গ এ ধারণা এবং আশাবাদ প্রচার করছিল যে, এখন হতে আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হবে না এবং জাতিসংঘ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ফেডারেল ইউনিয়ন গঠন করবে। বর্তমানে এ আশা কেবল বোকার স্বর্গে বাস করে এমন ব্যক্তিই পোষণ করতে পারে।

ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাদের যে সকল উপনিবেশকে স্বাধীনতা প্রদান করেছে তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার উপায় উপকরণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের

মধ্যকার প্রতিযোগিতা পূর্বের মতই বহাল রেখে চলেছে। ক্ষেত্র বিশেষে এ নিয়ন্ত্রণের কৌশল ও ধরণ ভিন্নতর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশের মাধ্যমে সাবেক উপনিবেশিক শক্তির মধ্যকার সংগ্রাম আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা উপনিবেশিক শক্তিকে হটিয়ে সেখানে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে সমগ্র বিশ্বে তাদের প্রভাব বলয় বিস্তার করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল।

'ইউরোপীয় আলোর' সূতিকাগারে ভূমিষ্ট এক উপগ্রহ হল বিপ্লবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইউরোপীয় সংকটের বিকল্প হিসাবে সে বিশ্ব সমাজ আদর্শকে উপস্থাপন করে। ১৭৭৬ খৃঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। এর পর হতে এ দেশটি ইউরোপ এবং সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। এজন্য সে ধর্মীয় এবং জাতীয়তাবাদী বিশেষত্বের দিক হতে বিশ্বের স্বর্গ হিসাবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। যারা আমেরিকায় বসবাসের জন্য গিয়েছিল তারাও নতুন বিশ্বের অভিভাবক রূপে উচ্চকণ্ঠ হতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুস্পষ্ট লক্ষ্য যে নতুন বিশ্ব সমাজ আদর্শকে পুরাতন বিশ্বব্যবস্থার স্থলে স্থাপন করা এ প্রত্যয় উপরোক্ত অবস্থার কারণে শক্তিশালী হতে পারেনি। এ আদর্শবাদ যে উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল তা মাত্র কয়েক দশক কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপরই বিশ্ব আদর্শের বক্তব্যের অন্তরালে ফুটে ওঠে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের কথা।[৮৪]

ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য এ আদর্শের প্রতি নিছক মৌখিক সমর্থনের কথা জ্ঞাপন করে্ এটাকে তারা এ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস হিসাবে ব্যবহার করে। তারা এ আদর্শকে ব্যবহার করেছে তাদের নিজেদের জনগণের জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বৃহৎ শক্তিবর্গ এ শতাব্দীতে যা করেছে তার প্রভাব বিশ্বের ইতিহাসের জন্য অনেক সুদূর প্রসারী এবং মানব জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক বিপদজনক।

বিগত দুই শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এ ব্যর্থতা পৃথিবীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে এমন দুই দৈত্যের কবলে নিক্ষেপ করেছে, যারা পরস্পরকে এবং সমগ্র পৃথিবীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে সক্ষম। বলা হচ্ছে যে, তাদের নিয়ন্ত্রণে যে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষ, মহিলা এবং শিশুর জন্য ৫০০ পাউন্ড বিস্ফোরকের সমান।[৮৫] এগুলোর বৈচিত্র্যতার কোন সীমা সংখ্যা নেই, নেই কোন সামঞ্জস্যতা। তারা চায় একে অপরকে বশীভূত করতে, চায় পৃথিবীকে শাসন করতে, চায় মানুষের শক্তিকে

---

৮৪. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯

৮৫. তারিক রমাদান, (অনু. এম রুহুল আমিন,gm¨j‡gi BD‡ivc) ; ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামি থ্যট (BIIT), ২০০৮, পৃ.১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

হরণ করতে। যদি কোথাও কোন শান্তি এবং সমঝোতা সম্ভব হয় সেটা হতে হয় তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য। এরূপ শান্তি স্থাপিত হয় ভূক্তভোগী অবশিষ্ট পৃথিবীর স্বার্থের বিনিময়ে। সুতরাং এরূপ ব্যবস্থা নেহাৎ ক্ষণস্থায়ী।

পৃথিবীর অপর কোন অংশে তাদের হিংস্র থাবা বিস্তারের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য এরূপ সমঝোতা করে থাকে। যদিও বলা হয় 'স্নায়ু যুদ্ধ' শান্তির বিগত ৪০ বছর কেটে গেছে সন্ত্রাসের ভারসাম্যের কারণে। এ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে বৃহৎ শক্তিদ্বয় নিজেদের মধ্যে। কিন্তু তা করেছে কোন শান্তি বা ন্যায় বিচারের খাতিরে সদিচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয় বরং এ জন্য যে তারা একে অপরকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করতে সক্ষম।

মানবতা ভয়ে প্রকম্পিত হয় যখন এ দানবদ্বয়ের যে কোন একটি অপরের প্রতি অভিযোগ করে বা হুঙ্কার ছাড়ে। মানবতাকে এ পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেয়ার করুণ মুহূর্তটি যে কখন এ দুই দৈত্যের জন্য হাজির হবে সে সম্পর্কে কখনও নিশ্চিত হওয়া যায় না। বিগত পাঁচ দশকে বার্লিন, পেলেষ্টাইন, হাঙ্গেরী, সাইপ্রাস, ভিয়েতনামা, কিউবা এবং কোরিয়ার প্রশ্নে পৃথিবী কয়েকদফা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিল।[৮৬] এ দুই দৈত্য সবসময় তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতির উপর জোর দিচ্ছে। পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য কার্যকর কিছুই করছে না।

দুই শক্তিধর তাদের জাতীয় আয়কে অপরিমিত অনুপাতে গবেষণা, উন্নয়ন, নির্মাণ এবং যুদ্ধাস্ত্র বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যয় করে। তাদের ইউরোপীয় মিত্রদের অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ তাদের তুলনায় কম। এখাতে ব্যয়ের ভর্তুকি প্রদান এবং একের বিরুদ্ধে অপরের ব্যবহৃত সমরাস্ত্রগুলোর ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্যই কি দুই অক্ষ শক্তি তৃতীয় বিশ্বের জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতার উন্নয়ন সাধনে তৎপর? উপনিবেশিক শক্তিগুলো তৃতীয় বিশ্বের জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামোর আওতায় সংগঠিত করেছিল। কিন্তু এসব রাষ্ট্রের সীমানা তারা এমনভাবে নির্ধারণ করেছিল যার ফলে প্রতিবেশী দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বজায় থাকে চিরস্থায়ী শত্রুতা। উভয় অক্ষশক্তি ক্রমাগতভাবে তৃতীয় বিশ্বের জাতি সমূহের মধ্যে শত্রুতাকে করছে উৎসাহিত। তারা প্রতিবেশীদের মধ্যে পুরানো শত্রুতা উস্কে দিচ্ছে অথবা সৃষ্টি করছে নতুন শত্রুতা। তৃতীয় বিশ্বের জাতি সমূহকে একের বিরুদ্ধে অন্যকে যুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। তারা প্রত্যেক জাতির মধ্যস্থিত আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক আন্দোলনকে সহযোগিতা করে। এসব কাজের ফলে তৃতীয় বিশ্বের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের লোকদের ব্যাপারে এবং প্রতিবেশীদের সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত্র। এ ভীতি তৃতীয় বিশ্বের শাসক গোষ্ঠীকে পরাশক্তি

---

৮৬. তারিক রমাদান, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

বর্গের উপর করছে আরো নির্ভরশীল। দরিদ্র জাতিগুলোকে পাশ্চাত্যের যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে বাধ্য করার জন্য পরাশক্তিবর্গ অব্যাহত অভিযান চালাচ্ছে। দরিদ্র দেশগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে এসব অস্ত্র ব্যবহার করছে। পুরাতন অস্ত্রকে প্রতিস্থাপন করছে নতুন নতুন অস্ত্রসস্ত্র কিনে।[৮৭]

এসব অস্ত্র দ্বারাই তারা নিজেদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করছে। আবার ধ্বংস প্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পুনঃনির্মিত হচ্ছে বৃহৎ শক্তি বর্গ কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল, যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। তাই দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে এ অবস্থা অব্যাহত রাখার জন্যই যে পাশ্চাত্যের কার্যক্রম নিবেদিত তা বলা কি অযৌক্তিক হবে? যদি তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতিত কোন দেশ এ অবস্থার শিকার হওয়া সত্ত্বেও শক্তিশালী হওয়ার পথে অগ্রসর হয় তাহলে এ মেকিয়াভেলিয় নীতি তার সমগ্র সম্পদকে প্রকৃত গঠনমূলক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত না করে নিয়োজিত করছে তার নির্ভরশীল মর্যাদাকে বিলুপ্ত করার কাজে।

বৃহৎ শক্তিবর্গের নীতির শিকার কোন দেশ দরিদ্র হলে সে দেশকে তারা অর্থ কর্জ দেয় তাদের অস্ত্রসস্ত্র এবং ভোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য। এভাবে সেদেশটির ভবিষ্যৎ জোর পূর্বক বন্ধক হয়ে যায় ঋণদাতা দেশের নিকট।

দরিদ্র তৃতীয় বিশ্ব পরস্পর বিনাশী মতভেদ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং সশস্ত্র শত্রুতায় লিপ্ত। তারা কাঁচামাল উৎপাদন করে্ এ সমস্ত কাঁচামাল দুই পরাশক্তি ক্রয় করে নিজেদের নির্ধারিত দামে। তৃতীয় বিশ্ব আমেরিকা এবং ইউরোপের শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবহার করে। তারা তাদের প্রধান খাদ্যের জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য এমনকি তাদের দৈনিক রুটির জন্যও নির্ভরশীল পরাশক্তিদ্বয়ের যে কোন একটির বদান্যতার উপর। অর্থাৎ পরাশক্তি ও তাদের মিত্রগোষ্ঠী তৃতীয় বিশ্বের জন্য যে ব্যবস্থা নির্ধারিত করে রেখেছে সে ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হয় তাদেরকে।[৮৮]

---

৮৭ "স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে অস্ত্রের ব্যবসা সবচেয়ে চাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ায় অস্ত্রের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় গত পাঁচ বছরে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পাঁচ বছরে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র নিয়েছে ভারত। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সৌদি আরব। ষ্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (এসআইপিআরআই) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য দিয়েছে। প্রতিবেদটি বলছে, ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশগুলোতে অস্ত্র আমদানির পরিমাণ ছিল বিশ্বের মোট আমদানির ৪৩ শতাংশ। আগের পর্যায়ের (২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত) তুলনায় এই আমদানি বৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ৭। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত এস আই পি আর আই এক বিবৃতিতে বলেছে, ২০১২-২০১৬ পর্যায়ে বড় ধরনের অস্ত্র কেনাবেচা ছিল স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী যেকোনো পঞ্চবার্ষিক পর্যায়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০০৭-২০১১ পর্যায়ে এশিয়া ও ওশেনিয়ার অস্ত্র আমদানি ছিল আন্তর্জাতিক বাজারের ৪৪ শতাংশ।" we¯ÍwiZ-^'wbK c_g Av‡jv, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭

৮৮. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৪

উৎপাদিত দ্রব্যের দাম যাতে না কমে সে জন্য পশ্চিমা দেশগুলো তাদের নাগরিকদেরকে নিজেদের ক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদন করার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে বেতন প্রদান করে। এটা করার পেছনে তাদের নিজস্ব যুক্তি রয়েছে। তাদের নৈতিকতা তাদের ক্রয় করার জন্য মওজুদ করার জন্য পণ্যাগার যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন ক্রয়কৃত খাদ্যশস্য ধ্বংস করার জন্যও তাদের অনুমতি দেয়। এটা তারা করে দ্রব্যমূল্য এবং ব্যবসার স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। যখন মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী অপুষ্টিতে ভুগছে, লক্ষ, কোটি মানুষ ক্ষুধায় আক্রান্ত এবং কোটি কোটি মানব সন্তান মওজুতদারী এবং খাদ্য শস্য ধ্বংসের মত সর্বনাশা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশ্চাত্যের অনুশীলিত নীতিতে অনৈতিকতা এবং অমানবিকতার এ হল এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।[৮৯]

মানব জাতিকে বিপর্যয় এবং ভয় ভীতির ছায়াতলে এভাবে বসবাস করতে বাধ্য করা এবং দুই পরাশক্তি ও তাদের মিত্র গোষ্ঠীকে উৎপাদন ধ্বংস যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ এবং পুনঃসরবরাহ করতে দেয়া মানবতার বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ অপরাধ। যুদ্ধ শিল্পের মত এটি সবচেয়ে সংকটজনক অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং স্বার্থন্বেষী মহলকে তাদের ক্ষমতা ও বড়াইয়ের খাতিরে মানুষে মানুষে ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টির কার্যক্রম অবাধে চালিয়ে যেতে দেয়ার বিষয়ে নির্বিকার থাকা সত্যিকার অর্থে এক শয়তানী কাজ। কিন্তু সংক্ষেপে ওটা হল বিগত দুই শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্যের অদূরদর্শী কর্তৃত্বের ফলশ্রুতি। বিশ্ব এখন নিরাপদও নয়, শান্তিপূর্ণও নয় এবং সন্তুষ্টও নয়। বিশ্ব এমন একটা টাইম বোমার রূপ ধারণ করে আছে যে কোনো মুহূর্তে এর ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। দুই পরাশক্তি বলয়ে মাত্র অল্প কয়েক মিলিয়ন লোক ক্ষমতা এবং প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করছে। অপর পক্ষে তাদের স্বদেশবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী দরিদ্র এবং তাদের সামনে নেই কোন অনুসরণযোগ্য আদর্শ। তাদের কতক চেয়ে আছে এমন কোন অলৌকিক ক্ষমতার দিকে যা তাদের জন্য বয়ে আনতে পারে সৌভাগ্যবানদের মত ক্ষমতা বা প্রাচুর্য। অবশিষ্ট মানবতা হল অপুষ্টির কবলে, ক্ষুধার্ত অথবা মৃত্যু পথযাত্রী। এটা কেবল বড় ধরনের কোন ব্যর্থতা নয়। এ হল এক ভয়াবহ ও মর্মান্তিক বিপর্যয়।[৯০]

প্রাকৃতিক আইন (Law of nature) কখনও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি। সপ্তদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টিকে আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট করার বিষয়ে পাশ্চাত্যের কোন চিন্তাবিদই অনুসন্ধান করেননি। এশিয়া এবং আফ্রিকার নতুন পৃথিবীতে কলোনী স্থাপনের জন্য

---

৮৯. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪
৯০. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ছিল কড়াকড়ি। ঐ সময় সংঘটিত হচ্ছিল অনেক ধর্ম যুদ্ধ। সকল প্রকার মহড়ার ক্ষেত্র ছিল এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশসমূহ।[৯১]

৯১. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলাম, কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি

বিদেশী রাজদরবারে সাময়িকভাবে দূত প্রেরণ এবং বিদেশী রাষ্ট্রে গুপ্তচর নিয়োগের দৃষ্টান্ত স্মরণাতীতকাল থেকেই মানব ইতিহাসে আছে। সুতরাং, আশ্চর্য হবার কিছু নেই যদি এই উভয় প্রকারের ব্যক্তির খোঁজ মুসলিম ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে নবী করিম (সা.) এর আমলে পাওয়া যায়। সামরিক উদ্দেশ্যে প্রেরিত গুপ্তচর ছাড়াও মক্কায় আল-আব্বাস, আওতাসে (তাইফের সন্নিকট) আনাস ইবনে আবি মারছাজ আল-গানাবী এবং নাযদে আল-মুনজির ইবনে আমর আস-সাইদী ওরফে আনাক-লিয়ামুত হযরত মুহাম্মদ (স.) এর গুপ্তচর হিসেবে নিয়োজিত এবং তারা এই সমস্ত দেশের অবস্থা সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে ওয়াকিফহাল রাখতেন বলে উল্লেখ আছে।

আমর ইবনে ওমাইয়া আদদামরী নামক একজন অমুসলিম তাঁর (রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর) প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন। কোরাইশরা আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিম বাস্তুহারাদেরকে তাদের হস্তে অর্পণ করার জন্য নিগাসকে প্ররোচিত করছিল। তাদের এই দুরভিসন্ধি বানচাল করার উদ্দেশ্যে নবী (সা.) দুই হিজরীতে আমর ইবনে ওমাইয়া আদ-দামরীকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেন।[৯২]

এটা স্পষ্ট যে, জীবনোপকরণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বেলায় যখন স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা যখন ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়ে পারস্পরিক নির্ভরতার পর্যায়ে পৌঁছে রাষ্ট্রসমূহ তখন বাণিজ্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য তৎপর হয়।[৯৩]

ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানকল্পে হযরত মুহাম্মদ (স.) স্বয়ং উদ্যোগী ছিলেন। এমনকি এর জন্য সরকারী তহবিল থেকে খরচ হলেও। তাঁর রাজ্যস্থিত সকল প্রকারের আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক তিনি বিলোপ করেন এবং বিভিন্ন গোত্রের সংগে তিনি যে সমস্ত চুক্তি করেছিলেন তাতেও উল্লেখ আছে যে, তারা এ সম্পর্কে তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী শুল্কের আওতাভুক্ত ছিল। উমর (রা.) এর আমলে মানবিজের ব্যবসায়ীদের উপর শুল্ক ধার্য

---

৯২. আদ্-দাম্‌রী যে তখনও অমুসলিম ছিলেন আশ-শামী তাঁর নবী চরিতে সে কথা উল্লেখ করেছেন। অমুসলিমরা যে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন সরখ্‌সীও সে কথা উল্লেখ করেছেন। শরহুল সিয়ারুল কবীর, ১ম খন্ড ২৯১।

৯৩. কূটনীতি সম্পর্কে লেখা আরবি সাহিত্য খুবই কম। মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা গ্রন্থের লেখক ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ তার গ্রন্থে ১৬৪ পৃ. বলেন ইবনুল ফাররা নামে পরিচিত আবু আলী আল হুসাইন ইবনে মুহম্মদ বিরচিত 'রসূলুল মুলুকি ওয়ামান ইয়াসলুহু লিররিসালাতি ওয়াস সিফারাহ' ই কূটনীতি সম্পর্কে লিখা একমাত্র পুস্তক। ১৯৪৭ সালে মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

সংক্রান্ত চুক্তিটিই এ ধরনের প্রধান চুক্তি বলে বলা হয়। হযরত আবু ইউসুফ (র.) যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো- হযরত উমর (রা.) ও তাঁর গভর্নর আবু মুসা আল-আশ্‌য়ারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক মজার পত্রালাপের উল্লেখ করেছেন।

আল-আশয়ারী লিখেন : আমাদের বণিকদের কেউ অমুসলিম রাষ্ট্রে গেলে তাদেরকে কর দিতে বাধ্য করা হয়।

উমর (রা.) জবাব দেন : তাদের উপরও কর চাপাও তারা যেমন মুসলিম বণিকদের উপর কর চাপিয়েছেন।”[৯৪]

সৈয়দ আমীর আলী তাঁর "A short History of the Saracens" গ্রন্থে বলেন:[৯৫] যখন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সাম্রাজ্যের জায়গীরদারে পরিণত হন এবং খলিফার প্রত্যক্ষ শাসনকর্তৃত্ব মোটামুটি রাজনৈতিক প্রভুত্বে পরিণত হয় তখন এই বিশ্বস্ত সংবাদবাহকগণ পোপের লেগেটের (Legates) ন্যায় খলিফার দূত বলে পরিগণিত হয় এবং তারা নিশাপুর, মাউ, মসুল ও দামিশক প্রভৃতি রাজদরবারে খলিফার স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে থাকে। ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ দিকে পোপের লেগেটদের মত এরা যে রাজাদের দরবারে প্রেরিত হত তাদের সামরিক অভিযানে তাদের সংগে যেত। আমরা তাদেরকে আল্‌প্‌ আর্সলান ও মালিক শাহের শিবিরেই দেখতে পাই না, বরং নূরুদ্দীন মাহমুদ ও সালাহ্‌উদ্দীনের শিবিরেও সদাকর্মব্যস্ত, কখনো অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে, আবার কখনো যেমন পরবর্তী আইয়ূবীদের সময় কলহরত রাজাদের মধ্যে মিলন ঘটাতে এবং গৃহ-বিবাদ মীমাংসা করতে দেখতে পাই।

প্রত্যেক রাজা নিজের পক্ষ হতে খলিফার দরবারে ‘শাহানা’ নামক একজন প্রতিনিধি রাখতেন। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের পক্ষে কূটনৈতিক চালবাজি লক্ষ্য রাখা এদের কাজ ছিল, কারণ পোপের আমলে রোমের মত বাগদাদেও সকল আইনসম্মত ক্ষমতার উৎসের উপর অপ্রতিহত প্রতিপত্তি স্থাপন করার জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। শাহানাগণ রাজধানী ছাড়াও সচরাচর ওয়াসিয়াত, বসরা, তিকরিত প্রভৃতি স্থানে মোতায়েন হত।

আব্বাসী সুলতানগণ প্রতিবেশী রাজাদের সহিত গোপনীয় কাজ সম্পন্ন করার বেলায় সর্বদাই বিশেষ দূত নিয়োগ করতেন। তারা নিজামূল হাদরাতাইন বলে অভিহিত হত।

৬৫৬ হিজরীতে মোঙ্গল কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের পর ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে স্থায়ী দূতাবাসের শূন্যতা দেখা দেয়, সেকালে এমনকি ইউরোপেও স্থায়ী রাষ্ট্রদূত ছিল না।

---

৯৪. আবু ইউসুফ, wKZvej LvivR, পৃ.৭৮

৯৫. সৈয়দ আমীর আলী, (অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সম্পা. ড. মফীজুল্লাহ কবীর), Avie RwZi BwZnvm *‘A Short History of the Saracens’* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ৪০৭-৪০৮

২.১: কূটনীতি: অর্থ ও সংজ্ঞা

'Diplomacy' একটি ইংরেজি শব্দ। যার বাংলা অর্থ হলো 'কূটনীতি। এর আভিধানিক অর্থ হলো চাতুর্যপূর্ণ কৌশল। কিন্তু Diplomacy শব্দটির আদি উৎপত্তি হলো গ্রিক ভাষার 'Diploma' শব্দ হতে। Diploma একটি ক্রিয়াপদ বিশেষ যার অর্থ দাঁড়ায় ভাজ করা (Fold)। ভাষার সভ্যতার বিবর্তনের পথ ধরে এক সময় গ্রিক শব্দ Diploma থেকে জন্ম নিয়েছে Diplomacy শব্দটি। ædiplomacy কূটনীতি, দূত এবং দূতাবাসের মাধ্যমে বহির্দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা ব্যবস্থা। এই কাজে দক্ষতা। diplomat কূটনীতিক কূটনীতিবিদ বা কূটনৈতিক দূত।"[৯৬] তবে শব্দগত এ অর্থ ও উৎপত্তি নির্ণয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পণ্ডিত ও কূটনীতিক মহল ভিন্ন ভিন্ন মত উপস্থাপন করেছেন। তাছাড়াও বিভিন্ন কারণে শব্দটির অর্থের মধ্যে একটা আবছা বা অস্পষ্টতার রেশ উপেক্ষা করা যায় না। আবার শব্দটি এক এক স্থানে এক এক অর্থে পর্যাপ্ত ব্যবহৃত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে পররাষ্ট্র নীতির সাথে শব্দটিকে একাকার করে ব্যবহার করা হয়। পরারাষ্ট্রনীতি শব্দটি কখনো বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা বা যোগাযোগ হিসেবে, আবার কখনো পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত আলোচনার প্রক্রিয়াকে কখনো বা কূটনৈতিক পেশাকে নির্দেশ করে।[৯৭] সর্বপ্রথম ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে Diplomacy শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর উপর লিবনিক ১৬৯৩ সালে 'Codex Juris Gentium Diplomatica' নামে এবং ডিউমন্ট ১৭৭৬ সালে 'Corps Universal Diploamv.ique Du Droit Des' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

কূটনীতির সংজ্ঞা

কূটনীতি শব্দটির বিভিন্ন প্রায়োগিক অর্থ বা ব্যাখ্যা থেকে এর সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বাধিক ব্যবহৃত পররাষ্ট্র নীতির কৌশল হিসেবে যে কূটনীতি তার সংজ্ঞাও স্থান-কাল-পাত্র ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন রকম। বস্তুত কূটনীতির পরিসর ও কলাকৌশল এত ব্যাপক যে এর একক পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয়।

---

96. Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Benglai Dictionary*, Dhaka: Bangla Academy, 2005, P.212
৯৭. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, AvšÍRvZK ivRbxZ cwiwPZ *(Introducation to Internatinal Politics*, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, তাবি. পৃ. ৪০৫

স্যার আর্নেষ্ট স্যাটো বলেছেন যে, "স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার জন্য যে বুদ্ধি ও কৌশল প্রযুক্ত হয় তার নাম কূটনীতি।"

কূটনীতির সবচেয়ে সুন্দর ও স্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে "Oxford English Dictionary'-তে। এখানে বলা হয়েছে, "Diplomacy is the management of international relations by negotiations or the method by which these relations are adjusted and managed." অর্থাৎ কুটনীতি হলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধান এবং পরিচালনা।[৯৮]

২.২: কূটনীতির গুরুত্ব

যুদ্ধকালে আমান প্রাপ্তির ফলে যেমন সাধারণ লোকের পক্ষে এক দেশ থেকে অপর দেশে যাতায়াত করা সম্ভব হত, তেমনি মুসলিম ও অমুসলিম শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে সংযোগ স্থাপন করা চলত কূটনীতির মাধ্যমে। জেহাদ বা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ ঘোষণা করার পূর্বে কতকগুলো নীতি মেনে চলতে হত। যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত এর দৃষ্টান্ত। কূটনীতির মাধ্যমেই ইসলামে আহ্বান জানানো সম্ভব হত। তাছাড়া, মুসলমান শাসকদের অমুসলমানদের সঙ্গে দশ বছর পর্যন্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা অনুমোদিত ছিল। মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রদূতদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হত। কাজেই কূটনীতি ইসলামের যুদ্ধনীতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করত। কূটনীতি ছিল জেহাদের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জেহাদের শক্তি যখন মন্দীভূত হয়ে আসল এবং যখন ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য জাতির শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠল, তখন শান্তিপূর্ণ ব্যাপারে কূটনীতির গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল। বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে, উপহার ও বিনিময়ে ও অন্যান্য সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কূটনীতি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করল।[৯৯]

---

98. *Oxford English Dictionary*,(Oxford University press: 2006) p-84
৯৯. মজিদ কাদ্‌দরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

কূটনীতি সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা

জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বহু প্রাচীনকাল থেকেই কূটনীতির রীতি চলে আসছে। কিন্তু ইসলামের রাষ্ট্রীয় আওতার বাইরের অন্যান্য জাতির সঙ্গে যে পর্যন্ত যুদ্ধাবস্থাকে ইসলামের একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক বলে মনে করা হত, সে পর্যন্ত ইসলামের কূটনীতি কেবলমাত্র নিছক শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি। ইসলামের গোড়ার দিকের ইতিহাসে দেখা যায় যে, কূটনীতিকে যুদ্ধের একটা অংশ বা বিকল্প হিসেবেই ধরে নেয়া হত। যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের বাণী প্রচার করার পূর্ব-গবেষণা হিসেবে কূটনীতি প্রয়োগ করা হত। আবার কূটনীতির মাধ্যমেই যুদ্ধের পরে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের পন্থা নিরূপিত হত। আব্বাসীয় আমলের উপঢৌকন বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ সম্পর্কীয় চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ ব্যাপারে কূটনীতি ব্যবহৃত হত না। এমন কি রাষ্ট্রদূতদের তখনকার দিনে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুপ্তচর বলে সন্দেহ করা হলেও কোন বিশেষ ঘটনা বা সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদূত পাঠানো হত। মোটামুটি রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা ও কূটনীতি প্রায় একই জিনিস ছিল। জাতিতে জাতিতে সমবন্ধ নির্ধারণের ব্যাপার তখন কূটনীতির বড় একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। বলতে গেলে কূটনীতি তখন অনেকটা ম্যাকিয়াভেলীয় বা সুবিধাবাদী নীতিভিত্তিক ছিল।[১০০]

বিদেশী রাজা-বাদশাহদের দরবারে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অধিকার বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করত এবং এতে কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্যেও হাসিল করা যেতে।

Diplomatic Mission

কূটনৈতিক কার্যাবলী বা Diplomatic Mission সম্পর্ক The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. গ্রন্থে বলা হয়েছে- An official delegation from one country to another, a diplomatic mission can be either temporary or permanent. The members of a diplomatic mission have diplomatic status, the most important element of which is diplomatic immunity. Although Muslim and non-Muslim diplomatic missions are virtually identical, they evolved quite separately.

১০০. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, পৃ.৭৫

The concept of a diplomatic mission representing one independent ruler to another independent ruler is not entirely compatible with Islamic political theory. The universalist nature of Islam assumes a single *ummah* (community of the faithful) under one law and administered by one government. Theoretically, therefore, no diplomatic missions were needed within the Islamic world, for all were presumably under a single ruler. As for non-Muslim states, the necessity of diplomatic missions was considered to be only temporary, until the whole world came under the dominion of Islam; non-Muslim states were not considered to be moral or political equals of the Islamic state.[101]

In practice, Islamic diplomatic missions, both to other Muslim states and to nun-Muslim states, have existed since the time of the Prophet. Muhammad himself used (hem 10 propagate the faith. As the Arab-Islamic empire grew in size and power, the necessity for diplomatic missions grew apace. The caliphs in Damascus and later in Baghdad were in virtually continuous diplomatic communication with neighboring states, particularly with their enemies, the Byzantines and the Franks. The 'Abbasid caliph Harun al-Rasid developed extraordinary diplomatic ties with the Holy Roman emperor, Charlemagne, and the two regularly exchanged gifts and dispatched diplomatic missions. In periods of Islamic political decline, diplomatic missions between Muslim rulers also increased.

The basic functions of Islamic diplomatic missions have changed very little over the centuries: negotiating treaties, arbitrating disputes, attending state ceremonies, and also collecting intelligence. *Mufawwadah* means

---

101. John L. Esposito (Editor in chief) ,*The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World.* V.1, Oxford University Press, 1995, New York, P. 378-380

"negotiation" in Arabic, and a *mufawivadiyah* is a legation, an old form of diplomatic mission. The chief of mission was a *mufawwad* (minister). Another term used for a chief of a diplomatic mission was *rasul* (messenger).[102]

রাষ্ট্রদূতগণ রাষ্ট্রীয় বার্তা পৌছিয়ে দিয়েই তাঁদের মিশনের সাফল্য ও অসাফল্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে শীঘ্রই তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে ফিরে যেতে রাষ্ট্রদূতদের বিশেষ জাঁকজমক ও আদর-আপ্যায়নের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো হত। তবু তাঁদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর বলে মনে করা হত। তাই, তাঁদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। তাঁরা যাতে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদ না পান এবং সাধারণে নাগরিকদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন না করেন, সেদিকেও নজর রাখা হত।[১০৩]

২.৩: কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তব রূপায়ণে কূটনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহু অতীতকাল থেকে স্বীকৃত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ এবং মতাদর্শের প্রভাব কূটনীতিবিদের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছে বলে অনেক সমালোচক মন্তব্য প্রকাশ করলেও পররাষ্ট্র নীতির আঙিনা থেকে এখন পর্যন্ত অপসারিত হয় নি। আন্তর্জাতিক জীবনে কূটনীতি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চলমান প্রক্রিয়া। আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিচালন ব্যবস্থায় কূটনীতিকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। কূটনীতির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে বলে যতই ক্ষেদোক্তি করা হোক না কেন পররাষ্ট্র নীতি ও কূটনীতি পরস্পর থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্ছিন্ন নয়। বৈদেশিক সম্পর্কের একেবারে কেন্দ্রবিন্দু হলো কূটনীতি।

পররাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ততম ভাষা হলো– "It is the substance of foreign relations." অন্যদিকে– "Diplomacy proper is the process by which policy is carried out." পররাষ্ট্রনীতি স্থিরীকরণে নানারকম সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে থাকে। বিদেশমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, আইনসভা ও জনমত। সবার একটা করে ভূমিকা থাকে। কিন্তু নির্ধারিত নীতি কার্যকর করার জন্য অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুন ব্যক্তি অপরিহার্য। এ পরিষেবা আসে কূটনীতিবিদের কাছ থেকে। সুতরাং

102 John L. Esposito; ibid, P. 378

১০৩ মজিদ কাদ্দরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

নীতি নির্ধারণ ও নীতির বাস্তবায়ন দু'টোই কূটনীতির সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। তাই পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনাকালে কূটনীতির কথা এসেই যায়। পামার ও পারকিন্স বলেছে– "Diplomacy provides the machinery and the personnel by which foreign policy is executed, one is substance: the other is method."[104]

প্রতিটি রাষ্ট্র জাতীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে পররাষ্ট্রনীতির কাঠামো প্রস্তুত করে। আবার এ ব্যাপারে ভাববাদীরা বলেন কোন রাষ্ট্র মতাদর্শকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে পররাষ্ট্রনীতি স্থির করে না। যাই হোক না কেন পররাষ্ট্রনীতিকে একটি লক্ষ্য বলে বিবেচিত করা হয়। কিন্তু লক্ষ্যে উপস্থিত হবার পথ অনেক। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কূটনীতি হলো সে সমস্ত পথের একটিমাত্র পথ, তবে গুরুত্বের বিচারে কূটনীতি নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থান দাবি করতে পারে। কূটনীতি নামক হাতিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সুন্দর যোগসূত্র স্থাপন করে । মত বিনিময়, আলাপ-আলোচনা এবং ভিন্নমুখী স্বার্থের মধ্যে সাযুজ্য বিধান কূটনীতির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কূটনীতি নামক হাতিয়ার ছাড়া এ কাজগুলোর অন্য কারোর পক্ষে করা সম্ভব নয়। সূদূর অতীতেও কূটনীতি এ কাজ করত, আজও করে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোন ওলট পালট পরিবর্তন না হলে এ কাজ অবিকৃত অবস্থায় থাকবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।[১০৫]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত "The Congress of Vierina" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে নিকলসন (Nicolson) বলেছেন যে শান্তির সময় কূটনীতি নানাবিধ পথ অবলম্বনে উদ্দেশ্য অর্জনে লিপ্ত থাকে। এ কথাটার অর্থ তাহলে এ দাঁড়ায় যে, কেবল সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কূটনীতি সমস্যা সমাধানে রত থাকে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বা সংঘর্ষ চলাকালীন অবস্থায় কূটনীতি কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। যুদ্ধের সময় কূটনীতি সহযোগিতা করে না। নিকলসনের এ মন্তব্য অনেকে মনে নিতে পারে নি। পামার ও পারকিন্স বলেছেন, It is misleading to suggest that diplomacy ceases to function when major international crises arise, especially if they lead to war. আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা করা যে কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং যুদ্ধের সময় জাতীয় নিরাপত্তা যদি সঙ্কটাপন্ন হয় তাহলে কোন কূটনীতিবিদ নিশ্চেষ্ট হয়ে

---

১০৪. নির্মলকান্ড়ি ঘোষ, পৃ.৩১৮
১০৫. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, AvšÍRvwZK ivRbxwZ cwiwPwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১

বসে থাকতে পারে না। অথবা জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কূটনীতি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে কূটনীতির ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়ে।[১০৬]

The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World গ্রন্থের প্রধান সম্পাদক John L. Esposito বলেন- Following World War I, when most Muslim countrieshad regained at least token independence, resident diplomatic missions again spread throughout the Muslim world. Bin the war also ended the Ottoman caliphate, and the universalist nature of Islamic political theory no longer represented political reality. Western rules of diplomacy, based on sovereign nation-states, became universally accepted throughout the Muslim world.
Even these practices have not been static, however. After World War II, the previously sharp distinction between diplomatic functions and consular functions virtually disappeared. Today, consular functions, which include granting visas to foreigners wishing to visit one's country, seeking the welfare and protection of one's citizens abroad, and promoting commercial relations, are performed in diplomatic missions, just as traditional diplomatic functions, such as political and economic reporting, are performed in consulates. Depending on the country, consular officials are now regularly granted diplomatic immunity, which was not a traditional practice in the West.

The raising of diplomatic missions to the status of embassies is also virtually universal. Traditionally, missions to less important countries were legations, and the duels of mission held the title of minister, whereas the major missions were embassies and the chiefs of mission held the title of ambassador. After World War II, however, because of the sensitivities of the

১০৬. নির্মলকান্ড়ি ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২০

smaller, Third World countries, virtually all countries are now represented by ambassadors, and their-missions are designated as embassies.[107]

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শান্তি ও যুদ্ধের সময় কূটনীতির ভূমিকা কখনও এক থাকে না। শান্তির সময় কূটনীতিবিদের তৎপরতা বা উদ্বেগ থাকে না বা থাকলেও তা নগণ্য। কিন্তু যুদ্ধের সময় কূটনীতিবিদকে বিশেষভাবে তৎপর হতে হয়। একটি রাষ্ট্রের সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ একজন কূটনীতিবিদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। একই সাথে বিদেশমন্ত্রীদের কাজও বহুলাংশে বেড়ে যায়। এ কথা মনে করা ভুল যে পররাষ্ট্রনীতির সংকট মোকাবিলা করার সাধ্য কূটনীতির নেই। বরং বলা যেতে পারে কূটনীতির সাফল্যের মাপকাটি হলো পররাষ্ট্রনীতির সঙ্কট। দুই বিশ্বযুদ্ধের দিকে তাকালে এ মন্তব্যের যথার্থ্য প্রমাণিত হবে। ইতিহাসে এমন কোন নজির লিপিবদ্ধ নেই যুদ্ধের সময় কূটনীতিকে স্থগিত রাখা বা কূটনীতিবিদের কার্যকলাপ বন্ধ রাখা হয়েছিল।[১০৮]

পররাষ্ট্রনীতির বাস্তব রুপায়ণে কূটনীতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য যে আছে তা কোন মতে উপেক্ষা করা চলবে না। কূটনীতিবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন যে পররাষ্ট্রনীতি স্থিরীকরণের কাজে কূটনীতি সরাসরি জড়িত থাকে না। প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি করে জবরদস্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থাকে। কোন কোন রাষ্ট্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যা হোক, কাজের ফারাক বিশেষ নেই। বিদেশ মন্ত্রকের সাথে জড়িত আমলারা নিজেদের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা এবং তথ্যাদির সাহায্যে নীতি স্থির করেন। কূটনীতির কাজ তাকে কার্যকর করে তোলা। হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে কূটনীতি দায়িত্ব শেষ করে।

বিদেশ দপ্তরের অধীনে থেকে কূটনীতি কাজ করে্ অর্থাৎ কূটনীতি একটি স্বাধীন সংস্থা নয়। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তর পররাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা প্রধানমন্ত্রী অথবা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বারা পরিচালিত হয়। স্বাধীন কূটনীতিবিদ নিজের ইচ্ছামত চলতে পারেন না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশেই তাঁকে চলতে হয়। সুতরাং পররাষ্ট্র নীতিতে কূটনীতিবিদের ভূমিকা মুখ্য নয়। এ জন্যই দেখা যায় যে, কূটনীতি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকতে পারে। অথবা কোন রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষ উপস্থিত হলে কূটনীতিক কার্যাবলিও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিদেশ মন্ত্রক বা সামগ্রিকভাবে পররাষ্ট্র নীতি স্থগিত হয় না।[১০৯]

---

107. John L. Esposito (Editor in chief), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World.* V.1, Ibid, P. P.380

১০৮. মো. আবদুল হালিম, AvšRwZK m¤úK (msw¶ß BwZnvm) *A Short History of International Relations*ঃ ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩, পৃ. ৫৮-৫৯

১০৯. হ্যারল্ড নিকোলসন, অনু. আরশাদ আজিজ, KUbxwZwe‘¨v, (*Diplomacy)*-ঢাকাঃ সূচীপত্র প্রকাশনী, ২০১২, ১ম সং. পৃ.৮৯

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিদেশ মন্ত্রকের যতই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাক না কেন কূটনীতির ভূমিকাকে আদৌ ছোট করে দেখা ঠিক নয়। কারণ বিদেশ মন্ত্রকের অভিজ্ঞ কর্মচারীরা যখন নীতি স্থির করেন সে নীতির মালমশলা আসে কূটনীতিবিদদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে। বিদেশের রাজধানীতে অবস্থান কালে সে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সম্যকরূপে ওয়াকিবহাল হন। সর্বাধুনিক তথ্যাদি তাঁরা নিজ 'দেশের রাজধানীতে' প্রেরণ করেন। অভিজ্ঞতা ও তথ্যাদির হস্তান্তর পররাষ্ট্রনীতি স্থিরীকরণের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে কাজ করেন। কূটনীতিবিদের ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য ও অপরিণত বুদ্ধিজাত অভিজ্ঞতা কখনও বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতির উপাদান হতে পারে না।[১১০]

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব বা কর্মকর্তারা যে নীতি স্থির করে দেন তার হুবহু বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়। কিছু রদবদল অবশ্যই করতে হয় এবং এ কাজ সাধিত হয় কূটনীতিবিদের দ্বারা। সুতরাং কূটনীতিবিদকে পররাষ্ট্রনীতির একজন যান্ত্রিক রূপকার বলে মনে কররে বিরাট ভুল হবে। তিনি যন্ত্রের মত কাজ করলেও কখনও যন্ত্র নন। বাস্তব পরিস্থিতি, রাজনীতিক আবহাওয়া ও অপরাপর আনুষঙ্গিক উপাদান ও পরিস্থিতি বিবেচনা পূর্বক নীতিকে বাস্তবে পরিণত করে থাকেন। পররাষ্ট্রনীতিকে সুন্দর ও ফলপ্রসূ করার কাজে কূটনীতির ভূমিকাই সর্বাধিক। আবার কূটনীতি সুন্দর ও কার্যকর হয়ে উঠবে যদি পররাষ্ট্র দপ্তর সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। এদের এ পরস্পর নির্ভরশীলতাকে অস্বীকার করলে কূটনীতি বা পররাষ্ট্রনীতি কোটা সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা যাবে না।[১১১]

পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে কূটনীতি

কূটনীতি হলো পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার হাতিয়ারস্বরূপ। বস্তুত পররাষ্ট্রনীতির সুষ্ঠু, যথাযথ ও সফল বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বের প্রতিটি দেশের কূটনীতি অতিশয় কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রণীত পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন সাধারণ, জটিল, গোপন নীতিসমূহ বাস্তবে কার্যকরকরণ ও প্রয়োগ করে জাতীয় স্বার্থ উদ্ধার করতে কূটনীতির কোন বিকল্প পথ নেই। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। আন্তর্জাতিক সমাজে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ অর্জন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং আপন-সম্মান-মর্যাদা ও অবস্থানকে উত্তরোত্তর উচ্চে তুলে ধরা বা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তা প্রণয়নের নীতিকে পররাষ্ট্রনীতি বলা হয়। আর এ নীতি এ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি (কূটনীতিক) যে সকল প্রক্রিয়া বা নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন তা হলো কূটনীতি। আবার উভয় নীতিই যেমন সর্বদা সর্বত্র

---

১১০. মো. আকরামুজ্জামান,Avš RvwZK mgm¨v I wek¦ ivRbxwZ (*International Issues & The World Politcis*)Ñ ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন, ১৯৯৬, পৃ.৫৭

১১১. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

চলমান তেমনি গতিশীল এবং এক অপরের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল। তাই পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ার হলো কূটনীতি।[১১২]

২.৪: ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ কূটনীতিক

অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেছে যে সুস্থ কূটনীতির জন্য কিছু নীতি থাকা দরকার। একজন আদর্শ কূটনীতিকের যে গুণাবলী থাকা দরকার তা পরীক্ষা করলে কথিত নীতিগুলির চরিত্র সঠিক ঠাহর করা যাবে। এই বিশেষ গুণাবলী কি? এর অনেকগুলো অচল হয়ে গেছে– অনেকগুলো এখনো অত্যাবশ্যক– সঠিক দেন-দরবারের ভিত্তি হলো নৈতিক প্রভাব, আর উক্ত প্রভাব গড়ে ওঠে সাতটি বিশেষ কূটনৈতিক গুণের উপর নির্ভর করে। ১. সত্যবাদিতা; ২. যথার্থ,[১১৩] ৩. স্থৈর্য,[১১৪] ৪. স্বাদু মেজাজ, ৫. ধৈর্য, ৬. নম্রতা, ৭. আনুগত্য।[১১৫]

কূটনৈতিক তত্ত্ব বিষয়ক অধিকাংশ লেখক একজন সফল আপস রফাকারীর কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন সে বিষয়ে আলোচনা করেন সবচেয়ে বেশি এবং সবিস্তারে। এই লেখকরা সাধারণভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন যে একজন রাষ্ট্রদূতকে সফল হতে হলে কর্মরত দেশের কর্তৃপক্ষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করতে হবে। এর জন্য অবশ্য স্থান ও কালের বিষয়টা বিবেচনা করতে হয়। যে ব্যক্তি সপ্তদশ শতকে হয়তো খুবই সফল হতেন রাষ্ট্রদূত হিসেবে, আজকের দিনে তার হাসির খোরাকে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ। যে ব্যক্তি তেহরানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিঃসংশয় সাফল্য অর্জন করেন তার পক্ষে ওয়াশিংটনে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব নাও হতে পারে। এই পার্থক্যগুলি খুবই সুস্পষ্ট। একজন আপসরফাকারীর স্থায়ী গুণাবলি সম্পর্কে কিছু বলার আগে দেখা যাক আগে কি কি গুণ মূল্যবান বিবেচিত হতো এবং আজকের দিনে সেগুলির মোটেই মূল্যায়ন করা হয় না।

---

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

১১৩. (জোথারথো), সত্য, সত্যতা, হাকিকত, প্রকৃত তথ্য, যথার্থতা, বিস্তারিত-ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী e¨enwiK evsjv Awfavb, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৭, পৃ.১১৮১

১১৪. (স্থাইরজো), স্থিরতা, ধীরতা, মানসিক দৃঢ়তা, উদাহরন (নেই সেই বিচার বোধের স্থৈর্য-আচিসে) বিস্তারিত-ড. মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০৯

১১৫. হ্যারল্ড নিকোলসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

একদিকে তাকে যেমন হতে হবে ক্লাসিক্যাল স্কলার, একজন ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ, সমরবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, অপরদিকে তাকে হতে হবে বিদগ্ধ কাব্যরুচির অধিকারী। সর্বোপরি তাকে মর্যাদাবান বংশজাত এবং সুদর্শন হতে হবে।

একজন কূটনীতিকের সবচেয়ে বড়ো গুণ হলো নৈতিক প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা। মর্যাদা অর্জন এবং রক্ষার ব্যাপারে তাকে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে। নচেৎ তার সরকার এবং বিদেশে তার কর্মস্থলের সরকার তার কথাবার্তার মূল্য দেবে না, তার উপর আস্থা রাখবে না।

অতএব যদি আমরা স্বীকার করি যে উদ্ভাবন-কূশল কূটনীতিকের পক্ষে অবিশ্বস্ত হওয়া সম্ভব, আর অবিশ্বস্ত কূটনীতিক সুনিশ্চিত বিপজ্জনক ব্যর্থতা কুড়াতে বাধ্য, তাহলে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, "নৈতিক প্রভাব" নামক সাধারণ শিরোনামের অধীনে আমাদের আদর্শ কূটনীতিকদের কি বিশেষ গুণাবলি থাকতে হবে, কিংবা তাদের অর্জন করতে হবে।

এই গুণগুলির প্রথমটি হলো সত্যবাদিতা। এখানে শুধু সজ্ঞানে মিথ্যাচার করা থেকে বিরত থাকলে চলবে না, এখানে সত্য চেপে রাখার প্রবণতাও অনাকাংখিত। একজন সৎ কূটনীতিক যাদের সঙ্গে কাজ করবেন তাদের মধ্যে কখনো নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করবেন না। যদি সরল বিশ্বাসে কোনো বিদেশ মন্ত্রীকে ভুল তথ্য দেন, কিংবা পরবর্তী কোনো সময় দেখা যায় যে তার দেয়া তথ্য সঠিক ছিল না, তাহলে তার কাজ হবে অবিলম্বে ভুল বোঝাবুঝি দূর করা, এর জন্য সাময়িক অসুবিধা হলেও তা করতে হবে। দেন-দরবারকে আমরা যদি নিম্নতম মান দ্বারাও বিচার করি, তবু এটা স্পষ্ট যে ভুল তথ্য সংশোধন করলে তাৎক্ষণিকভাবে সুনাম বৃদ্ধি পায়, আর ভবিষ্যৎ আস্থা হয় সুরক্ষিত।

একজন আদর্শ কূটনীতিকের জন্য যদি পয়লা নম্বরের আবশ্যকীয় শর্ত হয় সত্যবাদিতা, তাহলে দ্বিতীয় নম্বরে অবশ্যই থাকবে যথার্থতা। এখানে যথার্থতা বলতে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক যথার্থতা। বোঝানো হচ্ছে না, কারণ নৈতিক যথার্থতাও অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। আপস-রফাকারীকে সামগ্রিক অর্থে যথার্থ হতে হবে।

আদর্শ কূটনীতিকের তৃতীয় গুণটি হলো ধীর, স্থির, শান্ত ভাব। আপস-রফাকারীকে যে কোনো অবস্থায় ধীর-স্থির-শান্ত-ভাবটা বজায় রাখতে হবে। প্রতিপক্ষের নির্বুদ্ধিতা, অসততা, পাশবিকতা বা প্রবঞ্চনার ঝোঁক যেন রাষ্ট্রদূতকে বিচলিত না করে। নানা বাঁধা উপেক্ষা করে তাকে অপ্রিয় কাজটা সম্পন্ন করতে হবে। ব্যক্তিগত শত্রুতা কিংবা অনুরাগ, উৎসাহ, পছন্দ-অপছন্দ, অহংবোধ, নৈতিক ক্ষোভ এড়িয়ে চলা আবশ্যিক। তরুণ কূটনীতিক তালেরাঁ বলেছিলেন:

Et surtour pas trop de zele। "সর্বোপরি, নিজের কাজ সম্পর্কে কখনো উত্তেজিত হবে না।"[১১৬] একজন কূটনীতিক সত্যবাদি, ধীর স্থির, ধৈর্যশীল, স্বাদু মেজাজী হতে পারেন, তবে তিনি আদর্শ কূটনীতিক গণ্য হবেন না যদি তিনি একই সঙ্গে নম্র প্রকৃতির না হন। কোনো দূতের আত্মাভিমান সাজে না, এতে শুধু বিপদ ডেকে আনা হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপেক্ষা করে চলার ঝোঁক দেখা দিতে পারে। অথচ কোনো দেশ বা সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যিক। আত্মাভিমান প্রতিপক্ষের চাটুকারিতা কিংবা আক্রমণের কাছে নীতি স্বীকার করে।[১১৭]

একই কারণে তিনি অতিথি রাজনীতিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে অসংগত আচরণ করতে পারেন। নিজের বিদেশ মন্ত্রী বিষয়ে এমন মন্তব্য করতে পারেন যা আনুগত্যহীনতার পরিচায়ক। একই সঙ্গে তার মধ্যে অযথার্থতা, ক্ষতিকর উত্তেজনা, অধৈর্য, আবেগের আধিক্য, এমনকি মিথ্যাচারের মতো দোষ ঢুকে যেতে পারে। কূটনীতির জগতে যতগুলি ত্রুটি রয়েছে (সংখ্যাটা নেহাৎ নগণ্য নয়) তার মধ্যে আত্মাভিমান সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। অথচ এর প্রাদুর্ভাব সব চেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়।

২.৫: ইসলামী রাষ্ট্রের সদস্য পদের ভিত্তি

ইসলাম গোত্রবাদ এবং জাতীয়তাবাদকে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ যে মানব জাতিকে মহান আল্লাহ তার গুণাবলীর অংশ বা আত্মা দিয়ে সম মর্যাদা সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন তাকে বর্ণ, ভৌগলিক, ভাষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক গোত্রবাদ বা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে চায় না। এভাবে মানুষকে বিভক্ত করা মানবতা বিরোধী। এটা মানুষের মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক মানুষের পরিচিতি হবে তার চিন্তাধারা, আদর্শ, স্বতঃস্ফূর্ত কাজকর্ম এবং কৃতিত্বের ভিত্তিতে। জন্মগত পরিস্থিতি, জৈবিক অথবা সামাজিক গঠন মানুষের পরিচিতির নিয়ামক হওয়া সংগত নয়। কারণ এসব তার ইচ্ছাধীন নয়। প্রথম হিজরী (৬২২ খৃঃ) সনে মদিনার ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রথমে যে অমুসলিম সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি প্রদান করে তারা হল ইহুদী সম্প্রদায়। এরপর ক্রমান্বয়ে স্বীকৃতি পায়, খ্রীষ্টান, সাবায়ান (Sabean) এবং অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহ। এ সব সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মীয় পরিচিতির মাধ্যমে নিজেদের স্বতন্ত্র বজায় রাখার পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করে। যে সমস্ত লোক কোন ধর্মের ভিত্তিতে পরিচিত হতে আগ্রহী নয় সে সব

১১৬. নির্মলকান্ড়ি ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

১১৭. মো. আবদুল হালিম, Av¨š R¨ZK m¤úK (ms¶¶ß B¨Zn¨m) *A Short History of International Relations*: ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩, পৃ. ৬৪

লোককেও ইসলামী আইনতন্ত্র সমানভাবে স্বীকার করে। কিন্তু এজন্য শর্ত হল তারা যেমনভাবে জীবন যাপন করতে চায় তা পরিচালনার জন্য আইন কানুনের একটি উত্তরাধিকার থাকতে হবে।[১১৮]

স্বাধীনতা(Liberty)

ইসলাম এবং ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্ব ব্যবস্থায় এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে বন্দীদশা অবস্থায় কোন বন্দী পিতামাতার ঘরে জন্ম নেয়া সন্তান ব্যতীত সকল মানব সন্তানই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং যতদিন তারা বেঁচে থাকে ততদিনই তাদের সে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে। যুদ্ধের মাধ্যমে যোদ্ধাদেরকে বন্দী করাই হল বন্দী দশার একমাত্র স্বীকৃত উৎস। এসব বন্দী তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিপণের মাধ্যমে আইনগতভাবে মুক্তিযোগ্য। বন্দীরা নিজেও তাদের মুক্তির জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বন্দীদের সৃজনশীল কাজের দ্বারা নিজেদেরকে মুক্ত করার প্রস্তাব বন্দীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া অবৈধ।[১১৯]

অবাধ চলাচল (Openness)

ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্ব ব্যবস্থা এ পৃথিবীকে আল্লাহপাকের সাম্রাজ্য হিসাবে গণ্য করে। এখানে মানুষ তাঁর দয়ার দান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এর অর্থ হচ্ছে মানুষকে তাঁদের গতিবিধির ব্যাপারে নিষেধ করা যায় না। তারা যা পছন্দ করে তা করার জন্য স্বাধীনতা দিতে হবে। যে পর্যন্ত তারা দেশের সীমানা এবং জনগণকে নিয়ন্ত্রণকারী আইন কানুন মেনে চলতে ইচ্ছুক থাকে সে পর্যন্ত তারা দেশে প্রবেশ, অবস্থান এবং বসবাস করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আগমন ও বহির্গমন অনুমতি, আবাসিক বা কর্ম অনুমতি, সংরক্ষণকারী শুল্ক ছাড়পত্র ইত্যাদির মত নানা প্রকার বিধি নিষেধ দ্বারা মানুষ এবং মালামালের চলাচল অবশ্যই থাকতে হবে অবাধ। এ সমস্ত পদ্ধতি এবং এগুলোর লালন ও প্রয়োগকারী শতাব্দী কালের অধিক পুরাতন প্রতিষ্ঠান সমূহের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে। মানুষের পেশা এবং কাজ স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকার আল্লাহর বিশ্ব সাম্রাজ্য ব্যবস্থা অলংঘনীয়। একইরূপে মানুষের অধিকারে এ দুনিয়ায় যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে সেগুলোর মালিকানার ব্যাপারেও সে স্বাধীন। যেখানে খুশী সেখানে তার সম্পদ নিয়ে যাওয়ার জন্যও সে স্বাধীন। অন্যের সম্পদের উপর আক্রমণ বা তা হরণ করার মত কিছু না হলে কোন

১১৮. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১-৪৩
১১৯. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করা যায় না। একটি সত্যিকার ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থায় যে কোন দেশের অর্থনীতি এবং প্রশাসন হবে সমগ্র পৃথিবীর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল।[১২০]

ঐতিহ্যবাদ এবং পাশ্চাত্যবাদের তুলনামূলক আলোচনা

মুসলিম চিন্তাধারা, প্রযুক্তি এবং সামাজিক পদ্ধতি যখন তাকলীদকে প্রতিষ্ঠিত জীবন পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে স্থবির হয়ে পড়ে তখন ইউরোপ আত্মনিয়োগ করে নতুন ধ্যান ধারণা ও পদ্ধতি উন্নয়নের কাজে। সপ্তদশ শতকে যুদ্ধবিদ্যা এবং রাজনৈতিক সংগঠনের দিক দিয়ে ইউরোপ মুসলিম বিশ্বকে অতিক্রম করে। এর ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা আত্মরক্ষামূলক অবস্থা গ্রহণ করে পড়ে থাকে।

ইউরোপের সাথে ঘনিষ্ঠ এবং বেশী বেশী যোগাযোগের ফলে মুসলিম কর্তৃপক্ষসমূহ বিশেষ করে সামরিক ও সংশ্লিষ্ট পেশার প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ এবং সেগুলো প্রয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ সমূহ সামরিক ও পেশাদারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, ইউরোপ থেকে শিক্ষক ভাড়া আনে এবং নতুন দক্ষতা ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জনের জন্য মুসলিম দেশের ছাত্রদেরকে ইউরোপে প্রেরণ করে। এ পদক্ষেপ মুসলিম দেশসমূহের সামাজিক কাঠামোর জন্য এক মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে। এ পদক্ষেপ সমাজের ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেয়। কারণ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ হল ইসলামের বৈরী এক আদর্শবাদ।[১২১]

বর্হিবিষয়ক ক্ষেত্রে আধুনিক মুসলিম চিন্তাধারা হয়তো মুসলিম মনস্তত্ত্বের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অপ্রাসংগিক, নতুবা যে বিশ্বে মুসলিম জনগণ বসবাস করছে তার বাস্তবতার নিরিখে অপ্রাসংগিক। এটা মনে করা সঠিক নয় যে, মুসলিম মনস্তত্ত্ব, ধ্যান ধারণা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূখণ্ড এবং জনগণের কোন স্বরূপ স্বকীয়তা নেই। মুসলিমদের অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে কি করে আধুনিক প্রতিষ্ঠান এবং চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাওয়ানো যায় এবং কিভাবে এ প্রসংগে প্রতিক্রিয়া দেখানো যায় এবং কিভাবে সাধারণ মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্ব সমাজে নিজেদের অবস্থান করে নেয়া যায়। তাঁদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে বিভিন্ন সময়ে মুসলিম ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন অংশে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের জন্য যে কৌশল এবং নীতিমালা উপযোগী, সেগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তুরস্কের জন্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে যা প্রয়োগযোগ্য ছিল তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে যা প্রয়োগ করা যেত তা থেকে

১২০. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০-৭৪
১২১. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ ভিন্ন। একইভাবে বলা যায় পাকিস্তানী, ইরানী এবং তুর্কীদের জন্য বর্তমানে যে নীতি প্রযোজ্য তা মিশরীয় এবং সিরিয়দের জন্য উপযোগী নীতি হতে ভিন্ন প্রকৃতির।

ইসলামী চিন্তাধারায় এইরূপ উদ্যোগ গ্রহণ সংগত হতে পারে কেবল প্রাচীন ইসলামিক উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমাদেরকে সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত করতে হবে নবি করিম (সা.) এর মদিনার রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রতি। ঐ সমস্ত নীতিমালার সনাতন আইনগত ব্যাখ্যার অপসারণে এ প্রচেষ্টা আমাদের সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে সনাতন মুসলিম ধারণায় বিদ্যমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি সংশোধন করা।

তৃতীয় পদক্ষেপ হল সনাতন পদ্ধতিতে স্থান কালের উপাদান প্রসংগে চিন্তা ধারার মুসলিম নীতি নির্ধারকগণের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান সে সম্পর্কে তাঁদেরকে সচেতন করে বহিঃসম্পর্ক বিষয়ে একটি কার্যোপযোগী ইসলামী কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা। এটা করা সম্ভব হলে নীতি নির্ধারকগণ সমকালীন বিশ্বের পরিবর্তনশীল বাস্তবতার মোকাবেলায় সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। চূড়ান্ত পদক্ষেপে এই কাঠামোকে সমকালীন মুসলিম বৈদেশিক নীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিকের বিপরীতে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে একটি আদর্শ ভিত্তিক কাঠামোর সাফল্যের মূল্যায়ন হয় একদিকে ঐ আদর্শের মৌলিক ধারণার প্রেক্ষিতে এর উপযুক্ততা দ্বারা এবং অন্যদিকে নীতি প্রণেতাদের জন্য এর উপযোগ দ্বারা। আমরা প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা শুরু করবো। এ পদক্ষেপ হল বহিঃসম্পর্ক বিষয়ে নবি করিম (সা.) এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি সম্পর্কীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য সে সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।[১২২]

২.৬: রাষ্ট্রদূত

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞগণ মুসলিম প্রতিনিধিকে রাসূল (বহুবচনে–রুসূল) বা সাফীর (বহুবচনে–সুফারা) বলে অভিহিত করেছেন। রাসূল কথাটি ইরসাল থেকে এসেছে। ইরসাল মানে হল, পাঠানো বা কোন বিশেষ কাজ দিয়ে কোথাও কোন প্রতিনিধি পাঠানো। তাই, রাসূল বলতে নবী বা দূত– দুই-ই বোঝাতে পারে। সাফীর কথাটি সফর থেকে এসেছে। সফর বলতে রাষ্ট্রদূতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে

১২২. এ.জে. এম শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৬, পৃ. ১০৯

সমঝোতা ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কাজও বোঝায়।[১২৩] কিন্তু গোড়ার দিকে এ দুটি শব্দের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি। অবশ্য, পরবর্তী আইনবিদগণ সাফীর বলতে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বুঝেছেন এবং রাসূল কথাটি (ধর্ম সম্বন্ধীয়) নবী অর্থে ব্যবহার করেছেন।[১২৪]

মুসলিম রাষ্ট্রদূতগণ খলিফা ও সুলতানের প্রতিনিধিত্ব করতেন। বিশ্বস্ততা এবং জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মধ্য হতে রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ করা হত। সাধারণতঃ কার্যদক্ষতা, সাহসিকতা ও উপস্থিত-বুদ্ধির সঙ্গে তাঁদের শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য এবং মানসিক প্রফুল্লতা বিচার করে তাঁদের নিয়োগ করা হত। মদ্যপান তাঁদের জন্যে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক বিধায় নারীদের সংস্পর্শ থেকে তাঁদের দূরে থাকতে হত। খলিফা বা সুলতানগণ প্রায়ই রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করার জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজে পেতেন না। তাই, তাঁরা সাধারণতঃ কূটনেতিক কাজে দুই বা তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল পাঠাতেন; এর মধ্যে একজন যোদ্ধা ও একজন বিদ্বান ব্যক্তি থাকতেন। তৃতীয়জন সম্পাদক বা সেক্রেটারী নিযুক্ত হতেন।[১২৫]

Historically, the most important role of an Islamic diplomatic mission was probably arbitration. The Arabic for the more contemporary term, æembassy," is*sifarah,* and the chief of mission is a *safir* (ambassador). Both terms have the connotation of "mediation" or "arbitration," reflecting the greater emphasis in Islamic law on arbitration rather than establishing guilt.

Arbitration was practiced in the Middle Hast lung before the advent ol Islam and was simply absorbed into the new relDgion. The prophet Muhammad saw himself (and by extension, his successors) as an arbitrator, and the Qur'an admonishes the faithful, "If you differ, bring it before Allah and the apostle." (surah 4.59). The same principle was applied to arbitrating between nations.

---

১২৩. মফিজুল্লাহ কবীর, Bmjvg I wLjvdZ, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা: ১৯৭৪, পৃ. ৭৫
১২৪. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯
১২৫. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

In the early days of Islam, diplomatic missions were exchanged for the purpose of negotiating or arbitrating a particular issue. Although some missions slaved months or even years in a foreign capital, few were permanent in the contemporary sense. Maintaining permanent diplomatic missions was basically a European practice that developed around the sixteenth century. By the end of the sixteenth century, resident European envoys were accredited to the Ottoman sultan in Constantinople, and by the eighteenth century, Ottoman envoys were resident in Europe.[126]

রাষ্ট্রদূতদের সরকারী চিঠি বহন করতে হত এবং সেগুলো তাঁরা বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানকে সম্বোধন করে পড়ে দিতেন। এ সব চিঠিতে রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র থাকত, যাতে তিনি মৌখিক বাণী নিয়ে পৌঁছে দিতে পারেন। অনেক সময় এ পরিচয়পত্রে প্রেরিত রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে সাধারণ নীতি উল্লেখ থাকত। এতে একথাও লেখা থাকত যে, গোপনীয় তথ্য রাষ্ট্রদূত নিজে মুখে বলবেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর আমল থেকে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিদেশে দূত পাঠান হত। মুসলিম ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাইজান্টীয়াম, মিসর, পারস্য (ইরান) ও আবিসিনিয়ায় ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে দুত (প্রতিনিধি) প্রেরণ করেন। এসব দেশে দূতদের সঙ্গে প্রেরিত পত্রে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য ইত্যাদি সম্পর্কে যে সাধারণ বর্ণনা পাওযা যায়, তাতে দেখা যায়, দু'একটি বিষয়ে পার্থক্য ছাড়া এগুলো প্রায় একই ধাঁচে লেখা। বাইজান্টীয় সম্রাটের নিকট লিখিত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পত্রটি ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ[১২৭]

'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট থেকে রোমের (বাইজান্টীয়ার) সর্বোচ্চ শাসক হেরাক্লিয়াসের প্রতি। 'যাঁরা সত্যকে অনুসরণ করেন, তাঁদের প্রতি শান্তি (সালাম)। আপনাকে আল্লাহর নামে ইসলামে আহ্বান করা আমার কর্তব্য। আপনি যদি (ইসলাম গ্রহণ করেন) মুসলমান হন, তবে আপনি নিরাপদ এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। আপনারা অর্থাৎ কিতাবিরা আমাদের মধ্যে আল্লাহর একই বাণী দেখতে পাবেন। আসুন, আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন, 'ইলাহ'

126. John L. Esposito (Editor in chief), ibid, P. 378-380
১২৭. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪

বা উপাস্য গ্রহণ না করি। যদি ঈমান আনেন, তবে বলুনঃ 'আমরা মুসলমান; আর যদি এতে বিশ্বাস না করেন, তবে আপনি আপনার লোকদের পাপের জন্যে দায়ী হবেন।'[১২৮]

প্রচলিত বিবরণ হতে জানা যায় যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ ও মিসরের মুকাউকাস হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসলামে দাখিল হওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু বাইজান্টীয় সম্রাট জবাব দেন যে, তাঁর প্রজারা ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। আর পারস্যের বাদশাহ হযরতের আহবানপত্রটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন এবং পত্রবাহক দূতদের বিতাড়িত করেন। পারস্যের বাদশাহর আচরণের কথা অবহিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মন্তব্য করেনঃ 'তার সাম্রাজ্যও এমনিভাবেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে!' এই কূটনৈতিক আদান-প্রদানের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক।

প্রাথমিক যুগের খলিফাদের (খোলাফায়ে রাশেদা ও উমাইয়া খেলাফত) আমলে বাইজান্টীয়দের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং শুল্ক প্রদানের ব্যাপারেই কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়া খলিফাগণ বিশেষ করে প্রথম মুয়াবিয়া ও আবদুল মালিকের আমলে বাইজান্টীয়দের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং বার্ষিক শুল্ক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময়ে মুসলমানগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আরব ঐতিহাসিকগণ এসব বিষয়ের কোন উল্লেখ করেননি। আর এসব কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও চুক্তিগুলোর কোন দলিলও সুরক্ষিত হয়নি।

উমাইয়াদের চাইতে আব্বাসীয় খলিফাগণই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বাইজান্টীয় সীমান্তে প্রায় বছরই সমর-অভিযান চালনা হত। ফলে বন্দী বিনিময় কিংবা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্যে চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাতে হত। তাছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক কারণে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তৎকালীন সমসাময়িক প্রায় সকল শাসকের কাছেই রাষ্ট্রদূত পাঠানোর রীতি ছিল। ফাতেমীয় ও মামলুক শাসকগণ ব্যাপকভাবে এই রীতি অনুসরণ করেন। তাঁরা ইউরোপ এবং মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন।[১২৯]

---

১২৮. আবূ 'আব্দিলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী আল জু'ফি, mwnn eLvix, বাব-রাসূল (সা.) এর নিকট ওহি আসা কিভাবে শুরু হলো, বৈরুত:দারুল কিতাব, ১৯৮৭, খ.১ম, পৃ.৮-১০, হাদিস নং-৭।

১২৯. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮০

২.৭: রাষ্ট্রদূতের অভ্যর্থনা

বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ নিজেদের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আমান ব্যতিরেকে দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে পারতেন এবং সরাসরি রাজধানীতে উপস্থিত হতে পারতেন। সাধারণতঃ তাঁদের সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক থাকতেন।

কার্য উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রদূতগণ আমান ব্যতিরেকে দারুল ইসলামে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করতেন। একে কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বলা যেতে পারে। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে এবং নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকলে তাঁরা সাধারণতঃ এই সুবিধা ভোগ করতেন। নিষিদ্ধ কাজগুলো হচ্ছে গুপ্তচর বৃত্তি অথবা দারুল হারবে পাঠানোর জন্যে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা। শাসকদের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব থাকলে এ সুবিধা সবসময় দেয়া হত না। তবু মুসলিম ও অমুসলিম শাসকগণ কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে পারস্পরিক মঙ্গলের দিক থেকে কল্যাণকর বলে মনে করতেন।

আব্বাসীয় আমলের শেষের দিকে বিভিন্ন দেশের মর্যাদাবান মুসলমানদের নিকট হতে পাঠানো সরকারী পরিদর্শকদের অভ্যর্থনার জন্য যে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করা হত, তার চাইতে অনেক বেশী জাঁকজমক করা হত বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনায়। মুসলিম শক্তির অবনতির যুগে এ ধরনের জাঁকজমক প্রদর্শন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রদূতগণ সাধারণতঃ খলিফা ও সুলতানদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং ইসলামী জগতের বিভিন্ন রাজধানীতে তাঁদের সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা করা হত। শোভাযাত্রা সহকারে তাঁদের রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হত; রাস্তা বরাবর মিছিল চলত ও দুই পাশে সৈন্যগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। আগমনের পথে থাকত সুসজ্জিত তোরণ। তাঁদের অবস্থানের জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত বাড়ী নির্দিষ্ট করে রাখা হত, যেখানে জমকালোভাবে তাঁদের ভোজ ও আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হত। বাইজান্টীয় রাষ্ট্রদূতগণের বাগদাদ পরিদর্শন সম্পর্কে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।[১৩০]

আল-মুক্তাতাদিরের আমলে হিজরী ৩০৫ সনে (খৃস্টাব্দ ৯১৮) বাইজান্টীয় রাষ্ট্রদূতের বাগদাদ পরিদর্শন সম্পর্কে মুসলিম ইতিহাসে খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া যায়। খলিফা ও তাঁর সুদক্ষ উজির ইবনে আল-ফুরাতের ইচ্ছাক্রমে বাইজান্টীয় রাষ্ট্রদূতকে সাম্রাজ্যের বিস্ময়কর বস্তু, স্থান ও অট্টালিকা এবং অতুলনীয় ঐশ্বর্যের উপকরণসমূহ দেখানো হয়। খলিফা আততায়ী ও সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক বুয়াহিদের শাহজাদা অদুদ-

১৩০. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

উল-দওলা কর্তৃক আয়োজিত ফাতেমীয় রাষ্ট্রদূতের অভ্যর্থনা এর আর একটি দৃষ্টান্ত। ফাতেমীয় রাষ্ট্রদূত খলিফা শান-শওকত ও ইযযত-সম্ভ্রম দেখে অবাক হন। কর্ডোভার খলিফা ও মিশরের মামলুক সুলতানগণ ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতেন।

রাজধানীতে অবস্থানকালে রাষ্ট্রদূতদের যে কেবল আদর-আপ্যায়ন করা হত তাই নয়, তাঁদের প্রসিদ্ধ ও মনোরম স্থানগুলো দেখান হত এবং নানারকমের উপহার ও সম্মানী পোশাক দেয়া হত। অতিথি সেবক রাষ্ট্রের আতিথেয়তা এবং এর মার্জিত কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আদব-কায়দার গৌরব-মহিমার নিদর্শন হিসেবেই এসব উপহার দেয়া হত। উপহার আদান-প্রদান কূটনীতি সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানেরই অংশ বিশেষ ছিল।

কাজ শেষ হয়ে গেলে রাষ্ট্রদূতগণ বিদায়ের অনুমতি চাইতেন। এ সময়ও অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হত।[১৩১]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আমলে যখনই কোন বিদেশী দূত বা প্রতিনিধি দল আসত হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে স্থানীয় শিষ্টাচার অনুযায়ী অভ্যর্থনা করার পূর্বে একজন কর্মচারী অতিথিদেরকে অনুষ্ঠান প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞাত করতেন।

মদীনায় থাকাকালে নবী বিদেশী দূতগণকে বড় মসজিদে অভ্যর্থনা করতেন। দূতাবাসের স্তম্ভগুলি আজও সেই স্থানটির পরিচয় বহন করছে। বিদেশী দূতগণকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গিগণ সুন্দর পোষাক পরিধান করতেন বলে কথিত আছে।

দূতগণ সাধারণতঃ তাদেরকে যে রাজদরবারে পাঠানো হত সেই দেশের শাসকের জন্য তাদের নিজেদের রাজাদের তরফ থেকে উপঢৌকন নিয়ে আসত। এ ধরনের জিনিষ সরকারী তহবিলে প্রেরিত হত। একদা খলিফা ওমরের স্ত্রী তাঁর উপহারের প্রতিদানে কনষ্টান্টিনেপোলের সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে এক উপঢৌকন পান; কিন্তু খলিফা তাও সরকারী তহবিলে জমা দেন এবং খলিফার স্ত্রীকে তাঁর মূল উপঢৌকনের মূল্য কেবল প্রদান করা হয়। এমন ঘটনারও উল্লেখ আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিদেশী রাজাদের কাছ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তা তাঁর সরকারী ক্ষমতাবলে ব্যবহার করেছেন। উত্তরাধিকার

১৩১. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২

সূত্রে কেউ তাঁর কাছ থেকে কিছুই পাবে না এবং তাঁর যা কিছু ছিল সবই সরকারী তহবিলে যাবে– মহানবী (সা.) এর এই অনুশাসন ইহাই প্রমাণ করে যে, ব্যক্তিগত বলতে তাঁর কিছুই ছিল না।[১৩২]

দূতগণকে যে রাজাদের কাছে পাঠানো হত সে রাজাদের কাছ থেকে তারাও উপঢৌকন পেত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় যেমন দূতগণকে স্বয়ং উপঢৌকন দিতেন তেমনি যেন তাঁর উত্তরসূরীর দূতগণের প্রতি ব্যবহার করে এই মর্মে তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় ওয়াছিয়াত করে গেছেন বলে উল্লেখ আছে। ওমান থেকে আগত এক দূতকে নবী একদা পাঁচশত ড্রাকাম, এবং অন্য এক দূতকে সোনা ও রূপার কটিবদ্ধ দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী কম বেশী দূতদের সবাইকে তিনি উপঢৌকন দিতেন। এ সাধারণভাবে স্বীকৃত যে বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে মুসলিম দূত যদি কোন উপঢৌকন পায় তা সরকারী তহবিলে জমা হবে।

দূতদিগকে সরকারী খরচে আপ্যায়িত করা হয়। নবীর আমলে বিশেষ করে বিদেশী অতিথি সৎকারের জন্য মদীনায় অনেকগুলি প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। এ প্রসঙ্গে ইবনে সাদ এর গ্রন্থে রামালাহ্ বিনতুল হারিছের বাড়ীটির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। অন্য একটি বাড়ী অতিথি ভবন নামে পরিচিত ছিল। আবিসিনিয়ার দূতদেরকে আপ্যায়নের জন্য নবী (সা.) স্বয়ং যে বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কেননা ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে তিনি যখন মক্কায় চরম বিপদের সম্মুখীন হন এই দেশকেই তিনি পরম বন্ধু-রাষ্ট্র হিসেবে পান। সাধারণভাবে বলতে গেলে, দূতদের নিজ নিজ রাজা ও তাদের ব্যক্তিগত পদমর্যাদা অনুসারে তাদের প্রতি ব্যবহার করা হত।[১৩৩]

২.৮: দূতগণের বিশেষ সুবিধাবলী

দূতগণ তাদের দলের অন্যান্য লোকসহ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করে; তাদেরকে কখনো হত্যা অথবা তাদের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার বা উৎপীড়ন করা যাবে না। এমনকি দূত অথবা তার দলের কেউ যদি, যে রাষ্ট্রে তারা প্রেরিত, সেই রাষ্ট্রের একজন অপরাধীও হয় তাকে দূত হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া তার বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। 'তোমরা যদি দূত না হতে তাহলে আমি তোমাদেরকে

132. Akram Diya al Umari, Translated by: Huda Khattab, *Madinan Society at the time of the Prophet*, International islamic Publishing House and the international institute of Islamic thought, Herndon, Virginia U.S.A. 1995, p.392

১৩৩. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

শিরশ্চেদ করার আদেশ দিতাম’[১৩৪] প্রতারক মুসাইলামার দূতদের প্রতি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর এই উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

উপাসনা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য দূতদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) তাঁর নিজস্ব মসজিদে নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদলকে তাদের ধর্ম-কর্ম করার অনুমতি দেন। কৌতূহল মিটাবার উদ্দেশ্যে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, এইসব খৃষ্টান পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করেন।

কেবলমাত্র অসাধারণ ক্ষেত্রে দূতদেরকে আটক বা কারারুদ্ধ করা। সুতরাং মক্কার রাষ্ট্রদূতদেরকে নবী আটক করে রেখেছিল যতক্ষণ না মক্কায় আটককৃত মুসলিম রাষ্ট্রদূতকে হুদাইবিয়া, (যেখানে নবী ছাউনি ফেলেছিলেন,) নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

আবু দাউদ একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। (সুনান, জিহাদ পরিচ্ছেদ) যে একদা (স্পষ্টতঃ বদরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পর ২ হিজরীতে) মক্কাবাসীরা মহানবী (সা.)-এর সংগে আলাপ-আলোচনার জন্য আবু রফীকে তাদের দূত হিসেবে মদীনায় পাঠায়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কায় ফিরে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। মহানবী (সা.) বলেন ঃ ‘আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না, দূতদেরকে আটকিয়েও রাখি না; সুতরাং তুমি ফিরে যাও; যদি তোমার মনের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তবে তুমি ফিরে আসতে পার” তিনি তাই করেন। ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী লক্ষণীয় যে, আবু রফী তখন একজন দাস ছিলেন। বদরের যুদ্ধে আটককৃত কুরাইশ যুদ্ধবন্ধীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধারের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য তিনি এসেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।[১৩৫]

মুসলিম রাষ্ট্রে দূতদের সম্পত্তির উপর আমদানী শুল্ক আরোপ করা হয় না, যদি অনুরূপ সুবিধা মুসলিম দূত সেই রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত হয়। সুতরাং আশ-শায়বানীর মতে, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ যদি মুসলিম দূতদেরকে বাণিজ্য শুল্ক এবং অন্যান্য কর থেকে মুক্তি দেয় অনুরূপ রাষ্ট্রের দূতগণও মুসলিম রাষ্ট্রে সেই রকমের সুবিধাদি ভোগ করবে। অন্যথায়, মুসলিম রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে বিদেশী আগন্তুকদের ন্যায় সাধারণ শুল্ক আদায় করতে পারে।[১৩৬]

---

১৩৪. আবূ বকর আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী আল-বায়হাকী, Avm-mbvbj Keiv evqnvKx, বাব-দূতগণকে হত্যা না করা সুন্নাত অধ্যায়, বৈরুতঃ দারুল কিতাব, ১৯৮৭, খ.৯, পৃ.২১১, হাদিস নং-১৯২৪৮।

১৩৫. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১৩৬. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭২

২.৯: কূটনৈতিক মিশনের কার্যাবলী

স্থায়ীভাবে কূটনৈতিক মিশন বিনিময় করার প্রথা সেকালে প্রচলিত ছিল না। তাই, সাধারণতঃ কতগুলো বিশেষ কাজের জন্যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের বিদেশে পাঠানো হত। মুসলিম শাসকদের প্রয়োজন ও অবস্থার ওপরই এ কূটনৈতিক কার্যাবলীর প্রকৃতি নির্ভর করত। ইসলামের উন্মেষ-কালের গোড়ার দিকে প্রধানতঃ শত্রুপক্ষকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানোর মধ্যেই কূটনেতিক মিশনের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলাম গ্রহণ না করলে এ আহ্বানের মাধ্যমেই শত্রুদের সঙ্গে বিরোধের সূচনা হত বা যুদ্ধ ঘোষণা করা হত। দ্বিতীয়তঃ শত্রুপক্ষ ইসলাম গ্রহণে রাজি হলে বা ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন আপোষে আসতে চাইলে রাষ্ট্রদূতগণ শান্তিচুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে আলোচনা শুরু করতেন।[১৩৭]

With increasing European commercial and political penetration in the Muslim world, starling in the eighteenth century, diplomatic relations increased, but not necessarily through the medium of diplomatic missions. With the political decline of the Ottoman Empire, European states established independent lies to the emerging, although not yet technically independent Arab states. Farther east, commercial firms played the role of diplomatic missions. British diplomatic relations with the Safavid Empire in Persia and the Mughals in India, for example, were initially carried out through the British Hast India Company rather than the Foreign Office, Even after the British Government established more extensive government-to-government relations in the nineteenth century, they were mainly handled by tin- Colonial Office rather than the Foreign Office.

By the nineteenth century, European colonialism had so permeated the Muslim world that the utility of diplomatic missions had declined, measurably. Of particular importance was the capitulations. These were agreements granting special judicial privileges to resident Western nationals

১৩৭. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, ৫৯

engaged in commerce in Muslim countries nominally under the Ottoman Empire. These rights, however, were administered by Western consuls, not through diplomatic missions.[138]

আব্বাসীয় আমলে যখন ইসলামী রাষ্ট্র সুসংহত হয়ে আসে, তখন রাষ্ট্রদূতদের ওপর অন্যান্য আরও অনেক গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যভার ন্যস্ত হয়। খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্যই যে কেবল রাষ্ট্রদূত বিনিময় করা হত তাই নয়, উপহার, যুদ্ধবন্দী বিনিময় এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য কিংবা বাণিজ্যের সুবন্দোবস্ত করার জন্যও রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের ব্যবস্থা ছিল। অভ্যর্থনাকারী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করাও কূটনীতিকদের কাজ ছিল। কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, গুপ্তচরবৃত্তি। যে রাষ্ট্র তাঁদের প্রেরণ করত আর যে রাষ্ট্র তাঁদের গ্রহণ করত, তারা সকলেই দূতদের প্রদত্ত বিশেষ সুবিধার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করত; আর একই ভাবে সতর্ক থাকত, যাতে অপরপক্ষ বিশেষ কোন সুবিধা করতে না পারে।[১৩৯]

মুসলিম শাসকও কার্যতঃ স্বাধীন প্রাদেশিক শাসকদের মধ্যেও রাষ্ট্রদূত বিনিময় করা হত। সরকারী চিঠিপত্র ছাড়াও মোবারকবাদ, সমবেদনা জ্ঞাপন কিংবা শাসক বংশগুলোর মধ্যে বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করার জন্যও রাষ্ট্রদূত পাঠান হত। বিরোধ এড়ানোর জন্য, যাতায়াতের পথ সুগম করা এবং পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিম শাসকদের মধ্যে পরস্পর শুভেচ্ছা বাণীও পাঠানো হত।

আব্বাসীয় আমলে বাইজান্টীয়দের সঙ্গে বিরোধ লেগেই থাকত এবং প্রতি বছরই নতুন করে গোলমাল বেধে উঠত বলে যুদ্ধবন্দী বিনিময় বা বন্দীমুক্তির ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য রাষ্ট্রদূত পাঠান হত। তাছাড়া, একটি রাষ্ট্রকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবার জন্যও রাষ্ট্রদূতদের পাঠান হত।[১৪০]

---

138. John L. Esposito ibid ;V.1, P. 380
১৩৯. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান,৬১
১৪০. মজিদ কাদ্দুরী, অনু. অধ্যাপক হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৩-১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পররাষ্ট্রনীতি

আল-কোরআন থেকে যেমন চুক্তি পালনের নীতি এসেছে, তেমনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কার্যধারাও কতকগুলো দিক-নির্দেশক বিধি-ব্যবস্থার পত্তন করেছে। এগুলোর ভিত্তিতেই মুসলিম ও অমুসলিম কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাজনৈতিক লক্ষ্য ও পরিবেশন পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেন। তাঁর খলিফাগণ এগুলো আদর্শ চুক্তি হিসেবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শান্তিচুক্তি (যা পরে মদিনার ইহুদীরা মেনে নেন এবং এটা মদিনার অধিবাসীদের পক্ষে সনদের কাজ করে) থেকে শুরু করে হুদায়বিয়ার সন্ধি (যা মদিনার মুসলিম ও মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে অস্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপন করে) পর্যন্ত তিনি নানা ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) ইহুদী ও খৃস্টানদেরও সনদ প্রদান করেন। ফলে তারা মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেন।

হিজরতের পর মদিনার গোত্রগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করাই ছিল হযরতের প্রথম সন্ধির উদ্দেশ্য। ইবনে হিশামের "সিরাতে" এর মূল দলিলটি পাওয়া যায়; ওয়াকিদীর মাগাযীতেও আংশিকভাবে এ সন্ধিচুক্তিটির বিবরণ পাওয়া গেছে। সন্ধিচুক্তিটির দলিলের প্রথম অংশে মদিনার বিভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর চুক্তিটির পরবর্তী অংশে রয়েছে ইহুদীদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির বিবরণ। চুক্তির তারিখ সম্বন্ধে ইবনে হিশাম কোন কিছুই বলেননি; কিন্তু এটা যে হিজরী ১লা সন থেকে দ্বিতীয় সনের মাঝামাঝি কোন সময়ে সম্পাদিত হয় (খৃস্টাব্দ ৬২৩-৬২৪) তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, দ্বিতীয় হিজরীতেই (৬২৪ খৃস্টাব্দে) আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের মোকাবেলা করে।[১৪১]

---

১৪১. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭

৩.১: হিলফুল ফুজুল

আদর্শ কূটনৈতিক হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সামনে যত সমস্যা আসত তিনি অত্যন্ত নৈপুন্যতার সহিত এসব সমস্যা মোকাবেলা করতেন। বালক বয়সে তিনি হারবুল ফিজারের ভয়াবহতা লক্ষ্য করেন। বিবাহের পরবর্তী পনেরো বৎসরের অধিকাংশ সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) ধ্যান ও গভীর চিন্তনের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করেন। তাঁহার জীবনে এই সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহাকে নবুয়ত প্রাপ্তির জন্য মানসিক প্রস্তুতির পর্ব-রূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পরেই মক্কাবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন গোলযোগ দেখা দেয়। পারস্পরিক সাম্প্রীতির অভাব নাগরিকদেরকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল এবং গোত্রপ্রীতি প্রবল হইতেছিল। এক গোত্রের লোকজন অন্য গোত্রের লোকজনকে হিংসার চক্ষে দেখিত এবং প্রয়োজনবোধে স্বগোত্রের লোকদিগকে সহাযতা করিত। মক্কায় তখন বিদেশাগত ব্যক্তিদের ধন-প্রাণ আদৌ নিরাপদ ছিল না। কতিপয় সম্ভ্রান্তগোত্র মক্কাবাসীদের এই হীন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়। তাহারা দেশী-বিদেশী সকলকে দুবৃত্তরেদ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ৫৯৫ খৃষ্টাব্দের দিকে একটি সংস্থা গঠিত করে ইহা 'হিলফ-উল-ফজুল নামে পরিচিত।

হযরত মুহাম্মদ(সা.) ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশগণ কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করিরে একটি সামান্য ব্যাপারে লইয়া তাহাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত রক্তপাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে উক্ত বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন।'[১৪২]

সিরিয়া থেকে ফিরে এসে মুহাম্মদ (সা.) ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা লক্ষ্য করলেন। যুদ্ধটি শুরু হলো নিষিদ্ধ মাসে। তাছাড়া কায়স গোত্র অন্যায়ভাবে কোরাইশদেরউপর এ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। এ জন্য একে 'হারবুল ফিজার' বা অন্যায় যুদ্ধ বলা হয়। পাঁচ বছর যাবৎ এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি। তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ যুদ্ধে অনেকে হতাহতহয়। তাতেতার কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল। আহতদের আর্তনাদ শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন শান্তিকামী মানুষ হিসেবে এ অশান্তি তাঁর সহ্য হলো না। তাই তিনি আরবের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে হিলফুল ফুযুল (শান্তি সংঘ) গঠন করলেন।

---

১৪২. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, Avie RwZi BwZnvm, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮,পৃ. ২৫

এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা অত্যাচারীকে প্রতিরোধ ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা। শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখা। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শান্তিসংঘ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐ হিলফুল ফুজুলের কাছে ঋণী। তারাও হিলফুল ফুজুলের মতো যুদ্ধ বন্ধ করে সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর।

৩.২: আবিসিনিয়ায় হিযরত

শিষ্যদের অসহ্য দুঃখ-দুদর্শা দর্শনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আবিসিনিয়ার[১৪৩] খ্রিস্টান শাসকের রাজ্যে তাহাদিগকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেন। মুহাম্মদ (সা.) এই খ্রিস্টান শাসকের বদান্যতা, অতিথি বাৎসল্য ও মহত্বের কথা ইতঃপূর্বে শ্রবন করিয়াছিলেন। ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে দশটি পরিবার এবং পরে আরও তিরাশিটি পরিবার নাজাশীর রাজ্য আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করে। কুরাইশগণ তাহাদের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা খ্রিস্টান শাসক নাজাশীকে লিখিয়া জানাইল যে, মুসলমানগণ কুরাইশদের পিতৃ পুরুষের ধর্মকে অবজ্ঞা করিয়া একটি নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত।[১৪৪]

নাজাশীর নিকট আশ্রয় লাভঃ নাজাশী মুহাজিরদিগিকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে আলীর ভ্রাতা জাফর তাহাদের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁহাকে অবহিত করেন। নাজাশী[১৪৫] ইসলামের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিন্তে বসবাস করার আদেশ দেন। মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় প্রস্থানের ঘটনাটি ইব্ন-হিশাম কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। জনৈক আধুনিক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, এই ঘটনার মূলে ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যকার দলীয় কোন্দল।[১৪৬] তিনি অবশ্য একথা ও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই অভিমত অনুমানভিত্তিক।

আবিসিনিয়ায় নাজ্জাশীর নিকট অভিযোগ করিয়া কোনো ফল না পাইয়া মক্কাবাসীরা ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রদ্বয়কে সমাজচ্যুত করিল। উক্ত গোত্র দুইটির সঙ্গে সকল প্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল। হাশিম ও মুত্তালিবের গোত্রের মুসলমান ও মুর্তি উপাসক

---

১৪৩. আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত হর্ন অব আফ্রিকা হিসেবে খ্যাত একটি রাষ্ট্র। বর্তমান নাম ইথিওপিয়া, রাজধানী আদ্দিস আবাবা। we¯ÍvwiZ: Bmjvgx wek¦Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ.১, পৃ.৬৮

১৪৪. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, Avie RwZi BwZnvm, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮,পৃ. ২৯

১৪৫. Bmjvgx wek¦Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ-১৩, পৃ. ৬৬৯-৬৭১

১৪৬. W.M. Watt ইব্ন ইসহাকের বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ Muhammad at Mecca, P.115-116.

নির্বিশেষে সকলকেই চূড়ান্তভাবে নির্যাতিত হইতে হইল। নগরী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মক্কার প্রান্তদেশে, আবদুল মুত্তালিবের বাসগৃহের চতুর্দিকে তাহারা বসবাস করিতে লাগিল। কিন্তু আবু লাহাব শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া নগরীতেই থাকিল। প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া তাহাদিগকে এই নির্বাসন জীবনযাপন করিতে হইল। কিন্তু কুরাইশদের মধ্যকার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মনে করিতে লাগিলেন যে, এই চরম ব্যবস্থা আদৌ ন্যায়সঙ্গত নহে। অবশেষে আমরের পুত্র হিশাম এবং আবু উমাইয়ার পুত্র যুবাইয়ের প্রচেষ্টায় কুরাইশগণ হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রদ্বয়কে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান করে (খ্রিঃ ৬১৯)।[১৪৭]

৩.৩: মদীনায় হিযরত ও রাসূল (সা.)-এর দেশপ্রেম

'আকাবার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার' পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে লাগিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে ইয়াসরিব নগরীতে চলিয়া যাইবার জন্য নির্দেশ দিলেন। যথাসম্ভব গোপনীয়তা সত্তেও মুসলমানদের গতিবিধি কুরাইশদের নিকট অজ্ঞাত রহিল না। মুসলমানদের উপর অত্যাচার চলিত লাগিল। তাহারা বিভিন্ন দলে বিভিক্ত হইয়া অত্যন্ত গোপনে মক্কা ত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে ৭০ জন মুহাজির (স্বদেশত্যাগী) মদীনায় গিয় হাজির হইল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবু বক্কর ও আলী (রা.) সহ মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। কুরাইশগণ সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করিল যে, তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। আবু জাহিলের প্রস্তাব অনুযায়ী এইরূপ পরিকল্পনা গৃহীত হইল যে, বিভিন্ন গোত্রের সাহসী তরুণগণ একসঙ্গে তরবারির আঘাত হানিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণনাশ করিবে। তাহা হইলে খুনের জন্য কোনো একটি গোত্র দায়ী হইবে না; বরং সকলেই খুনের অপরাধে সমভাবে অপরাধী হইবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইল না। স্বীয় বিছনায় আলী (রা.)-কে শায়িত করিয়া রাখিয়া আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে লইয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা ত্যাগ করিলেন। পথে কিছু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রবী-উল-আখির মাসের ১২ তারিখে বা ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি মদীনার নিকটবর্তী একটি মরুদ্যানের প্রান্তদেশে অবস্থিত কুবা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। পরে আলী (রা.) ও আসিয়া মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। কুবায় আগমনের দিন হইতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদীনার জীবন আরম্ভ হইল। মুসলমানদের এই স্বদেশত্যাগই হিযরত নামে পরিচিত। ইসলামের ইতিহাসে

১৪৭. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, Avie RwZi BwZnvm, পৃ. ৩০,৩১

এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এখন একটি রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।[১৪৮]

৩.৪: মদিনা সনদ ও রাসূল (সা.)-এর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা

প্রখ্যাত আইন ও ধর্মবেত্তাগণ কর্তৃক লিখিত আইন পুস্তকে যিম্মি ও মুসলমানদের সম্পর্ক নির্ণয় করে অনেক আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হয়েছে। অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক মুসলিমদের বিধান ও কার্যাবলীর পর্যালোচনা পরবর্তী যুগের পরিবর্তন সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ কেতাবিগণের সম্পর্কের মধ্যে ধর্মীয় উদারতা ও সজ্ঞান সতর্কতা প্রত্যক্ষ করা যায়। ‘মদিনা-চুক্তিতে’ (৬২৩ খৃস্টাব্দ) একথাই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আউস ও খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের এ চুক্তিটি সম্পন্ন হয়। ইহুদীগণও চুক্তিতে শরিক হয়। এ সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল।

Madinan Society at the time of the Prophet গ্রন্থে Akram Diya al Umari মদিনা সনদের ৪৭ টি ধারার বিবরণ দিয়েছেন। যা নিম্নে হুবহু বর্ণনা করা হল-

The Prophet’s documentbetween the *Muhajirun,*
the Ansar and the Jews

The text of the document

Bismi Allah al Rahman al Rahim

Clause:

(1) This is a document from Muhammad, the Prophet (governing the relations) between the believers and Muslims of Quraysh and Yathrib, and those who followed them and joined them and singled with them.

---

১৪৮. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

(2) They are one community *(ummah)* to the exclusion of all men.

(3) The Quraysh *Muhajirun*, according to their present custom, shall pay the blood money within their number and shall redeem their prisoners with the kindness and justice common among believers.

(4) The Banu ‘Awf, according to their present custom, shall pay the blood money they paid hitherto, and every section shall redeem its prisoners with the kindness and justice common among believers.

(5) Banu al Harith (Ibn al Khazraj), according to their present custom, shall pay the blood money they paid hitherto and every section shall redeem its prisoners with kindness and justice.

(6) Banu Saidah, according to their present custom, shall pay the blood money they paid hitherto, and every section shall redeem its prisoners with the kindness and justice common among believers.

(7) Banu Jusham, according to their present custom, shall pay the blood money they paid hitherto, and every section shall redeem its prisoners with the kindness and justice common among believers.

(8) Banu al Najjar, according to their present custom, shall pay the blood money they paid hitherto, and every section shall redeem its prisoners with the kindness and justice common among believers.

(9) Banu ‘Amr ibn ‘Awf, according to their present custom, shall pay the blood money they paid hitherto, and every section shall redeem its prisoners with the kindness and justice common among believers.

(10) Banu al Nabit, according to their present custom, shall pay the blood money they paid hitherto, and every section shall redeem its prisoners with the kindness and justice common among believers.

(11) Banu al Aws, according to their present custom, shall pay the blood money they paid hitherto, and ever, section shall redeem its prisoners with the kindness and justice common among believers.

(12a) Believers shall not leave anyone destitute among them by not paying his redemption money or blood money in kindness.

(12b) A believer shall not take as an ally against him the freedman of another Muslim.

(13) The God-fearing believers shall be against the rebellious or anyone who seeks to spread injustice, or sin, or enmity, or corruption between believers; the hand of every man shall be against him even if he be a son of one of them.

(14) A believer shall not slay a believer for the sake of an unbeliever, nor shall he aid an unbeliever against a believer.

(15) God's protection is all-embracing, the least of them may give protection to a stranger on their behalf. Believers are friends and protectors one to the other, to the exclusion of outsiders.

(16) To the Jews who follow us belong help and equality. He shall not be wronged nor shall his enemies be aided.

(17) The peace of the believers is indivisible. No peace shall be made when believers are fighting in the way of God. Conditions must be fair and equitable to all.

(18) In every foray a rider must take another behind him.

(19) The believers must avenge the blood of one another shed in the way of God.

(20a) The God-fearing believers enjoy the best and most upright guidance.

(20b) No polytheist shall take the property or person of Quraysh under his protection nor shall he intervene against a believer.

(21) Whosoever is convicted of killing a believer without good reason shall be subject to retaliation unless the next of kin is satisfied (with blood money), and the believers shall be against him as one man, and they are bound to take action against him.

(22) It shall not be lawful to a believer who holds by what is in this document and believes in God and the last day, to help an evil-doer or to shelter him. The curse of God and His anger on the day of resurrection will be upon him if he does, and neither repentance nor ransom will be received from him.

(23) Whenever you differ about a matter. ;t must be referred to God and to Muhammad.

(24) The Jews shall contribute to the cost of war so *long* as they are fighting alongside the believers.

(25) The Jews of the Banu ‘Awf are one community with the believers (the Jews have their relDgion and the Muslims have theirs), their freedmen and

their persons except those who behave unjustly and sinfully, for they hurt but themselves and their families.

(26) The Jews of Banu al Najjar are like the Jews of Banu ‘Awf.

(27) The Jews of Banu al Harith are like the Jews of Banu ‘Awf.

(28) The Jews of Banu Saidah are like the Jews of Banu ‘Awf.

(29) The Jews of Banu Jusham are like the Jews of Banu ‘Awf.

(30) The Jews of Banu al Aws are like the Jews of Banu Awf.

(31) The Jews of Banu al Tha‘labah are like the Jews of Banu ‘Awf, *except* for whoever behaves unjustly and sinfully, for they hurt but themselves and their families.

(32) Jafnah, a clan of the Tha'labah, are as themselves.

(33) The Jews of Banu al Shutaybah are like the Jews of Banu ‘Awf. Righteousness is a protection against sinfulness.

(34) The freedmen of Tha'labah are as themselves.

(35) The close friends of the Jews are as themselves.

(36a) None of them shall go out to war save with the permission of Muhammad.

(36b) But he shall not be prevented from taking revenge for a wound. He who slays a man without warning slays himself and his household, unless it be one who has wronged him, for God will accept that.

(37a) The Jews must bear their expenses and the Muslims their expenses. Each must help the other against anyone who attacks the people of this document. They must seek mutual advice and consultation, and righteousness is a protection against sinfulness.

(37b)A man is not liable for his ally's misdeeds. The wronged must be helped.

(38) The Jews must pay with the believers so long as war lasts.

(39) Yathrib shall be a sanctuary for the people of this document.

(40) A stranger under protection shall be as his host doing no harm and committing no crime.

(41) A woman shall only be given protection with the consent of her family.

(42) If any dispute or controversy likely to cause trouble should arise, it must be referred to God and to Muhammad, the Apostle of God (may God bless him and grant him peace), God accepts what is nearest to piety and goodness in this document.

(43) Quraysh and their helpers shall not be given protection.

(44) The contracting parties are bound to help one another against any attack on Yathrib.

(45a) If they are called to make peace and maintain it, they must do so; and if they make a similar demand on the believers, it must be carried out except in the case of one engaged in combat for the sake of the relDgion.

(45b) Every one shall have his portion from the faction to which he belongs.

(46) The Jews of al Aws, their freedmen and thus themselves, have the same standing with the people of this document and the same loyalty from the people of this document. Righteousness is the protection against sinfulness: each person bears responsibility for his actions. God approves of this document.

(47) This deed will not protect the unjust and the sinner. The man who goes forth to fight is safe and the man who stays at home in the city is safe, unless either has been unjust and sinned. God is the protector of the righteous and God-conscious and Muhammad is the Apostle of God (may God bless him and grant him peace).[149]

মদিনা সনদের প্রধান ধারাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়সমূহ সমানভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

২. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) হবেন প্রজাতন্ত্রের প্রধান এবং সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কর্তা।

৩. মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে।

৪. কেউ কুরাইশ বা অন্য কোনো বহিঃশত্রুর সাথে মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে কোনো রূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

৫. স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সকল সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় তা প্রতিহত করা হবে।

৬. বহিঃশত্রু কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হলে সকলে সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করবে এবং প্রতেকে স্ব-স্ব গোত্রের যুদ্ধভার বহন করবে।

৭. কোনো ব্যক্তি অপরাধ কররে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হবে। তার অপরাধের জন্য গোটা সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

149. Akram Diya al Umari, (Translated by: Huda Khattab), *Madinan Society at the time of the Prophet,* (International islamic Publishing House and the international institute of Islamic thought, Herndon, Virginia U.S.A. 1995,) P. 107-110

৮. মদিনা পবিত্র নগরী বলে ঘোষণা করা হলো। এখন থেকে এই শহরে রক্তপাত, হত্যা, ব্যভিচার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।

৯. ইহুদি সম্প্রদায়ের মিত্ররাও সমান স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে।

১০. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অনুমতি ব্যতীত মদিনার কোনো গোত্র কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

Key to Holy Quran: Index cum-concordance গ্রন্থে প্রনেতা Altaf Ahmad Kherie উল্লেখ করেন No one shall go forth to war excepting with the permission of Muhammad (Sm), but this shall not hinder any from seeking lawful revenge. None shall join the men of Mecca or their allies, for verily the engaging parties are bound together against every one that shall threaten Madina. War and Peace shall be made in common.[150]

১১. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কখনো বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তা মীমাংসা করবেন।

১২. সনদের ধারা ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

এই মদিনা সনদ[১৫১] হলো মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান, যার মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবি (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।[১৫২]

Creation of the New Ummat: Hazrat Muhammad (Sm) also got the opportunity of organizing his followers into a well knit and disciplined community. Despite differences of language, colour, race, country of birth, and social and economic status, they all became one ummat brethren in faith living in peace and amity.[153]

---

150. Altaf Ahmed Kherie, *Islam a comprehensive Guide-book*, Pakistan: Royal Book Company, P.O Box 7737 SADDAR, Karachi-74400

১৫১. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ.১৬/ক) পৃ.১২২

১৫২. মুহাম্মদ আবদুল মালেক, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, ড. মোহাম্মদ ইউছুফ প্রমুখ, Bmjvg I ˆbwZK wkÿv, নবম-দশম শ্রেণি,(ঢাকাঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৬) পৃ. ১৫৯ ও ১৬০

153. John L. Esposito (Editor in Chief), *The oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world.* V.1, Oxford University Press, 1995, New York, P.98

এ চুক্তিতে ইহুদীদের ওপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় নি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বৃহত্তর কওমের মধ্যে পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায়রূপে তাদের অবস্থান করতে হবে, বিধি-নিষেধের মধ্যে শুধু এইটুকু। তাদের যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করা হত না। অবশ্য যুদ্ধে যোগদান করার জন্য তাদের আহ্বান করা হত। তারা যুদ্ধে যোগদান করলে সম্মিলিত যুদ্ধ-তহবিলে তাদের কিছু অর্থ প্রদান করতে হত। তাদের প্রতি কোন বিশেষ শুল্ক ও জিজিয়া তখনও ধার্য করা হয় নি। জিযিয়া আল-কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে বিধিবদ্ধ হয়ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ (٢٩)

'কেতাবিদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওপর ও শেষ দিনে ঈমান আনেনি এবং যারা আল্লাহর ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছেন, তা নিষেধ করে নি এবং যারা সত্যকে স্বীকার করে না তাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর ও তাদের অবনত করে জিযিয়া আদান কর'।[১৫৪]

কেতাবিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি সাবধানবাণী ছাড়া আল-কোরআন আর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করে নি। ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকলে, আল-কোরআন ও হাদিসে যে কেবল কিতাবীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে তা নয়, তাদের আক্রমণ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার জন্যও উদাত্ত আহ্বান জানান হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাবালা, জারাশ, আধরুহ, মাকনা, খায়বার, নাজরান ও আয়লা– এই সব কেতাবিদের প্রতি যে সনদ প্রদান করেন তা আবু ইউসুফ ও বালাজুরী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এসব সনদে জিযিয়া প্রদানের বিনিময়ে তাদের জীবন, ধন-সম্পদ ও ধর্ম-বিশ্বাস রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। নাজরান গোত্রকে দেয়া নিম্নোক্ত সনদটি এ বিষয়ে দিকদর্শনের কাজ করছেঃ

'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটা হল সেই সনদ যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) নাজরানের অধিবাসীদের দান করেন। নাজরানের অধিবাসী, তাদের ফলমূল, ধন-সম্পদ ও দাস-দাসীদের প্রতিও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এগুলো তারা ভোগ করবে। কিন্তু দু'হাজার পোশাক বা 'হুলাল আল-আওয়াকী' তারা দান করবে। এর মধ্যে এক হাজার রজব মাসে দিতে হবে, আর এক হাজার সফর মাসে দিতে হবে। প্রত্যেকবার শুল্ক প্রদানের সময় এক আউন্স করে রৌপ্য দিতে হবে। যদি ফসল এর চাইতে

১৫৪. আল-কোরআন, ৯ ঃ ২৯

বেশী বা কম হয়, তবে ফসলের অনুপাতে শুল্ক ধার্য হবে। মুসলমানরা নাজরানের অধিবাসীদের কাছ থেকে ঢাল, ঘোড়া, নানাপ্রকার জীবজন্তু এবং অন্যান্য দ্রব্য পেতে পারবেন। উর্ধ্বপক্ষে ২০ দিন তারা আমার দূতদের আপ্যায়িত করবে ও তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করবে। কিন্তু তারা সে দ্রব্যাদি এক মাসের বেশী নিজেদের কাছে রাখতে পারবে। ইয়েমেন ও মা-আররাতে যদি যুদ্ধ বাধে তবে তারা ত্রিশজন সৈন্যের পোশাক-পরিচ্ছদ আর ত্রিশটি ঘোড়া ও ত্রিশটি উট সরবরাহ করবে।[১৫৫]

ঋণ হিসেবে আমার দূতদের জন্য প্রদত্ত জিনিসপত্র যদি আংশিক বা সম্পুর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তার জন্য নাজরানের অধিবাসীদের সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। তাদের উপস্থিত অনুপস্থিত সবাই জীবন, ধন-সম্পদ, জমি-জমা, ধর্ম, পরিবার, চার্চ ও নিজস্ব দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহর আশ্রয় এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সা.) প্রতিশ্রুতি লাভ করবে। কোন পাদ্রী বা সাধুকে তার চার্চ বা মঠ থেকে অপসারণ করা চলবে না এবং তাদের পৌরহিত্য পারিত্যাগ করতে বাধ্য করা চলবে না। তাদের ওপর কোন প্রকার জোর-জুলুম বা নিপীড়ন করা চলবে না। আমাদের ফৌজ তাদের জমি অধিকার করবে না। যারা সুবিচার চায়, তারা তা লাভ করবে। উৎপীড়ক কিংবা উৎপীড়িত বলে কিছু থাকবে না। যারা সুদের ব্যবসা করে, তারা আমার কাছে রেহাই পাবে না। অপরের অপরাধের জন্য কাউকে দোষী করা চলবে না। এ চুক্তি বহাল রাখার জন্য আল্লাহর প্রদত্ত রক্ষাকবচ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদের (সা.) প্রতিশ্রুতিই আইনগত ভিত্তি রচনা করবে। এ চুক্তি ততদিন বলবৎ থাকবে যতদিন নাজরানের অধিবাসীগণ বিশ্বস্ততার সাথে চলবে আর তাদের কর্তব্য পালন করবে এবং কোন প্রকার অত্যাচারে শরিক হবে না। এ চুক্তিটি নিম্নলিখিত সাক্ষীবৃন্দের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়ঃ আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, গায়লান ইবনে আমর, বানু নাসর গোত্রের মালিক ইবনে আউফ, আল-আকরা ইবনে হাবিস আল-হানযালী ও আল-মুগীরা ইবনে শুবা। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর এ চুক্তিটি সম্পাদনার কাজ করেন।'

আয়লা[১৫৬] বা আকাবার খৃস্টানদের প্রতিও হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনুরূপ একটি সনদ প্রদান করেন। এর দ্বারা তিনি সর্বশেষ কেতাবি সম্প্রদায়কে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক পার্যায়ে আনবার চেষ্টা করেন। এর ফলে আরব দেশের ওপর ইসলামের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়লার খৃস্টানদের প্রদান ইয়াহুন্নার

---

১৫৫. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, nRiZ ivm‡j Kwig (mv.) Rxeb I wkÿv, ঢাকাঃ ইফাবা ১৯৯৭, পৃ.২১২

১৫৬. Bmjvgx wek¦‡KvI; XvKv: Bdvev; 1998, খ.১, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

(জন) কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি ইসলামের সঙ্গে খৃস্টানদের শান্তি স্থাপন করতে আহ্বান করেন। চিঠিখানি এই[১৫৭]ঃ

ইয়াহুন্না ইবনে রুবা ও আয়লার অধিবাসীদের প্রতি। আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ'র সব প্রশংসা যিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই। আপনাকে লিখিতভাবে না জানিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব না। ইসলাম গ্রহণ করুন কিংবা জিযিয়া প্রদান করুন এবং আল্লাহ, তাঁর নবি ও নবির প্রতিনিধিদের মান্য করুন। প্রতিনিধিদের সম্মান করুন ও তাঁদের উত্তম পোশাক প্রদান করুন। কিন্তু এ পোশাক যেন বিজাতীয় পোশাক না হয়। যায়েদকে পোশাকে সজ্জিত করুণ যাতে আমি ও আমার প্রতিনিধিগণ সন্তুষ্ট হতে পারি। আপনি যদি জল ও স্থলপথে নিরাপত্তা লাভ করতে চান, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করুন। এতে আপনি আরব বা বিদেশী শত্রুদের প্রতিটি আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবেন। যদি আপনি আমার দাবীতে সম্মত না হন, তবে আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনার লোকজন হত্যা করে এবং আপনাদের মহিলা ও শিশুদের বন্দী না করে আপনার কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করতে চাই না। আমি আল্লাহর রাসূল। আমি আল্লাহকে, তাঁর কিতাবগুলোকে, তাঁর নবিদের এবং মরিয়মের পুত্র ও আল্লাহর বাণী হযরত ঈসাকে (আঃ) সত্য বলে জানি। আমি তাঁকে আল্লাহর নবি বলে বিশ্বাস করি।

বিপদ নিপতিত হবার পূর্বে আমার আবেদন গ্রহণ করুন। আমার সেনাপতিদের আমি আপনার কাছে পাঠিয়েছি। হারামালাকে আপনি তিন ওয়াসক যব দেবেন। কারণ, হারমালা আপনার পক্ষ হয়ে আমার কাছে সুপারিশ করেছেন। আল্লাহর দয়া না হলে এবং তাঁর সুপারিশ না থাকলে আমার ফৌজের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ বা সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হত না। আমার প্রতিনিধিদের আপনি যদি মান্য করেন, তবে আল্লাহ, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারিগণ আপনার প্রতিবেশীরূপে গণ্য হবেন। আমার প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছে শুরাহবিল, উবাই, আবু হারমালা, হোরাইস ইবনে যাযেদ আত্-তাঈ।

আপনার সঙ্গে তাঁদের যে চুক্তি হবে, তাই আমি মেনে নেব। আপনি স্বাচ্ছন্দে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আশ্রয় অবলম্বন করতে পারবেন। আপনি যদি এতে স্বীকৃত হন, তবে আপনার ওপর শান্তি।

মাকনার লোকদের তাদের বাসভূমে পাঠিয়ে দিন।

১৫৭.আল্লামা শিবলী নুমানী (রহ.) অনু. এ কে এম ফজলুর রহমান মুন্সী, wmivZb bex (mv.) খ. ৭, ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি. ১৯৯২, পৃ.১১৯

ইয়াহুন্না হযরত মুহাম্মদের (সা.) তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। অতিথি হিসেবে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করা হয় ও তাঁকে একটি লম্বা আলখেল্লা উপহার দেয়া হয়। আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। পরিশেষে নিম্নলিখিত চুক্তি[১৫৮] স্বাক্ষরিত হয়ঃ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছিঃ

এটি হল একটি নিরাপদ সনদ যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইয়াহুন্না ইবনে রুবা ও আয়লার অধিবাসীদের প্রদান করেছেন। সিরিয়া, ইয়ামন বা সমুদ্র-উপকূল থেকে আগত তাদের জাহাজ, পরিব্রাজক এবং সঙ্গীদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।[১৫৯]

যারা গোলযোগের সৃষ্টি করে, তাদের ধন-সম্পদ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

তাদের যারা ধরে নিতে পারবে, তারা এদের অধীনস্থ হয়ে যাবে।

আয়লার অধিবাসীদের পানির ঝরণায় যাওয়া নিষেধ করা অবৈধ হবে। তাদের ব্যবহৃত স্থলপথ ও জলপথ থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না।

আল্লাহর রাসূলের অনুমতিক্রমে এ চুক্তি[১৬০] জুহাইন ইবনে আস-সালত ও শুরাহ-বিল ইবনে হাসান কর্তৃক লিখিত হয়।

উপরে বর্ণিত দলিলগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে যে কেবল গোড়াতে মুসলিম ও কেতাবিদের পরস্পর সম্পর্কই ধরা পড়েছে তাই নয় এর মধ্যে সারল্য এবং মুসলিম-অমুসলিম সামাজিক বিভেদের অনুপস্থিতিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একথা অবশ্য বলা যায় যে, সাবধানতাই শান্তিপূর্ণ উদার নীতির পত্তন করে। তবু একথা সত্য যে, কেতাবিদের প্রতি হযরত মুহাম্মদের (সা.) শিক্ষা খুব উদার ছিল। প্রথমতঃ, তাঁর ধর্ম প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর প্রতি ঈমান। আর তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করার অর্থ তাঁর কর্তৃত্বও স্বীকার করে নেয়া। কিন্তু এ রীতি গৌণভাবে প্রথম রীতির দ্বারা সীমিত হয়েছে। কেতাবিদের আল্লাহর রাসূলের (সা.) ওপর ঈমান না থাকলেও আল্লাহর ওপর তাদের ঈমান ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদের (সা.) সনদগুলো মেনে নেবার ফলে তারা 'আল্লাহর রাসূল' একথাগুলো ব্যবহার না

---

১৫৮. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, nRiZ ivm‡j Kwig (mv.) Rxeb I wkÿv, ঢাকাঃ ইফাবা ১৯৯৭, ১০৮
১৫৯. ড. মুহম্মদ হামীদুল্লাহ্‌, (অনু. আবদুল মতিন জালালবাদী), wek bex (mv.) Gi ivR‰bwZK Rxeb, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৫, বিস্তারিত, পৃ.১৫৮
১৬০. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আশআছ আস-সিজিস্‌ড়নী, mbv‡b Avey `vD`, বাব-জিযিয়া গ্রহণ করা অধ্যায়, খ.৯, পৃ.১৭৭, হাদিস নং-৩০৪৩

করলেও তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। ব্যবহারিক সমস্যা সম্পর্কে হযরত (সা.) খুব বাস্তববাদী ছিলেন। সেইজন্য তিনি এই সমঝোতা এই আশায় মেনে নেন যে, উদারতার ফলে কেতাবি ভাইরা সহজেই সত্যধর্ম গ্রহণ করতে পারবে। এ নীতি অনুসরণ করেই জিযিয়া ভিন্ন আর কোন বিভেদমূলক পন্থা অনুসরণ করা হয় নি। মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাতের মতই যিম্মিদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া হত। কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হওয়ার ফলেই কখনও কখনও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে বিন্দুমাত্র ধর্মীয় অনুদারতা ছিল না।[১৬১]

মুসলিম ও ইহুদী চুক্তিবদ্ধ একটি রাজনৈতিক জাতি

পরম করুণাময় ও কৃপানিধান মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। একদিকে কোরেশ বংশীয় ও ইয়াছরিবের (মদিনার) মুমিন মুসলমানগণ এবং আর যারা তাদের অনুসরণকারী ও তাদের সহ-সংগ্রামী, আর অন্যদিকে মদিনার ইহুদী সম্প্রদায় এবং আর যারা তাদের অনুসরণকারী ও তাদের সহিত একত্রে যুদ্ধ করে– তাদের সকলের প্রতি এটা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ হতে প্রদত্ত সনদ। নিশ্চয়ই তারা অন্যান্য সবকিছু হতে স্বতন্ত্রভাবে একটি সমাজ (রাজনৈতিক দিক হতে) গঠন করবে।[১৬২]

কোরেশ বংশীয় মদিনার বিশ্বাসী মুসলমানগণ এবং অন্য যারা তাদের অনুসরণ করে, তাদের সাথে যোগ দেয় ও তাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে সংগ্রাম করে; এটা হচ্ছে, তাদের সবার প্রতি তাদের নবী আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর সনদ। নিশ্চয়ই তারা অন্যান্য সম্প্রদায় হতে পৃথকভাবে একটি উম্মা (সমাজ) গঠন করবে।

কোরেশ বংশীয় মোহাজেরগণ একই সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বসবাস করবে এবং বর্তমানে তারা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই থাকবে। আর তারা ইনসাফ ও ন্যায়পরাণয়তার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তি-মূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।[১৬৩]

---

১৬১. আকরাম ফারুক (অনু.), mxiv‡Z Be‡b wnkvg, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ.১৩৮
১৬২. আল্লামা শিবলী নুমানী (রহ.), (অনু. এ কে এম ফজলুর রহমান মুন্সী), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯১
১৬৩. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮

মদিনা সনদের মাধ্যমে স্বীকৃত ইসলামের মৌলিক নীতির সার্বভৌমত্ব

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুমোদন ব্যতীত কোন ইহুদীই (মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে) যোগদান করতে পারবে না।

কাউকে বৈধভাবে আঘাতের (বা রক্তপাতের) প্রতিশোধ গ্রহণে বাধা দেয়া হবে না; যে কেউ অন্য কাউকে বিশ্বাসভঙ্গ করে হত্যা করে, সে তার এবং তার পরিজনদের জীবনের বিনিময়েই এইরূপ করে থাকে। আর যার প্রতি এইরূপ অন্যায় করা হয়েছে, একমাত্র সে (হত্যাকারী) এবং তার পরিবারই তার নিকট দায়ী থাকবে। এবং এইরূপ ঘটনায় যে ব্যক্তি অধিকতর ভাল ব্যবহার করে থাকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পক্ষেই আছেন।

ইহুদীরা তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বহন করবে এবং মুসলমানরাও তাদের ব্যয়ভার বহন করবে; এবং এই চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর যারা হামলা করে থাকে, তারা (চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়) তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই নিজেদের পরস্পরকে সাহায্য করবে; এবং তাদের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও কল্যাণবোধ; এবং তারা কখনো কোন অপরাধ কিংবা পাপাচার করবে না।[১৬৪]

এই চুক্তির পক্ষগুলোর মধ্যে যদি কোন বিষয়ে কোন বিরোধ বা বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে কোন অশুভ পরিণতির আশঙ্কা দেখা দেয় তবে তার মীমাংসার জন্য অবশ্যই সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ আর তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। যে এই চুক্তিপত্রের বিধানগুলো পালনের জন্যে সব চেয়ে বেশী আগ্রহশীল থাকবে এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে এগুলো পালন করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে থাকবেন। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই এই সনদ কার্যকরীকরণে সাহায্য করবেন। (শত্রুভাবাপন্ন) কোরেশগণ এবং তাদের সাহায্যকারী ও সমর্থকদের সাহায্য দান করা চলবে না।

যারা মদিনা দখলের হুমকি প্রদান করবে, তাদের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ দলগুলো একে অপরকে সাহায্য প্রদান করবে এবং যারা আক্রমণ করবে, (মুসলমান ও ইহুদীগণ) তাদের ওপর অবশ্যই জয়লাভ করবে।

কোন শান্তিচুক্তি সম্পাদনে ইহুদীদের অংশ গ্রহণের জন্য মুসলমানগন যদি তাদের প্রতি আহ্বান জানায়, তবে অবশ্যই তাদের তা গ্রহণ করতে হবে; এবং যখন ইহুদীদের পক্ষ থেকে মুসলমানগণকে অনুরূপ আহ্বান জানানো হবে, তখন তাদের জন্যও অনুরূপ কর্তব্য হবে; তবে কেবল ওই সব ব্যক্তি ছাড়া যারা

---

১৬৪. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, nRiZ ivm‡j Kwig (mv.)-Gi Rxeb I wkÿv, পৃ.১০১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জেহাদ (ধর্মের জন্য যুদ্ধ) করে (অর্থাৎ তারা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে)।

প্রত্যেক দল পূর্বের মতই তাদের পক্ষ হতে তাদের নিজ নিজ অংশ পাবে।[১৬৫]

নিশ্চয়ই আল-আউস গোত্রের ইহুদীগণ, আর তাদের আশ্রিতগণ এবং তারা নিজেরা সদ্ব্যবহার অক্ষুন্ন রাখলে এই চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলোর মতই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ সর্বপ্রকার অধিকার ও মর্যাদা লাভ করবে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সঙ্গেই আছে যে এই চুক্তিপত্রের যা কিছু রয়েছে, তার প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল, অনুগত এবং ন্যায়পরায়ণ, জালিম ও পাপাচারী ব্যতীত কেউই এই চুক্তির বিরুদ্ধাচারণ করতে পারবে না; এবং এই চুক্তিপত্র জালিম ও পাপাচারীদের জন্য নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করবে না।

যারা মদিনা নগরে বসবাস করবে, তাদের যে কেউ যুদ্ধে থাক বা ঘরে অবস্থান করুক, তারা নিরাপদে থাকবে, কেবলমাত্র অত্যাচারী ও পাপাচারীগণ ব্যতীত; তাদের জন্য নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

যারা ধর্মশীলতা ও ন্যায়পরাণয়তার সাথে জীবনযাপন করবে এবং এই চুক্তির বিধানসমূহ কার্যকরী করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের আশ্রয় দেবেন ও নিরাপদ রাখবেন। আর নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক)।[১৬৬]

এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এ চুক্তিটি একটি ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি। মক্কার বাস্তুচ্যুত মুহাজির, মদিনার আনসার (মুহাজিরদের সাহায্যকারী ও অনুগামীগণ) এবং ইহুদীগণ– এই তিন পক্ষের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে চুক্তিপত্রের দলিলটি পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, এটা কেবলমাত্র একটা সাধারণ মৈত্রীচুক্তি নয়; বস্তুত এর লক্ষ্য ও গুরুত্ব আরো অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর ক্ষেত্র আরো ব্যাপক।

চুক্তির প্রথম অংশ হতেই সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন গোত্র বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌছার প্রয়াসই কেবল এর লক্ষ্য নয়; প্রকৃতপক্ষে, সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি সাধারণ রাষ্ট্রীয়মৈত্রী সংস্থার আওতায় মদিনার সকল প্রতিদ্বন্দ্বী আরব গোত্রকে সম্মিলিত করে অবশিষ্ট জন সমষ্টি হতে স্বতন্ত্র একটি জাতি গঠনই এই চুক্তির মূল লক্ষ্য। অন্য কথায় একে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রারম্ভিক গঠনতন্ত্রও বলা যেতে পারে।

---

১৬৫. শায়খুল হাদীস মাও. তফাজ্জল হোসাইন ও ড. এ এইচ এম মুজবতা হোসাইন (সম্পা). nRiZ gnv¤§` g¯Ídv (mv.) mgKvjxb cwi‡ek I Rxeb, ইসলামিক রিসার্চ ইনিস্টিটিউট বাংলাদেশ ১৯৯৮, পৃ.১১৭

১৬৬. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩-১৫৪

চুক্তির দ্বিতীয় অংশ হতে বোঝা যায় যে, আরব গোত্রগুলোকে নিয়ে একটি পক্ষ ও ইহুদী গোত্রগুলোকে নিয়ে অপর একটি পক্ষ গঠিত হয়। অতঃপর উভয়পক্ষ সম্মিলিতভাবে মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়। বিশ্বাসীদের নিয়ে প্রত্যেক ইহুদী গোত্রের সমন্বয়ে একটি জাতি গঠিত হয়।

চুক্তির তৃতীয় অংশের প্রকৃতি হতে বোঝা যায় যে, মদিনাকে কেন্দ্র করে আরব ও ইহুদী গোত্রসমূহের সমবায়ে একটি কনফেডারেশন গঠিত হয়েছে। এই কনফেডারেশনের অংশ হিসেবে মদিনা অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ব্যাপক প্রাধান্য বিস্তার করে।[১৬৭]

ইহুদীদের অধিকার

"আউফ সায়দাহ, আল-হারিস, জুসম, আল-নজর, আন্-নাবিত, আল-আস প্রমুখ বংশীয়গণ পূর্বের মতই একই সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বসবাস করবে এবং যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায়ই থাকবে। আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরাণয়নতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিমূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।

কোন বিশ্বাসী অপর কোন বিশ্বাসীর আশ্রিত ব্যক্তির (মওলা) সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না; কোন ব্যক্তি যদি ন্যায়নীতি বিগর্হিতভাবে অপরাধ করে থাকে অথবা অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন করে থাকে কিংবা সীমা লঙ্ঘনের অভিপ্রায়ে বা বিশ্বাসীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে শক্তির অভিলাষী হয়ে থাকে, তবে মুমিন বিশ্বাসীগণ অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবেন, এমন কি সে ব্যক্তি যদি তাদের (বিশ্বাসীদের) পুত্রও হয়ে থাকে।[১৬৮]

কোন বিশ্বাসী একজন অবিশ্বাসীর জন্য অপর কোন অবিশ্বাসীকে হত্যা করতে পারবে না; কিংবা তিনি একজন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে সাহায্য বা সমর্থন করবেন না।

দীনতম ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকল বিশ্বাসীর জন্যই (সমভাবে) রয়েছে আল্লাহর (আইনের) নিরাপত্তা। বিশ্বাসীগণ পরস্পরকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করবেন। একজন বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে একজন দীনতম বিশ্বাসীকেও রক্ষা করবেন; অন্যায় জাতি ভিন্ন শুধু বিশ্বাসীগণ তাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাহায্যকারী।

---

১৬৭. আকরাম ফারুক (অনূ.), mxiv‡Z Be‡b wnkvg, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮,পৃ. ৫৯
১৬৮. এ.জে. এম শামসুল আলম, Bmjvgx ivó, প্রাগুক্ত, c. 107

ইহুদীদের মধ্যে যারা আমাদের অনুসরণ করে, তারা সমভাবে আমাদের সমর্থন এবং সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করবে; তাদের প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন কিংবা অন্যায় ব্যবহার করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন অভিপ্রায় পোষণ করবো না অথবা তাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করব না। সবার জন্যই সমভাবে রয়েছে বিশ্বাসীদের শান্তির নিশ্চয়তা।

চুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল–যে পর্যন্ত ইহুদীগণ মুসলমানদের সাথে থেকে যুদ্ধ করবে, সে পর্যন্ত তাদের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনে শরীক হতে হবে এবং যে পর্যন্ত মুসলমানগণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকবেন, সে পর্যন্ত ইহুদীগণও তাদের সাথে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে যাবেন; আউফ গোত্রের ইহুদীগণ মুসলমানদের সাথে একই (রাজনৈতিক দিক থেকে) জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইহুদীদের জন্য রয়েছে তাদের নিজস্ব ধর্মমত; আর বিশ্বাসীদের জন্যও রয়েছে তাদের নিজস্ব ধর্মমত; তাদের মাওয়ালীদের (আশ্রিত বা দাসদের) এবং পরিবারের অন্যান্য লোকজনেরও এই একই অধিকার থাকবে; তবে অপরাধী, জালিম ও পাপাচারী ব্যক্তিগণ এই অধিকার লাভ করবে না; নিশ্চয়ই তারা (জালিম ও পাপীগণ) তাদের এবং তাদের পরিজনদের ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন ছাড়া অন্য কারো ক্ষতি করতে পারে না।”[১৬৯]

ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা

ইহুদীরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া মদীনা আক্রমণে মক্কাবাসীদের সহযোগিতা করিল। অবরোধ অনেক দিন পর্যন্ত চলিলেও নগরে প্রবেশের প্রত্যেক চেষ্টাই পয়গম্বরের সতর্কতাগুণে ব্যর্থ হইল। অবশেষে প্রাকৃতিক শক্তি অবরোধকারী সৈন্যদলের বিরোধিতা করে় বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাতে তাহাদের অশ্বগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাহাদের আহর্যদ্রব্য নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং তাহাদের সৈন্যদল যেমন একতাবদ্ধ হইয়াছিল তেমনি ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।[১৭০]

অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত কিছু ত্রুটিপূর্ণ ধারণার ফলশ্রুতিতে মুসলমান এবং অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি যথোপযোগী সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হতে পারেনি।

---

১৬৯. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮-১৫০

১৭০. সৈয়দ আমীর আলী, (অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সম্পা. ড. মফীজুল্লাহ কবীর), Avie RwZi BwZnvm *'A Short History of the Saracens'* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ.-১১-১৪

চারটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বৈদেশিক বিষয়ে নবি করিম (সা.) এর আচরণের নিছক আইনগত নয় বরং সর্বোত্তম রাজনৈতিক যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে। এই চারটি বিষয় হলঃ

১. বদরের যুদ্ধে ধৃত যুদ্ধবন্দীবৃন্দ

২. আরবের ইহুদী এবং বিশেষ করে মদিনার বনু কোরাইজার বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযান,

৩. প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের প্রধান শত্রু কোরাইশদের প্রতি গৃহীত উদার নীতিমালা ও

৪. আহলে কিতাবদের প্রতি প্রদর্শিত অব্যাহত সম্মান এবং ধৈর্য।[১৭১]

১৭১. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮-১৪৯

৩.৫: বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দী

মক্কা হতে মদিনায় নবি করিম (সা.) হিজরাতের (দেশত্যাগ) পর দ্বিতীয় বর্ষে (১৭ রমজান) মুসলমান এবং কোরাইশ গোত্রের মধ্যে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনশত তের জন মুসলিম প্রায় এক হাজার কুরাইশ যোদ্ধার মোকাবিলা করে। মুসলমানগণ এতে বিজয় অর্জন করেন। এ যুদ্ধে কোরাইশ নেতাদের অনেকেই নিহত অথবা বন্দী হয়। প্রায় ৭০ জন বন্দীর মধ্যে মাত্র দুইজনকে আইনানুগ প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। বাকীদেরকে বিভিন্ন অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়। মুসলমান কোরাইশ এবং আরবের অন্যান্য আরব ও ইহুদী গ্রোত্রের মধ্যে বদরের যুদ্ধই ছিল প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ বারটি বছরের চাপ এবং মারাত্মক নির্যাতনের পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বার বছরের অত্যাচার নির্যাতনের সংকটকালে মুসলমানদের অনেকেই বাধ্য হন পলায়ন করতে, প্রথমে আবিসিনিয়ায় এবং পরে মদিনায়।[১৭২]

কুরাইশ যখন মদিনার লোকদেরকে নবি করিম (সা.) এবং তাঁর কোরাইশ অনুগামীদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করে দেয়ার জন্য প্ররোচিত করতে সচেষ্ট হয় তখন নবি (সা.) অনিবার্য সংঘর্ষ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে মুসলিম শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত ও সংহত করার কাজ শুরু করেন। তিনি মদিনার ইহুদী গোত্রসমূহ এবং মুসলমানদের মধ্যে একটি সম্মানজনক শান্তিচুক্তি (মদিনা সনদ) সম্পাদন করেন। আনসার এবং মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে মদিনার চতুর্দিকে অভিযান প্রেরণ করেন। একটি কোরাইশ কাফেলার বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম আক্রমণেই ইবনে যাহশ এর গোয়েন্দা অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অভিযানের গুরুত্ব এই যে, এটা কোরাইশ সেনাদলের অগ্রাভিযানকে প্রথমে মদিনা এবং পরে বদরের যুদ্ধের দিকে পরিচালনা করছিল।[১৭৩]
শানে নুযূলঃ বদর যুদ্ধে সত্তরজন কাফির বন্দী হইয়া মুসলমানদের হাতে আসে। হুযূরে আকরাম ছাল্লাহল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সম্পর্কে সাহাবাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে অনেক পরামর্শ দিলেন যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হউক। কেহ কেহ বলিলেন, ফিদিয়া অর্থাৎ, জীবন-বিনিময় স্বরূপ কিছু অর্থ গ্রহণপূর্বক তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই যুক্তসঙ্গত। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতি ওহী আসিল-আপনি সাহাবাদিগকে জানাইয়া দিন যে, বন্দীদিগকে হত্যা করা ও বিনিময় গ্রহণে ছাড়িয়া তোমাদের সত্তর ব্যক্তিকে শহীদ হইতে হইবে। ওহীর কথা অবগত হওয়ার পরেও অধিকাংশ

---

১৭২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৯-১৫১
১৭৩. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪

সাহাবী বিনিময় লাইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করা হউক; মুক্তি পাইলে হয়ত ইহারা পরে ঈমান আনিতেও পারে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আরও একটি লাভ আছে যে, এই অজুহাতে এখন মুসলমানদের কিছু অর্থও হস্তগত হইবে। দয়াল নবীও দয়াপরবশ হইয়া এই মত পছন্দ করিলেন। অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকল বন্দীকেই বিনিময় গ্রহণে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ওক্‌বা, নযর, তো'মা এই কয়েকজন বন্দী দুর্দান্ত ও বিশেষ অপরাধে অপরাধী ছিল বলিয়া ইহাদিগকে হত্যা করা হইল। সাহাবাদের পরামর্শক্রমে কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা.) জামাতা হযরত আবুল আ'স (রা.)-কে [তিনি তখন কাফের বন্দীদের মধ্যে ছিলেন পরে ইসলাম গ্রহণ করেন] বিনিময়গ্রহণ ব্যতিরেকে মুক্তি দেওয়া হইল। শরীয়াতের পরিভাষায় বিনিময়কে 'ফিদিয়া' এবং বিনিময় ব্যতীত মুক্ত দেওয়াকে 'মান্ন' বলে। এ সমস্ত কাজ সমাপিত হইলে পর ৬৭ ও ৬৮নং ফিদিয়ার অর্থ ভোগ করার হালাল হওয়া সম্পর্কে সাহাবাদের মনে সন্দেহের উদয় হয়। তখন (৬৯নং) আয়াত নাযিল হয়। বন্দীদের মধ্যে কেহ কেহ মুক্ত হওয়ার পর ঈমান আনয়ন করে। তন্মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতৃব্য আব্বাস (রা.) এবং আরো কয়েকজন মুসলমান হওয়ার পর তাহারা অনুরোধ জানাইল যে, ফিদিয়া দিতে যাইয়া তাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। এ সম্পর্কে ৭০নং আয়াতটি নাযিল হয়।[১৭৪]

বন্দীদের সম্পর্কে নির্দেশঃ (হে মুসলমানগণ! তোমরা যে নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু ফিদিয়া লাইয়া এ বনদীদিগকে মুক্তি দিতে পরামর্শ দিয়াছ তাহা অসঙ্গত হইয়াছে; কেননা,)-যে পর্যন্ত তিনি ভূ-পৃষ্ঠে উত্তমরূপে কাফিরদের রক্তপাত না করেন। (কারণ, শরীয়াতে জেহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য হইল ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ফেৎনা ফ্যাসাদ বিদূরীত করা। কাফিরদিগকে প্রাণে বধ করিয়া তাহাদের প্রতাপ বিধ্বস্ত করা ব্যতীত ফ্যাসাদ করা সম্ভব নহে। অবশ্য যখন কাফিরদের জাতীয় শক্তি খর্ব হইয়া মুসলিম শক্তির সম্মুখে তাহারা অবনত হইয়া পড়ে, তখন শরীয়াতে প্রাণনাশ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বনেরও অন্য ব্যবস্থা রহিয়াছে। এখন কিন্তু অবস্থা তদ্রুপ নহে; অতএব এখন তাহাদিগকে মুক্তি দিতে যাওয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ন্যায় সমাজ সংস্কারকের পক্ষে সঙ্গত নহে। তোমরা এমন অসঙ্গত পরামর্শ তাহাকে কেন দিলে?) তোমরা তা দুনিয়ার ধন সম্পদ চাহিতেছ; (এই কারণেই ফিদিয়া গ্রহণের মত দিয়াছ আর আল্লাহ তা'আলা চাহিতেছেন পরকাল (এর কল্যাণ। সেই কল্যাণ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে যে, বন্দীদিগকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিলে কাফিরগণ ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িবে এবং সেই সুযোগে ইসলামের

---

১৭৪. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র), evqvbj KiAv‡bi সরল অনুবাদ, ৬ষ্ঠ পারা, ঢাকাঃ এমাদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ১৯৯৬ পৃ. ৫৩৪

আলো ও হেদায়েত স্বাধীনভাবে চর্তুদিকে ছড়াইতে থাকিবে। আর দলে দলে মানুষ অবাধে ইসলাম গ্রহণপূর্বক পারলৌকিক মুক্তি লাভ করিবে)। আর আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তিনি তোমাদিগকে নিশ্চিয়ই কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করিতেন এবং বহু দেশ বিজয় দ্বারা তোমাদিগকে ধনবান করিয়া দিতেন, যদিও বিশেষ কোন হিক্মতের কারণে তাহাতে বিলম্বই হউক না কেন।)[১৭৫]

এ ঘটনা উপলক্ষে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ

অর্থ : "দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবির জন্য সংগত নহে।"[১৭৬]

আইনের বিধানের চুলচেরা অনুসরণ (লিগালিজম) মুসলিম লেখকবৃন্দকে এই আয়াতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার পর্যায়ে পরিচালিত করেছে আর এই আয়াতের মাধ্যমে বিপরীত যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা। সে আয়াতটি নিম্নরূপঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ٭ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ

অর্থ: "অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সহিত যুদ্ধে মোকাবেলা কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে।"[১৭৭]

সমকালীন লেখকগণ প্রায় সময় এক প্রকার উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। একটি নিরাপদ এবং সুষ্ঠু নীতি হিসাবে যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার বিষয় বিবেচনা করে তারা এ উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেন। দোষারোপের আয়াতের (বদরযুদ্ধ ধৃত সকল যুদ্ধ বন্দীকে হত্যা না করার জন্য) তীব্রতা হ্রাস করেন এটা বলে যে, এটা হল ক্ষণস্থায়ী ধরনের কিছু এবং এটা প্রযোজ্য ছিল কেবল প্রাথমিক যুগের মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কালে। অন্য একটি বিকল্প দৃষ্টিতেও আধুনিক লেখকগণ বিষয়টিকে দেখেন। সেটা হল নিছক যুদ্ধ বন্দী হিসাবে না দেখে যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে একটি আইনগত বিষয় হিসাবে এটিকে যুক্তিযুক্ত করা।

---

১৭৫. আশরাফ আলী থানবী (র), প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৩৪-৫৩৫
১৭৬. আল-কুরআন, ৮ : ৬৭
১৭৭. আল-কুরআন, ৪৭ : ৪

সুরা আনফালে পাঠকদের নিকট যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করছে সেগুলো হল জনশক্তির অভাবের জন্য মুসলমানদের মধ্যে যে ভীতি সৃষ্টি হয়েছিল তা, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জন্য তাদের যেসব বিষয় প্রয়োজন সেগুলো এবং নবি করিম (সা.) সকল দিক দিয়ে শত্রুদের সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের স্বাধীনতা। এই সুরাতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য মুসলমানদের আবেদনের বিষয় উল্লেখ আছে। মুসলমানগণ যে তাদের প্রতি কৃত অত্যাচার নির্যাতন এবং ধর্মের বিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পরস্পর সহযোগিতা করার বিষয়ে আগ্রহী, সে বিষয়টি এ সূরায় প্রকাশ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ‘নবীর উচিত নয় বন্দীদেরকে নিজের কাছে রেখে দেওয়া, যাবত না দেশে ব্যাপক রক্তপাত করা হয়। তোমরা কমনা কর পার্থিব সামগ্রী আর আল্লাহ্ চান আখিরাত। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়’।[১৭৮]

বদরের যুদ্ধ-বন্দীদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল,
কেন নেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র কী পছন্দ ছিল

বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণের হাতে সত্তর জন কাফির বন্দী হয়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা’আলা মুসলিমগনের সামনে দু’টি উপায়ে তুলে ধরেনঃ (ক) হত্যা করা, কিংবা (খ) মুক্তি পণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শর্ত ছিল পরবর্তী বছর সম সংখ্যক মুসলিমকে শাহাদত বরণ করতে হবে। এদুটোর মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার প্রদান মূলত আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা ছিল, যাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মুসলিমগণ স্বীয় রায় ও স্বভাব অনুযায়ী কোন দিকে ঝোঁকে। যেমন উম্মুল-মু’মিনীনগণকে দু’টি পন্থার মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল- ‘ তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর, তবে এসো.[১৭৯].. মি’রাজে প্রিয়নবী (সা.) এর সামনে দুধ ও শরারের দু’টি পাত্র পেশ করা হয়েছিল। তিনি তা হতে দুধ গ্রহণ করেন। জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথহারা হয়ে যেত। যা হোক, আলোচ্য বিষয়ে প্রিয়নবী (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে পরামর্শ করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল“ এসব কয়েদী আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বেরাদর। তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলেই ভাল। অসম্ভব কি এই অনুগ্রহ ও সদয় ব্যবহারের ফলে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তারা

---

১৭৮. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
১৭৯. আল-কুরআন, ৩৩ ঃ ২৮,২৯

নিজেরা, তাদের আওলাদ ও অনুগত লোক আমাদের বাহুবল বৃদ্ধি করবে? তা ছাড়া, তাৎক্ষণিক যে অর্থ আমাদের হাতে আসবে, তা জিহাদ প্রভৃতি দীনের কাজে ব্যবহার করা যাবে। বাকি সামনের বছর যদি আমাদের মধ্যে সত্তর জনকে শহীদ হতে হয়, তবে ক্ষতি নেই। শাহাদতের মর্যাদা লাভ হবে। স্বভাবগত দয়া ও মমত্ববোধ, সেই সঙ্গে আত্মীয়ের প্রতি সদয় আচরণের প্রেরণায় রাসূলে করীম (সা.) এর মনের ঝোঁকও এই মতের দিকেই ছিল। বরং অধিকাংশ সাহাবীর মনোভাব ও রকমই ছিল। আবূ বকর (রা.) যে কারণ দেখিয়েছেন, তার ভিত্তিতে অনেকে এবং কেউ কেউ কেবল আর্থিক সুবিধার দিক বিবেচনা করে এ মতের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেছিলেন (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এর দ্বারা এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেমন হাফিয ইব্ন হাজার, ইবনুল কায়্যিম প্রমুখ ব্যক্ত করেছেন)।[১৮০] কিন্তু হযরত উমর (রা.) ও সা'দ ইব্ন মু'আয (রা.)-এর বিরোধিতা করেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, হে রাসূল! এসব বন্দী কুফরের ইমাম ও মুশরিকদের নেতা। (এদেরকে হত্যা করা হলে কুফর ও শির্কের মাথা ভেঙ্গে যাবে। সমস্ত মুশরিকের উপর ভীতি ছড়িয়ে পড়বে। ভবিষ্যতে মুসলিমগণকে কষ্ট দেওয়ার এবং মহান আল্লাহ্র পথে বাধা দেওয়ার হিম্মত তাদের থাকবেনা)।

এর দ্বারা মহান আল্লাহ্র সম্মুখে মুশরিকদের প্রতি আমাদের চরম ঘৃণা ও পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ হয়ে যাবে যে, আমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে নিজ আত্মীয়-স্বজন ও আর্থিক সুবিধার কোন পরওয়া করিনি। তাই আমার ভাল মনে হয়, এ বন্দীদের মধ্যে যারা আমাদের যার আত্মীয় ও আপনজন সে তাকে হত্যা করবে। মোট কথা, আলোচনা-পর্যালোচনার পর আবু বকর (রা.) এর পরামর্শ্যই গৃহীত হল। কেননা, সেদিকেই রায় বেশী পড়েছিল এবং খোদ নবী করীম (সা.) স্বভাবগত মমতা ও দয়ার কারণে সেদিকেই ঝোঁকা ছিলেন। এমনিতেও নৈতিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে সাধারণ অবস্থায় সে রায়ই বেশী সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু ইসলাম তখন যে পরিস্থিতির উপর দিয়ে চলছিল, সে দৃষ্টে তখন কাফিরদের মুকাবিলায় প্রচণ্ড কোমরভাঙ্গা আচরণ করাই ছিল সময়ের দাবী। তের বছরের নির্যাতিত মুসলিমগণের জন্য শয়তানের পূজারীদের উপর একথা প্রমাণ করে দেওয়ার এটাই ছিল প্রথম সুযোগ যে, তোমাদের পারস্পরিক আত্মীয়তা, ধন ও জনবল, সামরিক শক্তি কোন কিছুই তোমারকে মহান আল্লাহ্র তরবারি হতে রক্ষা করতে পারে না। প্রথমেই যালিম মুশরিকদেরকে একবার ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিতে পারলে পরে নম্র আচরণ

---

১৮০. আশরাফ আলী থানবী (র), e⁄qvbj KiAv‡bi সরল অনুবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৫

ও আত্মীয়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করার অনেক সুযোগ পাওয়া যেত এবং তা আরও বেশী ফলপ্রসূ হত। অন্য দীকে সত্তরজন মুসলিম নিহত হবে। একথার উপর রাযী হওয়ায় মা'মূলী বিষয় ছিল না। তাই এ রায়কে গ্রহণ করা তখনকার স্বার্থ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় আল্লাহ্‌র মনঃপূত ছিল না।[১৮১]

এ আয়াতের মাঝে তাঁর এই অপসন্দের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটাকে সাহাবায়ে কিরামের কঠিন ইজতিহাদী ও চিন্তাগত ভুল সাব্যস্ত করা হয়েছে। যারা আর্থিক সুবিধার দিকে লক্ষ্য করে এর সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার নশ্বর সামগ্রীর দিকে তাকাচ্ছ, অথচ মু'মিনের লক্ষ্য থাকা উচিত আখিরাতের প্রতি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের কাজ স্বীয় কুদরত ও ক্ষমতা বলে বাহ্য আসবাব-উপকরণ ছাড়াই সম্পন্ন করতে পারেন। যা হোক, মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়াকে তখনকার পরিস্থিতি দৃষ্টে কঠিন ভুল সাব্যস্ত করা হয়েছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, রিওয়ায়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে কেবল এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, কেবল দয়া ও আত্মীয়তা রক্ষার তাগিদেই তাঁর ঝোঁক এ রায়ের দিকে ছিল। তবে কতিপয় সাহাবী আর্থিক সুবিধাকে লক্ষ্য করে এবং তাদের অধিকাংশ অন্যান্য দীনী স্বার্থ ও নৈতিকতার অনুপ্রেরণায় সেই সঙ্গে আর্থিক সুবিধাকেও সামনে রেখে এ মত প্রকাশ করছিলেন। অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে আর্থিক লাভের দিকটি অবশ্যই বিবেচিত হয়েছিল। যে কোনও পর্যায়ে আর্থিক লাভের চিন্তায় বুগ্য ফিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র জন্য দুশমনী)- এর সেঙ্গ স্বেচ্ছায় সত্তর জন-মুসলিমের নিহত হওয়াকে স্বীকার করে নেওয়াকে সাহাবায়ে কিরামের মত নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সম্মান-মর্যাদার পরিপন্থী গণ্য করা হয়েছে। এজন্যই আলোচ্য আয়াত সমূহে কঠিন তিরস্কার মিশ্রিত ভংগি অবলম্বন করা হয়েছে। হাদীছে আছে, এক যুদ্ধে এক সাহাবীর মাথা যখম হয়ে যায়। তার গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মাথায় পানি ব্যবহার তার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ছিল। সঙ্গীদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললেন, পানির বর্তমানে আমরা তোমার জন্য অন্য কোন সুযোগ দেখছি না। তিনি গোসল করলেন এবং মারা গেলেন। বিষয়টি যখন প্রিয়নবী (সা.) জানতে পারলেন, বললেন, 'তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন এতদদ্বারা বুঝা যায় ইজতিহাদী ভুল যদি অতি স্পষ্ট ও বিপজ্জনক হয়, তবে তজ্জন্য তিরস্কার করা যায়।

---

১৮১. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র), (অনু. মাওলানা এ.বি.এম মাঈনুল ইসলাম), Zvdmx‡i gvhnvix, ঢাকাঃ সেরহিন্দ প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৪

কেননা তখন ধরে নেওয়া যায় মুজতাহিদ তার ইজতিহাদী শক্তি পুরোপুরি প্রয়োগ করতে ত্রুটি করেছে।'[১৮২]

বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ দানে ত্রুটি হওয়া সত্ত্বেও শাস্তি না দেওয়ার কারণ

এমনিতে এ ত্রুটি এমন ছিল যে, যারা পার্থিব সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে এরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন,তারা কঠিন শাস্তির উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু শাস্তিদানের জন্য এমন একটি জিনিস বাধ্য ছিল, যার সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই নিয়ে রেখেছিলেন। কী সে জিনিস? নিম্ন-বর্ণিত বিষয়গুলোর যে কোনটি হতে পারে- ক. এরূপ ইজতিহাদী ভুলের কারণেমুজতাহিদকে শাস্তি দেওয়া হবে না খ. যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা পরিস্কার আদেশ বা নিষেধ যতক্ষণ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা করলে তিনি শাস্তি দান করেন না, গ. বদর যুদ্ধের মুজাহিদগণের ভুল-ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন, ঘ. ভুলবশত যে পদ্ধতি আগেভাগেই অবলম্বন করা হয়েছিল অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া, তা যে পরবর্তীতে অনুমোদিত হবে তা মহান আল্লাহ্র জ্ঞানে স্থিরীকৃত ছিল। ইরশাদ হয়েছে 'এর পর হয় অনুগ্রহ, নয়ত মুক্তিপণ'[১৮৩] ঙ. এটাও গৃহীত সিদ্ধান্ত যে, যতক্ষণ নবী করীম (সা.) এর অবস্থিতি তাদের মধ্যে থাকবে বা তারা নিষ্ঠার সাথে ইস্তিগ্ফার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি আসবে না, চ. বন্দীদের অনেকের ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ লেখা ছিল। মোদ্দা কথা, এ ধরণের কোন বাধা যদি না থাকত, তবে ত্রুটি এত বড় ও জঘন্য ছিল যে, তজ্জন্য কঠোর শাস্তি নাযিল হওয়ারই শাস্তি আসতে পারত, তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অতি কাছে এনে দেখানো হয়। সে যেন উক্ত হুশিয়ারী বাণীকে আরও জোরদার ও ক্রিয়াশীল করার একটা পন্থা ছিল। তিনি সে দৃশ্য দেখে কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা.) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমার সামনে তাদের শাস্তি তুলে ধরা হয়েছে, যা তাদের উপর আপতিত হত-যদি না উপরিউক্ত বাধা খাত। মনে রাখতে হবে তাঁর সামনে এ আযাব তুলে ধরা হয়েছিল ঠিক সেই রকমের, যেমন সূর্যগ্রহণের সালাত আদায়কালে জান্নাত- জাহান্নামকে কিবলার দিকের দেওয়ালে চিত্রিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ সম্ভব্য সেই শাস্তির নমুনা তাঁকে দেখাবার ছিল, ব্যস, তাই করা হয়েছে।[১৮৪]

---

১৮২. শায়খুল হিন্দ্ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), (অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম), Zvdmx‡i Dmgvbx, খ.২, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৭, পৃ. ১৬১-১৬৬

১৮৩. আল-কুরআন, ৪৭ ঃ ৪

১৮৪. শায়খুল হিন্দ্ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), (অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম), প্রাগুক্ত , পৃ. ১৬৪

৩.৬: বনু কুরাইযা ও কুরাইশ সম্প্রদায়

বনু কুরাইযা সম্প্রদায় : বিশ্ব মানবতার মুক্তির অগ্রদূত, সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬২২ খ্রি. ২৪ সেপ্টেম্বর মদিনায় হিযরত করেন। মদিনার আরব গোত্রগুলো ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বনু কুরাইযা ছিল মদিনায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রগুলির একটি। ইহুদী গোত্রগুলো ছিল জনসংখ্যা এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়ে দুর্বল। কিন্তু তারা ছিল পণ্ডিত। শিল্প, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির দিক দিয়ে তাদের আরব প্রতিবেশীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মুসলমান এবং মদিনার ইহুদী গোত্রগুলোর মধ্যে একটা ফেডারেল ব্যবস্থা ছিল। বনু কুরাইযা ছিল এ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যবস্থায় ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ ছিল। আরও এতে ছিল স্বায়ত্বশাসন এবং মুসলমানদের বড় শত্রু কুরাইশদের বিরুদ্ধে একটি সামরিক জোট।[১৮৫]

Verses 26 and of Sura Ahzab (33:26,27) are about the Banu Quraiza Tribe of the jews, who were æthe citizens of Madina and where bound by solemn engagements to help in the defnce of the city. But on the Occasion of the Confederate siege by the Quraish and thir allies they intrigued with the one nies and treacherously sided with them."[186]

কুরাইশ, গাতফান, কায়েস এবং বনু নজির গোত্রসমূহ মিলে একটি জোট গঠন করে। এ জোট বিরাট এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলে। এ সেনাবাহিনী নিয়ে তারা মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। নগরীর অবরোধ কালে বনু কুরাইযা মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে তারা আক্রমণকারীদের সাথে আলাপ আলোচনার সূত্রপাত করে। বনু নজিরের হয়ে ইবন আহতাব এসব আলোচনার সূচনাকারী এবং মধ্যস্থতাকারী ছিল। বনু নজির গোত্রটি সেই গোত্র যাদেরকে মদিনা হতে কুরাইশদের সাথে দালালী কালে শত্রুতামূলক ও ধ্বংসাত্মক কাজের অপরাধে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বনু কুরাইযা এবং আক্রমণকারীদের মধ্যে এসব আলোচনা অবশ্য সফল হয়নি। কারণ বনু কুরাইযাদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। অবরোধ ভেঙ্গে যাওয়ায় মুসলমান এবং বনু কুরাইযাদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

---

১৮৫. Bmjvgx wek¦Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ. ৫, পৃ.৭৪

186. Altaf Ahmed Kherie, *Islam* a comprehensive Guide-Book, Pakistan:Royal Book Company, P.O. Box 7737 SADDAR, Karachi, P.115

নবি করিম (সা.) গাতফান গোত্রকে বলেছিলেন, যদি তারা মুসলমানদের উপর হতে কিছু চাপ প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের মদিনার বাৎসরিক ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়া হবে। কুরআন মজিদ এ চাপ এবং মুসলমানদের মধ্যে সর্বাত্মক ধ্বংসের ভীতকে অনুপম বাচন ভঙ্গিতে প্রকাশ করে।[১৮৭]

মুসলমানদের সাথে বনু কুরাইশরা চুক্তিভঙ্গ করে। এ চুক্তি ভঙ্গ ছিল বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ। ইহুদী ধর্মযাজকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণা চালায়। এতে তারা বলে ইহুদী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের জন্য মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এ বিষয়টির নৈতিক এবং আইনগত অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে বলে লেখকগণ খুব জোর দিয়েছেন।

সামরিক এবং রাজনৈতিক মোকাবিলার প্রেক্ষিতে চরম কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যতামূলক সত্ত্বেও ধর্মীয় এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে মুসলমানদের সাথে সহবস্থান করতে দেয়ার ইসলামী অবস্থানকে কখনও অস্বীকার করা হয়নি। বরং নবি করিম (সা.) সারা জীবন ধরেই এ অবস্থানকে অব্যাহত রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাঁর বিজয়গুলো বহিসম্পর্ক বিষয়ে তাঁর নৈতিক এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিরই কেবল প্রকাশ ঘটিয়েছে। বস্তুত পক্ষে সবসময়ই তিনি চুক্তির শর্ত পুরা করাকে যে কোন বহিঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি শর্ত বানানোর চেষ্টা করেছেন। এভাবে তিনি নিজের তরফ হতে তাঁর প্রতিপক্ষের উপর নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব ফেলেছেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক অঙ্গীকারের অভাবই হচ্ছে বিশ্ব শান্তির জন্য বিপদের সত্যিকারের উৎস। মুসলিম উম্মাহ এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে নবি করিম (সা.) জীবনের শেষ দশ বছর কালে সম্পাদিত অন্যান্য রাজনৈতিক এবং সামরিক কার্যাবলীর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিবেশের প্রেক্ষিতে এর মৌলিক স্বার্থ এবং প্রয়োজনের একটি গতিশীল প্রতিক্রিয়া হিসাবে বহিষ্কার এবং প্রতিশোধের বিষয়ে নীতি সংক্রান্ত তারতম্যের তাৎপর্য আরও বেশী করে উপলব্ধি করা যায়।[১৮৮]
বিশ্বাসঘাতক বনু কুরায়জার কৃতঘ্ন ব্যবহার যে কোন মুহুর্তে মদীনার ধ্বংস আনয়ন করিতে পারে বিবেচনায় মদীনার এত নিকটে তাহাদিগকে বাস করিতে দেওয়া সমীচীন বোধ হইল না। সেজন্য তাহাদিগকে সে স্থঅন পরিত্যাগ করিতে বলা হইল; কিন্তু তাহারা অস্বীকার করায় তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া বিনা শর্তে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনে বাধ্য করা হইল। এ ইহুদীরা আওস দলপতি হযজরত সাদ ইবন

১৮৭. শায়খুল হাদীস মাও. তফাজ্জল হোসাইন ও ড. এ এইচ এম মুজবতা হোসাইন (সম্পা). প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৯-৪৪৭
১৮৮. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫২

মুয়াজের আশ্রিত ছিল। তাহারা মুসলমানদিগের সহিত কেবল এই শর্ত করিল যে তাহাদের বিচার ভার এই সা'দের উপর অর্পিত হউক। তিনি একজন দুর্দান্ত বীরপুরুষ ছিলেন; পরিখার যুদ্ধে আহত হইয়া পরদিনই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতায় রাগান্বিত হইয়া মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই দণ্ডদেশ দিয়াছিলেন যে তাহাদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদিগকে হত্যা এবং্ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে মুসলমানদের দাসত্বে আবদ্ধ করা হউক। এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যে পরিণত করা হইয়াছিল। বর্তমানকালে এই শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইবে; কিন্তু তৎকালে প্রচলিত যুদ্ধের প্রথা অনুসারে উহা বিধিসঙ্গত ছিল।

মক্কাবাসীদিগের এই পরাজয়ের পর নূতন ধর্ম আরব উপদ্বীপে দ্রুতগতিতে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং গোত্রের পর গোত্র তাহাদের পূরাতন গর্হিত জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল।[১৮৯]

কুরাইশ সম্প্রদায় : খায়বারের[১৯০] যুদ্ধের পর নবি করিম (সা.) মদিনা এবং তার চতুর্দিকের এলাকার বৈরী ইহুদী শক্তির চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটান। উদ্বিগ্ন, অক্ষম এবং হতবল কুরাইশদের প্রতি তাদের মূল্যবান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ করার মাধ্যমে এটা করা হয়।

নবি করিম (সা.) এবং কুরাইশদের[১৯১] মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এর উপর কুরাইশরা প্রতিষ্ঠিত থাকতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া যখন তাদের মিত্র বনু বকর খোজাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তাদের দ্বারা স্বয়ং মক্কা মুয়াজ্জামায় সংঘটিত হয় রক্তপাতের তাণ্ডব। এসময় নবি করিম (সা.) মক্কার বিরুদ্ধে আচমকা এক বিরাট আঘাত হানার সুযোগ কাজে লাগান। তাঁর এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ যখন মক্কা এবং কুরাইশদের আত্মসমর্পনে বাধ্য করল, তখন তিনি মক্কার কুরাইশদের দ্বারা মুসলমানদের উপর সুদীর্ঘ নির্যাতনের সকল সিক্ত স্মৃতির পরও তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক ব্যবস্থা, ধ্বংস এবং শাস্তির নির্দেশ প্রদান করেননি।

বরং তাদের সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দিলেন।

---

১৮৯. সৈয়দ আমীর আলী, অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ.-১১-১৪

১৯০. "খায়বারের যুদ্ধঃ ইহা সপ্রমাণিত সত্য যে, মদীনা মুনাওওয়ারার বাহিরে ইসলামের সহিত সর্বাধিক শত্রুতা প্রদর্শন করিয়াছে খায়বারের য়াহুদীগণ। তাহারাই খন্দক যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অপরাধী ছিল। বানু কুরায়জাঃ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তাহারা পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল। কিন্তু তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনশক্তি সম্ভবত খায়বারেই সংরক্ষিত ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে আ-হযরত (স.) কুরায়শদেরকে খায়বারের অধিবাসী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতেই ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে মাত্র পনের শত মুসলমান খায়বারবাসিগণের– য়াকু'বীর বর্ণনানুসারে (২খ. ৫৬) বিশ সহস্র এবং মাকরীযীর অভিমতানুসারে (১খ. ৩১০) দশ হাজার হিংস্র রক্ত পিপাসুদেরকে এমনই শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিলেন যে, পরবর্তীকালে ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে তাহারা আর কখনও আক্রমনের দুঃসাহস দেখাইতে পারে নাই।" বিস্তারিত-Bmjvgx wek‡Kvl, ইফাবা, খ.৯, পৃ. ৫৭৮

১৯১. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ.৯, পৃ. ৫৫

রোমানদের ষড়যন্ত্রঃ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক আরম্ভ হইবার অল্প কিছুদিন পূর্বে বাইজেন্টাইনগণ উসমান নামক জনৈক আরববাসীর সাহায্য লইয়া হিজাযকে একটি রোমান প্রদেশে পরিণত করার চেষ্টা করিয়াছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সক্রিয় চেষ্টায় এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা, অমায়িক ব্যবহার, মর্যাদাবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা মুগ্ধ করিয়াছিল এবং সত্য-নিষ্ঠার জন্য মুহাম্মদ (সা.) সকলের নিকট আল-আমীন বা বিশ্বাসী রূপে পরিচিত হন।[১৯২]

৩.৭: বিদেশে দূত প্রেরণ ও খ্রিস্টানদের প্রতি সনদ

বিদেশে দূত প্রেরণ: হযরত মুহাম্মদ (সা.) পারস্যের রাজা ও বাইজান্টাইন (পূর্ব রোমক) সম্রাটকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষি ত হইতে অনুরোধ জনাইয়া দূত প্রেরণ করেন।[১৯৩]

পারস্যের রাজা ঘৃণার সঙ্গে দূতকে তাড়াইয়া দেন; কিন্তু বাইজান্টাইন সম্রাট দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন। দামিশকের নিকটবর্তী বাইজান্টাইন সম্রাটের অধীনস্থ জনৈক খ্রিস্টান রাজার নিকটও একজন দূত প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত দূত অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শহীদ হয়।

সপ্তম হিজরীতে খায়বারের ইহুদীরা বিদ্রোহী হয়; কিন্তু শীঘ্রই তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে। নির্দিষ্ট ভূমি রাজস্ব আদায়ের বিনিময়ে স্বী ভুসম্পত্তিতে তাহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা ধর্মীয় স্বাধীনতাও লাভ করিল।

মক্কাবাসীদিগের সহিত যুদ্ধবিরতির শর্তানুসারে[১৯৪] মুসলমানগণ কাবা দর্শন করিতে যান এবং মক্কাবাসিগণ যাহাতে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর সংশ্রবে না আসে সেজন্য তাহারা শহর খালি করিয়া দেয়।

---

১৯২. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১৯৩. ষষ্ঠ হিজরীতে হজরত মুহম্মদ (সা.) এই দূত প্রেরণ করেন। তৎকালীন বাইজান্টাই সম্রাট ছিলেন হিরাক্লিয়াস এবং পারস্য সম্রাট ছিলেন খসরু পারভেজ। হিরাক্লিয়াসের অধীনস্থ খ্রিস্টান রাজার রাজ্যের নাম ছিল গাসমান এবং ইহার রাজধানী ছিল বুসরা

১৯৪. ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে হজরতের সহিত মক্কাবাসীদের এই যুদ্ধবিরতী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ইহা হুদায়বিয়ার চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তি অনুসারে দশ বৎসরের জন্য শান্তি স্থাপিত হইল। এই চুক্তি মুসলমানগণকে ও মক্কাবাসীদিগকে সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

তিন দিন পর মুসলমানগণ মদীনায় ফিরিয়া আসিলে মক্কাবাসীরা স্বগৃহে প্রত্যাবৃত হয়। ইহার অল্পদিন মাত্র পরে মক্কাবাসীরা এবং তাহাদের মিত্রগণ মুসলমানদের সহিত মিত্রতাবদ্ধ একটি গোত্রকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক আক্রমণ করিয়া তাহাদের অনেক লোককে হত্যা করে। এই সব অত্যাচারিত ব্যক্তি প্রতিশোধার্থে পরস্পরের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। বহুদিন হইতে মক্কায় অবিচার ও অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। আবেদনের প্রত্যুত্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) দশ সহস্র লোক লইয়া পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধভিযান করিলেন। দুইটি গোষ্ঠীর প্রধানদের দ্বারা সামান্য বাধা প্রাপ্ত হওয়ার পর প্রায় বিনা প্রতিবন্ধকতায় তাঁহারা মক্কায় প্রবেশ করিলেন। যে মক্কা নগরী মুহাম্মদ (সা.) কে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত করিয়েছিল, সেই নগরীতে তিনি এইভাবে প্রবেশ লাভ করিলেন। এ শহর এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভারশীল; কিন্তু এই জয়োল্লাসের মহুর্তেও তিনি সর্বপ্রকার অসদ্ব্যবহার ও অত্যাচারের কথা ভুলিয়া মক্কাবাসীদের প্রতি সর্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করিলেন। যখন তিনি নেতারূপে নগরে প্রবেশ করিলেন তখন মাত্র চার জন আইন অনুযাযী দোষী সাব্যস্ত হইয়া তাঁহার শাস্তির তালিকাভুক্ত হয়। সৈন্যদল তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরন করিয়া শান্ত ও ধীরভাবে নগরে প্রবেশ করিল। কোন গৃহ লুণ্ঠিত হইল না বা কোন স্ত্রীলোক অপমানিত হইল না। এ সম্পর্কে যথাযর্থই উক্তি করা হইয়াছে "জয়ের সমগ্র ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের তুলনা নাই"।অবশ্য প্রতিমাগুলি নিমর্মভাবে চূর্ণীকৃত হইল এবং ইহাদের উপাসকগণ মর্মপীড়ার সঙ্গে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করিল। যে স্বর শুনিয়া একদা তাহারা হাস্য ও বিদ্রূপ করিত প্রতিমাগুলি চুর্ণ করিতে করিতে সেই পুরাতন পরিচিত স্বরে যখন তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, "অসত্য দূরীভূত হইয়া সত্যের আবির্ভাব হইয়াছে, প্রত্যেক অসত্যই অস্থায়ী" তখন তাহাদের সমক্ষে সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তাহাদের দেবদেবীর প্রতিমাগুলি কতই না অসত্য এবং অসহায় প্রমাণিত হইল।[১৯৫]

প্রতিনিধি প্রেরণের বৎসরঃ হিজরী নবম সনে বিভিন্ন দেশীয় নরপালগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে পয়গম্বরের নিকট দূত প্রেরণ করেন। সেজন্য মুসলিম ইতিহাসে এই বৎসরকে 'প্রতিনিধি প্রেরণের বৎস' বলা হয়। মুহাম্মদ (সা.) এর অনুরোধে তাঁহারা প্রধান প্রধান সহচর ও মদীনার প্রধান নগরবাসীগণ এই দূতদিগকে নিজ নিজ আবাসে গ্রহণ করিয়া আরবদিগের চিরসম্মানিত অতিথেয়তার রীতি অনুসারে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন।

১৯৫. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১-১৪

প্রত্যাগমনকালে তাহারা পাথেয়স্বরূপ প্রচুর অর্থ এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী এতদতিরিক্ত উপঢৌকন লাভ করিত। প্রত্যেক গোত্রকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকার দিয়া সর্বদাই একখানি লিখিত সন্ধিপত্র প্রদান করা হইত। নবীদিক্ষিত লোকদিগকে ইসলামের কর্তব্যকার্য শিক্ষা দিবার জন্য এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে কদভ্যাসগুলি বিদুরিত করিবার জন্য প্রত্যাগত অতিথিগণের সহিত একজন করিয়া ধর্মশিক্ষক অবশ্যই যাইতেন।[১৯৬] সে সমস্ত শিক্ষককে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাইতেন তাঁহাদিগকে তিনি নিম্নলিখিত রূপে উপদেশ দিতেন:-

কাহারও প্রতি কঠোর হইবে না; সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবে, কাহাকেও ঘৃণা করিবে না। আহ্ল-ই-কিতাব অনেক ব্যক্তির সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে। তদুত্তরে বলিবে, আল্লাহ্ সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা এবং সৎকার্য করা।[১৯৭]

খ্রিস্টানদের প্রতি সনদ: হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সিনাই পাহাড়ের নিকটস্থ্ সেন্ট কেথারিন নামক মঠের সন্ন্যাসীদিগকে এবং অন্যান্য সব খ্রিষ্টানকে এক সনদ প্রদান করেন। অসাধারণ সহিষ্ণুতার কীর্তি স্তম্ভ স্বরূপ ইহা জগতে এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইহা দ্বারা তিনি খ্রিষ্টানদিগকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা প্রদান করেন। এই সনদের কোন শর্ত ভঙ্গ বা তার অপব্যবহার করিলে মুসলমানদিগকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া তাঁহার আদেশ জারি হয়। এই সনদ দারা খ্রিস্টানদিগকে রক্ষা করিতে, তাহাদিগকে সকল বিপদাপদ হইতে বাঁচাইতে এবং তাহাদের গির্জা ও পুরোহিতদের বাসস্থানসমূহের হিফাজত করিতে নবী মুহাম্মদ (সা.) নিজে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকেও অনুরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। খ্রিস্টানদের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর গ্রহণ করা, কোন ধর্মযাজককে তাঁহার পদ হইতে বহিস্কার করা, কোন খ্রিস্টানকে তাহার স্বধর্ম ত্যাগের জন্য বাধ্য করা, কোন মঠাধ্যক্ষকে তাঁহার মঠ হইতে বিতাড়িত করা, কোন তীর্থযাত্রীকে তাহার তীর্থযাত্রায় বাধা দান করা অথবা গির্জাগলি ধ্বংসা করিয়া তৎস্থানে মসজিদ বা মুসলমানদিগের আবাস নির্মাণ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইল। খ্রিস্টান মহিলাগণ মুসলমাদিগের সহিত বিবাহিতা হইলে স্ব স্ব ধর্মানুসারে চলিতে পারিবে; ধর্মের খাতিরে তাহাদের প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না বা তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইবে না। যদি

১৯৬. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২
১৯৭. সৈয়দ আমীর আলী, অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১১-১২

খ্রিস্টানগন তাহাদের গির্জা বা মঠ সংস্কার বা অন্য কোন ধর্মকার্য সম্পাদনের জন্য সাহায্যপ্রার্থী হয় তাহা হইলে মুসলমানগণ তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।[১৯৮]

৩.৮: হুদায়বিয়ার সন্ধি: রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পররাষ্ট্রনীতির একটি গৌরবোজ্জ্বল দিক

বিশ্ব ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর শাসনকাল একটি যুগন্তকারী বৈপ্লবিক অধ্যায়। ঐ সময়ে সারা বিশ্বে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য পারস্য ও রোম ছিল মরণপথ সংগ্রামে লিপ্ত। ভারতবর্ষ ও চীনে সভ্য জাতিসমূহের শাসন পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও ভুমধ্যসাগরীয় এলাকায় অভ্যাহত ছিল বৃহৎ শক্তিসমূহের ক্ষমতা দখলের সংঘাত। ভুমধাসাগর ঐ সময় কেবল ভৌগোলিক দিক থেকে নয় বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও ছিল পৃথিবীর মধ্যবর্তী এলাকা। ভূমধ্যসাগরের তীরেই গ্রীসের অবস্থান। রোম, মিসর এবং সিরিয়ার অবস্থানও ভূমধ্যসাগরের তীর ঘেষে, এই সাগরেরই উপকূলে শেষ হয়েছে আরবের উত্তরসীমা। আর এই সাগর পর্যন্ত নিজ সাম্রাজ্যসীমা বিস্তারে পারস্য ছিল সদা তৎপর, অল্পকালের জন্য হলেও তারা এক্ষেত্রে বেশ কয়েকবার সাফল্যও অর্জন করেছিল। প্রকৃতি আরবদেশকে স্থাপন করেছে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এ তিনটি মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে। আরবেরই বাসোপযোগী উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যস্থলে অবস্থিত মহানগরী মক্কা। কবির কল্পনায় নয় বরং বাস্তবতার নিরিখেই বলা চলে যে, মহানগরী মক্কা ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলেই অবস্থিত। অতএব ঐ প্রাচীন যুগে বিশ্বব্যাপী কোন আন্দোলন পরিচালনার পক্ষে মক্কাই ছিল সর্বাধিক উপযুক্ত স্থান। ‘হিজায’ ভূমিতে ইউরোপের শীতল, আফ্রিকার উষ্ণ ও এশিয়ার শস্য-শ্যামল পরিবেশের একটি মিশ্রিত রূপ ছিল বিদ্যমান। কাজে কাজেই সেখানকার অধিবাসীরাও ছিল তিনটি মহাদেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সর্বোপরি সামরিক দিক থেকে মক্কা ছিল অতি সুরক্ষিত অঞ্চল।[১৯৯]

হুদায়বিয়ার এ সন্ধি (কুরাইশদের ভাষায় মুসলমানদের পরাজয়)-কে কুরআনুল কারীম মুসলমানদের জন্য এক মহাবিজয় ও এক বিরাট সাফল্য বলে আখ্যা দিয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, বাহ্যত একটা পরিস্কার পরাজয়কে কিভাবে মহাবিজয় আখ্যা দেওয়া হলো? তবে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, ইসলামী সরকার তো পূর্ব থেকেই কুরাইশদের মুখরক্ষাকারী শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল।

---

১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩-১৪
১৯৯. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, ivmj (m) Gi miKvi KvVv‡gv, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪, পৃ.৭৫

Dhaka University Institutional Repository

খায়বর যুদ্ধে কুরাইশরা যাতে হস্তক্ষেপ না করে-এটাই ছিল মুসলমানদের মূল লক্ষ্য। তাদের সে লক্ষ্য পূর্ণ হল। কুরাইশরা হুদায়বিয়া সন্ধির মাধ্যমে তা মেনে নিল বরং বলা যায়, একটু অধিক পরিমাণেই মেনে নিল। আর লেখার মধ্যে পৌত্তলিকতা বা শিরকের কিছু ছিল না। লেখার মধ্যেও মুসলমানদের ক্ষতির কোন কারণ ছিল না। এভাবে 'উমরা' থেকে বাধাদানও ছিল একটি মামুলি ব্যাপার।

কেননা এর কারণে ঐ সময় মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরজ ছিল না। কোন মক্কাবাসী মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে খোদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ভাষ্য হলো,"আমাদের কাছ থেকে যে ব্যক্তি পলায়ন করেবে, সে তো কাফির। তাকে ফেরত নিয়ে আসার আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই। আর কুরাইশাদের কাছ থেকে পলায়ন করে যারা আমাদের কাছে আসবে, সে তো সত্যিকার মুসলমান। অতএব সে যদি তার দেশবাসীর অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উত্তম পুরস্কার দেবেন।"[২০০] দেখা গেল, কিছুদিন যেতে না যেতেই ঐসব নও-মুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের আওতা বহির্ভূত একস্থানে জড়ো হয়ে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে। কুরাইশরা এতে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পযন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দরবারে এসে চুক্তির ঐ শর্তটি বাতিল করে ওদেরকে মদীনায় নিয়ে আসার অনুরোধ জানায়। তৃতীয় শর্ত তো মুসলমানরা নিজেরাই কামনা করেছিল, মুসলমানরা চেয়েছিল কুরাইশরা যাতে তাদের সাথে একটি সন্ধি শর্তে আবদ্ধ হয় এবং তাদের যুদ্ধসমূহে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। মুসলমানদের এই নাজুক পরিস্থিতিতে হুদায়বিয়ার কুরাইশদের পক্ষ হতে সন্ধির জন্যে এগিয়ে আসাটা ইসলামী পররাষ্ট্র নীতির একটি 'মহান বিজয়' ও বিরাট সাহায্য এছাড়া কিছু ছিল না। এই সন্ধির কারণেই মুসলমানদের ভাগ্য প্রশস্ত হয়। তারা আকস্মিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং মুক্ত পরিবেশে তিন বছরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে নিজেদের রাষ্ট্রের বিস্তৃতি প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি করে পূর্ণ আরব উপদ্বীপকে নিজেদের অনুগত করে নেয়। ঐ এলাকা থেকে রোমীয় ও ইরানী প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করে তারা এমন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে, যা পনের বছরের মধ্যেই তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সময় যে শক্তিই তাদের মুকাবিলা করেছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে, আর যারা আনুগত্য স্বীকার করেছে তারা বর্ণ ও ভাষার ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামী মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে সমমর্যাদার অধিকারী হয়েছে।

২০০. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮

হুদায়বিয়ার সন্ধি হচ্ছে এমন একটি ঘটনা যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান কীর্তি আখ্যা দেওয়া চলে। এর মূল ভাষা আরবী গ্রন্থসমূহে কখনো পূরোপুরিভাবে, অবার কখনো আংশিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।[২০১]

হুদায়বিয়া[২০২] সন্ধি ও রাসূল (সা.)-এর দূরদর্শীতাঃ ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের দরুণ হিযরত করে এবং দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী সামরিক ক্ষেত্রে নিপীড়ন হওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর পিতার শহরেও তাঁর মারাত্মক শত্রুদের ঘাঁটি শহরটিতে, অর্থাৎ মক্কা শহরে হজ্ব্রত পালনের জন্য গমন করেন।[২০৩] তৎকালে, উত্তরদিকে সুরক্ষিত দুর্গ খায়বারে তাঁহার জঘন্য শত্রু ইহুদীরা ছিল এবং দক্ষিণে ছিল বিক্ষুব্ধ কিন্তু বিশেষভাবে পরিশ্রান্ত মক্কার কোরেশগণ। খায়বার ও মক্কার মধ্যে একটা আঁতাত আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল। অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত ছিল যে, যদি মুসলমানরা মক্কা অভিমুখে অভিযান করতেন, ইহুদীরা শূন্য ও অরক্ষিত মদিনার উপর হামলা করত এবং মুসলমানরা যদি খায়বারের উপর হামলা করতেন, একই ভয় ছিল মক্কাবাসীর ক্ষেত্রে। মুসলমানরা তখন আদৌ সেরূপ শক্তিশালী ছিলেন না যে, একাধারে দুই দিকে অভিযান পরিচালনা করবেন। অন্ততঃপক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীকে রক্ষা করবার জন্য যথেষ্ট বাহিনী তাঁদের ছিল না, যদি মক্কা বা খায়বারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হত।

In A.H. 6, the holy Prophet had a dream that he had entered the Sacred Mosque at Mecca, (cf.48:27) and he, thereupon, decided to go to Mecca for performing Umra, or the minor piligrimage (cf, 2:196). By convention every Arab was entitled to enter Mecca, Unarmed, for the major or minor pilgrimage (Hajj and Umra): and fighting during certain months, including ziqad, was forbiddeh. The holy Prophet left Medina, with 1400 to 1500 Unarmed followers, in ziqad A.H.6, for performing the Umrah.[204]

---

২০১. ড. মুহম্মদ হামীদুল্লাহ্ (অনু. আবদুল মতিন জালালবাদী), wek bex (mv.) Gi ivR‰bwZK Rxeb, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৫, বিস্তারিত, পৃ.৯৬-১০৬

২০২. "আল-কু'রআনে হুদায়'বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট অর্থাৎ যথার্থ বিজয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে আল্লাহ পাকের এই মহাবাণী যথার্থই সত্য পরিণত হইয়াছিল।" (Bmjvgx wek‡Kvl, ২১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯২)

২০৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, mwnn gmwjg, বাব-হুদায়বিয়াতে হুদায়বিয়ার সন্ধি, বৈরুতঃ দারুল কিতাব ১৯৮৭, খ.৫, পৃ.১৭৩-১৭৫, হাদিস নং-৪৭২৯,

204. Altaf Ahmed Kherie, *Islam a comprehensive Guide-Book*, Ibid, P.116

Dhaka University Institutional Repository

অধিকন্তু, পারস্যবাসীরা (ইরানীরা) বাইযানটাইনদের হাতে কেবলই একটা পরিপূর্ণ পরাজয় বরণ করেছিল এবং এই ছিল আরবের জন্য উপযুক্ত সময়, এর অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান করে আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করার, অন্ততঃপক্ষে ইরানী প্রভাব হতে নিস্কৃতি দিয়ে আরবের প্রদেশগুলিকে মুক্ত করার অর্থাৎ, বাহরাইন, ওমান ও ইয়েমেনকে উদ্ধার করার।

মহানবী (সা.) খায়বার ও ইরান সম্বন্ধে স্বাধীন ইচ্ছা মতো কাজ করতে চেয়েছিলেন। এমন কি তাঁর সম্মানহানিকর কিছু শর্তাবলীও তিনি মানতে রাজি ছিলেন। এ হল এক দিক।

পক্ষান্তরে, সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামামা এমন কি ইয়েমেনের খাদ্যদ্রব্যের বাজার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, চারদিকে ইসলামে দীক্ষিত গোত্রসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাদের বন্ধুবান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত অনাবৃষ্টিতে ভুগে, মহানবী (সা.) যখন দুর্ভিক্ষে সাহায্যকল্পে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রার মতো মোটা অংকের সাহায্য দান করে ইয়ামামার রবি শস্যের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন এবং সন্ধিকালে শত্রুদের জাতীয় পবিত্র গৃহদর্শন করে অনেকের মনোরঞ্জন ও সহানুভূতি লাভ করেছিলেন, তখন এ আশা করা গিয়েছিল যে, এই সফল অবস্থার প্রেক্ষিতে কুরাইশরা অনায়াসে সন্ধি করবে, যদি তাদের মুখ রক্ষা করার মতো কিছু শর্ত সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২০৫]

এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে মহানবী (স.) ১৪০০ সৈন্যসহ মক্কার উপকণ্ঠে হুদায়বিয়াতে শিবির স্থাপন করেন। এবং দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর নিম্নলিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়ঃ

সন্ধির মর্ম

তোমার নামে হে আল্লাহ!

এই স্থির হলো, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ ও আমার এক পুত্র সুহায়েলের মধ্যেঃ

তাঁরা উভয়েই সম্মত হন, জনগণের তরফ হতে দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং দশ বৎসরকাল জনগণ শান্তিতে বাস করবে এবং পরস্পর যুদ্ধ হতে বিরত থাকবে।

এবং যে কেউই হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সহচরগণের (সাহাবীগণ) ভিতর হতে হজ্জ বা উমরার জন্য কিংবা আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে (অর্থাৎ ব্যবসায় উপলক্ষ্যে),– তুলনীয় কুরআন

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (١٠)

২০৫. সুলায়মান ইব্নে আহমাদ ইবনে আইয়ুব আবুল কাশেম আত-তাবারানী, gÕRvgj AvImvZ, খ.২, পৃ.২৭

অর্থ: "সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করিবে, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।"[২০৬]

ইয়েমেন বা তায়েফ হয়ে মক্কা যাবে, সেই ব্যক্তির জান-মাল নিরাপদে থাকবে।

এবং যদি কুরাইশদের মধ্যে কেউ তার অভিভাবকের (মওলার) অনুমতি ব্যতিরেকে হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর নিকট আসে, তাহা হলে তিনি (মহানবী (স.) তাকে কুরাইশদের নিকট প্রত্যর্পণ করবেন; এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট হতে কেউ কোরেশদের নিকট এলে তারা তাকে তাঁর নিকট ফেরত দিবে না।

এবং আমাদের ভিতর উভয় পক্ষই শর্তাবলী পালন করতে বাধ্য থাকবে।

এবং যে কেউ হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পক্ষে যোগদান করতে চায় সে তা করতে পারবে; এবং যে কেউ কোরেশ পক্ষে যোগদান করতে চায়, করতে পারবে।

– অতঃপর বনু খুযা'আ দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলঃ আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর দলের সঙ্গে যোগ দিতে চাই এবং বনু বকর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলঃ আমরা কুরাইশদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক।[২০৭]

এবং আপনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই বৎসর কোরেশদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবেশ করবেন না; এবং আগামী বৎসরে আমরা আপনাদের নিকট হতে অন্যত্র যাব এবং আপনি সহচরগণ সহ প্রবেশ করে তিন রাত্রি অবস্থান করবেন, আপনাদের সংগে উষ্ট্র চালকের অস্ত্র মাত্র থাকবেঃ কেবল তরবারি; তরবারি ব্যতীত অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ আপনি করবেন না।

এবং কুরবানীর প্রাণী (আপনি যা আনবেন) তা কুরবানী করা হবে যেখানে আমরা তাদেরকে পেয়েছিলাম (অর্থাৎ হুদাইবিয়াতে) এবং আপনি সেগুলিকে আমাদের নিকট মক্কায় পাঠাতে পারিবেন না। সম্ভবতঃ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সীল মোহর ও সুহায়েলের সীল মোহর।

স্বাক্ষীগণ

---

২০৬. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

২০৭. আবু 'আব্দুলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযবীনী, mbv‡b Be‡b gvRvn, বাব-ফি আবদুল মুশরিকিনা ইয়ালহিকুন; খ.৩, পৃ১৭, হাদিস নং ২৭০২।

মুসলমান পক্ষ ঃ হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.), আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.) , আবদুল্লাহ, ইবনে সুহায়েল (রা.), ইবনে আমর সাদ ইবনে আবি ওয়াককাস (রা.), মাহমুদ ইবনে মাসলামা (রা.) প্রমুখ।

মক্কাবাসীর পক্ষঃ মিকরাযান ইবনে হাফস।

লেখক ও স্বাক্ষী ঃ আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)।

চুক্তিটির দুই কপি প্রস্তুত করা হয়। এক কপি মহানবী (সা.) কর্তৃক রক্ষিত হয় এবং অন্য কপিটি কোরেশদের প্রতিনিধি সুহায়েলকে দেওয়া হয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশ দূত বা প্রতিনিধিকে আটকে রেখেছিলেন যতক্ষণ মক্কায় অন্যায়ভাবে আটক মুসলমান দূত প্রত্যাবর্তন করেন নাই।

উভয় পক্ষ সম্মতি দান করার পর কিন্তু দস্তখত হওয়ার পূর্বে কোরেশ দূতের পুত্র, যে ইসলাম কবুল করার দরুণ নির্যাতিত হয়েছিল তার পিতার নিকটে অন্তরীণ অবস্থা হতে পলায়ন করে মুসলমান শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাকে ফেরত দেওয়ার দাবী করায় মহানবী (স.) তাকে বহিষ্কার করেন এবং বলেন যে, চুক্তি কার্যকরী হবে সম্মতি জ্ঞাপনের পরই প্রকৃত বাস্তবায়নের প্রতীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নাই।[২০৮]

মহানবী (সা.) কেবল পুরুষ মানুষ ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেন এবং তাঁহার হুদাইবিয়া ত্যাগের পূর্বে যখন কিছু স্ত্রী-লোকের ক্ষেত্রে অনুরুপ ব্যাপার ঘটে তখন তিনি তাদের আইনের অন্তর্ভূক্ত করেন নাই। অর্থাৎ তাদেরকে ফেরত দেন নাই। কুরাইশগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এতে সম্মতি দান করেন। মুসলিম শিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত নব দীক্ষিত মুসলমান স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে, মহানবী (স.) তাদের স্বামী থাকলে তাদেরকে তাদের স্ত্রীদিগকে দেওয়া বিবাহের যৌতুকের উপর অধিকার দান করতেন, যাহা সাধারণ কোষাগার বা বায়তুলমাল হতে তাদের নামে জমা হত।

এক তরফা ফেরত মক্কাবাসীদের পক্ষে ব্যয় বহুল ও অসুবিধাজনক প্রমাণিত হয়; এবং তাদেরই অনুরোধে মহানবী (সা.) এই শর্তটি পরিবর্তন বা বাতিল করে দেন।

আরও কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, এলাকা বহির্ভূত শিবির ও সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে উভয় পক্ষই স্বীকৃতি দান করে।

২০৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, C॥¸ ³, হাদিস নং-৪৭৩৩

মহানবী (স.) এর মক্কায় অবস্থানের তিনদিনের মেয়াদকে বর্ধিত করার অনুরোধ করা হয়, কিন্তু মহানবী (সা.) পরবর্তী বৎসর মক্কায় গমন করলে কুরাইশগণ সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের জাতীয় পবিত্র গৃহ দর্শন করার অনুমতি আদায়। ঘটনাক্রমে দশ বৎসরের মেয়াদের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে উভয়ের এলাকায় ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাতায়াতের অধিকার বা ছাড়পত্র দেওয়া হয়। যা উল্লেখিত আছে তদানুসারে মৌলিক চুক্তি-স্বাক্ষরকারী পক্ষের মতো বিভিন্ন গোত্র একই অধিকার ও কর্তব্যসমূহ লাভ করবে।

একটি শর্ত, যা মহানবী (সা.) নিজের সিলমোহর দেওয়ার পূর্বে যোগ দিলেন তা এই যে, "তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যসমূহ হবে পারস্পরিক ক্ষেত্রে সমান।" [২০৯]

মহানবী (সা.) ও মুসলমানগণ কর্তৃক মদিনা হিযরতকালে ফেলে যাওয়া ধনসম্পত্তি যা মক্কাবসীগণ দখল করেছিল, চুক্তিটি সে বিষয়ে নীরব ছিল এবং নীরবে মুসলমানরা শত্রুদের অধিকারের স্থিতিবস্থা মেনে নেয়।

রাসূল (সা.) এর সীরাত থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি হুদায়বিয়ায় কুরাইশদের সাথে কৃত চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলেছিলেন। চুক্তির আওতায় কেউ মদীনা থেকে মক্কায় চলে এলে তাকে সেখানে থাকতে দেয়া হতো। অপরপক্ষে কেউ মক্কা থেকে পালিয়ে আসলে রাসুল (সা.) তাকে গ্রহণ করতে পারতেন না, তাকে পুনরায় মক্কায় ফেরৎ পাঠাতে হতো। পরের ঘটনায় মক্কা থেকে কোন মুসলিমকে মুক্ত করে দেয়া হতো আর সে যদি মদীনায় থাকতে চাইতো চুক্তি ভঙ্গের ভয়ে তাকে থাকতে দেয়া হতো না। সাহাবীদেরকে হতবাক করে দিয়ে রাসূল (সা.) লোকটাকে ফেরৎ পাঠাতেন এ মর্মে যে, চুক্তিতে কোন ব্যতিক্রমী কিছু হতে পারে না। কুরাইশ বংশগুলো রাসূল (সা.) এর সাথে হুদায়বিয়ার কৃত চুক্তি যখন ভঙ্গ করল তখন রাসূল (সা.) তার সেনাবাহিনীকে মক্কার দিকে অভিযানে পাঠালেন।

বদরের যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে মক্কাবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন (খৃস্টাব্দ ৬২৪-৩০) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক মর্যাদা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে তিনি মদিনার আশেপাশের গোত্রগুলোকে ইসলামের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস

২০৯. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২

পান।[২১০] ইবনে হিশামের ভাষায়, বদরের সামরিক সাফল্যের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রকৃতপক্ষে হেজাযের একচ্ছত্র শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। ওহুদের যুদ্ধের (খৃস্টাব্দ ৬২৫) নগণ্য পরাজয় তাঁর ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ, কিছুকাল পরেই খন্দকের যুদ্ধে (খৃস্টাব্দ ৬২৭) তিনি আবার এক সুদূরপ্রসারী সাফল্য লাভ করেন।

ঠিক এই সময়েই ইহুদীদের নাযীর গোত্রের ষড়যন্ত্রের ফলে তাদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রীচুক্তি বাতিল হয়ে যায়। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ইহুদীগণ (নাযীর গোত্র) কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবননাশের ষড়যন্ত্রই এই চুক্তি বাতিল হওয়ার প্রধান কারণ। অবশ্য চক্রান্তকারী বানু নাযীর ছাড়া চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ইহুদী গোত্রের সঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখেন। চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বানু নাযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের পরাজিত করেন। কিন্তু এর পরও কিছুকাল ইহুদীদের সঙ্গে বিরোধের অবসান ঘটেনি; কারণ, অবশিষ্ট ইহুদীগণ বিশেষ করে স্ব-ধর্মাবলম্বী বানু নাযীরের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল। কোরায়জা গোত্রও এই সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মদিনার মুসলমানদের সঙ্গে (ইহুদীদের) মৈত্রীচুক্তির ফলে ইহুদীদের এই শত্রুতার অবসান ঘটে।[২১১]

হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রথমতঃ তাঁর পরম শত্রু কোরেশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে মক্কা বিজয়ের দ্বারা তাঁর জীবনের সাফল্যকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মক্কায় হজে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছেন। হজব্রত পালন এই সমঝোতায় পৌঁছানোর আশু কারণ হলেও প্রকৃতপক্ষে তখন উভয়পক্ষের অবস্থা থেকে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও তাঁদের মধ্যে ক্ষমতার একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। কোরেশদের অবস্থা তখনো এমন পর্যায়ে ছিল যে, মদিনার শাসন-কর্তৃপক্ষের পক্ষে তাদের পরাভূত করা সহজ-সাধ্য ছিল না। বিশেষ করে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে। অন্যদিকে মক্কাবাসীগণ বদর ও খন্দকের যুদ্ধে উপর্যুপরি দু'বার মুসলমানদের হাতে চরমভাবে পরাজিত হয় এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) সিরিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। এর ফলে কুরাইশদের বাণিজ্য-কাফেলা প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অন্ততঃ স্বল্পকালের জন্যে হলেও উভয়পক্ষ একটা

---

২১০. সুলায়মান ইব্নে আহমাদ ইবনে আইয়ুব আবূল কাশেম আত-তাবারানী, gÖRvgj Kwei, খ.২, পৃ.৩০, হাদিস নং-১১৮৭

২১১. Bmjvgx wek¦Kvl; ঢাকা: ইফাবা; 1998, খ.২৬, পৃ.১০৩

শান্তিচুক্তির জন্য বিশেষভাবে আগ্রহশীল হয়ে ওঠে। সে ঘটনাবলী শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তা হচ্ছে সংক্ষেপে এই ঃ

রাসূল মুহাম্মদ (সা.) তাঁর মুষ্টিমেয় সংখ্যক অনুগামী নিয়ে হজ্ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কুরাইশগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আশঙ্কা ও সন্দেহ পোষণ করে পথিমধ্যেই তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশদের নিকট শান্তির প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত করেন। এতদানুযায়ী তিনি তাঁর জামাতা ও ভাবী তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফান (রা.) কে তাঁর শান্তি প্রস্তাবসহ কোরেশদের নিকট প্রেরণ করেন। মক্কাবাসীগণ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সঙ্গে শান্তিচুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্যে সুহাইল ইবনে-আমরকে প্রেরণ করে। এই আলাপ-আলোচনার ফলেই 'হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি' নামে অভিহিত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। হযরত রাসূল (সা.) এর চাচাতো ভাই ও ভাবী চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে-আবু তালেব (রা.) চুক্তির দলিল লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সম্পাদকের কাজ করেন। নীচে চুক্তিটির[১১২] বিবরণ দেয়া হল ঃ

'হে আল্লাহ! তোমার নামে শুরু করছি। এ চুক্তিটি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সা.) শান্তিপূর্ণভাবে সুহাইল ইবনে আমরের সঙ্গে একমত হয়ে সম্পাদন করেছেন :

"তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে একমত হয়ে দশ বছর কালের জন্য যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে নিয়েছেন; পরস্পরের আক্রমণ থেকে (উভয়পক্ষের) জনসাধারণ নিরাপদ থাকবে; "কোরেশদের কোন লোক তার ওয়ালীর (অভিভাবক) অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদ (সা.)-এর দলে যোগদান করতে চাইলে, তাকে তাদের (কোরেশদের) কাছে প্রত্যার্পণ করতে হবে; কিন্তু মুহাম্মদের (সা.) কোন অনুগামী কোরেশদের দলে যোগদান করতে চাইলে, তাকে কোনরূপ বাধা দেয়া হবে না;

"আমাদের উভয় দলের পক্ষেই অসদাচরণ ও অবৈধ কার্যকলাপ নিষিদ্ধ; এবং আমাদের মধ্যে স্বপক্ষ ত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতার কোনরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে পারবে না;

"যারা (যেসব লোক) মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে যোগদান করতে এবং তাঁর চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তারা অবাধে তা করতে পারবে; এবং যারা কোরেশদের সঙ্গে যোগদান করতে এবং তাদের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তারাও অবাধে তা করতে পারবে।"

---

১১২. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩

Dhaka University Institutional Repository

এই চুক্তির ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সদিচ্ছা সম্পর্কে মক্কাবাসীদের মনে আস্থা সৃষ্টির জন্য কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত করেন। এঁরা চুক্তির শর্তসমূহ পালন ও অক্ষুণ্ন রাখার শপথ গ্রহণ করেন। এই সাক্ষীদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বকরা (রা.), উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রা.) ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)। এই চুক্তির ফলে ইসলামের আরেকটি বিরাট বিজয় সূচীত হয়। কারণ, এই চুক্তির মাধ্যমেই অবশেষে অভিজাত কোরেশ গোত্রের নেতৃবৃন্দ মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শাসন-কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং গৌণভাবে হলেও ইসলামকে মদিনার রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। এতে মক্কায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করে। অথচ মদিনায় হিজরতের পূর্বে এক সময়ে এই মক্কাতেই তাঁকে অকথ্য লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল।[২১৩]

হুদায়বিয়ার চুক্তির ফলে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম এই রীতির অনুবর্তন হয় যে, মুসলিম কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী মেয়াদের ভিত্তিতে মুশরিকদের (অংশীবাদী) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। এ ধরনের চুক্তির মেয়াদ সম্পর্কে আইনবিদদের মধ্যে অবশ্য মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আইনবিদ হুদায়বিয়ার চুক্তির অনুরূপ দশ বছরের মেয়াদ অনুমোদন করেছেন। আবার কেউ বা দু-তিন বছরের মেয়াদের কথা বলেছেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এসব চুক্তি দু-তিন বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়নি। অবশ্য আইনবিদগণ এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শত্রুদের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে শান্তিচুক্তি আবদ্ধ হওয়া ইসলামের মূল স্বার্থের পরিপন্থী নয়।

হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তিও কার্যতঃ দুবছরের মধ্যে লঙ্ঘন করা হয়। ইতিহাসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের ওপর কোরেশদের অবৈধ আক্রমণের ফলেই চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। চুক্তির বিধানে "যারা মুহাম্মদ (সা.) এর দলে এবং তার মৈত্রীতে যোগদান করতে চাইবে, তারা অবাধে তা' করতে পারবে" বলে যে স্বীকৃত শর্তটি রয়েছে, এ হামলার দ্বারা কোরেশগণ সরাসরি তা লঙ্ঘন করে। এরপরও অবশ্য কোরেশদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আলাপ-আলোচনা চালানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই সময় কুরাইশদের তুলনায় মুসলমানগণ অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে; ঠিক এই অবস্থায় মুসলমানদের ওপর একটা অন্যায় হামলা দ্বারা তারা একটা বৃহত্তর শক্তি পরীক্ষাকে আসন্ন করে তোলে। নিজের অনুগামীদের ওপর কুরাইশদের এই অহেতুক আক্রমণে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্তক্ষুব্ধ হন। কিন্তু তবুও তিনি তাদের সঙ্গে একটা আপোষ রফার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে মুসলমানগণ মক্কা

২১৩. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, ১৫৪-১৫৮

অভিমুখে সামরিক অভিযান পরিচালনার সংকল্প করেন।[২১৪] হিজরী ৮ সালে (খৃস্টাব্দ ৬৩০) তাঁরা মক্কা দখল করেন। এই সময় কোরেশগণ অত্যন্ত হীনবল ও শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে তারা নব বলে উদ্দীপ্ত মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করতে কিংবা তাদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সাহস পেল না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বিজয় পতাকা হস্তে মুক্ত তোরণ দ্বার দিয়ে অবাধে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

মক্কা বিজয়ের ফলে দুই নগর-রাষ্ট্রের বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাপ্তি ঘটে। আর এর ফলে সমগ্র হেজাযে ইসলামের সুদৃঢ় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মিশন এক বিস্তৃততর লক্ষ্যপানে সম্প্রসারিত হয়।[২১৫]

৩.৯: সন্ধির আইনগত প্রকৃতি

সন্ধি (মুহাদানা বা মুওয়াদা) হল এক রকমের আকদ বা বন্ধন; চুক্তিতে কোন একটি বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করার ফলে তার আইনগত ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়। মুসলিম আইনের আকদ (চুক্তি) পশ্চিমী আইনের চুক্তির (contract) চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আকদের বাহ্যিক আকার ও পদ্ধতি যাই হোক না কেন, ঐক্যমত বা মনের মিলকেই মৌলিক জিনিস বলে মনে করা হয়। একদল প্রস্তাব (ইজাব) করেন আর অপর দল তা গ্রহণ (কবুল) করেন, ফলে মনের সমন্বয় সম্ভব হয়। চুলচেরা বিচারে এতে পারস্পরিক সুবিধা থাকুক আর নাই থাকুক, আইনের চোখে চুক্তিটি বৈধ ও কার্যকরী বলে সাব্যস্ত হবে।[২১৬]

চুক্তি-সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে করে এর শর্ত ও ধারাগুলো বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিপালিত হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। আল-কোরআনে মুসলিমকে 'ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা রাখবার জন্য' আহ্বান করা হয়েছে ।

وُ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ[৮৪]
وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٩٣)

২১৪. আলী ইব্‌নে উমর আবুল হাসান, আদদারে কুতনি আল বাগাদাদী, mbv‡b 'v‡i KZwb, বাব- বাবুল মাওয়াকিত, খ.২, পৃ.২৪৪, হাদিস নং-৩৬

২১৫. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, Bmjv‡g cwZi ÿv †KŠkj ('হাদীসে দেফা' নামক বিখ্যাত উর্দু গ্রন্থের বাংলা তরজমা), ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮৪, পৃ.৭৮

২১৬. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

অর্থ: "ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হইবে।"[২১৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا
فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (۴)

অর্থ: "তবে মুশরিকদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যাহারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।"[২১৮]

তাই চুক্তির অবশ্য পালনীয় মৌলিক প্রকৃতি আকদের অন্তর্নিহিত অবস্থা প্রকাশ করে। সব মুসলিম আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ইসলাম ইমামকে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চুক্তির ব্যাপারে সব দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।[২১৯]

সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা

ইসলাম ও অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর সাধারণ সম্পর্ক বিরোধগত। তবু প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ করে কোন ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের পরাজয়ের ফলে শত্রু-পক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বিরোধী নয়। আল্লাহ'র বিধানে অমুসলিমদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া অনুমোদন করা হয়েছে:

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (۷)

অর্থ: "আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করিয়া বলবৎ থাকিবে? তবে যাহাদের সঙ্গে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পারিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে, যদি তাহারা তোমাদের

২১৭. আল-কুরআন, ১৬ : ৯৩
২১৮. আল-কুরআন, ৯ : ৪
২১৯ . মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬

চুক্তিতে স্থির থাকিবে তোমরাও তাহাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।"[২২০]

প্রচলিত ব্যবহার-বিধি আল-কোরআনের এই নির্দেশেরই সমর্থন জানিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কাবাসীদের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করে এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এ চুক্তিটির শর্তাদি ও কার্যকালের মাধ্যমে মুসলিম আইনবিদগণ পরবর্তী যুক্তিগুলোর দিক-নির্দেশ করেছেন। একটি হাদিসে রাসূল (স.) বলেছেনঃ "বাইজান্টীয়গণ তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে।" কাজেই আল-কোরআন ও হাদিস অনুসারে আইনবিদগণ এ সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিম-স্বার্থ রক্ষিত হলে শত্রু পক্ষের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করা বিধিসম্মত এবং এ চুক্তির ধারাগুলো পালন করতেও মুসলমানরা বাধ্য থাকবেন। প্রাথমিক খলিফাদের কার্যধারা ও আইনবিদদের সর্বসম্মত অভিমত বা ইজমার ফলে চুক্তি সম্পাদন শরিয়তের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়েছে।

রাসূলে আকরাম (সা.)-এর হাতেই চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা ছিল এবং পরবর্তীকালে এ ক্ষমতা তাঁর খলিফাদের হাতে গিয়ে বর্তায়। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এ ক্ষমতা প্রায়ই যুদ্ধরত সেনাপতিদের দেয়া হত।[২২১]

৩.১০: সন্ধি বা চুক্তির বিষয়বস্তু

সন্ধি বা চুক্তির বিষয় বস্তু কেমন হতে পারে, এমন বিষয়ে পবিত্র কোরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে অনেক আয়াতের উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআন মাজিদে সর্বাপেক্ষা বড় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا تَدَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوۡهُ ؕ وَلۡيَكۡتُبْ بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبٌۢ بِالۡعَدۡلِ ۚ وَلَا يَاۡبَ كَاتِبٌ اَنۡ يَّكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلۡيَكۡتُبْ ۚ وَلۡيُمۡلِلِ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَـقُّ وَلۡيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـئًا ؕ فَاِنۡ كَانَ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَـقُّ سَفِيۡهًا اَوۡ ضَعِيۡفًا اَوۡ لَا يَسۡتَطِيۡعُ اَنۡ يُّمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهٗ بِالۡعَدۡلِ ؕ وَاسۡتَشۡهِدُوۡا شَهِيۡدَيۡنِ مِنۡ رِّجَالِكُمۡ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُوۡنَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ وَّامۡرَاَتٰنِ مِمَّنۡ تَرۡضَوۡنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنۡ تَضِلَّ اِحۡدٰٮهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحۡدٰٮهُمَا الۡاُخۡرٰى ؕ وَلَا يَاۡبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوۡا ؕ وَلَا تَسۡـَٔمُوۡۤا اَنۡ تَكۡتُبُوۡهُ صَغِيۡرًا اَوۡ كَبِيۡرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمۡ اَقۡسَطُ عِنۡدَ اللّٰهِ وَاَقۡوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدۡنٰٓى

---

২২০. আল-কুরআন, ৯ : ৭
২২১. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫

اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ۬ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٢٨٢)

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়; লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। যেমন আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়-বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাযী তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাইয়া দিবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে। ইহা ছোট হউক অথবা বড় হউক, মেয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহর নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর, কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।"[২২২]

কুরআন মাজিদ হতে দুই-একটি উদ্ধৃতি এ বিষয়টিকে পরিস্ফুট করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

فَلَا تَهِنُوْا وَ تَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ (٣٥)

অর্থ: "সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না।"[২২৩]

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦١)

২২২. আল-কুরআন, ২ : ২৮২
২২৩. আল-কুরআন, ৪৭ : ৩৫

অর্থ: "এবং যদি তারা শান্তি চায় আপনিও হে মুহাম্মদ! শান্তির প্রতি অনুরাগী হোন। জেনে রাখুন তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা।"[২২৪]

ইহা লক্ষ্যণীয় যে, বিজয়ী মুসলমানকে শান্তি-প্রস্তাব দিতে হবে, শত্রুর বিনাশ সে কামনা করবে না। মুসলমানের জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র পতাকার বিজয়, কোনো পার্থিব লাভ নয়।

চুক্তি ও অংগীকারের ক্ষেত্রে কাফিরদের নীতি এবং মুসলিমগনের করণীয়

যারা চিরদিনের জন্য কুফরে নিমজ্জিত হয়েছে, পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ ও ওয়াদা খিলাফীতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তারা মহান আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম প্রাণী। ওয়াদা খিলাফী ও বিশ্বাস হননে ফিরাউনী গোষ্ঠীর এমনই চরিত্র ছিল'।[২২৫]

'আর যখন তাদের উপর শাস্তি আসত, তারা বলত, হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সাথে তাঁর যে অংগীকার রয়েছে তদনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর হতে শাস্তি অপসারিত কর,তবে আমরা তো তোমার উপর ঈমান আনবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে যেতে দেব। যখনই তাদের উপর হতে শাস্তি অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য, যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভংগ করত'[২২৬] প্রিয় নবী (সা.) এর সময় বনূ কুরায়যা ইয়াহূদী গোত্রগুলোরও এ চরিত্রই ছিল। তারা তাঁর সঙ্গে অংগীকার করত, আমরা পবিত্র মক্কার মুশরিকদের সাহায্য করব না। কিন্তু পরে তাদের ঠিকই সাহায্য করত। জিজ্ঞাসা করলে বলত, আমাদের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ ছিল না। এমনই তারা বরাংবার করত। সামনে বলা হয়েছে এরূপ বিশ্বাসঘাতকদের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে।

৩.১১: মহানবী (স.) এর সময় নিরপেক্ষতার চুক্তিসমূহ

কুরআনে মাজিদের বিধানের পরেই প্রাচীন যুগের কার্যকলাপের গুরুত্ব বলা যেতে পারে। যা কিছু অদ্ভুত ঘটনা এবং কৌতূহলের উদ্রেক করতে পারে।

ঘটনাবলী

২২৪. আল-কুরআন, ৮ : ৬১
২২৫. Bmjvgx wek‡Kvl; ঢাকা: ইফাবা; 1998, খ.৮,পৃ.৬৩
২২৬. আল-কুরআন, ৭ ঃ ১৩৪-১৩৫

ক. ইহুদী বনু নাযির গোত্রের সংগে বনু গাতফান গোত্রের মিত্রতা ছিল এবং পার্শ্ববর্তী বনু কুরায়যার পক্ষে বনু নাযির সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিল। এসব শক্তিশালী মিত্রের সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে বনু নাযির চতুর্থ হিজরীতে মুসলমান ও তাদের মিত্রদের পূর্ব চুক্তিবদ্ধ রক্তপণ দেওয়ার জন্য মহানবী (সা.) এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাদের দুর্গে তারা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। বনু কুরায়যা নিরপেক্ষ ছিল এবং বনু নাযির[২২৭]কে কোন সাহায্য করে নাই।[২২৮]

খ. মদীনা ছাড়তে বাধ্য হয়ে বনু নাযির খায়বারে হিযরত করতঃ বসবাস স্থাপন করে। মক্কাবাসী ও অন্যান্যদের সংগে তাদের চক্রান্তের দরুণ মহানবী (সা.) গোড়াতেই বিপদের মুলোৎপাটনের জন্য সচেষ্ট হন এবং খায়বারের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। অন্য পথে তিনি বনু নাযিরদের মিত্র গাতফানের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন– তাদেরকে মুসলিম ও ইহুদীদের সংঘাতের মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করে। গাতফান গোত্র প্রত্যুত্তরে বলে, 'এরূপ একটি বিপদের সময় তারা তাদের বন্ধুদের ত্যাগ করতে পারবে না।

তাদের ঘাঁটির বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কূটনৈতিক অভিযান পরিচালিত হলো এবং তাদের গৃহাভ্যন্তরে থাকতে ও খায়বারের বিরুদ্ধে মহানবী (সা.) এর ইচ্ছামতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেওয়ায় বাধ্য করল।

গ. মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর আরবের কিছু অংশে ধর্মদ্রোহিতাজনিত অশান্তির মধ্যে কায়েস নামক জনৈক ইয়েমেনী সর্দার অন্য এক সর্দার যুলকুলার নিকট এক বার্তা প্রেরণ করে এই মর্মেঃ

'আবন্য (ইয়েমেনে বসবাসকারী পারস্যবাসী) তোমাদের দেশে অনধিকার প্রবেশকারী এবং তারা বিদেশ হতে আগত। যদি তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তোমাদের উপরও প্রভুত্ব করবে। অতএব তাদের সর্দারদের হত্যা করা এবং আমাদের দেশ হতে অন্যান্যদের বিতাড়িত করা আমি ন্যায়সংগত মনে করি।'

যা হোক, যুলকুলা ও তার অনুসারিগণ তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তার সংগে সহযোগিতাও করে নাই, এবং আবন্যকেও সাহায্য করে নাই; বরং তারা নিরপেক্ষ রইল এবং বলল ঃ এসবের সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; তোমরা যা ইচ্ছা করো।

---

২২৭. Bmjvgx wek‡Kvl; ঢাকাঃ ইফাবা; 1998, খ.১৫, পৃ. ১০৭
২২৮. আল্লামা শিবলী নুমানী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮

ঘ. মদীনায় আল-জারুদ ইসলাম কবুল করেছিল। মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর তার গোত্র আবদুল কায়েসও বিদ্রোহের ইচ্ছা পোষণ করেছিল, সে তার লোকজনকে সর্তক করে দেয় এবং তার ফলে এই গোত্রটি ইসলামের প্রতি অনুগত থেকে যায়; ফলে বাহরাইনের মুসলমানদের ও রাবেয়ার বাকী গোত্রগুলির মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধে তাতে তারা অংশগ্রহণ করে নাই। তাদের এই নিরপেক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[২২৯]

তারা যদি নিজেরা অংগীকার করার পর নিজেদের শপথ ভংগ করে এবং তোমাদের দীনের নিন্দা করে, তবে কুফরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধে কর, নিশ্চয়ই তাদের শপথ কোন শপথই নয়, যাতে তারা নিবৃত্ত হয়।

অর্থাৎ যদি ওয়াদাও (প্রতিশ্রুতি) ভেঙ্গে ফেলে (যেমন বনূ বক্‌র চুক্তি লংঘন করে বনু খুযাআর উপর হামলা চালায় এবং কুরায়শও সে হানাদারদের সাহায্য করে) এবং কুফ্‌র হতে নিবৃত্ত না হয়ে উল্টো সত্য দীন সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও স্পর্ধমূলক ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত থাকে, তবে বুঝে নেবে এ ধরণের লোক কুফরের সর্দার ও নেতা। তাদের তৎপরতা দেখে ও তাদের কথা শুনে বহু দুশ্চরিত্র ও নির্বোধ প্রকৃতির লোক তাদের অনুসারী হয়ে যায়। এরূপ দলপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তাদের কোন কথা ও শপথ এবং ওয়াদা ও অংগীকার আর বাকি থাকেনি। তোমাদের হাতে কিছুটা শাস্তি পেয়ে তারা অন্যায় ও অবাধ্যতা হতে নিবৃত্ত হলেও হতে পারে।[২৩০]

তারা উভয়েই দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বীকৃত এবং এই সময়ের মধ্যে জনগণ শান্তি উপভোগ করবে এবং পারস্পরিক সংঘাত হতে বিরত থাকবে ..... এবং আমরা শর্তাবলী পালন করতে বাধ্য এবং নিরপেক্ষতা ভংগ করে কোনো গোপন সাহায্য করা ও বিশ্বাস ভংগ করে কোনো কাজ করা চলবে না।'

কুরাইশরা চুক্তি ও অংগীকার ভেঙ্গে ফেলেছিল। কারণ, চুক্তির বিরুদ্ধে তারা বনূ খুযাআর মুকাবিলায় বনূ বক্‌রকে সাহায্য করে। হিজরতের আগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কে পবিত্র মাতৃভূমি মক্কা হতে বহিষ্কার করার চক্রান্ত করে এবং সে চক্রান্তের কারণেই তিনি পবিত্র মক্কা ছেড়ে বের হন। পবিত্র মক্কাতে নিরাপরাধ নিরীহ মুসলিমগণের উপর যুলুম-নির্যাতনের সূচনা করে। এবং আবূ সুফ্‌য়ানের বাণিজ্য দল নিরাপদে ফিরে গেলে তারা মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দর্পভরে বদর প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হয়। হুদায়বিয়ার

---

২২৯. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, nRiZ ivm‡j Kwig (mv.) Rxeb I wkÿv, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৫
২৩০. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধির পরও তারা চুক্তি ভংগের সূচনা করেছিল। কেননা, মুসলিমগণের মিত্র বনূ খুযাআর বিরুদ্ধে সর্বদা বনূ বক্‌রকে উসকাতে থাকে এবং অস্ত্র দিয়ে তাদের সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত মুসলিমগণ তাদের সঙ্গে লড়াই করে এবং মক্কা মুকাররমাকে মুশরিকদের কবল থেকে মুক্ত করে। এর উদ্দেশ্য এই প্রতীয়মান হয় যে, যে-কোনও সম্প্রদায় এ ধরণের কার্যকালাপ করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে মুসলিমদের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়। তাদের সামরিক শক্তি ও জনবলের ভয় যদি মনে জাগে, মুসলিমগণের তো সবচেয়ে বেশী ভয় আল্লাহ্‌কে করা উচিত। অন্তর মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানী হতে দূরে থাকবে, তার শাস্তি ও গযবের ভয়ে প্রকম্পিত থাকবে, এটাই ঈমানের দাবী। লাভ-ক্ষতি সব মহান আল্লাহ্‌রই হাতে। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন মাখলুককেও সামান্যতম ইষ্ট-অনিষ্টও সাধন করতে সক্ষম নয়।[২৩১]

সন্ধিসমূহ

যে সমস্ত চুক্তিতে নিরপেক্ষতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে; অথবা রাষ্ট্রীয় দলিল বা নথিপত্র– যাতে নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়ে থাকে, সেগুলি (ইসলামের প্রারম্ভকালের) প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। ঐগুলির মধ্যে কিছু অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

ক. যখন মহানবী (সা.) মদীনায় হিযরত করেন ও সেখানে একটি নগররাষ্ট্র গঠন করেন তখন তিনি বিশেষ করে মক্কা হতে সিরিয়ার পথে এবং মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী অমুসলিম আরব গোত্রদের সংগে মিত্রতা স্থাপন করে মুসলিম শক্তিকে সংহত ও সুদৃঢ় করবার প্রয়াস পান। নিম্নলিখিত চুক্তিটি বনু দামরা গোত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে সম্পাদিত হয়েছিলঃ

‘তিনি (মহানবী) (সা.) বনু দামরাকে হামলা করবেন না কিংবা তারাও তাঁকে হামলা করবে না, কিংবা তারা শত্রু সৈন্যদল বৃদ্ধি করবে না অথবা কোনরূপেই শত্রুদের সাহায্য করবে না।’

খ. অনতিকাল পরে একই গোত্রের অন্যান্য পরিবারগুলি একত্রিত হয় এবং পারস্পরিক সাহায্য ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়।

---

২৩১. শায়খুল হিন্দ্ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭৮-১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

'আল্লাহ রাহমানুর রাহিমের নামে। ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর লিপি বা প্রতিশ্রুতি বনু দামরার জন্য, যাতে তাদের জানমালের নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে; তারা তাঁর সাহায্যের উপর ভরসা করতে পারে, যদি কেউ তাদের উপর হামলা চালায়, একমাত্র ব্যতিক্রম হবে যদি তারা ধর্মের নামে যুদ্ধ করে। এই আশ্বাস কার্যকরী থাকবে যতদিন সমুদ্র সলিল শক্তিকে সিক্ত করতে থাকবে। অনুরূপভাবে যখন মহানবী (সা.) তাদের সাহায্য চাইবেন তারা তাঁকে সাহায্য করবে; এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর নামে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তাদের সাহায্য করা তাদের আনুগত্য ও সততার উপর নির্ভর করবে।'

গ. অন্য এক গোত্র, যারা লোহিত সাগরের উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করত। তারা হচ্ছে বনু গিফার। ঐ সময়ে এরাও একত্রিত হয় এবং তার সন্ধি ছিল এই মর্মেঃ

'তাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, যদি কেউ আক্রমণ করে, এবং যদি মহানবী (সা.) তাদের সাহায্যে প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন তারা তাঁকে সাহায্য দান করবে এবং তাঁকে সাহায্য করা তাদের অবশ্য কর্তব্য হবে, কেবল ব্যতিক্রম হবে ধর্মের যুদ্ধের বেলায়। এই চুক্তি কার্যকরী থাকবে যতো দিন সাগর সলিল শক্তিকে সিক্ত করবে।'

ঘ. যখন মদীনার নগর-রাষ্ট্র স্থাপিত হয় তখন আরব নগরীর পূর্ব উপকণ্ঠে অনেকগুলি ইহুদী লোকালয় ছিল। তারাও নগর-রাষ্ট্রের সংগে যোগদান করেছিল এবং অন্যান্য জিনিসের সংগে যে সব বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছিল সেগুলি হলঃ

'যদি তারা (ইহুদীরা) শান্তির প্রস্তাবে যোগদান করতে এবং এর প্রতি অনুগত থাকতে আহুত হয়, তারা যোগদান করবে এবং অনুগত থাকবে। অনুরূপভাবে যদি তারা চায় মুসলমানরাও তার জন্য বাধ্য থাকবে। ধর্মের জন্য যুদ্ধ হবে এই চুক্তির ব্যতিক্রম।

ঙ. সম্ভবতঃ পঞ্চম হিজরীতে বনু আবদ ইবনে আদী গোত্রের সংগে মহানবী (সা.) মিত্রতা ও নিরপেক্ষতার চুক্তি করেছিলেন যার সম্পর্কে আমাদের ঐতিহাসিকগণ বলেন ঃ

'মহানবী (সা.) বনু আবদ ইবনে আদীর একটি প্রতিনিধিদল গ্রহণ করে ছিলেন। তারা বললঃ হে মুহাম্মদ (সা.) ! আমরা মক্কার চতুষ্পার্শ্বস্থ পবিত্র ভূমির অধিবাসী এবং এই ভূমির অধিবাসীবৃন্দ সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশীল। আমরা আপনার সংগে যুদ্ধ করতে চাই না। পক্ষান্তরে, কেবল মক্কার কুরাইশ

ব্যতিত আমরা আপনার যে কোনো অভিযানে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কারণ আমরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।'[২৩২]

চ. হুদায়বিয়ার বিখ্যাত চুক্তিতে নিরপেক্ষতার কথার উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ সেখানে একটি বাচনভংগী ব্যবহার করা হয়েছে, যা অভিধান লেখক বা শব্দকোষ সংকলকের মতানুযায়ী বিভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। সে শব্দটি হচ্ছে 'ইসলাল'। এর অর্থ তরবারী কোষমুক্ত করা এবং সেই সংগে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ এবং চুক্তিবদ্ধ অপর পক্ষের শত্রুকে সাহায্য দান। 'ইসলাল' শব্দটি হুদায়বিয়া চুক্তিতে শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রমাণিত হয়, অন্য দুটি চুক্তি দ্বারা যা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সম্পাদিত হয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে এটি একটি 'টেকনিক্যাল' ব্যবহারিক শব্দ।

৩.১২: মক্কা বিজয়কালে হযরত মুহাম্মদ (সা.) উদারতা

কোরাইশদের যে সকল নেতা ইসলামের সততায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু লোকজনের ভয়ে তা প্রকাশ করতেন না, তারা মক্কা বিজয়ের এ সুযোগে ইসলাম গ্রহণ করে নেন, যারা সেসময়ও নিজেদের পূর্বতন কুফরী ধর্মের উপর অবিচল ছিল, তাদের মধ্যে থেকে কতিপয় লোক ছাড়া বাকি সকলের জানমালের নিরাপত্তা দিয়ে রসূলুল্লাহ (সা.) পয়গম্বরী আদর্শের এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা প্রতিপক্ষ থেকে মোটেই আশা করা যায় না। তিনি সেদিন কাফিরদের সকল শত্রুতা, জুলুম ও অত্যাচারের প্রতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি রেখে বলেছিলেন, আজ তোমাদের সেকথাই বলব, যা ইউসুফ (আ) আপন ভাইদের বলেছিলেন, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।"[২৩৩]

বিপরীত পক্ষে, নবি করিম (সা.) মক্কার নিরাপত্তার জন্য এবং তার অধিবাসীদের নিরাপত্তার বিধান নিশ্চিত করার জন্য সকল কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের ক্ষমতার আওতায় তাদের হৃদয় জয় করার জন্য এবং তাদের সমর্থন লাভের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করেছিলেন। তিনি এখন হয়ে গেলেন আরবের অবিসংবাদিত নেতা। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে নমনীয় নীতি এবং কুরাইশ ও অপরাপর গোত্র যেমন তাইখের হাওজীন গোত্রের প্রতি বদান্যতা দেখানো সম্ভব ও ফলপ্রসূ বলে বিবেচনা করেন। এই সিদ্ধান্তের

২৩২. এ.জে. এম শামসুল আলম, Bm jvgx iv6, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩
২৩৩. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.৩৬২

সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। তখন মুসলমানগণ একটি শক্তিশালী এবং নিরাপদ জাতি হিসাবে তাঁদের অবস্থান করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া নতুন পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে রূপলাভ করতে শুরু করে। খায়বারের যুদ্ধের পর বৃহৎশক্তি বাইজেনটাইন এবং পারস্যের সাথে যে সশস্ত্র যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে তা তিনি উপলব্ধি করলেন। মুসলিম এবং রোমান সৈন্য বাহিনীর মধ্যে মুতা নামক স্থানে তখন প্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বাস্তবায়ন ঘটে। নিজের পক্ষে আরব এবং কুরাইশদের নিয়ে নবি করিম (সা.) এর পক্ষে এখন আরবের উত্তর অঞ্চলের উপর বাইজেন্টাইনদের প্রভাব বলয়ের উপর নজর দেয়া সম্ভব হল। উত্তরাঞ্চলের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে এভাবে জড়িয়ে পড়ার একটি ইতিবাচক দিকও ছিল। আর তা হল এই যে, আরব গোত্রগুলির মধ্যে এর ফলে সংহতি এবং উদ্দীপনা সংরক্ষণের চেতনা সঞ্চারিত হল। নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তার উচিত কি অনুচিত সে বিষয়ে কোন তাত্ত্বিক যুক্তিতে যাওয়ার পূর্বেই স্বশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।[২৩৪]

শান্তিপূর্ণ মক্কা বিজয়[২৩৫] অভিযান থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের প্রতি রোমানদের শত্রুতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের জবাবের উত্তরে ফিলিস্তিন সীমান্তে তাবুকের দিকে নবি করিম (সা.) তাঁর সময়কালের বৃহত্তম এক সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হলেন। মৃত্যুর পূর্বে এটাই ছিল তাঁর শেষ অভিযান। উসামাহ (রা.)-এর অভিযান ছিল রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর পূর্বে নির্দেশিত শেষ অভিযান। নবি করিম (সা.) এর ওফাতের পূর্বেই এটা প্রস্তুত ছিল। তথাপি নব নিযুক্ত খলিফার নবতর নির্দেশ লাভের পরই উত্তর দিকের গন্তব্য অভিমুখে এ বাহিনী যাত্রা করে। উত্তরের সীমান্তে দুটি বৈরী সাম্রাজ্যের সাথে সশস্ত্র

---

২৩৪. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, পৃ. ১৫৭-১৫৮

২৩৫. "৮ম হিজরীর শা'বান মাসে বানু খুযাাআঃ ও বানু বাকর-এর মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কিঞ্চিৎ রক্তপাত ঘটে। কতিপয় মক্কাবসী ছদ্মবেশে বানু বক্‌র-এর সৈন্যদলে যোগদান করে। অধিকন্তু তাহাদেরকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে। এই আচরণ হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলীর প্রত্যক্ষ লংঘনেরই শামিল্‌ মুসলমানদের 'হালীফ' বানু খুযাা'আঃ আ-হযরত (স.) এর নিকট অভিযোগ পেশ করিলে তিনি সাহায্য প্রেরণের ওয়াদা করিলেন। অতঃপর তিনি দূত মারফত মক্কার কু'রাইশদের নিকট তিনটি শর্ত পেশ করিলেন: ১. নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হউক। ২. বানু বাকরদের সহিত কুরাইশদের চুক্তিপত্র রহিত করা হউক। ৩. হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত অর্থাৎ' 'বাতিল' ঘোষণা করা হউক। কু'রত' ইবনে উমার কুরাইশদের পক্ষ হইতে পত্রোত্তরে জ্ঞাত করাইল, 'আমরা তৃতীয় শর্তই কবুল করিলাম। রাসূল আকরাম (স.) একদিকে এই ব্যবস্থা কায়েম করিলেন যে, মদীনা মুনাওওয়ারাঃ হইতে কেহ বাহিরে গমন করিতে পারিবে না। হাতিব ইবনে্‌ আবী বালতা'আ: (রা.) মক্কার কুরাইশগণকে সংবাদ পৌছাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রেরিত পত্র উদ্ধার করা হয়। আঁ-হযরত (স.) বদরযুদ্ধে তাহার অবদানের কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন (ইবনে হিশাাম, ৪খ. ৪০)।" (Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৮, ২১তম খ', পৃষ্ঠা ৫৯২-৫৯৩)

যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে আরবে মুসলিম শক্তিকে তিনি সংহত করেছিলেন। এ পদক্ষেপ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ করে। [২৩৬]

পরাজিত শত্রুর প্রাপ্য ঋণ

যুদ্ধ ঘোষণা হলেই শত্রুর প্রাপ্য ঋণ ও আমানত নষ্ট হয় না; পক্ষান্তরে তা পূর্ববৎ ঠিকই থাকে।

ইহা লক্ষণীয় যে, শত্রুর পরাজয়ের দরুণ তার প্রাপ্য ঋণ হতে সে বঞ্চিত হয় না, যদি সে ঋণ আইনত তার প্রাপ্য হয়। এর পিছনে মহানবী (সা.) এর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত হাদীস অনুসারে পরাজিত ইহুদী গোত্রের সম্পর্কে আমরা জানি; যখন মহানবী (সা.) তাদের গৃহ হতে বহিষ্কারের আদেশ দেন তখন তাহারা বললঃ 'কিন্তু আমাদের ঋণ প্রাপ্য আছে, যার পাওনার তারিখ এখনও আসে নাই।' মহানবী (সা.) প্রস্তাব দিলেনঃ 'কিছু বাদ দিয়ে তাদের আসল শোধ করো।' পুনরায় যখন মহানবী বনু নাযির সম্প্রদায়কে বহিষ্কৃত করেন তখন তারা বলল" 'অনেক লোকের নিকট হতে আমরা ঋণ পাই, যার দেয়ার তারিখ এখনো আসে নাই।' মহানবী (সা.) পূর্ববৎ একই আদেশ দিলেন। [২৩৭]

পূর্বেকার এ দুই ঘটনা প্রমাণ করে যে, বাস্তবিক পক্ষে পারস্পরিক আর্থিক দেনা-পাওনা কখনো নষ্ট হয়ে যায় না; পক্ষান্তরে প্রাপক ও খাতক উভয়ের মধ্যে ঋণের বাধ্যবাধকতা অক্ষুন্ন থাকে যুদ্ধ এবং পরাজয়, এমন কি শর্তহীন আত্মসমর্পণ হলেও। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণকে কিছু বাদ দিয়ে তৎক্ষণাত দেয় ঋণে পরিণত করলেও এমন একটি ঐচ্ছিক ব্যাপার যা পূর্ণ আর্থিক দাবিকে স্বীকৃতি দান করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আমলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মুসলিম আইন ও আচরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করতে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি ঃ

ক. উল্লেখ আছে যে, মুনাফিক 'হারিস ইবনে সুওয়ায়েদ' ওহুদে ইচ্ছাকৃত ভাবে 'আল-মুজাযযার ইবনে যিয়াদকে' হত্যা করে বসে, যখন মুসলিম বাহিনীর উপর অপ্রত্যাশিত শত্রু হামলার দরুণ কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। এই হত্যার কারণ ছিল সময় অতিবাহিত করা এবং প্রাক-ইসলামী এক

২৩৬. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৮
২৩৭. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩২

প্রাচীন কলহের প্রতিশোধ গ্রহণ করা। মহানবী (সা.) বিচারের পর অপরাধীর শিরশ্ছেদের আদেশ দেন।

খ. ওহুদে, উক্ত বিশৃঙ্খলার সময়ে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভাবে, সতর্কীকরণ সত্ত্বেও 'হুযায়েল ইবনে জাবির' মুসলমান সৈনিকদের হাতে নিহত হয়ে যান। তথাপি পরিস্থিতি এমন জটিল এবং আয়ত্ত্বের বাইরে চলে গিয়েছিল যে, এরূপ দুর্বল প্রতিবাদ কদাচ কার্যকর হতে পারতো। মহানবী (সা.) এ ঘটনা শুনে বায়তুল মাল হতে রক্তের বিনিময়ে অর্থ দেওয়ার আদেশ দেন, তথাপি সেই মৃত ব্যক্তির পুত্র এই অর্থের উপর তার দাবি ত্যাগ করেন এবং বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।'

গ. খন্দকের যুদ্ধকালে রাত্রিতে দুই মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা হয় এবং পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবার পূর্বেই কিছু রক্তপাত হয়ে যায়; ফলে কিছু নিহত ও কিছু আহত হযে পড়ে। মহানবী (সা.) তাদেরকে ভুলের দরুণ সুবিধা দেন এবং শাস্তির ব্যবস্থা না করে বিষয়টি মিটিয়ে দেন এবং বলেন, 'উভয় পক্ষের মৃত ব্যক্তিরা হবে শহীদ এবং তারা বেহেশতবাসী হবে; এবং উভয় পক্ষেরই ব্যক্তিরা আল্লাহর পথে কাজ করেছে এবং কোন পক্ষের জন্য কোন ক্ষতিপূরণের অধিকার থাকবে না।[২৩৮]

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা সর্বকালে সকলের নিকট সমাদৃত। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করলে একটি শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৩.১৩: আবিসিনিয়ার শাসকের সাথে রাসূল (সা.) এর পত্রালাপ

মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে আবিসিনিয়া বহু যুগব্যাপী এক অভূতপূর্ব মর্যাদার আসন লাভ করে এসেছে। অমুসলিম রাষ্ট্রপূঞ্জের মধ্যে এ দেশ থেকে একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে রইল, যাকে ইসলামী রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় জেহাদের গণ্ডীর বাইরে রেখেছে।

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনবিশেষজ্ঞগণ এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত বিশ্লেষণ কালে আবিসিনিয়ার সঙ্গে প্রথম যুগের ইসলামী রাষ্ট্রের গভীর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের নজির এবং এ সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে।[২৩৯] তাছাড়া কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম বাহিনী আবিসিনিয়ায়

---

২৩৮. ড. মুহম্মদ হামীদুল্লাহ্ (অনু. আবদুল মতিন জালালবাদী), বিস্তারিত, পৃ.১২৭

২৩৯. "আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত (নুবুওয়াতের ৫ম বৎসর): মক্কায় মুসলিমদের উপর অব্যাহত নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করিয়া মহানবী (স.) একদিন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন: সম্ভব হইলে তোমরা আবিসিনিয়া গমন কর। তথায় একজন হৃদয়বান শাসক আছেন যাঁহার নিকট সত্যের কদর আছে এবং সেখানে কাহারও উপর অত্যাচার হয় না। তথায় অবস্থান করিবে যতদিন না আল্লাহ তোমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেন (ইবন হিশাম, ১খ. পৃ.৩৪৪)।

অনুপ্রবেশ করেনি। মুসলিম আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আবিসিনিয়ার মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এর ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর কিছুটা আলোকপাতের প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলামের উন্মেষ পূর্বে আবিসিনিয়া আরবের ইয়ামেন অঞ্চলে আক্রমণ করে এবং সেখানে খৃস্টধর্মের পুন:প্রতিষ্ঠা করে। সাধারণ প্রচলিত বর্ণনা হতে জানা যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের বছরেই (খৃস্টাব্দ ৫৭০) আবিসিনিয়া মক্কা আক্রমণ করে্ এই সামরিক অভিযানই যে, আরব ও আবিসিনিয়ার মধ্যে একমাত্র সংযোগ ছিল তাই নয়, এ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল।[২৪০] এ সম্পর্কের ফলেই এককালে মক্কায় আবিসিনীয় কলোনী গড়ে ওঠে এবং আরবী ভাষায় বহু আবিসিনীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে।

আর একটা ঘটনা মুসলমানদের আবিসিনিয়ার প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন করে তোলে। এই ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাদশাহ নাজ্জাশীকে ইসলাম গ্রহণের যে দাওয়াত পাঠান, নাজ্জাশী তার অনুকূলে জবাব দান করেন। হিজরী ৮ সালে হযরত মুহাম্মদ (স.) বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে ইসলাম গ্রহণের আহব্বানপত্র পাঠান।[২৪১] নাজ্জাশীর কাছেও তিনি অনুরূপ একটি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি বলেন ঃ

‘পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করেছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সা.) কাছ থেকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রতি।

আপনার প্রতি সালাম। আল্লাহর সব প্রশংসা যিনি এক, মহান ও পবিত্র, করুণাময় এবং নির্ভরযোগ্য হেফাজতকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর রূহ এবং বাণীস্বরূপ এবং তিনিই (আল্লাহ) তাঁকে মহাআশীষ প্রাপ্ত, মহাসাধবী মরিয়মের কাছে পাঠান এবং তার ফলেই মরিয়মের গর্ভে তাঁর জন্ম হল। তিনি (আল্লাহ) নিজের আত্মা থেকে হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করেন–

এগার অথবা বার জন মুসলিম পুরুষ ও চার অথবা পাঁচ জন মহিলার প্রথম দলটি, যাঁহাদের মধ্যে “উসমান (রা.) ও তাঁহার স্ত্রী– মহানবী (সা.)-এর কন্যা রুকা’য়্যাঃ (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তথায় পৌঁছিয়া নিরাপদ অবস্থানের খবর দেন (ইব্ন সা’দ, তাবাকা’ত, ১খ. ২০৩ পৃ.)। ইহার পর আরও কিছু সাহাবী তথায় গমন করেন [এই দলটি এক গুজনের উপর ভিত্তি করিয়া কিছুদিন পর ফিরিয়া আসেন। কিন্তু পুনরায় যখন নির্যাতন বৃদ্ধি পায় তখন মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে ৮১ জন মুসলিম যাঁহাদের মধ্যে ১১ জন কু’রাইশ মহিলা ছিলেন, আবিসিনিয়া হিজরত করেন (ইব্ন সা’দ, ১খ, পৃ.২০৭)]। তন্মধ্যে আ’ফার তায়্যার (রা.) ইব্ন আবী তালিবও ছিলেন, যাঁহার হাতে মহানবী (স.) নাজাশীর নামে একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন (দ্র. আল-ওয়াছ’াাইকু,’ সিয়াাসিয়াঃ, সংখ্যা ২১)। সম্ভবত উহা পরিচিত ও সুপারিশপত্র হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল।” (Bmjvgx wek‡Kvl, ২১তম খ.৩, পৃ.৫৮১)

২৪০. আবু বকর আবদুল্লাহ্ ইব্নে মুহম্মদ ইব্নে আবি শায়বাহ, gmvbv‡d Be‡b Awe kvqevn, বাব-মা যায়া ফিল হাবশাহ ওয়া আমারা নাজ্জাসী, খ.১৪, পৃ.৩৪৪, হাদিস নং- ৩৭৯৫

২৪১. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮

তাঁর নিজেদের প্রশ্বাস দিয়ে তাঁকে জীবনীশক্তি দান করেন। এভাবেই তিনি হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। আমি আপন লা-শরীক এবং আসমান, জমিন ও শেষ বিচার দিনের মালিক আল্লাহর উপাসনা করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমার রিসালাত মেনে নিন। আমাকে অনুসরণ করুণ এবং আমার অনুগামীদের জামাতে দাখিল হোন। কারণ, আমি আল্লাহর রাসূল্ ... আপনার রাজকীয় সার্বভৌমত্বের গর্ব পরিত্যাগ করুন। আমি আপনাকে ও আপনার প্রজাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত মেনে নিতে আহ্বান জানাচ্ছি। আমার কর্তব্য শেষ হল। আমি আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা, যাঁরা আমার উপদেশ শুনলেন, তাঁরা যেন এর দ্বারা উপকৃত হন। সত্য ধর্মের আলোক পথে যিনি চলবেন, তাঁর প্রতি সালাম।'[২৪২]

মুসলিম ইতিহাসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, বাদশাহ নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহর (সা.) পত্রখানি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর মাথায় ও ললাটে স্পর্শ করেন এবং তাঁর (হযরতের) রিসালাত কবুল করেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট উপহার পাঠান এবং সেই সঙ্গে এই মর্মে তাঁর চিঠির জওয়াব প্রেরণ করেনঃ

'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। আল্লাহ তাঁর রহমতের ছায়ায় আপনাকে আশ্রয় দান করুন এবং তাঁর অফুরন্ত আশীষ আপনার ওপর বর্ষিত হোক। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনিই আমাকে ইসলামে দাখিল করেছেন। আপনার চিঠি আমি পাঠ করেছি। আপনি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সবই সত্য এবং সত্য ধর্মের কথা। কারণ, তিনি তাছাড়া আর অধিক কিছুই বলেননি।[২৪৩] আসমান-জমিন ও শেষ বিচার দিনের মালিকের ওপর আমি আমার বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করছি। আপনার মহান উপদেশাবলী সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। ... আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল; এবং আমি একথা জাফর (রা.)-এর সামনে ঘোষণা করেছি এবং তাঁর নিকট ইসলাম কবুল করেছি। হে রাসূল! জগতসমূহের স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের ইবাদাতের জন্যে আমি নিজকে সমর্পণ করলাম। আমি আমার পুত্রকে আপনার কাছে আমার ব্যক্তিগত দূতরূপে পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনি যদি হুকুম করেন, তবে আমি নিজে গিয়ে আপনার পবিত্র পথ-নির্দেশের পথে নিজকে উৎসর্গ করব। আমি পুনরায় সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার বাণী সত্য।'[২৪৪]

---

২৪২. আহমদ ইব্নে আবি বকর ইব্নে ইসমাইল আল বুসরী, AvZvnvdj LvBivZj gwniivn , বাব-কিতাবুল ইমরাত, খ.৫, পৃ.৭৬, হাদিস নং-৪২৬০

২৪৩. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত,পৃ.১৪৮

২৪৪. মুহম্মদ ইব্নে আব্দুল্লাহ্ আবু আব্দুল্লাহ্ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী, gmZv'ivK Avjv mwnnvBb wjj nwKg, বাব-কিতাবুল হিজরাতুল উলা ইলা হাবশাহ, খ.২, পৃ.৬৭৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি (৬৩২-৬৬১)

হযরত আবু বকর (রা.) ৬৩২-৬৩৪,

হযরত উমর (রা.) ৬৩৪-৬৪৪

হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪-৬৫৬,

হযরত আলী (রা.) ৬৫৬-৬৬১

৪.১: হযরত আবু বকর (রা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি

(জ. ৫৭৩ খ্রি., খিলাফত ৬৩২ খ্রি., মৃ. আগস্ট ৬৩৪ খ্রি.)

হযরত আবু বকর (রা.): কোরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে বয়স ও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আবু বকরই ছিলেন প্রথম। তিনি হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁহার শ্বশুরও ছিলেন। তিনিই হন প্রথম খলিফা, খলিফায়ে রাসুলুল্লাহ "আল্লাহ্‌র বার্তাবাহকের প্রতিনিধি"। কিঞ্চিতাধিক দুই বৎসর তাঁহার সংক্ষিপ্ত শাসন ইসলামের অধীনে আরবের পুনঃঐক্য সাধনার্থে অতিবাহিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আরব গোত্রগুলির আনুগত্য ছিল অগভীর এবং তাহাদের উপর তাঁহার আধিপত্য সুদৃঢ় করিবার মতো সময় তিনি পান নাই। প্রিয় নবী (সা.) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংযোগ রক্ষাকারী শক্তিশালী কবচ তাহারা ছিন্ন করে। ইহা হইল যাকাত বা কর প্রদান। কর প্রদানের সঙ্গে অপরিচিত একটি জাতির পক্ষে যাকাত একটি অর্থনৈতিক বোঝা, যাহা তাহাদের স্বাধীন জীবনযাত্রার পথের অন্তরায়। কোনো কোনো গোত্র ইসলাম হইতে যাহা শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহা ভুলিবার পথ অবলম্বন করে। অন্যান্য গোত্রগুলি কোরাইশ গোত্রের দ্বারা পরাজিত হইবার ভয়ে নিজস্ব নবীর দাবি করে। আবু বকর ও তাঁহার উপদেষ্টাদের নিকট ইহা অসহনীয় মনে হয় এবং তাঁহারা শক্তির দ্বারা এই হুমকির মোকাবিলা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২৪৫]

---

২৪৫. শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫, পৃ. ১

ইসলামের পতাকাতলে সমগ্র মদীনা বশীভূত। এইবার মক্কাবাসীগণ আরবের অবশিষ্টাংশে যুদ্ধ চালাইয়া যান। এই সমস্ত যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তাঁহার চমৎকার সৈন্য পরিচালনায় গোত্রগুলি একের পর এক পরাজিত হয়। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আবু বকর যখন মৃত্যু শয্যায়, খালিদের বিজয়ী বাহিনী তখন কোনো কোনো বিদ্রোহী গোত্রকে সিরিয়ায় পশ্চাদ্ধাবিত করে এবং বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর একটি অংশকে পরাজিত করে।

উত্তরাধিকারের সমস্যা: হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬৩২ সালের ৮ই জুন পরলোকগমন করে। জীবিতকালে তিনি নবী, বিচারক, বাদশাহ, ধর্মীয় নেতা ও সেনাপতির দায়িত্ব পালন করিতেন। কেহ তাঁহার অধিকারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যু ছিল অন্তত দুইজন ব্যক্তির পরলোকগমন- একজন আল্লাহ্‌র নবী (সা.) এবং অন্যজন রাষ্ট্রপ্রধান। আল্লাহ্‌র শেষ প্রেরিত পুরুষ হিসাবে প্রিয় নবী (সা.) কোনো উত্তরাধিকারী থাকিতে পারে না। তবে রাষ্ট্র-নায়কের অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে তাঁহার দায়িত্বের যথা-প্রধান সেনাপতি, আইনদাতা, বিচারক ইত্যাদির জন্য একজন উত্তরাধিকারী প্রয়োজন, যাহাকে খলিফা বলা হয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দেহ কবরে অর্পণ করিবার পূর্বেই উত্তরাধিকারের বিষয় লইয়া একটি তিক্ত বিবাদের সুত্রপাত হয়। খলিফা পদের জন্য একাধিক প্রার্থী দণ্ডায়মান হয়। এই বিবাদ বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিতে থাকে এবং ইসলামের ইতিহাসকে রঞ্জিত করে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক রূপান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি হইল গোত্রীয় বা জাতীয় ভ্রাতৃত্বকে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বে রূপদান। তিনি মানুষের ভ্রাতৃত্বের চাইতেও অধিক প্রচার করেন মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব। আধুনিক জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মতবাদ ইসলামে স্থান পায়না। স্বয়ং নবী-নৃপতি হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি উঁচুদরের জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন।

আবু বকর আনসারদিগকে দৃঢ়ভাষায় বলেন, “আরবগণ সমষ্টিগতভাবে শুধুমাত্র কোরাইশদের আধিপত্য স্বীকার করিবে”। এই উক্তির যথার্থতা আনসারদিগকে বিচলিত করে। কা’বার রক্ষাকর্তা হিসাবে কোরাইশ ছিল খুবই প্রসিদ্ধ গোত্র। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের মর্যাদা তো খর্ব হয়ই নাই বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। আনসারগণ অতঃপর একটি পরিষদ হিসাবে গোত্রীয় নেতাদের একটি সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব ছিল নিষ্ফল। যে একতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরবদের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন ইহার ফলে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িত। প্রত্যেকের মনোভাব ইতিমধ্যে কঠিন আকার ধারণ করে এবং পরস্পরের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। এই সময় উমর এক পর্যায়ে আবুবকরের নাম প্রস্তাব

করিয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্য বা বায়'আত প্রকাশ করেন। মুহাজিরগণ ইহার অনুসরণ করে। অতঃপর আনসারদের নড়বড়ে দল ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাঁহারাও অনুরূপ আনুগত্য প্রকাশ করেন।[২৪৬]

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর উপদেশঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হওয়ার সময়। হযরত উসামার মাধ্যমে যে উপদেশ দিয়েছেন- [২৪৭]

"হে লোকেরা! তোমরা শোন! আমি তোমাদিগকে দশটি আদেশ দিচ্ছি। সেগুলো মনে রেখোঃ অপহরণ করো না বা তহবিল তসরুপ (অপচয়) করোও না, প্রতারণা করো না, শিশুকে, কিংবা বয়ঃবৃদ্ধকে কিংবা স্ত্রীলোককে হত্যা করো না, খেজুর গাছ কাটবে না অথবা দগ্ধ করবে না। অথবা কোন ফলের গাছ কাটবে না এবং খাদ্যের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ছাগল গরু বা উট যবেহ করো না। হতে পারে, খানকায় নির্জনতা অবলম্বনকারী লোকদের সাক্ষাৎ পেতে পার। হতে পারে, তোমরা এমন সব লোকজনের সাক্ষাৎ পেতে পার যারা তোমাদের জন্যে বিবিধ খাদ্য পূর্ণ পাত্র আনতে পারে। যদি তোমরা একটির পর একটি ভক্ষণ করতে থাকো, তাহলে আল্লাহর নাম নেবে এবং তোমরা এমন লোকের সাক্ষাৎ পাবে যাদের মাথার চুল দেখে মনে হবে শয়তান তাদের মাথার উপর বাসা বেঁধেছে আর তার চার পাশে তারা পাগড়ী পরেছে। সুতরাং ঐগুলি তরবারী দ্বারা বিদ্ধ করো।

'আল্লাহর নামে অগ্রসর হও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে বর্শা ও মহামারী দ্বারা সাহায্য করুণ।'

অন্য এক বিবরণী অনুযায়ী ঃ[২৪৮]

অতঃপর তিনি সৈন্য দলের ভিতর দণ্ডায়মান হয়ে বললেনঃ

'আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার জন্যে আদেশ লঙ্ঘন করো না, প্রবঞ্চনা করো না, ভীরুতা পরিহার করো, গীর্জা ধ্বংস করো না, তালগাছ নষ্ট করো না, ফসল দগ্ধ কর না, প্রাণীর রক্তপাত কর না, ফলের গাছ কাটবে না, বৃদ্ধ, বালক, বা শিশু বা স্ত্রী লোককে হত্যা করিও না।"[২৪৯]

---

২৪৬. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, (অনু. মোহাম্মদ এনামুল হক), ga¨cÖP¨ AZxZ I eZgvb, ঢাকা:বাংলা একাডেমি,১৯৯৪, পৃ. ৫৯-৬০

247. BEVERLEY MILTON EDWARDS, *islamic politics in Palestine,*London, New Yorik: Tauris Academic Studies, P.67

২৪৮. মোহাম্মদ রেজাউল করিম, wdwjw¯Íb mgm¨vi µgweeZb, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫, পৃ.৭৮-১৪০ (বিস্তারিত দেখুন)

২৪৯. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, (অনু. মাও. মুহাম্মদ শামাউন আলী), †RiæRv‡jg wek gmwjg mgm¨v, ঢাকা: আল-ফুরকান প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ১৮-৪২ (বিস্তারিত দেখুন)

আবু বকর (রা.) এর উপদেশগুলো অনুসৃত হলে অন্যায় ভাবে হাজার হাজার অসহায় নারী শিশু, বৃদ্ধ বেসমারিক লোক হতাহত হত না। বড় পরামানিবক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো তাদের ক্ষমতার অবৈধ শক্তি প্রদর্শন করছে, আর তার আক্রমনের শিকার হচ্ছে নিরাপরাধ মানুষগুলো। সকল বোমের মা যুক্তরাষ্ট্রের (১০ টন) আর সকল বোমের বাবা রাশিয়া (ওজন ৪৪ টন)।[২৫০]

সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় আবু বকর (রা.) এর উপদেশঃ

যখন আবু বকর (রা.) ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হতে আদেশ দিলেন, তখন তিনি সংগে যেতে যেতে তাকে নানা উপদেশ দিলেন। ইয়ায়িদ উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন ও আবু বকর (রা.) পদব্রজে হাঁটছিলেন। ইয়াযিদ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর উত্তরাধিকারী! হয় আপনি উঠুন, নয়তো আমি নেমে যাই।'

তিনি উত্তরে বললেন ঃ

'তুমিও নামবে না, আমিও উঠব না। আমি এই হাঁটাহাঁটিকে আল্লাহর পথে গণ্য করছি।'

'হে ইয়াযিদ! তুমি এমন একটি দেশে যাবে যেখানকার অধিবাসীরা তোমাদিগকে নানাবিধ খাদ্য প্রদান করবে, সুতরাং আহারের পূর্বেও পরে আল্লাহর নাম নেবে। তোমরা এমন সব লোকের সাক্ষাৎ পাবে যারা খানকায় বা মাঠে নির্জনে বসবাস করছে। তাদেরকে নির্জনবাসে থাকতে দাও। আবার এমন লোক দেখবে– যাদের মাথায় শয়তান বাসা বেঁধেছে– যাদেরকে 'শামামিশা' বলা হয়– অতএব তাদের শিরশ্ছেদ করো। কিন্তু কোন বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধাকে কিংবা নাবালক কিংবা অসুস্থ, কিংবা সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা করো না। কোন লোকালয়ে ধ্বংস করো না। প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোন গাছকে দগ্ধীভূত বা জলমগ্ন করো না। বিশ্বাস ঘাতকতা করোনা, অঙ্গহানি করোনা, কাপুরুষতা প্রদর্শন করো না, এবং প্রতারণা করো না। আল্লাহ্ অবশ্যই ওদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁর ও রাসূল (সা.) এর উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে কারণ আল্লাহ্ শক্তিশালী।

আমি তোমাকে আল্লাহর হেফাযতে সমর্পণ করেছি এবং বিদায় দিচ্ছি।"[২৫১]

অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন।

---

২৫০. দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০১৭

২৫১. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়া অভিযান

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হইবার পরের দিনই মসজিদ হইতে নিশানটি লইয়া পুনরায় উসামার হস্তে প্রদান করিয়া বলেন যে, হজরতের ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে সিরিয়া অভিযানের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল এবং পূর্বের ন্যায় জুরফে গিয়া শিবির স্থাপন করিয়া উসামা সৈন্য সংগ্রহ করিবেন এবং সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিবেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায় উসামা (রা.) যে অভিযানের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে মদীনার বিখ্যাত যুদ্ধবিশারদগণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন উসামা (রা.)-কে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন, তখন কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্কটজনক অবস্থা। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহদেখা দিয়াছিল এবং অনেকেই ইসলাম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। [২৫২]

ইয়ামামার যুদ্ধ

হযরত আবু বকর (রা) এতে বিচলিত হয়ে বীরশ্রেষ্ঠ খলিদ বিন ওয়লিদ (রা.)-কে মুসায়লামার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধ-বিপর্যয়ে ইসলামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার আশঙ্কায় খালিদ (রা.) বীরবিক্রমে মুসায়লামাকে আক্রমণ করেন এবং ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামামার যুদ্ধে (Battle of Yamamah) তাকে পরাজিত করে। পরাজিত শত্রুপক্ষ একটি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করলে সেখানে মুসায়লামা সহ অসংখ্য লোক নিহত হয়। এ কারণে আরব ঐতিহাসিক তাবারী একে 'মৃত্যুর বাগান' (The Battle of the Garden of Death) বলে উল্লেখ করেন। স্বধর্মত্যাগীদের এই ভয়ংকর যুদ্ধ সাধারনত ইয়ামামার (কঠিন) যুদ্ধ নামে পরিচিত। যোসেফ হেল বলেন, "কঠিনতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহের মধ্যে ইয়ামামার যুদ্ধ অন্যতম ছিল।" ইয়ামামার যুদ্ধের পর ওয়াহশি (রা.) নামক একজন মুসলিম নিগ্রোর হাতে মুসায়লামা নিহত হয়।[২৫৩]

---

২৫২. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৬৪

২৫৩. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, D"P gva¨wgK Bmjv‡gi BwZvnm, প্রথম পত্র, ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ২০০৩, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পৃ.৯২

৪.২: হযরত উমর (রা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি

(জ. ৫৮৩, খিলাফত-৬৩৪, মৃ. নভেম্বর ৬৪৪)

উত্তরাধিকার লইয়া যাহাতে কোনো বিবাদের সূত্রপাত না হয় সেইজন্য আবুবকর তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী হিসাবে উমর (রা.)-এর নাম উল্লেখ করিয়া যান। খলিফার পিছনে সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী না হইলেও উমর ছিলেন আবু বকরের সর্বঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা।[২৫৪]

এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যমশীল ব্যক্তি, যিনি তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন, শুধু একজন প্রথমিক ইসলাম গ্রহণকারী নহেন বরং নবী (সা.)-এর একজন শ্বশুরও। তাঁহার পুরা নাম উমর ইবন আল-খাত্তাব (রা.)। তাঁহার অনুপ্রাণিত নেতৃত্বে মরুভূমির আরবগণ আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইয়া সম্মুখের সব কিছুকে গ্রাস করে। এক যুগের মধ্যে তাহার বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে এবং দক্ষিণে মিসর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। একই সঙ্গে তাহাদের বাহিনীর আরেকটি শাখা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিয়া মধ্য ইরানের দিকে অগ্রসর হয়। সেই যুগের দুইটি সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের উপর একটি অধীনস্থ ও অশিক্ষিত জাতির এই দর্শনীয় ও দ্রুত বিজয় ঐতিহাসিক দিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দেয় এবং এইজন্য ইহা অনেক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। তবুও হুনদের দ্বারা রোম বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং মোঙ্গলদের দ্বারা চীনাগন বিজিত হইয়াছেন। এইগুলির কারণ খুঁজিয়া বাহির করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে।

কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কল্পনার সাম্রাজ্য আরবদের বাহিরে বিস্তার লাভ করে নাই। খলিফা থাকাকালে আবু বকর ছিলেন সম্পূর্ণ কর্মব্যস্ত, তাই ইরাক ও সিরিয়ায় যাইবার জন্য খালিদকে আদেশ করিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু খলিদ ইতিমধ্যেই সিরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাই এইসব বিজয়ের ব্যাপারে আবুবকর সম্মতি প্রদান করেন। তবে হযরত উমর (রা.) সজানে পরিকল্পনা রচনা করিয়া এই অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করেন।[২৫৫]

---

২৫৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব কান্ধলভী (রহ.) (অনু.হাফেজ মাও. মুহাম্মদ যুবায়ের), হায়তুস সাহাবাহ, খ. ২, ঢাকা: দারুল কিতাব, ২০০৫, পৃ. ৩৯৩

২৫৫. বিস্তারিত- Bmjvgx wek¦Kvl, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, খ.৬, পৃ.২২

যিম্মিদের সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) এর আইন

আইনবিদগণ আল-কোরআনের নির্দেশ ও হযরত মুহাম্মদ (স.) এর কার্যাবলী ছাড়াও প্রথম খলিফা উমরের (রা.) সনদের উল্লেখ করে থাকেন। এ সনদে মুসলিম রাষ্ট্র সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কেতাবিদের অবস্থার পুর্ণব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সনদটিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সনদটি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু শুরুতে এ কথা বলে রাখা ভাল যে, হযরত উমর (রা.) বোধ হয় একই দলিলে সনদটিতে উল্লেখিত শর্তাদির বিবরণ প্রদান করেন নি। কিন্তু সাধারণতঃ তাই ধরে নেয়া হয়।

আবু ইউসুফ ও বালাযুরীর বর্ণনা অনুসারে ইরাক ও সিরিয়ার খৃস্টানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে সমঝোতায় পোঁছানোর ব্যাপারে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আবু উবায়দা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন। খলিফা উমর (রা.) এ চুক্তিগুলো অনুমোদন করেন। বালাযুরী প্রদত্ত চুক্তির বিষযগুলো আবু ইউসুফের সঙ্গে মিলে যায়। আর আবু ইউসুফের প্রদত্ত দলিলই এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করছে। তাই এ দলিলগুলো এখানে বিশদভাবে বিধৃত করা হবে। আবু ইউসুফ (র.) বলেন যে, প্রধান সেনাপতি খালিদের সেনাবাহিনী ইরাকে শক্তি বলে অনেক শহর দখল করেন; কিন্তু হিরা অঞ্চলে তাঁকে কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়।[২৫৬] আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। ফলে তাঁর সঙ্গে হিরার অধিবাসীদের এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। হিরার খৃস্টানদের সঙ্গে মুসলিম কর্তৃপক্ষের এটাই ছিল প্রথম চুক্তি। চুক্তিটির বিবরণ নীচে দেয়া হলঃ

‘পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটা খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ও হিরার অধিবাসীদের মধ্যে চুক্তি। খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে ইয়ামা’মা থেকে অগ্রসর হয়ে ইরাকের অধিবাসীদের (আরবীয় ও পারসিকদের) নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর উপর ঈমান আনার আহ্বান জানাবার জন্য এবং ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য ও ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত হলে তাদের নরকাগ্নি সম্পর্কে সাবধানবাণী দেবার জন্য আদেশ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গে সমান দাবী-দাওয়া ও কাজ-কর্মের অধিকার ভোগ করবে। পরিশেষে আমি হিরায় পৌছে আয়াস-বিন-কাবিসা আততাঈ ও শহরের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে আহ্বান করি। কিন্তু তারা তাতে রাজী হন

২৫৬. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৭

নি। তাই, আমি তাঁদের জিযিয়া[২৫৭] প্রদান করতে অথবা যুদ্ধের সম্মুখীন হতে আহ্বান করি। তাঁরা জবাব দেনঃ 'আমরা যুদ্ধ চাই না। কেতাবিরা যেমন জিযিয়া প্রদান করে শান্তি স্থাপন করেন, আমরাও অনুরূপ জিযিয়া দিয়ে শান্তি লাভ করতে চাই।' আমি এ প্রস্তাব মেনে নিলাম ও গণণা করে দেখলাম যে, তাদের জনসংখ্যা সাত হাজার। এক হাজার বৃদ্ধ জিযিয়া থেকে রেহাই পেলেন। ছ'হাজার লোকের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া ঠিক হল। জিযিয়ার পরিমাণ হবে ৬০ হাজার দিনার।

'এ কথা স্বীকৃত হল যে, হিরার অধিবাসীগণ তাদের চুক্তি লঙ্ঘন করবে না এবং আরব বা ইরানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না। তাদের কেউ যদি দুর্বল ও বৃদ্ধ বা পীড়িত হয়ে পড়ে বা ধনী অবস্থা থেকে গরীব হয়ে যায় তবে তাকে আর জিযিয়া দিতে হবে না। সে ও তার পরিবার দারুল ইসলামে অবস্থান করলে বায়তুল মাল থেকে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হবে। তারা যদি দারুল ইসলাম পরিত্যাগ করে, তবে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করা হবে না। তাদের যদি কোন দাস ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সর্বাপেক্ষা অধিক দাম নিয়ে তাকে বিক্রয় করে দিতে হবে ও বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তার প্রভুকে দিতে হবে। সামরিক পোশাক ছাড়া কেতাবিগণ যে কোন পোশাক পরিধান করতে পারবে; অবশ্য সে পোশাক যেন মুসলমানদের পোশাকের মত না হয়। তাদের মধ্যে কেউ যদি সামরিক পোশাক পরিধান করে, তবে তাকে গ্রেফতার করা চলবে এবং সেজন্য তাকে কারণ দর্শাতে হবে। এ কারণ যদি যথোপযুক্ত না হয়, তবে একটি সামকির পোশাকের দাম তার কাছ থেকে আদায় করা হবে। ঠিক হয় যে, বায়তুল মালের মাধ্যমে জিযিয়া প্রদান করতে হবে। যদি তাদের কোন অর্থকরী সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে তারা তা বায়তুল মাল থেকে গ্রহণ করবে।'[২৫৮]

এ চুক্তিটি মুসলিম ও অধিকৃত অঞ্চলের খৃস্টানদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলোর প্রথম। এ চুক্তির গুরুত্ব এই যে, এর দ্বারা উভয়পক্ষ অনেকগুলো বাধ্যবাধকতা মেনে নেন। খৃস্টানগণ পৌর-জীবন যাপন করতে, সামরিক পোশাক পরিধান না করতে এবং মুসলমানদের শত্রুকে সাহায্য না করার প্রতিশ্রুতি দেন। আর মুসলিম কর্তৃপক্ষ শুল্ক দেয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর হিসেব করে সামগ্রিকভাবে জিযিয়া গ্রহণ করবেন এবং

---

২৫৭. বহুবচনে জিযা, ইমাম রাগীব (মুফ্রাদাতুল'ল কু'রআন, ঐ শব্দের অধীন)-এর মতেও শব্দটি জাযা' হইতে নির্গত: জিয্য়াঃ নামকরন এই জন্য হইয়াছে যে, ইহা হইল যি'ম্মীদের প্রাণরক্ষার বিনিময়। তাফসীরকারদের মধ্যে 'আল্লামাঃ যামাখ্শারীর মতে শব্দটির মূল হইল জাযা' এবং ইহাকে এইজন্য জিয্য়াঃ বলা হয় যে, যিম্মী দের কর্তব্য সমূহের একটি কর্তব্য যাহা তাহারা পালন করে (আল-কাশ্শাফ কায়রো ১৯৪৬, খ.২, পৃ.২৬২), we¯ÍwiZ- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, খ. ১১, পৃ.৫৭৭

২৫৮. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০-১৩৪

এর বিনিময়ে তাদের নিরাপত্তার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, এটাই প্রাচ্যের প্রথম জিযিয়া। এতে বোঝা যায় যে, এ চুক্তিটি মুসলিম কর্তৃপক্ষ ও ইরাকের খৃস্টানদের মধ্যে সম্পাদিত প্রাথমিক চুক্তি। এর মধ্যে এমন কোন কিছুর ব্যবস্থা নেই, যা অসম্মানজনক বলে গণ্য হতে পারে। জিযিয়া প্রদান করা বা সামরিক ব্যাপারে শরিক না হওয়ার মধ্যে আপত্তিজনক কিছুই নেই। কারণ, পরাজিত হবার ফলে স্বভাবতই সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা নিয়ে নেয়া হয় এবং মুসলিম কর্তৃপক্ষই দেশরক্ষার ভার নেন। আবার মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা লাভ করা বিনিময়ে জিযিয়া দেয়া হয়। মনে রাখা উচিত যে, যিম্মিদের ওপর কোন ভূমি-শুল্ক (খারাজ)[২৫৯] ধার্য করা হত না। জিযিয়া পাইকারী-শুল্ক (মাথা-গণতি কর) ছিল না। একটি সামগ্রিক শুল্কের নামই জিযিয়া যার মধ্যে কোন অসম্মান বা হীনমন্যতা ছিল না। জিযিয়া বৃদ্ধি করার কোন কথাও জিযিয়ার মধ্যে ছিল না। বরং এতে এ কথাই লেখা ছিল যে, যদি ধনীগণ পরে জিযিয়া দিতে অসমর্থন হয়ে পড়েন, তবে তাদের আর জিজিয়া দিতে হবে না। তাদের বায়তুল মাল থেকে সাহায্য করা হবে। লক্ষ্য করার বিষয়, এতে কেতাবিগণ মুসলিমদের সঙ্গে একই ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুযেগা-সুবিধা লাভ করে।[২৬০]

আবু ইউসুফ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, বানিকিয়া ও আইন-আততামর প্রভৃতি শহরও একই প্রকার চুক্তির আওতায় বশ্যতা স্বীকার করে। বালাযুরীও একথা সমর্থন করেছেন। সিরিয়ার বেলায় অবশ্য চুক্তিতে আরও কতকগুলো বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। হযরত আবু উবাইদা (রা.)-এর পরামর্শে খলিফা উমর (রা.) তা গ্রহণ করেন। পরে এগুলো মুসলিম শাসনাধীনে সব কেতাবিদের প্রতি প্রযোজ্য হয়। এ ব্যাপারে বালাযুরীর সঙ্গে তা'বারী ও ইয়াকুবী প্রায় একমত পোষণ করেন। চুক্তির কযেকটি ধারায় অবশ্য কয়েকটি গরমিল দেখা যায়। সিরিয়া অভিযানের প্রত্যক্ষদর্শী মাখুলের মতে আবু ইউসুফ (র.) কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ[২৬১]

---

২৫৯. খারাজ গ্রীক মূল Khoregia হইতে সিরিয়া ভাষার মাধ্যমে উদ্ভুত একটি শব্দঃ কিন্তু আরবগণ ইহাকে স্থানীয় শব্দমূল এর সহিত সংশ্লিষ্ট করেন। শব্দটির মৌলিক অর্থের সহিত প্রচলিত অর্থের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমান ব্যবহারিক রূপে শব্দটি সার্বিকভাবে ‘কর’ অর্থটিই প্রকাশ করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এবং বস্তুত বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট করের ার্থবোধক হিসাবে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইহা হইতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। আরবী ভাষায় প্রাযুক্তিক ও আইন সম্বন্ধীয় রচনাবলীতে ইহা অধিকতর সুর্দিষ্টভাবে ব্যবহার করা হইয়াছেঃ তুর্কী রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হইবার পূর্বের সময়ে ইহা ভূমি-কর অর্থে ব্যবহৃত হইত এবং বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা ইহাতেই সীমাব্ধ। we¯ÍwiZ-Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৬, খ. ৯,পৃ.৬৩১

২৬০. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৬

২৬১. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৭

‘জিযিয়া দেবার বিনিময়ে মুসলমানদের সঙ্গে দামেস্কের অধিবাসীদের শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে মুসলমানেরা তাদের জীবন ও ধনসম্পদ এবং চার্চ রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন। তারা কোন নতুন চার্চ নিমার্ণ করতে পারবেন না। অবশ্য পুরাতন চার্চগুলো তারা সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করতে পারেন। দামেস্কের অধিবাসীগণ পুল সংস্কার করতে বাধ্য ছিলেন এবং একাজ তারা স্বাছন্দে করতে পারেন। তাদের অঞ্চল দিয়ে সফরের সময় তারা মুসলমানদের অভ্যর্থনা করতেন, তিনদিন আদর-আপ্যায়ন করতেন ও প্রয়োজন হলে তাদের পথ দেখিয়ে দিতেন। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীদের জন্য আলোক-সংকেতের ব্যবস্থা করতেন এবং কোন মুসলমানকে প্রহার বা অসম্মান করতে পারতেন না। নামাজের সময় তাদের ঘন্টা বাজাবার অধিকার ছিল না। মুসলিম জনসমাবেশে তারা ক্রুশ বা শূকর নিয়ে যেতে পারতেন না। সামরিক পোশাক পরিধান করতে, অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে বা ধর্মীয় উৎসব ছাড়া ভোজের সময় নিশান বহন করতে তাদের অনুমিত দেয়া হত না।’

চুক্তির এ ধারাগুলো দামেস্কের অধিবাসীরা সানন্দে গ্রহণ করেন। ফলে অন্যান্য অনেক গোত্রও এসব নীতির ওপর ভিত্তি করে মুসলিম কর্তৃপক্ষের অধীনে চলে আসে। যখন খলিফা উমরের (রা.) কাছে এগুলো অনুমোদনের প্রার্থনা জানানো হয়, তখন তিনি বললেন ঃ

‘সিরিয়ার শহর ও নগরগুলোর অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পন্ন চুক্তিগুলো আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। এবং আমি আমার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে তাঁদের মতামতও জানতে পেরেছি। এগুলো ও আল্লাহর কেতাবের ওপর ভিত্তি করে, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে কুরআন মাজিদের সূরা হাশরের ৬, ৭ ও ৮ নং আয়াতে।

6bs AvqvZ, Avjøvn Bqvû‘x‡‘i wbKU nB‡Z Zvnvi ivmj (mv.) †K †h dvq w‘qv‡Qb, Zvnvi Rb¨ †Zvgiv A‡k wKsev D‡ó Av‡ivnY Kwiqv h× Ki bvB; Avjøvn †Zv hvnvi Dci B”Qv Znvi ivmj‡‘i‡K KZZ ‘vb K‡ib; Avjøvn mewel‡q mekw³gvb|

7bs AvqvZ Avjøvn Rbc‘evmx‡‘i wbKU nB‡Z Zvnvi ivmj‡K †h dvq w‘qv‡Qb Zvnv Avjøvni Zvnvi ivm‡ji, ivm‡ji ¯RbM‡Yi, BqvZxg‡‘i, AfveM¯Í I c_Pvix‡‘i, hvnv‡Z †Zvgv‡‘i g‡a¨ hvnviv weËevb †Kej Zvnv‡‘i g‡a¨B Hkh AveZb bv K‡i| ivmj (mv.) †Zvgv‡‘i‡K hvnv †‘q Zvnv †Zvgiv MnY Ki Ges hvnv nB‡Z †Zvgv‡‘i‡K wb‡la K‡i Zvnv nB‡Z weiZ _vK Ges †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki; Avjøvn †Zv kw¯Í ‘v‡b K‡Vvi| (miv nvki)

8bs AvqvZ GB m¤ú‘ AfveM¯Í gnwRiM‡Yi Rb¨ hvnviv wb‡R‡‘i Niewo I m¤úwË nB‡Z DrLvZ nBqv‡Q| Zvnviv Avjøvni AbMn I mšwó Kvgbv K‡i Ges Avjøvn I Zvnvi ivm‡ji mvnvh¨ K‡i| DnviB †Zv mZ¨vkqx|[262]

আমি যে সিদ্ধান্তে এসেছি তা হল এই যে, যে দেশ আপনারা দখল করেছেন, তা সেখানকার অধিবাসীদেরই থাকবে, তারাই সেখানকার কৃষিকার্য পরিচালনা করবে। আর আল-কোরআনের নির্দেশ অনুসারে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী আপনারা তাদের ওপর জিযিয়া ধার্য করবেন। তারা জিযিয়া দান করবে আপনারা তাদের কাছ থেকে আর কিছু চাইবেন না। আর জমি যদি সাবেক অধিবাসীদেরই থাকে, তবে মুসলমানেরা এর থেকে ফসল ভোগ করতে পারবে।

'তাই আপনারা তাদের (যিম্মিদের)[২৬৩] ওপর জিযিয়া ধার্য করবেন; কিন্তু কখনও তাদের বন্দী করবেন না কিংবা তাদের ওপর কোন প্রকার অত্যাচার বা ক্ষতি সাধন করবেন না। সত্যিকার দাবী না থাকলে আপনারা তাদের কাছ থেকে ধনসম্পদও গ্রহণ করবেন না। তাদের সঙ্গে আপনারা যে চুক্তি সম্পাদিত করেছেন, তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবেন। উৎসবের দিনে বছরে একদিন করে ক্রুশ বের করা সম্বন্ধে বলতে চাই যে, তারা তাদের নিশান বাইরে না আনে, তবে শহরের বাইরে ক্রুশ আনতে তাদের বাঁধা দেবেন না।'

আবু ইউসুফ (র.) যদিও কেবল হযরত উমর (রা.) আবু উবায়দার অনুসৃত নীতি অনুমোদন করে যে পত্র লিখেছিলেন, তা হুবহু বিধৃত করেছেন, তবু একথা বলা যায় যে, হযরত উমর (রা.) খালিদের নীতি অনুমোদন করেন। পরবর্তীযুগে কেতাবিদের[২৬৪] সঙ্গে যতগুলো চুক্তি সম্পাদিত হয়, সবই কিয়ামতের দিন অবধি চালু থাকবে।

আবু উবায়দার কাছে লিখিত পত্রে আমরা যে কেবল ক্রুশ ও চার্চ সম্পর্কে কতকগুলো নতুন নতুন দাবী সন্নিবেশিত দেখতে পাই তাই নয়, এগুলো সব যিম্মিদের জন্যই কার্যকরী করা হয়। অবশ্য ইরাকের খৃস্টানদের সঙ্গ সম্পন্ন খালিদের চুক্তিতে এসবের কোন উল্লেখ ছিল না। শত্রুপক্ষের নিকট হতে দখলকৃত জমিজমা সম্পর্কেও এ নীতির উল্লেখ দেখতে পাই। হযরত উমর (রা.) বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, গ্রামাঞ্চলের জমিজমা (শহর বা নগরের জমিজমা নয়) গানিমা হিসেবে যোদ্ধা বা জেহাদীদের মধ্যে বন্টন

২৬২. আল-কুরআন, ৫৯ : ৬-৮
২৬৩. বিস্তারিত- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, খ. ২১, পৃ.৬১৫ এবং আহলুল যিম্মা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭৪
২৬৪. প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.২৭৫

করে দেয়া যাবে না। এ জমি হস্তান্তরিত করাও চলবে না। এসব যিম্মি কৃষকদের হাতেই থাকবে। তারাই জমি চাষ করবে এবং মুসলমান, তাদের বংশধর ও তাদের নিজেদের (কৃষকদের) কল্যাণে সামর্থ অনুযায়ী জিযিয়া প্রদান করবে।[২৬৫] খেয়াল করার বিষয় যে, খালিদ ও আবু উবায়দা (রা.) উভয়ের চুক্তিতেই জিযিয়া এমন একটি শুল্ক বলে গণ্য হয়েছে যার সাথে আয়ের উৎস বা পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নেই। হযরত উমরের (রা.) চিঠিতে কেবল উক্ত জমিরই উল্লেখ আছে যা যিম্মিরা জিযিয়া প্রদান করে নিজেদের বলে দাবী করতে পারত। প্রশ্ন উঠতে পারে, হযরত উমর (রা.) কি খারাজ বা ভূমি-রাজস্ব হিসেবে অন্য কোন শুল্ক দাবী করতেন। অথবা যিম্মিরা কৃষক হিসেবে যখন জমির ওপরেই একান্তভাবে নির্ভর করত, তখন এ শুল্কের আর প্রয়োজন ছিল না– একি সত্য? আবু ইউসুফ (র.) ও বালাযুরীর প্রদত্ত চুক্তিগুলোর দলিল দেখে এর কোন সুরাহা করা যায় নি। অবশ্য দুজনেই বলেছেন যে, হযরত উমরের হুকুম-নামায় জিযিয়া ও খরাজ উভয়ই রয়েছে।

হযরত উমর (রা.) এর সনদ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, খলিফা হযরত উমর (রা.) যিম্মিদের মর্যাদা সম্পর্কে সুসামঞ্জস ও সর্বাঙ্গীন কোন নিয়ম নির্দেশ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, আংশিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কার্যাবলী এবং আংশিকভাবে হযরত উমর (রা.)-এর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনামা ও পরবর্তী খলিফাদের কার্যধারার ওপর ভিত্তি করেই এসব নিয়ম-কানুন ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে। তবু আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাগণের কাছ থেকে কত গুলো দলিল পাওয়া গেছে। এসব দলিলে বিভিন্ন কানুন ও নীতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলো নাকি হযরত উমর (রা.) যিম্মিদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নিরূপনের জন্য জারী করেন। একেই হযরত উমর (রা.)-এর সনদ বলা হয়। সিরিয়ার খৃস্টানগণ আবু উবায়দা (রা.) নিকট যে দরখাস্ত পেশ করেন, হযরত উমর তা অনুমোদন করেন।[২৬৬] এর বিবরণ নিচে দেয়া হল ঃ

"আপনারা যখন আমাদের দেশে আসেন, তখন আমরা আপনাদের নিকট থেকে জীবনের নিরাপত্তা এবং এখানকার অধিবাসীগণ ধর্মের স্বাধীনতা পেতে চাই। আর আমরা এসব বিষয়গুলো মেনে নিয়েছি– দামেস্কে ও এর চারপাশে কোন চার্চ, ধর্মস্থান বা ধর্মযাজকালয় নির্মাণ করা হবে না। যে সব চার্চ বিনষ্ট

২৬৫. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী: Avj -wn ‘vqvn, দেওবন্দ: মাকতাবায়ে থানুবী, তাবি, খ. ১, পৃ.৭৫

২৬৬. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ,প্রাগুক্ত,পৃ.১২৫

হয়ে গেছে, সেগুলো আমরা সংস্কার করব না। মুসলিম বাসস্থান অঞ্চলেও এই একই রীতি অনুসৃত হবে। দিনে বা রাত্রিকালে চার্চগুলোতে সাময়িকভাবে অপেক্ষা করার অধিকার মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া চলবে না। পরিব্রাজক ও মুসাফিরের জন্যে দরজা সর্বক্ষণ খোলা থাকবে। চার্চে বা বাড়ীতে কোন গুপ্তচরকে আমরা আশ্রয় দেব না। মুসলিমদের প্রতি বিশ্বাসঘাতককে আমরা লুকিয়ে রাখব না। মৃদুভাবে আমরা চার্চে 'নাকুস' বাজাব। সেখানে আমরা ক্রুশ ঝোলাব না এবং উচ্চস্বরে উপাসনা বা ধর্ম-সঙ্গীত গাইব না, মিছিল করে আমরা ক্রুশ বা বাইবেল নিয়ে যেতে পারব না; ইস্টার বা বিশেষ রবিবারে আমরা মিছিল বার করতে পারব না; মৃতদেহের ওপর উচ্চস্বরে কাঁদা চলবে না বা মুসলিম -বাজারে আগুনসহ মৃতদেহ নিয়ে যেতে পারব না' মুসলিমদের কবরের নিকট আমরা কাউকে কবর দেব না' মুসলমানদের সমাবেশে মদ বিক্রয় বা পৌত্তলিকতার বাহ্যিক প্রদর্শনও নিষিদ্ধ। আমাদের ধর্মে মুসলিমদের প্রলুব্ধ করতে বা আহ্বান করতে পারব না; মুসলমানদের দাসদের আমরা রাখতে পারব না; আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনকে আমরা ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারব না; আমাদের ধর্মের কোন প্রচার আমরা করব না; মুসলমানদের মত আমরা কালানসুয়া, পাগড়ী, জুতা ব্যবহার করতে পারব না; তাঁদের মত চুল ছাঁটতে বা অশ্বে আরোহণ করতে পারব না; তাঁদের ভাষা আমরা ব্যবহার করতে পারব না; তাঁদের নামের মত আমরা নাম গ্রহণ করতে পারব না; আমাদের সামনের চুল কাটতে হবে ও বিভক্ত করে রাখতে হবে; কোমরে যুননার ঝোলাতে হবে; আমাদের সিলমোহরের আরবী অক্ষর লেখা যাবে না; ঘোড়ার জিন ব্যবহার করা চলবে না; আমরা বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র রাখতে পারব না এবং তরবারী বহন করতে পারব না; মুসলমানদের সমাবেশে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে; তাদের রাস্তা দেখিয়ে দিতে হবে; তারা যখন চাইবেন, জনসভায় তাদের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াতে হবে; আমাদের বাড়ীঘর তাদের বাড়ীঘরের চাইতে উঁচু করে তৈরী করা চলবে না; আমাদের ছেলে-মেয়েদের আমরা কোরআন শেখাতে পারব না; ব্যবসায় ভিন্ন আর কোন ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে শরিক হতে পারব না; আমাদের চলতি প্রথা-মত প্রত্যেকটি মুসলিম পরিব্রাজককে তিনদিন আপ্যায়িত করব ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করব। আমরা কোন মুসলমানকে অবমাননা করব না। যে ব্যক্তি মুসলমানকে আঘাত করবে, তার অধিকার ও দাবী-দাওয়া নস্যাৎ হয়ে যাবে।"[২৬৭]

২৬৭. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮-১৩৯

ওপরেরটিই একমাত্র দলিল নয়' ছোট-বড় এমনি ধারার আরো অনেক দলিল আছে। অবশ্য, এগুলো মূল ধারার দিক দিয়ে একই রকম। একথা প্রমাণ করার দরকার নেই যে, হযরত উমর (রা.) তথাকথিত এ সনদটি তাঁর সময়কার নয়। পরবর্তী যুগেই এটি বিধিবদ্ধ হয়। কারণ, এর মধ্যে যে সব বাধ্যবাধকতা আছে, তা সেনাপতিদের প্রতি হযরত উমর (রা.)-এর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনামার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। অনুদারতা ও নিপীড়নই এ ধারাগুলোর ভিত্তি। হযরত উমরের উদারতার নযির এর মধ্যে পাওয়া যায় না।

অবশ্য, সনদটির আইনগত গুরুত্ব সমধিক। কারণ, ইসলামের প্রথম যুগের আইনবিদগণ এর ওপর ভিত্তি করেই আইনের বিধান দিয়েছেন। সর্বসম্মতিক্রমে এটা যিম্মিদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নির্ণয়ের নির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এর আইনগত বৈধতার ফলে ঐতিহাসিক প্রামাণ্যের প্রশ্নটি আর কেউ তোলে না।

যুদ্ধ-বন্দী

যুদ্ধ-বন্দীদের 'গানিমার' অংশ হিসেবে গণ্য করার রীতি খুবই প্রাচীন এবং পুরাকাল থেকেই এ প্রথা চলে আসছে। পারসিকগণ যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি অমানুষিক ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করত। বন্দীদের অন্ধ করে দেয়া হত, শারীরিক কষ্ট দেয়া হত, মেরে ফেলা হত কিংবা ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হত। ইহুদীদের রীতি পারসিকদের চাইতেও কম নৃশংস ছিল না। যুদ্ধ-বন্দীদের সম্পর্কে আইন আল-কোরআনের এ নির্দেশের মধ্যে পাওয়া যায়ঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ

অর্থ: "দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়।"[২৬৮]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ
فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ؕ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ
لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَاۡ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ
يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ (۴)سَيَهْدِيْهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ ۚ (۵)

---

২৬৮. আল-কুরআন, ৮ : ৬৭

অর্থ: “অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদেরকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। ইহাই বিধান। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে উহাদেরকে শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে। যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদের কর্ম বিনষ্ট হইতে দেন না। তিনি তাহাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাহাদের অবস্থা ভাল করিয়া দেন।”[২৬৯]

যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন আইনপন্থীদের মধ্যে নানামতের সৃষ্টি হয়েছে। আইনবিদরা এ চারটি পন্থার যে কোন একটি অনুসরণ করতে ইমামকে পরামর্শ দিয়েছেন ঃ[২৭০]

প্রথমতঃ ইমাম যুদ্ধ-বন্দীদের সবাইকে বা কিছুসংখ্যককে মেরে ফেলার হুকুম দিতে পারেন। আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, বিশেষ কারণ ভিন্ন হত্যা করা উচিত নয়। শত্রুপক্ষকে দুর্বল করে দেবার জন্য বা বৃহত্তর মুসলিম স্বার্থের খাতিরে এ নীতির প্রয়োজন হতেও পারে। আউযায়ী বলেন যে, যুদ্ধ-বন্দীকে হত্যার পূর্বে মৃত্যুদণ্ডের বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে তাকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ তিনি আল-কোরআনের নির্দেশানুযায়ী ‘ফিদা’[২৭১] (যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্ত করার জন্য ক্ষতিপূরণ)

গ্রহণ করে তাদের মুক্ত করে দিতে পারেন; অথবা ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকেও তাদের ছেড়ে দিতে পারেন। খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ফিদা নিয়ে মুক্ত করার বিরোধী ছিলেন।

তৃতীয়তঃ তিনি মুসলিম যুদ্ধ-বন্দীদের সঙ্গে এসব বন্দীদের বিনিময় করতে পারেন। খলিফা হযরত উমর (রা.) মুসলিম যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্ত করার ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁর মতে, এজন্য গানিমা থেকেও অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে কিংবা বায়তুল মাল থেকে টাকা দিয়ে তাদের মুক্ত করা যেতে পারে। ইমাম মালিক (র.) বলেন যে, যুদ্ধ-বন্দীদের যদি দাসে পরিণত করা না হয়, তবে হয় তাদের হত্যা করতে হবে নতুবা

---

২৬৯. আল-কুরআন, ৪৭ : ৪-৫

২৭০. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত,পৃ.২০৮

২৭১. ফিদা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সচরাচর মুসলমানদের হাতে খৃস্টান বন্দী ও ক্রীতদাসদের মুক্তি অথবা মুক্তিপণের ক্ষতিপূরণের পারস্পরিক বন্দী ও ক্রীতদাসদের মুক্তি অথবা মুক্তিপনের ক্ষতিপূরনের পারস্পরিক বিনিময়ের কাজের সহিত যুক্ত হইয়া পড়ে। বস্তুত যেই ক্ষেত্রে একজন অবিশ্বাসী তাহার হাতে বন্দী মুসলমানগণকে অন্য কোন প্রকারে মুক্তি প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, সেই ক্ষেত্রে ইসলাম খৃস্টান বন্দীদের বিনিময়ে মুসলমানগণকে মুক্ত করার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, এমনকি যদি শেষোক্ত খৃস্টানগণ মুক্তি লাভের পর দারু’ল-ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার আশংকা থাকে। we¯ÍwiZ- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, খ. ১৫, পৃ.১১০

মুসলিম যুদ্ধ-বন্দীদের সঙ্গে বিনিময় করতে হবে। আব্বসীয় আমলে এটাই সাধারণত নীতি হয়ে দাঁড়ায় এবং চুক্তি মারফত বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।[২৭২]

চতুর্থতঃ ইমাম যুদ্ধ-বন্দীদের দাসে পরিণত করতে পারেন। দাসদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে ইসলামে বিস্তারত আলোচন করা হযেছে।

যুদ্ধ-বন্দী হিসেবে সুবিখ্যাত পারসিক সেনাপতি আল হারমুযানের[২৭৩] বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূণ হারমুযানকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন আল-হারমুযান জবাব দেন (মুগীরা ইবনে শূবা দোভাষী ছিলেন)ঃ

প্রাক-ইসলামী যুগে আল্লাহ নিরপেক্ষ ছিলেন এবং আমাদের যুদ্ধ করার সুযোগ দান করেন। আর এভাবেই আমরা আপনাদের ওপর জয়ী হই।

হযরত উমর (রা.) বললেন, না। এর কারণ হল, আপনারা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, আর আমরা তা ছিলাম না। এখন বলুন, আপনি কেন শান্তির ওয়াদা পালন করেন নি?

হারমুযান জবাব দিলেন ঃ আমার ভয় হয়, আপনি আমার কথা শেষ হবার পূর্বেই আমাকে হত্যা করবেন।

তৃষ্ণায় প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় তিনি পানি চাইলেন। খলিফা বললেন, ঃ তাকে শান্তিতে পানি পান করতে দাও।

বন্দী বললেন ঃ না, আমার ভয় হয়, কেউ আমাকে অজান্তে হত্যা করবে।

হযরত উমর (রা.) বললেন ঃ পানি পান না করা পর্যন্ত আপনার জীবন নিরাপদ।

হারমুযান ভাবলেন, তিনি জয়ী হয়েছেন। তাই তিনি পানি মাটিতে ফেলে দিলেন। খলিফা আর এক পেয়ালা পানি আনতে বললেন। কিন্তু হারমুযান বললেন যে, তাঁর আর পানির দরকার নেই। 'আমি পানি চাই নে, চেয়েছি নিরাপত্তা (আমান)। আর তা তো আপনি আমাকে দান করেছেন।

হযরত উমর বললেন ঃ মিথ্যাবাদি! আমি তোমাকে হত্যা করব।[২৭৪] খলিফার পারিষদগণ বাধা দিয়ে বললেন যে, তাঁকে তো ইতিমধ্যেই আমান দেয়া হয়ে গেছে। তখন খলিফা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দানের

---

২৭২. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০-৩৮

২৭৩. ইনি প্রথম ইরাক অভিযানে মুসলমানদের বির“দ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। হারমুযান খৃস্টীয় ৬৪০ সনে বন্দী হন এবং তাঁকে মদিনায় প্রেরণ করা হয়। খলিফা হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে মৃত্যুদ' দ'িত করার মনস্থ করেন।

আইনগত পন্থা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোন কিছুই খুঁজে পেলেন না। তাই তাঁকে ক্ষান্ত হতে হল। তিনি বললেন ঃ 'লোকটা আমায় ঠকিয়েছে। কিন্তু আমি তো সে লোকের জীবন বাঁচাতে পারি না, যে ব্যক্তি বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করে অতগুলো বিশ্বাসীকে হত্যা করেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যে পর্যন্ত আপনি ইসলাম গ্রহণ না করেন, সে পর্যন্ত আপনি প্রতারণা দ্বারা বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না।' তৎক্ষণাৎ সেখানেই আল-হারমুযান ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর স্বাধীনভাবে তিনি মদিনায় বসবাস করতে থাকেন এবং বায়তুল মাল থেকে একটি বৃত্তি লাভ করেন।[২৭৫]

আইনজ্ঞগণ এ সম্বন্ধে একমত যে, সাবীকে হত্যা করা যাবে না। এর মধ্যে অনেক মহিলা ও শিশু থাকে। তাদে দাসে পরিণত করে বণ্টন করে দিতে হবে।[২৭৬] কোন কোন মহিলা ও শিশুকে মৃত্যুদণ্ড দান করা হয়। কিন্তু রাসূল করীম হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহিলা ও শিশু হত্যার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। সাবীদের বিনিময়ে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার রীতি তিনিই প্রবর্তন করেন।

শত্রুপক্ষ কর্তৃক ধৃত মুসলিম বন্দীগণ শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না এবং তাদের হুকুম তামিল করবেন না। যদি তারা পালিয়ে যেতে পারেন কিংবা শত্রুপক্ষের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে পারেন, তবে তা করবেন। যদি মুসলিম বন্দীগণ পালিয়ে না যাবার ওয়াদা দিয়ে থাকেন, তবে তিনি তা যথাযোগ্যভাবে পালন করবেন। মুসলিম বন্দীগণ কখনও শত্রুপক্ষকে মুসলমানদের প্রয়োজনীয় খবরাখবর দিবেন না। এটাই তাদের কর্তব্য। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও শরিক হবেন না ও ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারবেন না। অবশ্য জোরপূর্বক যদি তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। যদি কোন মুসলিম মহিলা শত্রু-হস্তে বন্দী হন, তবে তাঁকে প্রহার করলেও তিনি তাদের কোন দাবী দাওয়া মেনে নেবেন না। তাঁর জীবন বিপন্ন হলে অবশ্য অন্য কথা। ইমাম লোক বা সম্পত্তি বিনিময়ের দ্বারা বন্দীদের মুক্ত করার বন্দোবস্ত করবেন।[২৭৭]

২৭৪. এ.জে. এম শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র, প্রাগুক্ত,পৃ.২০
২৭৫. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০-৯৩
২৭৬. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫
২৭৭. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী:Av j -wn 'vqvn, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১২৩

স্থলবাহিনীর সেনাপতির নিকট খলিফা উমর (রা.)-এর উপদেশ

যখনই উমর কোথাও সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন তিনি সেনাপতিগণকে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিতেন এবং অতঃপর পতাকা দেওয়ার সময় বলতেনঃ

"আল্লাহর নামে ও আল্লাহর সাহায্যে। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের আশায় ধাবিত হও। সদাচার ও সহনশীলতায় অটল হও। আল্লাহর পথে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তথাপি সীমা লঙ্ঘন করো না, কারণ সীমা লঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন না।

যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করো না। তোমার শক্তি থাকলেও অঙ্গচ্ছেদ করো না। বিজয়ী হলে বাড়াবাড়ি করো না। বৃদ্ধ বা নাবালককে হত্যা করো না, বরং দুই বাহিনীর ভিতর সংঘর্ষের সময়ে, বিজয়ের উত্তেজনার মুহূর্তে এবং পরিকল্পিত আক্রমণের সময়ে তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। গনিমতের বন্টনের ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা করো না। পার্থিব লাভের চিন্তা হতে জিহাদকে পবিত্র করো। আল্লাহর সঙ্গে যে চুক্তি তোমার হয়েছে তার জন্য আনন্দ করো এবং তাই মহান সাফল্য।"[২৭৮]

তিনি তাঁকে বাইরে ও ভিতরের সকল কাজে আল্লাহর ভয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর আদেশ পালন করার জন্যে কাজ করতে এবং পবিত্র কর্ম ও সন্তোষজনক ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর সংগে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাঁকে সদাচারী হতে, ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে, তাঁর উপর অর্পিত আমানতের যোগ্য হতে এবং তাঁর প্রতিটি কর্মে ও পদক্ষেপে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারী নাই, একথা বিশ্বাস করতে তাকে আদেশ দিয়েছেন।[২৭৯]

আমীরুল মুমিনীন-যে কর্তব্য তাঁকে সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়েছেন তা এই আশায় যে, তাঁর দক্ষতা, যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও নিয়মানুবর্তিতার জ্ঞান আছে; যার ফলে তিনি অন্যায় ও দুষ্কৃতিকারিগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে পারবেন এবং দেশবাসীর উন্নতি বিধান করতে পারবেন।

তিনি তাঁকে অপ্রিয় কার্যকলাপ হতে, নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহ হতে এবং আল্লাহ, কর্তৃক যে সব আদেশ লঙ্ঘনকে এবং বস্তুসমূহকে পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে সে সব হতে বিরত থাকা, তাঁর সেনাবাহিনী ও লোক-লষ্করকে কোন প্রজাপীড়নের চেষ্টা না করা, কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না করা এবং তাদেরকে সর্বদা ন্যায় পরায়ণ হতে, আনুগত্যের পথে আগুয়ান হতে এবং দেশের ভিতর আল্লাহর শত্রুকে আঘাত হানতে এবং তাদের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রসদ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে আদেশ দিয়েছেন।[২৮০]

২৭৮. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৯
২৭৯. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৮
২৮০. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭-৫৮

অন্তর্ভুক্ত এলাকার অধিবাসীগণকে অধিকার দান

বিজিত এলাকায় কোনো শত্রুর প্রাক্তন প্রজাগণকে বিজয়ীর প্রতি শান্তিকামী, আইনানুগ আশা করা যায় এবং কোনোক্রমেই শত্রু ভাবাপন্ন ভাবা যায় না। কিন্তু যদি তাদের জেলা বা দেশ নূতন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবু তাদেরকে নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক বলপূর্বক করা হবে না; কিন্তু তাদেরকে একটি বৎসর সময় দেওয়া হয়, যাতে তারা হয় দেশ ত্যাগ করে যাবে নতুবা মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হবে। সমস্ত অধিবাসিগণকে প্রজা হিসাবে গ্রহণ করার আবশ্যকতা নাই; তাদের কিয়দংশকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। খলিফা উমর (রা.) ইহুদী, গ্রীক ও দস্যুদিগকে জেরুযালেমে বাস করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

যদি তারা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত, তাহলে তাদেরকে জিযিয়া কিংবা নতুন সরকার ও তাদের মধ্যে যে চুক্তি হত, তা দিতে হত। অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করার পর তারা সাধারণ প্রজা বলে গণ্য হয়।[২৮১]

আরব উপদ্বীপের বেদূইনগণ কর্তৃক উত্তরে ফারটাইল ক্রিসেন্ট লুণ্ঠন বোধ হয় প্রথম নহে। খুব সম্ভবত আসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, কলদীয় ও ফুনিসীয় সেমিটিকগণ উপদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া বিশাল সাম্রাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। হিব্রুগণ বহির্বিশ্বে একটি ধর্মীয় ছাপ রাখিয়া যায়। তাহাদের অনুসরণ করিয়া আরবগণও একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং তৎসঙ্গে একটি ধর্মও চাপাইয়া দেয়। [২৮২]

নূতন ধর্ম বিস্তারের জন্য বহু কর্মপন্থার নায়ক উমর (রা.)-কে ইসলামের ইতিহাসে সেন্ট পলের সহিত তুলনা করা যায়। কিন্তু সেন্ট পলের ন্যায় তিনি রোমের নিকট আশ্রয় চান নাই বরং তিনি রোম ও ইরানের সাম্রাজ্যকে হুমকি প্রদর্শন করেন এবং পরাজিত করেন। তিনি একজন আরব, ইসলামের একজন একাগ্র অনুসারী এবং যে ধর্মতন্ত্রের জন্য তিনি আমীর-উল-মুমেনীন বা বিশ্বাসীদের সেনাপতি সেই ধর্মে একজন পাকা বিশ্বাসী। তদনুসারে তাঁহার উদ্দেশ্য তিনটি-একটি হইল, আরবকে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল করিয়া একটি আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য তিনি সমস্থ অমুসলিম এমনকি খ্রিষ্টান ও ইহুদীদিগকেও আরব হইত বহিষ্কার করেন, আরবদেশ সম্পূর্ণভাবে একটি মুসলিম ভূমিতে পরিণত হয়।

২৮১. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
২৮২. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, (অনু. মোহাম্মদ এনামুল হক), প্রাগুক্ত,পৃ.৫৯

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল, সেই সাম্রাজ্যে ইসলাম একমাত্র ধর্ম না হইলেও অন্তত প্রধান ধর্মে পরিণত হয়।

তৃতীয় উদ্দেশ্য হইল, যেহেতু আল্লাহ্ ও পবিত্র কোরআনের ভাষা আরবি সেহেতু সাম্রাজের ভাষাও আরবি হয়।

হযরত উমর (রা.) ও তাঁহার সভাসদগণ বিশ্ব ইতিহাসে এইসব পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রথম বা শেষ জাতি নহেন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে তিনি এবং তাঁহার অনুসারিগণ ছিলেন বেশি কৃতকার্য।

যুদ্ধে অর্থ ব্যয় হয় এবং অর্থ আসে জনগণের কাছ হইতে। যুদ্ধের ব্যাপক খরচ এবং উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের উচ্চমানের খরচ যোগাইবার দরুন বাইজানটিয়াম ও ইরানের জনসাধারণ তখন বিশাল করের বোঝায় ভারগ্রস্থ।[২৮৩]

অধিকন্তু, খ্রিষ্টান ও জরথুস্ত্র উভয় ধর্মের প্রাথমিক শক্তি নিঃশেষ হইয়া তখন বাইজানটিয়ামে সীমাহীন ধর্মতাত্ত্বিক শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। অপর দিকে ইরানে পুরোহিত শ্রেণীর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। যীশুখ্রীষ্টের মাত্র একটি প্রকৃতিতে বিশ্বাসী মনোফিজাটগণ এবং তাঁহার অলৌকিক ও মানবীয় এই দুই প্রকৃতিতে বিশ্বাসী খ্রীষ্টানদের মধ্যে তখন তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছে। যীশুখ্রিষ্টের প্রকৃতি উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ইচ্ছা কার্যকরী করিবার জন্য হেরাক্লিয়াস এক অভিনব প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ইহা কোনো পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। উপরন্ত ইহা একটি তৃতীয় দলের সৃষ্টি করে।

যাযাবর বাহিনী কর্তৃক সুসভ্য জাতিকে জয় করা ইতিহাসে কোনো নূতন ঘটনা নহে। কিন্তু ইহা ব্যাখ্যা করা কঠিন। এই ক্ষেত্রে বাইজান্টাইন ও পারস্যবাসীদের ক্ষমতা এত বিশাল ছিল যে আবু বকর তাঁহার সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং উমর (রা.)ও ছিলেন খুবই সতর্ক। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিদল ছিলেন অপরিচিত । অতএব মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতির জন্য অন্য কাহারো চাইতে এইসব সেনাপতিদিগকেই অধিক সম্মান দেওয়া উচিৎ।[২৮৪]

---

২৮৩. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
২৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

ব্যাবিলন অধিকার

সেনাপতি থিওডোরাস আলেকজান্দ্রিয়ায় পলায়ন করেন এবং বাইজান্টাইন শাসনকর্তা সাইরাস ব্যাবিলনের দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাধ্য হইয়া সাইরাস মুসলমানদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসা করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু মুসলমানগণের শর্ত ছিল, ইসলাম গ্রহণ, কর প্রদান অথবা যুদ্ধ, এই তিনটির মধ্যে একটি সাইরাসকে বাছিয়া লইতে হইবে। বাইজান্টাইন শাসনকর্তা এই শর্তাগুলি হিরাক্লিয়াসকে জানাইলেন। সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া সাইরাসের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে নির্বাসিত করিরেন। এদিকে ব্যাবিলনে অবরোধ চলিতেছি। সাত মাস পরে হযরত জুবায়ের (রা.) পরিখা পূর্ণ করিয়া একটি মই দিয়া কয়েকজন সঙ্গীসহ 'আল্লাহু-আকবার' (আল্লাহু মহান) শব্দ করিয়া নগরীর মধ্যে অবতরণ করিয়া উহার দ্বার খুলিয়া দিলেন। ভীতসন্ত্র বাইজান্টাইন বাহিনী পলায়ন করিল (৬ এপ্রিল, ৬৪১ খ্রি:)।[২৮৫]

ইয়ারমুকের যুদ্ধের গুরুত্বঃ এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই যুগসন্ধিক্ষণকারী সংগ্রাম। এর কারণ এই যে, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সমগ্র সিরিয়া মুসলিম শাসনাধীনে আসে। এর ফলশ্রুতিতে মুসলিম বাহিনী সমগ্র সিরিয়া ও জর্ডাল দখল করে ইসলামী শাসন কায়েম করে। তারা সহজেই কিন্নীসিরিন, এন্টিওক, আলাস্কা, টায়ার, সিডন প্রভৃতি স্থান দখল করতে সক্ষম হয়।[২৮৬]

জেরুযালেম অধিকৃত (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ)ঃ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন অভিযানে জেরুযালেমের পতন একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর হযরত আমর-ইবন-আল-আস (রা.) জেরুযালেম অবরোধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে রোমান শাসনকর্তা আরতাবুন শহর পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। খলিফা হযরত উমর (রা.) জেরুযালেমে আগমন করে খ্রিস্টান ধর্মগুরু সাফ্রেনিয়াসের সাথে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন।

আফ্রিকা অভিযান

২৮৫. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৯৪
২৮৬. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

বার্কা ও ত্রিপনী বিজয় ঃ হযরত উমর (রা)- এর খিলাফতকালে হযরত আমর-ইবন-আল-আস (রা.) আলেকজান্দ্রিয়া হতে উত্তর আফ্রিকা বা ইফ্রিকায় অভিযান প্রেরণ করেন। রোমানদের ঘন ঘন আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে আমর (রা.) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে বার্কায় একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। খ্রিস্টান জনসাধারণ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে কর দানে স্বীকৃত হয়। বার্কা দখল করে ত্রিপলীতে অভিযান পরিচালিত করা হয় এবং এই অঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[২৮৭]

৬৩৪ সালের দিকে অনেক সতর্কতামূলক অগ্রগতির পর খালেদ ইবনে ওয়ালিদ পূর্ব সিরিয়া আক্রমণ করেন। তিনি এই কাজ সম্পন্ন করিতে পারিতেন না যদি বাইজান্টাইনদের সহিত চুক্তিবদ্ধ আরব ঘাসসানীয়গণ তাঁহার সহিত সহযোগিতা না করিত। ৬৩৫ সালের ফেব্রুয়ারির দিকে খালেদ বিন ওয়ালিদ দামেষ্ক নগরী অবরোধ করেন। তিনি অধিবাসীদিগকে তিনটি শর্ত প্রদান করেন- যাহা ইসলামের পরবর্তী যুদ্ধসমূহে নির্ধারিত নিয়মে পরিণত হয়। এই শর্তগুলি হইল ইসলাম গ্রহণ করা, জিজিয়া প্রদান করা অথবা যুদ্ধ করা।

৬৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে দামেস্ক আত্মসমর্পণ করে। এক বৎসর পর ৬৩৬ সালের আগেস্টে ইয়ারমূকে হেরাক্লিয়াস ও খালেদের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংগটিত হয়। আরবদের জয়েয় ফলে বাইজান্টাইন সম্রাটকে সমগ্র সিরিয়া ও ফিলিস্তিন মুসলমানদের নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করে। ৬৩৭ সালে সিরিয়া ৬৩৮ সালে জেরুজালেমের পতন হয়। এইভাবে সংক্ষিপ্ত চারি বৎসরে আরবগণ ফারটাইল ক্রিসেন্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বাইজান্টাইন প্রদেশগুলির প্রতুত্ব অর্জন করে।

সিরিয়াকে কেন্দ্র হিসাবে রাখিয়া আরবগণ আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও উত্তর ইরাকের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু উহার প্রবেশ করিতে কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়। হযরত আমর-ইবনে-আল-আস (রা.) যিনি মোটামুটি মিসরের সহিত পরিচিত ছিলেন, তথায় সেনাবাহিনীর একটি উপদল পরিচালনা করেন। এই পরিচালনার অনুমতি প্রদানে উমর দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ৬৩৯ সালের দিকে তিনি সীমান্তে উপনীত হন এবং লিউসিয়াম ও হেলিপোলিশের দিকে অগ্রসর হন। নববলে বলীয়ান হইয়া তিনি নীল

২৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

নদের পাড় ঘেষিয়া প্রসিদ্ধ নগরী আলেজান্দ্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ৬৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা পদানত করেন।[২৮৮]

পশ্চিমে অভিযান চলাকালে ইসলামের তৃতীয় সেনাপতি হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াককাস (রা.) প্রায় ৬০০০ সৈন্য লইয়া ইরাকের দিকে অগ্রসর হন। তিনটি প্রধান যুদ্ধের মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। প্রথমটি সংঘটিত হয় কাদিসিয়া নামক স্থানে ৬৩৫ সালের জুন মাসে এক উত্তপ্ত ধূলিঝড়ের দিনে। ইহাতে রুস্তমের নেতৃত্বে পারস্যবাসীগণ পরাজয় বরণ করে। দুই বৎসর পর ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী আরব গোত্রসমূহের সাহায্য লইয়া সাদ সাসানীয়দের রাজধানী তেসীফল অবরোধ করেন। ৬৩৭ সালে এই প্রসিদ্ধ রাজধানীর পতন হয়। নগরীর ধন-সম্পদ নিশ্চয়ই আরব সৈন্যদের কল্পনাতীত ছিল। ফলে তাহারা হৃদয় ভরিয়া তেসীফন লুন্ঠন করে। কথিত আছে যে, তাহারা রন্ধনকার্যের জন্য কর্পুর ব্যবহার করে, 'হলুদ খণ্ড, বা সাফরার (স্বর্ণ) পরিবর্তে 'সাদা খন্ড' বা বায়দা (রৌপ্য) বিনিময় করে। স্বর্ণ তাহারা ইতিপূর্বে দেখে নাই, রৌপ্য তাহাদের নিকট মোটামুটি পরিচিত। ইয়াজদাজারদের সেনাবাহিনীর একটি অংশ আরবদের সঙ্গে নেহাবান্দ বা আধুনিক হামাসানের নিকটে মিলিত হয় এবং ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত হয়। মার্ভ এলাকার কোনো এক স্থানে মাহ্ স্বয়ং একজন লোভী চাষীর হাতে নিহত হন এবং এইভাবে ২২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাসানীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে.[২৮৯]

৪.৩: হযরত উসমান (রা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি

(জ. ৫৭৬, খিলাফত-৬৪৪, মৃ. ১৭ জুন ৬৫৬)

হযরত উমর (রা.)-এর নীতি আশানুরূপ সময় পর্যন্ত স্থিতিশীল না হইবার কারণ তাঁহার উত্তরাধিকারী ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে দূর্বলতম শাসনকর্তা। উমর (রা.) যখন জানিতে পারিলেন-পারস্যবাসী আততায়ীর আঘাত হইতে তিনি রক্ষা পাইবেন না, তখন তিনি পরবর্তী খলিফা মনোনীত করিবার জন্য ছয় সদস্যের একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। আলী (রা.) এবং উসমান (রা.) উভয়েই এই কমিটির সদস্য। আলী (রা.)-কে হতাশ করিয়া উসমান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। উসমান ইবনে আফফান (রা.) তখন ৭০ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। তিনিও আলী (রা.)-এর ন্যায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জামাতা।

২৮৮. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২৮৯. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬৫

তিনি কোরাইশ বংশের অভিজাত উমাইয়া উপগোত্রের লোক-যে গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় তাঁহার প্রধান শত্রু ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দাবি অনুসারে মক্কা অধিকারের পর এই উমাইয়াগণ অক্ষতভাবে বাঁচিয়া যায়।

উমাইয়াগণ মদীনায় বসতি স্থাপন করিয়া ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্নস্তরে নেতৃত্ব প্রদান করে। তাহাদের চেষ্টার ফলেই বোধ হয় উসমান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। ফলে তাঁহার পরিবর্তে কার্যত উমাইয়া বংশের হাতেই রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা চলিয়া যায়। কোমলমতি, উৎসাহহীন এই বৃদ্ধ লোকটি জনসাধারণের কার্যাবলীর চাইতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতকেই বেশি প্রাধান্য দেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহার পরিবারের লোকদিগকে বিশ্বাস করিতে থাকেন। ফলে শীঘ্রই তাঁহার উমাইয়া আত্মীয়-স্বজন বিজিত প্রদেশগুলির শাসনকর্তা হিসাবে পুরাতন ও বিশ্বাসী যোদ্ধাদের স্থলাভিষিক্ত হন। এমন কি তিনি মিসর বিজয়ী আমর ইবনে আস (রা.)-কে গভর্নর পদ হইতে অপসারণ করিয়া তদস্থলে রাসূল (সা.) কর্তৃক ধিকৃত তাঁহার পালিত ভাইকে নিয়োগ করেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন উমর (রা.)-এর আদেশ আদেশ অমান্য করিয়া বিজিত দেশে জায়গাজমি দখল করিলে উসমান (রা.) না দেখার ভান করেন। অকোরাইশ আরবগণ এই আইন পছন্দ করিত না কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উমর (রা.)-এর ভয়ে উহার বিরোধিতা করিতে সাহস করে নাই, তাঁহারাও উসমান (রা.) এই অমনোযোগিতায় উৎসাহ লাভ করে।[২৯০]

আলেকজান্দ্রিয়ায় নৌ-অভিযান

৩১ হিঃ-৬৫২ খ্রীঃ সাইপ্রাসের পতনের তিন বৎসর পরে আফ্রিকার পোতাশ্রয় হইতে বিতাড়িত হইয়া বাইজান্টাইনগণ পুনরায় শক্তি সংগ্রহ করিতে থাকে এবং প্রায় ৫০০ রণতরী লইয়া আরব বাহিনীকে আক্রমণ করে। ইবনে আবি সারাহ মিসর ও আফ্রিকার রণপোতগুলি হইতে বাছাই-করা সৈন্য লইয়া শত্রুসমক্ষে অগ্রসর হন। আলেকজান্দ্রিয়ার সন্নিকটে শত্রুর রণবহর পরিলক্ষিত হইল। উভয়পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বাইজান্টাইনগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও মুসলমাগণের আক্রমনে টিকিতে না পারিয়া পলায়ন করে। সেনাপতি সিরাকুজের দিকে পলায়ন করেন এবং সেখানে নিহত হন। ৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল্লাহ্ নুবিয়ার অদিবাসীদিগের সহিত সন্ধি করিয়া উক্ত দেশ আরব প্রভাবে আনয়ন করেন।[২৯১]

---

২৯০. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

২৯১. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮০

খিলাফতের সম্প্রসারণ

পূর্বাঞ্চলে অভিযান ঃ মধ্য-এশিয়ায় অভিযান ঃ হযরত ওসমানের খিলাফতে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে সমরাভিযান প্রেরিত হয় এবং মুসলিম রাজ্য ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। পারস্য বিদ্রোহ দমন করে মুসলিম সৈন্যবাহিনী নিশাপুর, মার্ভ, বলখ, তুখারিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে আগমন করে রাজ্য জয় করে। ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ইয়াজদিগার্দের মৃত্যুতে সাসানীয় বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। এর ফলে ক্রমশ পারস্য, গজনী, কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান মুসলিম দখলে আসে।[২৯২]

পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান ঃ এশিয়া মাইনর, ত্রিপলী ও সাইপ্রাস দখল ঃ সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাইজানটাইন আক্রমণ প্রতিহত করেন। শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে মুসলিম বাহিনী এশিয়া মাইনর ও আর্মেনিয়া দখল করে এবং কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আলেকজান্দ্রিয়া বাইজানটাইনদের হস্তগত হলে ইবন আবি সারাহ একটি সুসংঘবদ্ধ বাহিনী নিয়ে শহরটি পুনরায় দখল করেন। আমর-ইবন-আল-আসের পরে নবনিযুক্ত মিসরীয় শাসনকর্তা আবদুল্লাহ-বিন-সাদের নির্দেশে উত্তর আফ্রিকার বার্কা ও ত্রিপলীর দিকে মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়। ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপলী মুসলমান অধিকারে আসে। ৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়ার নির্দেশে আবদুল্লাহ বিন কায়েসের নেতৃত্বে প্রথম মুসলিম নৌ-বহর সাইপ্রাস দখল করে। নৌ-বহর গঠনের ফলে পরবর্তীকালে রোডস দ্বীপ[২৯৩] দখল সহজতর হয় এবং সিসিলিতে আক্রমনের সূচনা হয়। [২৯৪]

নৌ-আক্রমণে বাইজান্টাইনদের নিকট হৃত আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরটি ৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে পুনরাধিকার করা হয়। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম বাহিনী বার্কা এলাকার উপর দিয়া আগ্রসর হইয়া ত্রিপলী ও প্রাচীন কার্থেজ অধিকার করে। উসমান (রা.) বার্বারদিগকে মহাগ্রন্থের লোক হিসাবে মর্যাদা দান করেন। ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দ

২৯২. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৬

২৯৩. ৫৩ হি. রোডস (Rhodes) আক্রমন করা হয়। ইহা রোম সাগরের ইফদ্বীপ আনাতোলীর নিকট অবস্থিত এবং খুবই উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে মুসলিমদের নতুন বসতি স্থাপন করা হয় (আল-বালাযুরী, ফতুহু'ল-বুলাদান, পৃ.২৩৬)। এই সময়ে সি'কি'লিয়্যাঃ (Sicily)-ও আক্রমণ করা হয়, কিন্তু জয়লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই। বিস্তারিত- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৬, খ. ১৯, পৃ.৪১৬

২৯৪. এ.জে. এম শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র, ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৬, পৃ.২৯

নাগাদ মুসলমানগণ ন্যুবিয়ানদের[২৯৫] সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করিতে আরম্ভ করে। সিরিয়ায় আরেকজন উমাইয়া বংশের সদস্য মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে আক্রমণ পরিচালিত হয়। তাঁহার নেতৃত্বে মুসলমানগণ তাহাদের প্রথম নৌযুদ্ধে সফলতা লাভ করে এবং সাইপ্রাস অধিকার করিয়া রোডস এর দিকে অগ্রসর হয়। উত্তরে মুসলমানগণ আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার কিয়দংশ দখল করে এবং পূর্বে আধুনিক আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের প্রান্তদেশে অগ্রসর হয়। [২৯৬]

তবে ইসলামের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি অধিকতরভাবে আভ্যন্তরীণ বিষয় বিশেষত উসমান (রা.)-এর অব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার বৈমাত্রর ভ্রাতাকে তিনি কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন-যিনি রাসূল (সা.)-এর প্রতি থুথু নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চাচাত ভাইকে খাজাঞ্চিখানার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে ব্যাপক স্বজনপ্রীতি ছাড়াও উসমান (রা.) গভর্নর পদ নগদ অর্থ বা সুন্দরী ক্রীতদাসী উপঢৌকনের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন। ফলে রাসূল (সা.)-এর ঘনিষ্ঠতম সহচরদের অনেকেই তাঁহার বিপক্ষে চলিয়া যান। এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াতে আলী ও তাঁহার সমর্থকগণ যে উৎসাহ প্রদান করেন তাহা একটি সাধারণ সত্য।[২৯৭]

নুবিয়া নামক রাষ্ট্রের সাথে মুসলমানদের চুক্তি

নুবিয়ায়[২৯৮] আবিসিনিয়ার মত ঘটনা সংঘটিত হয়নি; ফলে নুবিয়াকে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই নুবিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে নুবিয়ার পারস্পরিক ভিত্তিতে ব্যবসাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

---

২৯৫. বিস্তারিত- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, খ. ১৪, পৃ.১৯৭-২০১

২৯৬. সৈয়দ আমীর আলী, (অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সম্পা. ড. মফীজুল্লাহ কবীর), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯-৪১

২৯৭. হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে আনীত এই সমস্ত অপবাদ অতি পুরাতন। আধুনিক অনেক গ্রন্থে এই গুলিকে খন্ডন করিযা প্রমাণ করা হইয়াছে যে তিনি এই সমস্ত দোষের উর্ধ্বে চিলেন। আরব জাতির ইতিহাস গ্রন্থের অনুবাদক।

298. Nubia: region in northeastern Africa, extending from the first cataract of the Nile, in upper Egypt eastward to the Red sea southward to khartum and westward to the Libiyan Desert, the Muslims made invasions into the region from Egypt in 641 and 651. The second of which carried them as far as Dongola. The first king to bear a Muslim name was Abd Allah b. Sanbu who was installed in 1316, with the coming of the negroid Funj in the xviith c. the history of Nubia is merged in that of the Sudan.
Details-E.Van Donzel, *Islamic Desk Reference, Compiled from the Encyclopedia of Islam,* new York 1994, P.323

হযরত আমর বিন-আস (রা.) কর্তৃক মিসর বিজয়ের পর মুসলমানদের সঙ্গে নুবিয়াবাসীদের একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে উভয়পক্ষই বুঝতে পারল যে, অহেতুক একে অন্যের ভূখণ্ড আক্রমণ না করে পারস্পরিক সমঝোতায় আবদ্ধ হওয়াই ভালো। অতঃপর মিসরের পরবর্তী শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ-ইবনে-আবি সারাহ একটি চুক্তি সম্পাদনা করেন (খৃস্টাব্দ ৬৫২)। এতে স্থির হয় যে, নুবিয়ার অধিবাসীগণ প্রতি বছর ইসলামী রাষ্ট্রকে ৩৬০ জন দাস এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ গম, যব, ঘোড়া ও পোশাকাদি শুল্ক হিসেবে দান করবে। চুক্তিটির বিবরণ নীচে দেয়া হল ঃ[২৯৯]

'এটা সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ-বিন-আবি সারাহ কর্তৃক নুবিয়ার সরদার ও অধিবাসীদের প্রতি অঙ্গীকৃত চুক্তি। এ চুক্তি আসোয়ানের সীমান্ত থেকে আলওয়া পর্যন্ত নুবিয়ার ছোট বড়ো সকল অধিবাসীর প্রতি প্রযোজ্য।

আব্দুল্লাহ-বিন-সাদ নুবিয়ার অধিবাসী, প্রতিবেশী মিশর রাষ্ট্রের মুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিম ও জিম্মীদের মধ্যেও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন।

আপনাদের নুবীয় জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর রক্ষাকবচের ছায়াতলে নিরাপত্তা ভোগ করবে।[৩০০] যতদিন আপনারা চুক্তিটি পালন করবেন, ততদিন আমরা আপনাদের আক্রমন করব না বা আপনাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করব না কিংবা আপনাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করব না। সফরকারী হিসেবে আপনারা আমাদের দেশে সফর করতে পারবেন; কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবেন না। আমরাও সফরকারী হিসেবে (স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে নয়) আপনাদের দেশে প্রবেশ করব। মুসলমানগণ ও তাদের মিত্রগণ যখন আপনাদের দেশে প্রবেশ করবেন বা ভ্রমণ করবেন, তখন তারা সে স্থান পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আপনারা তাদের নিরাপত্তার ভার নেবেন।[৩০১]

আপনাদের দেশে মুসলমানদের কোন দাস পালিয়ে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া মাত্র আপনারা মুসলিম রাষ্ট্রে ফিরিয়ে দেবেন। আপনারা তার ওপর কোন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। কোন মুসলমান তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে তাকে আপনারা বাধা দিতে বা ভয় দেখাতে পারবেন না। সে (মুসলিম) ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে আপনাদের সাহায্য করতে হবে। আপনাদের নগরে যদি মুসলমানগণ কোন মসজিদ নির্মাণ করেন, তবে আপনারা তা সযত্নে রক্ষা করবেন। কাউকে সেই মসজিদে ইবাদাত করতে বাধা দিতে

২৯৯. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৩০০. Bmjwg wek‡Kvl- ইফাবা, (ঢাকাঃ ১৯৯৮, খ-১৪) ১৯৭-২০১
৩০১. মজিদ কাদ্দুরী, (অনু. অধ্যাপক হাসান জামান), প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৩-১৯৬

পারবেন না। আপনারা মসজিদখানাকে পরিষ্কার করে রাখবেন; এতে নিয়মিত প্রদীপ দেয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং একে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবেন।

প্রতি বছর আপনারা মুসলমানদের প্রধান শাসকের নিকট ৩৬০ জন দাস প্রেরণ করবেন।[৩০২] দাস-দাসীগণ যেন মধ্যম প্রকারের এবং সবল ও সুস্থ হয়– অতি বৃদ্ধ বা সল্প বয়স্ক শিশু যেন না হয়। এদের আপনারা আসোয়ানের শাসনকর্তার নিকট সমর্পণ করবেন।'

উপরোক্ত চুক্তিটি পর্যালোচনা করে বুঝা যায়,

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই যে, চুক্তিটির পারস্পরিক বিনিময় ভিত্তিক প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায় তাই নয়, বস্তুতঃ আইনবিষয়ক এবং রাজনৈতিক শর্তেও এটা সুপরিস্ফুট রয়েছে। এই শর্তাদির ভিত্তিতেই মুসলমানগণ ও নুবিয়াবাসীগণ পরস্পরের রাষ্ট্রে ভ্রমণকারীদের সফরের সুযোগ দান, পরস্পরের দেশে মহান নবীগণ এবং পরস্পরের ধর্মমত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের (যেমন নুবিয়ায় মুসলমানদের মসজিদ) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং পরস্পরের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে স্বীকৃত হয়। চুক্তির কার্যকালের মেয়াদ সম্পর্কে কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি; ফলে সাধারণ বিধি ও নিয়ম অনুসারে চুক্তিটি দশ বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়নি। তবে 'বাকত' (নির্ধারিত শ্রেণির শুল্ক) পরিশোধের নিয়ম বার্ষিক হওয়ায়, উভয়পক্ষই সময়ে সময়ে খুব সহজেই চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে নিতেন। এ অবস্থার ফলে কার্যতঃ দেখা যায় যে, মিশরে ফাতেমীয় খেলাফত পর্যন্ত ৬শ' বছরের অধিককাল চুক্তিটি অক্ষুন্ন ছিল।[৩০৩]

নিম্নলিখিত শর্তটি নুবিয়ার শাসকের সংগে সম্পাদিত চুক্তি হতে নেয়া হয়েছে, যে চুক্তি তৃতীয় খলিফা উসমানের খিলাফতের সময়ে মিসরের মুসলমান শাসনকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিলঃ

'হে নুবিয়াবাসিগণ তোমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর তরফ হতে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হচ্ছে। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করব না, যুদ্ধের প্রস্তুতিও নেব না, কিংবা তোমাদেরকে আক্রমণও করব না, যে পর্যন্ত তোমরা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির খেলাফে কাজ না করো...... কিন্তু যদি কোন শত্রু তোমাদের উপর হামলা করে তাকে বিতাড়িত করতে বা বাধা দিতে মুসলমানরা বাধ্য থাকবে না যদি ঘটনা উলওয়া ও আসওয়ান এলাকার মধ্যে ঘটে।'[৩০৪]

---

৩০২. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত,পৃ.১২৫

৩০৩. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

৩০৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২

সাইপ্রাস রাষ্ট্রের সাথে মুসলমানদের চুক্তি

সাইপ্রাস[৩০৫] (কুবরাস) উপরোক্ত বিশেষ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার আর একটি দৃষ্টান্ত। ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম আইন ব্যবস্থায় সাইপ্রাস একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে।

প্রথম মুয়াবিয়া যখন ৬৪৮ খৃস্টাব্দে সাইপ্রাস আক্রমণ করেন, তখন সাইপ্রাস ছিল বাইজান্টীয়দের অধিকারভুক্ত দ্বীপ।

এ দ্বীপটি বাইজান্টীয়দের শুল্ক প্রদান করত। সাইপ্রাস দখল করলে মুসলমানদের সঙ্গে বাইজান্টীয়দের আর একটি যুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পূর্ব থেকেই তাদের সঙ্গে মুসলমানদের ভূমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই ছিল। তাই নতুন সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে একটা চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে সাইপ্রাসকে এই দুই বৃহৎ শক্তির (মুসলিম ও বাইজান্টীয়) মধ্যবর্তী একটা রাষ্ট্রে (Buffer State) পরিণত করা হয়। চুক্তিতে স্থির হয় যে, সাইপ্রাসকে প্রতি বছর মুসলমানদের ৭২০ দিনার প্রদান করতে হবে। বাইজান্টীয়দের সঙ্গে সাইপ্রাসের এ ধরনের শুল্ক সম্পর্কীয় চুক্তি আগে থেকেই ছিল। এখন সাইপ্রাসের অধিবাসীদের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে এ শুল্ক ধার্য হল। স্থির হল, মুসলমান ও তার শত্রুদের মধ্যে সাইপ্রাস কোন পক্ষ অবলম্বন করবে না। তবে মুসলমানদের তারা বাইজান্টীয়দের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর দেবে। বালাযুরী বলেন, চুক্তিতে এও স্থির হয় যে, 'নৌ-অভিযানের সময় মুসলমানগণ সাইপ্রাস দ্বীপের কোন ক্ষতি সাধন করবে না' আবার সাইপ্রাস বাসীগণও তাদের সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না।'[৩০৬]

৬৫৪ খৃস্টাব্দে হযরত মুয়াবিয়া আবার সাইপ্রাস আক্রমণ করেন। কারণ, সেই সময়ে চুক্তির খেলাফ করে এক নৌ-যুদ্ধে সাইপ্রাসবাসীরা বাইজান্টীয়দের জাহাজ দিয়ে সাহায্য করে। সাইপ্রাসবাসীগণ চুক্তি লঙ্ঘন করলেও হযরত মুয়াবিয়া পূর্বের চুক্তির শর্তাদি অক্ষুন্ন রাখেন এবং পুনর্বাসনের জন্যে সাইপ্রাসে ১২,০০০

---

305. Cyprus: Island in the Mediterranean south of Turkey. The Muslims Made Their first expedition against the island in 647, which was the beginning of a from of joint rule by the Byzantire emperor and the caliph. To safeguard Cyprus from the ottoman Turks' expansion, it was taken over by the Venetians, who ruled Unit 1571. By a treaty in 1573 Venice formally ceded the island to the ottoman Sultan. From 1878 Unit 1959 Cyprus was ruled by the British and it became independent in 1960.
Details: E.Van Donzel, *Islamic Desk Reference, Compiled from the Encyclopedia of Islam,* New York 1994, P.77.

৩০৬. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-২০০

লোক পাঠান।[৩০৭]সেই সময়ে মুয়াবিয়া সাইপ্রাসে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। তাছাড়া, তিনি দ্বীপটিতে একটি নগর নির্মাণ করেন এবং বালবাক থেকে কিছুসংখ্যক লোক ও একদল ফৌজ সেখানে মোতায়েন করেন। পরে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযিদ এদের ফিরিয়ে নেন এবং নগরটা ধ্বংস করতে হুকুম দেন। শেষ পর্যন্ত ৬৪৮ সনের চুক্তির ভিত্তিতে সাইপ্রাসের আইনগত মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে।[৩০৮]

২৮ হিজরীতে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাস হামলা করেছিল। একটি সন্ধি চুক্তি হয়েছিল নিম্নলিখিত শর্তেঃ 'মুসলমানরা সাইপ্রাসের অধিবাসিগণের উপর আক্রমণ করবে না, কিন্তু সেই সংগে তারা ওদের রক্ষা করবে না, যদি অন্য কোন শক্তি তাদের আক্রমণ করে।'[৩০৯]

সিসিলি

যখন সিসিলির শাসক ফিমি তার বাইযানটাইন প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে টিউনিসের আগলাবী রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তিনি সিসিলি আক্রমণ করেন (২৪৪ হিজরীতে)। কিন্তু মুসলিম সেনাপতি ফিমি ও তার লোকজন যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে নির্দেশ দেন এবং বাইযানটাইনদের একা পরাস্ত করেন। [৩১০]

উসমান (রা.)-এর স্থায়ী কৃতিত্ব হইল পবিত্র কোরআনের একত্রীকরণ। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসস এই যে কুফার বিদ্রোহ তাঁহার এই অবদানকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হয় এবং পরিণামে তাঁহার মৃত্যু ডাকিয়া আনে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষত যেখানে আলীর সমর্থক শক্তিশালী, তিনি ক্রমশ জনসমর্থনহীন হইয়া পড়েন। কুফায পণ্ডিতগণ কোরআনের মূল পরিবর্তন করিয়া উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রেরিত আয়াতগুলি বিনষ্ট করিবার দোষে উসমানকে অভিযুক্ত করেন। এই আন্দোলন মিসরে আলীর বন্ধুদিগকে ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করে। মিসরীয়গণ আরেক ধাপ অগ্রসর হইয়া ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৫০০ সৈন্যের একটি দল মদীনায় প্রেরণ করে এবং খলিফার গৃহ অবরোধ করে। শোনা যায় সৈন্যগণ দরজা ভাঙ্গিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় তিনি কোরআন শরিফ তেলাওয়াতে রত ছিলেন এবং এই অবস্থাতেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতানুসারে তাঁহার হত্যাকারী ছিল তাঁহার বন্ধু প্রথম

---

৩০৭. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৯
৩০৮. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, ১৯৮৪, পৃ.৫৯
৩০৯. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত,পৃ.১৯৬
৩১০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৯

খলিফা আবুব করের পুত্র মুহাম্মদ।[৩১১] অন্য বনর্ণা মতে উসমান (রা)-এর হত্যাকারী আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম। এইভাবে ইসলামের তৃতীয় খলিফা ভয়াবহ মৃত্যুবরণ করেন।

৪.৪: হযরত আলী (রা.)-এর পররাষ্ট্রনীতি

(জ.৬০০খ্রি. খিলাফত-৬৫৬খ্রি, মৃ. ১৭ রমজান ৪০ হি. ৬৬১খ্রি.)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর চব্বিশ বৎসর পর একটি নূতন জাতি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে যাহা প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিজয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া অনেক দূর-দূরান্ত সফর করিয়াছে এবং ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। নিত্য নূতন আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিয়াছে এবং বিরাট সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছে। মরুভূমির সাধারণ জীবন অপসারিত এবং তৎসঙ্গে যাঁহারা রাসূল (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্মান প্রদর্শন এবং ভক্তিজনিত ভয়ও সুদূর পরাহত। আলী (রা.)-এর খেলাফত আরম্ভ হইবার অনতিকাল পরেই তাঁহার দুই আপন সহচর তালহা ও জোবায়ের (রা.), তাঁহাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন।[৩১২]

তিন দশকের ব্যবধানে স্বার্থপরায়ণ মুসলামানগণ উত্তরাধিকারের সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়ে। ইহাতে তিনটি মতামতের সৃষ্টি হয়। একদল বিশ্বাস করে যে, রাসূল (সা.)-এর উত্তরাধিকারী কোরাইশ বংশ হইতে হইবে। রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর অনতিকাল পরে মক্কা ও মদিনাবাসীদের মধ্যে এই যুক্তি মৌলিকরূপে দেখা দেয়। এই মতের পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃবৃন্দের অঘোষিত একটি সভায় আবু বকর মনোনীত হন। উমর (রা.) তাঁহার পূর্ব খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হন। উমর (রা.) কর্তৃক একটি কমিটির দ্বারা উসমান (রা.) নির্বাচিত হন। দৃশ্যত এই নিয়মগুলো গ্রহণযোগ্য। কোরাইশ বংশের সমস্ত সদস্যই যেহেতু খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি তাই বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে এই ব্যাপারে যথেষ্ট প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় দল সাধারণ্যে 'বৈধতাবাদী, (Legitimists) নামে সুপরিচিত। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, খেলাফত একটি ঐশ্বরিক পদ এবং নিযুক্ত ব্যক্তি ঐশী আদেশে এই পদে সমাসীন হন। এশী আদেশে মুহাম্মদ (সা.)-এর রাসুল রাজা হইবার বিষয়টি যেহেতু প্রশ্নাতীত, তাহারা যুক্তি প্রদন করেন যে, উত্তরাধিকারীও সেইহেুত রাসূল (সা.)-এর পরিবার হইতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর জামাতা, চাচাত ভাই এবং পোষ্যপুত্র হিসাবে আলী (রা.) একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী। তাঁহার পর নেতৃত্ব

৩১১. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৩১২. প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

যাইবে তাঁহার পুত্রদের নিকট অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের (সা.) পৌত্র প্রভৃতির নিকট। বৈধতাবাদীগণ শীয়ানে আলী (রা.)-এর বা আলীর সমর্থক এবং পরবর্তীকালে শুধু শিয়া নামে পরিচিত।

তৃতীয় দল মুসলমানদের মধ্যে একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ। তাঁহারা বিশ্বাস করে যে, খেলাফত কোনো বিশেষ পরিবারের অধিকার নহে। তাঁহারা পবিত্র কোরআনের আদেশ অনুযায়ী বিশ্বাস করেন যে, 'মহত্ত্ব' পুণ্য কাজের উপর নির্ভরশীল, রক্ত সম্পর্কের উপর নহে। তাঁহাদের নীতি অনুযায়ী একজন ক্রীতদাসও খলিফা হইতে পারে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে তাহারা অতি শুদ্ধচারী এবং তাহারা রাসূল (সা.)-এর বাণী অনুযায়ী সাধারণ জীবন ভালবাসেন। প্রথমে আলী (রা.)-এর সৎজীবন দেখিয়া তাহারা তাঁহার সমর্থক হয় এবং তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধাচারণ করেন। পরে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাহারা খারেজী[৩১৩] বা 'দলত্যাগী' নামে পরিচিত হন। ইসলামের খাঁটি আদর্শ রক্ষার্থে তাহারা স্বেচ্ছায় যোদ্ধায় পরিণত হয় এবং পরবর্তী খলিফাদের শরীরের কাঁটার ন্যায় অবস্থান করে।[৩১৪]

খুব সম্ভবত তালহা ও জুবায়ে (রা.) আশংকা পোষণ করেন যে, খেলাফত কোরাইশকে বাদ দিয়া শুধু আলী (রা.)-এর পরিবারের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্ত্রী বসরায় বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করেন। এইভাবে ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর ২৪ বৎসর পর ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বসরা শহরের উপকণ্ঠে সংঘটিত হয়। একদিকে তাঁহার জামাতা এবং অপরদিকে তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী। ইহা উষ্ট্রের যুদ্ধ[৩১৫] নামে পরিচিত, কারণ আয়েশা (রা.) একটি উটের উপর সওয়ার হইয়া যোদ্ধাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন। এই যুদ্ধে আলী (রা.) জয়ী হন। তিনি আয়েশায় প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাকে মদিনার প্রেরণ করেন।[৩১৬]

এই সমস্যা তিরোহিত হইবার পর কুফায় রাজধানী স্থাপন করিয়া আলী (রা.) শাসনকার্য পরিচালনা করেন। উসমান (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত প্রায় সব লোককে তিনি অপসারিত করেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শে সাদাসিধা প্রকৃতির মানুষকে নিয়োগের মাধ্যমে সংস্কারের সূচনা করেন। তবে তিনি তখনও অধিক শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হন নাই। সিরিয়ার গভর্নর এবং উসমান (রা.)-এর একজন আত্মীয় মুয়াবিয়া আলী (র.)-কে স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকার করেন। এক শুক্রবার মুয়াবিয়া নিহত খলিফা উসমান (রা.)-এর

৩১৩. ড. রশীদুল আলম, gmwjg 'k‡bi fwgKv; ঢাকাঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৯ঃ পৃ.-১৮৪,১৮৫
৩১৪. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৮৯
৩১৫. Bmjwg wek‡Kvl- ইফাবা, ঢাকাঃ ১৯৯২, খ.৭, পৃ.১৭২
৩১৬. সৈয়দ আমীর আলী, (অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ), প্রাগুক্ত,পৃ.৪৫

রক্তাপ্লুত জামা প্রদর্শন করিয়া আলীকে একই হত্যার ষড়যন্ত্রের অংশীদার বলিয়া অভিযোগ করেন। এইভাবে উমাইয়াগণ আলী (রা.)-এর উত্তরাধিকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে।[৩১৭]

তবে অন্যান্য বিষয়েও সংঘর্ষ চলিতে থাকে। আলী (রা.)-এর খেলাফত পর্যন্ত মুসলমানগণ এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। অশিক্ষিত, নিরস্ত্র কিন্তু উৎসাহী আরব মুসলমান এবং সিরিয়া ইরাকের সুশিক্ষিত ও সভ্য লোকদের সহিত সংমিশ্রণের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এত অধিক ধন-সম্পদ এবং এই ব্যাপক শিক্ষা-দীক্ষা দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইয়া যায়। অধিকন্তু, ব্যবহারিক অর্থে এই বিশাল নূতন সাম্রাজ্য শাসন করিবার জন্য বিজিত লোকদের সাহায্য তাহাদের প্রয়োজন হয়। অতএব, আরবদের বাহ্যিক গৃহযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সাবেক বাইজান্টাইন ও পারস্যবাসীদের আওতাধীন এলাকাগুলির মধ্যে ঘটে। গ্রীস-রোমান সংস্কৃতির বাহক সিরিয়া আধিপত্য লাভ করিবে, নাকি পারস্য-সংস্কৃতির বাহক ইরাক আধিপত্য অর্জন করিবে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলিম আরব সাম্রাজ্যের কেন্দ্র মদীনা ইতিমধ্যেই ইহার প্রাধান্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

দুই বাহিনী আলী (রা.) তাঁহার ইরাকীদের লইয়া এবং মুয়াবিয়া তাঁহার সিরীয়দের লইয়া, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে ইউফ্রেটিস নদীর পাড়ে সিফফিন[৩১৮] নামক স্থানে মিলিত হয়। বর্শার অগ্রভাগে পবিত্র কোরআন ঝুলাইয়া সিরীয়গণ চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং সন্ধির প্রস্তাব করে। আলী (রা.)-এর শৌর্যবীর্য ও ধর্মপরায়ণতা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে ঢাকিযা ফেলে বলিয়া তিনি কোরআনের ভিত্তিতে সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৩১৯]

শান্তির পতাকা

প্রাচীনকালে আত্মসমর্পণের নিদর্শন ছিল উপরে হাত তোলা এবং অস্ত্র বর্জন। খলিফা আলী (রা.)-এর সময়ে 'শান্তির পতাকা' নামে একটি কথা পাওয়া যায়।

এখানে মুআবিয়ার সেনাবাহিনী কর্তৃক কুরআন উত্তোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে; যার দরুণ উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী যুদ্ধ ক্ষান্ত করেছিল।[৩২০]

---

৩১৭. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
৩১৮. Bmjwg wek‡Kvl- ইফাবা, ঢাকাঃ ১৯৮৮, খ.১৭, পৃ.৩৫২
৩১৯. সৈয়দ আমীর আলী, অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সম্পা. ড. মফীজুল্লাহ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৩২০. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২

হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সালিশী

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) (খৃস্টাব্দ ৬৫৬-৬৬১) ও সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধের অবসানের জন্যে যে সালিশী হয়, সম্ভবতঃ ইসলামের ইতিহাসে সালিশীর ক্ষেত্রে তা-ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাজনৈতিক বিষয়টি এখানে আইনগত দিকের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেভাবে বিষয়টির মীমাংসা করা হয়, তাতে তদানীন্তন যুগের সালিশীর প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণায় পৌঁছা যায়।

আমর-বিন-আল-আস (রা.) যুদ্ধে মুয়াবিয়ার আসন্ন পরাজয়ের সম্ভাবনার বিষয় বুঝতে পেরে মুয়াবিয়াকে সালিশীর আবেদন জানাতে পরামর্শ দান করেন। আমরের পরামর্শ অনুযায়ী মুয়াবিয়া সালিশীর জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁর সৈন্যদের বর্শার অগ্রভাবে আল-কোরআন তুলে ধরতে নিদের্শ দেন। এর তাৎপর্য এই যে, মুয়াবিয়া তাঁর ও হযরত আলী (রা.) মধ্যে কোরআনকে মধ্যস্থ হিসেবে উপস্থাপিত করে যুদ্ধ অবসানের আবেদন করেন। হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়ার এর চাতুর্যপূর্ণ কৌশল ধরতে পারলেও আল-কোরআনের মাধ্যমে পেশকৃত এ আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তা'ছাড়া, তাঁর অনুগামী ও সমর্থকগণ কোরআনের প্রতি তাদের স্বাভাবিক ভক্তি-শ্রদ্ধাবশতঃ এ আবেদনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ, কোরআনকে মান্য করাটা মুসলমানদের মধ্যে একটা সাধারণ কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত। যাহোক, উভয়পক্ষই স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের পক্ষ হতে একজন সালিশ (হাকাম) নিয়োগে স্বীকৃত হন এবং কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই সালিশকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করেন। হযরত মুয়াবিয়া আমর-ইবনুল-আস (রা.)-কে এবং হযরত আলী (রা.) আবু মূসা-আল-আশারী (রা.)-কে সালিশ নির্বাচিত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত আলী (রা.) তাঁর সমর্থকদের চাপের ফলে আবু মুসাকে নিয়োগ করেন। উভয় সালিশকেই জীবন, ধন-সম্পদ এবং তাঁদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। সালিশদের এক বছরের মধ্যে তাদের রায় দিতে বলা হয়। হিজরী ৩৮ সালে (খৃস্টাব্দ ৬৫৯) আধরুহ নামক স্থানে উভয় সালিশ বৈঠকে মিলিত হন এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক যথারীতি স্বীকৃত একটি সন্ধিচুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করেন। হুদায়বিয়া চুক্তিতে এই সালিশী চুক্তিটির দলিল প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[৩২১] এই পদ্ধতি গ্রহণের ফলে হযরত আলী (রা.) খলিফার সরকারী

৩২১. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৭

Dhaka University Institutional Repository

পদবী হতে বঞ্চিত হলেন এবং তাঁর মর্যাদা সিরিয়াস্থ তাঁর শাসন-প্রতিনিধি (গর্ভনর) মুয়াবিয়ার সমপর্যায়ে নেমে এলো। নীচে চুক্তিটির বিষয়বস্তুর বিবরণ দেয়া হলঃ[৩২২]

"পরম করুণাময় আল্লাহ'র নামে শুরু করছি।

"আলী ইবনে আবু তালিব ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এতদ্বারা তাঁদের মধ্যে (বিরোধ মীমাংসায় অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে) সালিশীর ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছেন। আলী কুফাবাসীগণ ও তাঁদের অনুগামী মুমিন মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, আর মুয়াবিয়া শামসবাসীগণ (সিরিয়াবাসী) ও তাঁদের অনুগামী মুমিন মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

"আমরা আল্লাহ এবং তাঁর কিতাবের (আল-কোরআনের) নির্দেশিত সালিশীর জন্য আবেদন করছি; কারণ এছাড়া অন্য কোন পন্থা বা ভিত্তি নেই... এবং উভয় আইনবিদ– আবু মুসা আল-আশারী ও আমর ইবনুল-আস-আল্লাহর কিতাবের (আল-কোরআন) নির্দেশিত পন্থার ভিত্তিতে কাজ করবেন... এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবে যদি কোন কিছু না পাওয়া যায়, তবে আইনানুগ সুন্নাহ'র বিধানই তাঁদের কর্মপন্থার ভিত্তি হবে..."

বলাবাহুল্য, চুক্তিটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। সালিশীর উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়াদি সম্পর্কে এতে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র এতে কোরআন ও সুন্নাহকে সালিশীর ভিত্তিরূপে গণ্য করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তিটির সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতা আমর-ইবনুল-আসকে মূল বিষয়টি হতে দূরে সরে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ দান করেছে; এবং এই সুযোগের মাধ্যমে অন্যতম সালিশ আবু মুসাকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করে তিনি আলোচ্য বিষয়ের মোড় ঘুরিয়ে দেনঃ

"আবু মুসা, আপনি কি এটা স্বীকার করেন না যে, উসমানকে (তৃতীয় খলিফা) অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে?ঃ

আবু মুসা সম্মতিসূচক জওয়াব দান করেন।

অতঃপর আমর আবার বলেনঃ 'আপনি কি এটা স্বীকার করেন না যে, মুয়াবিয়া এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন উসমানের উত্তরাধিকারী?'

আবু মুসা এতেও সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

৩২২. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

আমর পুনরায় বললেন, আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا (٣٣)وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ
هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا (٣٤)

অর্থ: "আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না। কেহ অন্যায়ভাবে নিহিত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়াছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছেই। *ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তোমরা তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিও; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।"[৩২৩]

.... অন্যায়ভাবে যে কাউকেই হত্যা করা হয়, তার উত্তরাধিকারীদের ওপরই আমরা কর্তৃত্ব দান করেছি; হত্যার ব্যাপারে (প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে) সে (উত্তরাধিকারী) যেন সীমা অতিক্রম না করে; এবং (সীমা অতিক্রম না করলে) নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য দান করা হবে।

এরপর আমর (রা.) মন্তব্য করলেনঃ 'সুতরাং, এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.)-এর পর মুবাবিয়া কেন তাঁর উত্তরাধিকারী (অর্থাৎ খলিফা) হবেন না?"

কিন্তু আমর (রা.) আবার বললেনঃ 'আপনি যদি এই ভয় করেন যে, শাসন-ক্ষমতা পরিচালনার ব্যাপারে মুয়াবিয়ার যোগ্যতা ও অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণ প্রশ্ন তুলবে, তবে আপনি তাদের এই জওয়াব দিতে পারেন যে, মুয়াবিয়া হযরত উসমান (রা.)-এর স্ববংশসম্ভুত এবং উত্তরাধিকারী, আর হযরত উসমান (রা.)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আরও বলতে পারেন যে, মুয়াবিয়া রাজনীতিতে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং রাষ্ট্র-পরিচালনাও বিশেষ সুদক্ষ। আর, তা'ছাড়া তিনি রাসূলের (সা.) অন্যতম সাহাবী ছিলেন'

আবু মুসা (রা.) জওয়াবে বললেন ঃ 'হে আমর! আল্লাহকে ভয় কর! হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) কোরেশদের মধ্যে একজন অতি সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি।'[৩২৪]

---

৩২৩. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩-৩৪
৩২৪. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

খলিফা হওয়ার পক্ষে কে সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত, শেষ পর্যন্ত তা নিয়েই সালিশদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। ফলে, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার উপায় বা পদ্ধতির ওপর বিশেষ কোন গুরুত্বই আরোপ করা হল না। আবু মুসা (রা.) দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)–কে খলিফা মনোনীত করার বিষয় চিন্তা করেন। পক্ষান্তরে, আমর (রা.) খলিফার পদে মুয়াবিয়ার পক্ষ সমর্থনের সিদ্ধান্ত করেন।

পরিশেষে আবু মুসা (রা.)-কে লক্ষ করে আমর বললেনঃ 'এ ব্যাপারে (খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে) আপনার মত কি?'

আবু মুসা (রা.) জওয়াবে বললেনঃ 'আমার মত হল, এ দু'জন লোককে (হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কে) পদচ্যুত করেন মুসলমানদের সাধারণ নির্বাচনের (শুরা বা সাধারণ গণভোট) ওপর বিষয়টি ছেড়ে দেয়া উচিত। তারা তাদের নিজেদের জন্য (তাদের শাসক হিসেবে) তাদের পছন্দ অনুযায়ী যাঁকে খুশী নির্বাচন করবে।' আমর বললেনঃ 'আমার মতও তাই।'

বাহ্যতঃ অনুরূপভাবে সমঝোতায় পৌঁছে যাবার পর, দু'জন সালিশই সরকারী ভাবে সাধারণ্যে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে প্রস্তুত হলেন। বয়োঃজ্যেষ্ঠ হিসেবে আবু মুসা (রা.)-কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার জন্য আমর (রা.) নম্রভাবে অনুরোধ করলেন এবং বললেন যে, তাঁর (আবু মুসার) ঘোষণার পরই তিনি (আমর) তাঁর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করবেন।[৩২৫] আবু মুসা একথার পর প্রথম আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং অতঃপর বললেনঃ

'হে লোকগণ! আমরা এই জাতির সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) উভয়কে অপসারণ করা ছাড়া আর কোন উত্তম সমাধান খুঁজে পাইনি যাতে করে সমগ্র বিষয়টি এই জাতি নিজের হাতে গ্রহণ করবে এবং তাদের যাকে ইচ্ছা, তার ওপর শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করবে। আমি হযরত আলী ও মুয়াবিয়া, উভয়কে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত করেছি এবং আপনারা যাঁকে যোগ্য মনে করেন, তাঁকে নির্বাচিত করতে পারেন।'[৩২৬]

আবু মুসার উপরোক্ত ঘোষণার পর আমর (রা.) আল্লাহর প্রশংসা করে বললেনঃ

'আপনারা এ লোকটির (আবু মুসার) বক্তব্য শুনেছেন। তিনি তাঁর বন্ধুকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতের অনুরূপ আমিও তাঁর বন্ধুকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত করেছি। কিন্তু আমি আমার বন্ধু

৩২৫. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৮৭
৩২৬. শামসুল আলম, Bmjvgx ivó, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৫, পৃ.৪২

মুয়াবিয়াকে শাসন-পরিচালকের পদে সমর্থন করেছি। কারণ, তিনিই হযরত উসমান (রা.)-এর উত্তরাধিকারী এবং এই পদের জন্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি'।[৩২৭]

সালিশদের এই ঘোষিত সিদ্ধান্তের মধ্যে তাঁদের পরস্পরের সুস্পষ্ট মতবিরোধ থাকায় স্বাভাবিক কারণেই হযরত আলী এটা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন। তিনি সালিশদের কার্যক্রমের নিন্দাবাস ও তাঁদের প্রতি দোষারোপ করে বলেনঃ

"... তাঁরা কোরআনের নীতি থেকে দূরে সরে গেছেন... এবং কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ না করে তাঁরা প্রত্যেক নিজের নিজের ইচ্ছামত কাজ করেছে, তাঁদের সিদ্ধান্তের পেছনে কোন প্রামাণ্য ভিত্তি কিংবা কোন পূর্বতন নজির নেই; অধিকন্তু, এই সিদ্ধান্তে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য রয়েছে ..."

আবু মুসা (রা.)-এর সাথে চাতুরীর জন্য আরব ঐতিহাসিকগণ কঠোর ভাষায় আমরের নিন্দা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ প্রশ্নটিতে তত চাতুর্যপূর্ণ বা প্রতারণামূলক বলে মনে হয় না। কারণ, এতে আসলে বিরোধ-বহির্ভূত একটি সমস্যার ফয়সালায় আবু মুসাকে প্রভাবান্বিত করার ব্যাপারে আমর (রা.)-এর বিশেষ দক্ষতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আবু মুসা (রা.)-এর ত্রুটি হল, নির্দিষ্ট বিরোধমূলক প্রশ্নটি (আলী (রা.) ও মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের অবসানের প্রশ্ন) এবং সালিশ হিসেবে তাঁদের ক্ষমতা-বহির্ভূত অপর প্রশ্নটির (অর্থাৎ খলিফা নির্বাচনের প্রশ্নটি) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থতা। কারণ, মূল বিষয় ও চুক্তির উদ্দেশ্য অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধের নির্দিষ্ট প্রশ্ন সম্পর্কে রায় দানের জন্যই আবু মুসা ও আমরকে সালিশ নিয়োগ করা হয়।
মধ্যস্থতাকারীগণ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিলম্ব করেন। ইতিমধ্যে আলী (রা.)-এর অনুসারীদের এক বিরাট অংশ সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করায় আলীর উপর বিরক্ত হইয়া পড়ে। "আল্লাহ ছাড়া কোনো মধ্যস্থতাকারী নাই" এই জিগির তুলিয়া তাহারা দলত্যাগ করে। আলী (রা.) এইসব খারেজীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে নাহরাওয়ান নদীর পাড়ে তাহাদিগকে পরাজিত করেন।

৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে মুয়াবিয়া স্বয়ং জেরুজালেমে নিজেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রথমবারের মতো ইসলামে দুইজন খলিফার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মসজিদে যাইবার সময় আলী (রা.) একজন খারেজীর আক্রমণে আহত হন এবং দুইদিন পর পরলোকগমন করেন।[৩২৮]

৩২৭. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৩২৮. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬

আলী (রা.)-এর হতাশ অনুসারীগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রা.)-কে খনিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে হাসান (রা.) সমাগত অনিবার্য সংঘর্ষের আশঙ্কার বিচলিত হন। এই সময় মুয়াবিয়া অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রস্তাব করেন যে, হাসান (রা.) অবসর গ্রহণ করিয়া মদীনার নিকটবর্তী তাঁর আবাসগৃহে চলিয়া যাইতে রাজি হইলে তিনি তাঁহাকে একটি রাজকীয় ভাতা ও নিরাপত্তা প্রদান করিবেন। হাসান (রা.) তাহাই করেন। অতঃপর মুয়াবিয়া দামেস্কে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া ইসলামের অবিসংবাদিত খলিফায় পরিণত হন।[৩২৯]

এইভাবে সনাতন খলিফাদের যুগ শেষ হয়। এই যুগটিকে খাঁটি ধর্মতন্ত্রের যুগ হিসাবে মান্য করা হয়; যখন আল্লাহ্‌র আইনই ছিল দেশের আইন এবং সুন্নাহ্ বা 'রাসূল (সা.)-এর আদর্শ' ছিল একমাত্র পথ যাহাকে প্রত্যেকে অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হয়।

ইসলামের কোনো কোনো ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এই যুগকে 'প্রজাতান্ত্রিক' ও 'গণতান্ত্রিক' উভয়ভাবে উল্লেখ করেন। প্রজাতান্ত্রিক এইভাবে বলা যায় যে, একমাত্র আলী (রা.) ব্যতীত কখনও পারিবারিক বংশে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা হয় নাই। গণতান্ত্রিক ইহা নিশ্চয়ই ছিল না। বড় জোর ইহাকে এটি স্বল্প লোক শাসিত রাজ্য (Oligarchy) বলা যায়।[৩৩০]

হযরত আলী (রা.)- এর শাসন আমলে অন্যান্য চুক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

'আল্লাহ রাহমানুর রহিমের নামে। শত্রু এলাকা তাবারিস্তান ও জিলজিলান সম্বন্ধে ইহা খুরাসানের সেনাপতি ফাররখানের পক্ষে সুওয়ায়িদ ইবনে মুকারবিনের প্রতিশ্রুতি।'

'তোমরা আল্লাহর হিফাযত সম্বন্ধে নিশ্চিত, তিনি মহিমান্বিত, যদি তুমি তোমার দেশের ও পার্শ্ববতী দেশের দস্যু-তস্করের লোভ-লালসার বিরোধিতা করতে পার যদি তুমি আমাদের বিরোধী কোনো বিদ্রোহীকে আশ্রয় না দাও। এবং তুমি তোমার দেশের সীমান্তে মুসলিম সেনাপতিকে তোমার দেশের মুদ্রায় ৫ লক্ষ দ্রাকমা দান করবে।'

'যদি তুমি এটা কর, আমাদের পক্ষে তোমাদের আক্রমণ করা, তোমার দেশে বিচরণ করা বা প্রবেশ করা ন্যায়সংগত হবে না। যা হোক, অনুমতি নিয়ে আমরা তোমাদের দেশে নিরাপদে পর্যটন করতে পারবো এবং একই আইন প্রযোজ্য হবে তোমাদের পর্যটন সম্পর্কেও।'

৩২৯. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২
৩৩০. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬

'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় দেবে না, আমাদের কোনো শত্রুকে গোপন সাহায্য দেবে না এবং বিশ্বাসঘাতকের মতো কোনো কাজ তোমরা করবে না। নতুবা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো চুক্তি হবে না।'

এ চুক্তি নুওয়ায়েম ইবনে মুকাররিম রায় প্রদেশের সর্দারকে মনযুর করেছিলেন ঃ

'যদি তোমরা বিশ্বস্ততার সংগে কাজ করো, আমাদের পথ প্রদর্শন কর, অবিশ্বাসের কাজ না কর এবং চুক্তির খেলাফে আমাদের শত্রুকে গোপনে সাহায্য না কর।'

মিসরের শাসনকর্তার সাথে হযরত আলী (রা.)-এর পত্রালাপঃ

মিসরের শাসনকর্তা 'কায়েস ইবনে সাদ' খলীফা আলীকে নিম্নলিখিত পত্র দিয়েছিলেন তৎকালীন গৃহযুদ্ধের সময়েঃ

'আল্লাহ রাহমানুর রাহিমের নামে−

আমীরুল মু'মিনিনকে−

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এখানকার লোক নিরপেক্ষ থাকতে চায়। তারা আমাকে অবস্থা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে নির্যাতন না করতে অনুরোধ করেছে।'

আলী (রা.) উত্তর দিলেনঃ

'যে লোকদের কথা তোমার পত্রে উল্লেখ করেছ তাদের নিকট যাও। যদি অন্য মুসলমানের মতো তারা কথা শোনে তো ভালো, অন্যথায় তাদের শাস্তি দাও।'

শাসনকর্তা জওয়াব দিলেন ঃ

'আমি বিস্ময় বোধ করছি, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কিরূপে ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিচ্ছেন, যারা আপনার নিকট হতে দূরে থাকছে এবং তা দ্বারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে। আপনি যদি তাদের সংগে যুদ্ধ করেন তাহলে তারা আপনার বিরুদ্ধে আপনপর শত্রুকে সাহায্য করবে। সুতরাং, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার কথা শুনুন, ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।'

বনু নাজিয়ার বিদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে লিখিত আলী (রা.) এর খোলা চিঠির কিয়দংশ

'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ মোতাবেক চলতে দাওয়াত দিচ্ছি এবং সেই সঙ্গে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী সৎকাজ করতেও আমন্ত্রণ জানাই। এতদ্ব্যতীত তোমাদের

মধ্যে যে কেউ তার আপনজনের কাছে ফিরে আসে এবং দূরে থেকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে নৈরাজ্যবাদী ও দস্যুর ফিৎনার সময়ে (অর্থাৎ বনু নাজিয়া গোত্রের সর্দার খিররিত), যে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়েছে এবং দেশে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছে সে বা তারা সকলেই তার বা তাদের জানমালের নিরাপত্তার আশ্বাস পাবে।[৩৩১] কিন্তু যারা তার অনুসরণ করবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আমাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করবে, আমরা তার বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব।[৩৩২]

হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর ভিতর যুদ্ধে আল-ওলিদ বিন উকবা (রা.) নিরপেক্ষ থেকে মক্কা চলে যান এবং যুদ্ধের অবসান হওয়া পর্যন্ত কোন পক্ষই সমর্থন করেন নি।

বসরার বিদ্রোহ দমন :আলীর রাজত্বকালের পরবর্তী দিনগুলিও শান্তিপর্ণ ছিল না। মু'য়াবিয়ার খিলাফত-দাবি, খারিজিদের বিদ্রোহ, এবং রাষ্ট্র হইতে মিসরের বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি আলীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। বসরার শাসনকর্তা ইবনে আব্বাস (রা.) আলী (রা.)-কে সান্তনা দিতে গেলে এই সুযোগে মু'য়াবিয়া বসরার অসন্তুষ্ট লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। অবস্থা সঙ্কটজনক দেখিয়া বসরার ভারপ্রাপ্ত গভর্নর কুফায় সহায্যের জন্য লিখিলে আলী অবিলম্বে সেখানে কিছু প্রভাবশালী লোক প্রেরণ করিলেন। উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধের পর বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইল। কিন্তু তাহারা শান্ত হইল না।[৩৩৩]

সর্বশেষ বলা যেতে পারে যে, খোলাফায়ে রাশেদিন অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে রাষ্ট্রপরিচালনার পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্কের ধারা অব্যাহত রাখতে সদা তৎপর ছিলেন।

কুরাইশ বংশ ও খিলাফত[৩৩৪]

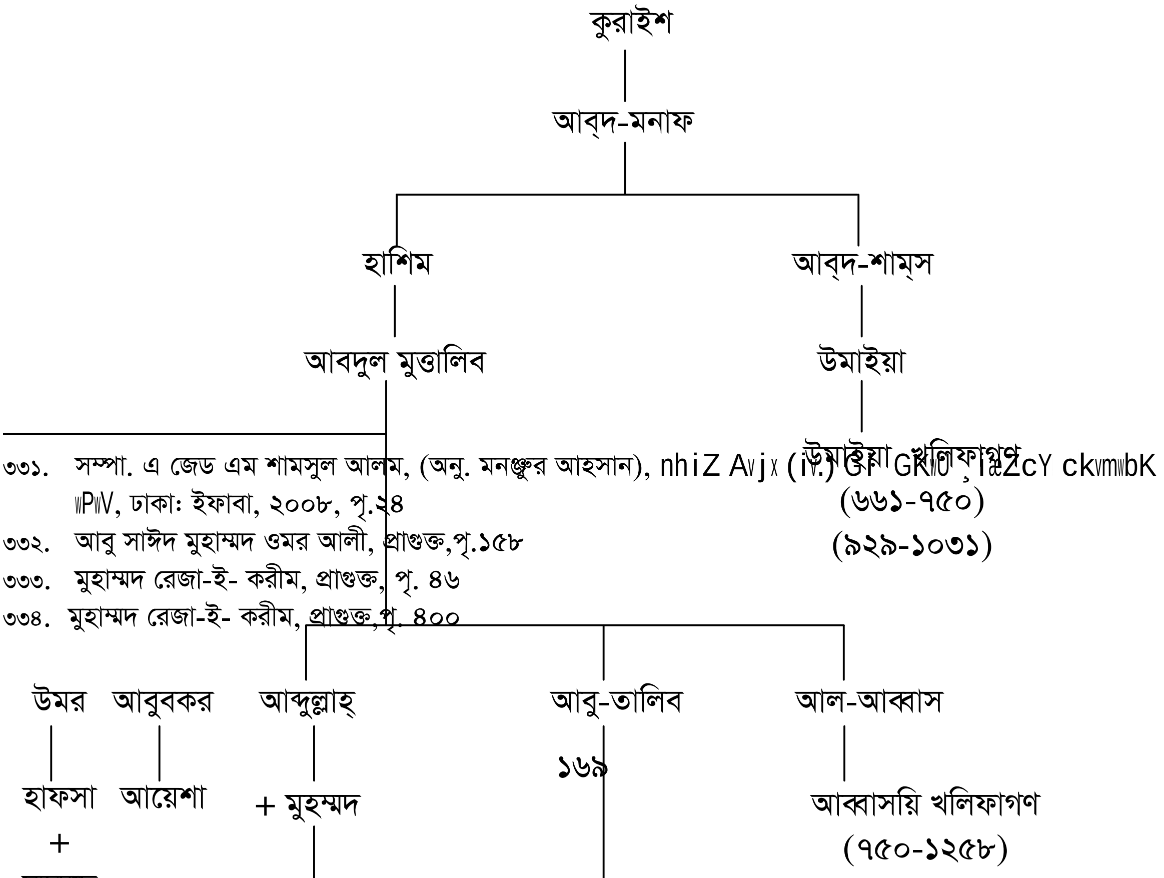

৩৩১. সম্পা. এ জেড এম শামসুল আলম, (অনু. মনঞ্জুর আহসান), nhiZ Avjx (iv.) Gi GKwU ¸iæZ¡c~Y© cÖkvmwbK wPwV, ঢাকা: ইফাবা, ২০০৮, পৃ.২৪
৩৩২. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত,পৃ.১৫৮
৩৩৩. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৩৩৪. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪০০

Dhaka University Institutional Repository

এই মানচিত্রটি নেওয়া হয়েছে[৩৩৫]

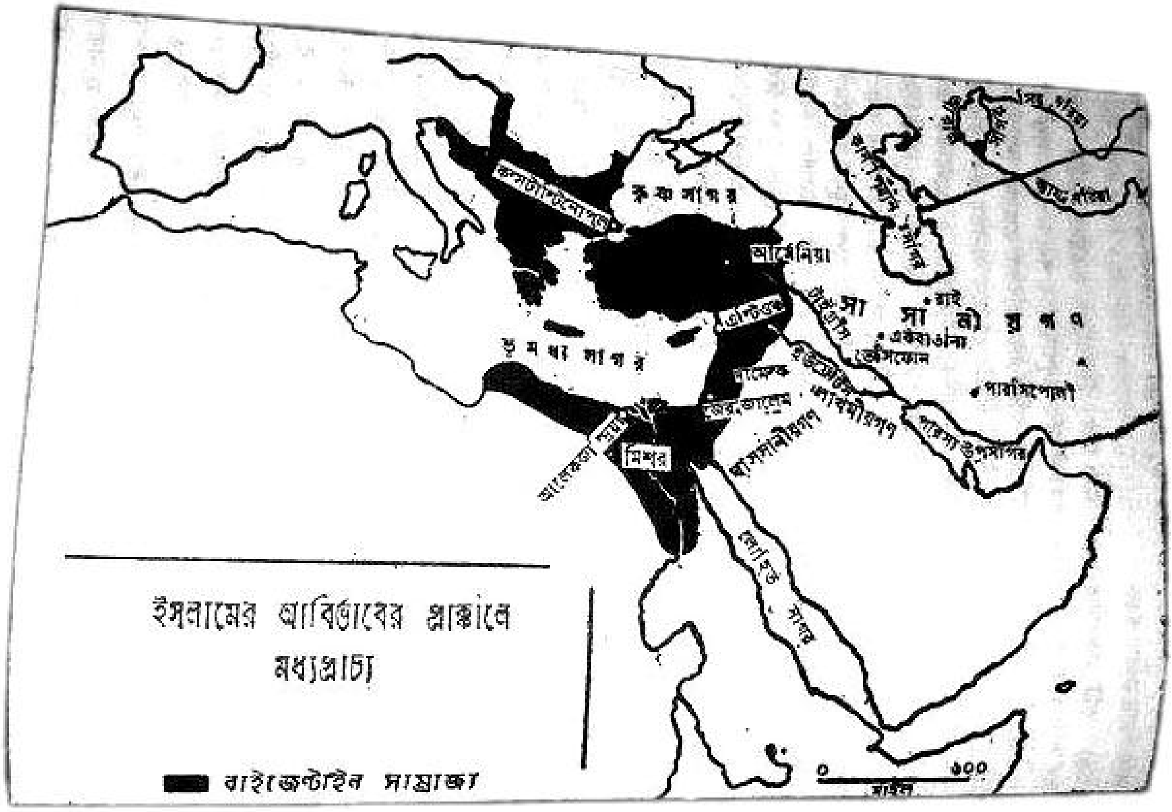

৩৩৫. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, (অনু. মোহাম্মদ এনামুল হক), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

এই মানচিত্রটি নেওয়া হয়েছে[৩৩৬]

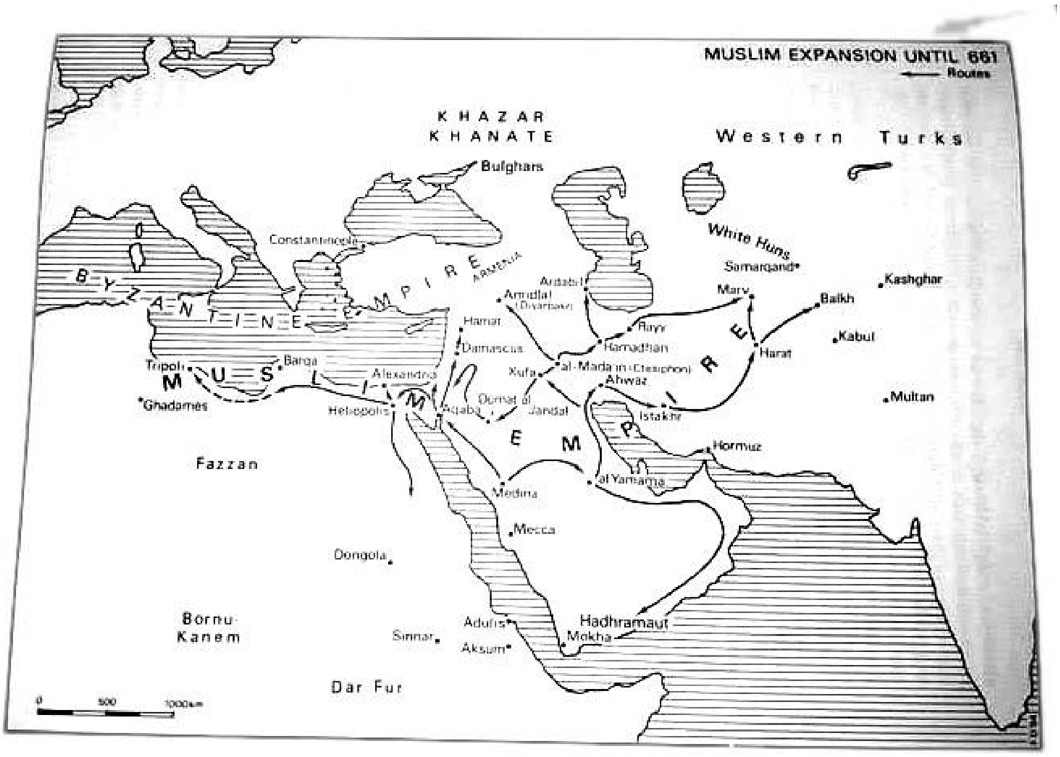

336. BEVERLEY MILTON EDWARDS, *islamic politics in Palestine*,London, New Yorik: Tauris Academic Studies, 1984, P.172.

পঞ্চম অধ্যায়

উমাইয়া যুগের পররাষ্ট্রনীতি

উমাইয়া বংশ ৬৬১-৭৫০

সুফিয়ান শাখা :মুয়াবিয়া ১ম (৬৬১-৬৮০) ইয়াজিদ ১ম (৬৮০-৬৮৩) মুয়াবিয়া ২য় (৬৮৩)

মারওয়ান শাখা:মারওয়ান ১ম (৬৮৩-৬৮৫) আবদ আল-মালিক (৬৮৫-৭০৫), ওয়ালিদ ১ম (৭০৫-৭১৫), সুলায়মান (৭১৫-৭১৭), উমর ২য় (৭১৭-৭২০), ইয়াজিদ ২য় (৭২০-৭২৪), হিশাম (৭২৪-৭৪৩), ওয়ালিদ ২য় (৭৪৩-৭৪৪), ইয়াজিদ ৩য় (৭৪৪), ইব্রাহীম (৭৪৪), মারওয়ান ২য় (৭৪৪-৭৫০)

৫.১: ১ম মুয়াবিয়ার শাসনামল

(খিলাফত ৩০ জুলাই ৬৬১-এপ্রিল ৬৮০ খ্রি.)

আরব সাম্রাজ্যে ৬৬১ সালে নতুন রাষ্ট্র নায়ক হন মুয়াবিযা। যিনি ৪০ বছর জেরুজালেম শাসন করেন। তিনি দামেস্ক থেকে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জেরুজালেমে মুসলমানদের সাথে বসবাসের সুযোগ দেন। অনেকে মনে করেন; মুয়াবিয়াই ইসলামি টেম্পল মাউন্ট নির্মাণ করেন। অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি পূর্ব পারস্য, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকায় আরব সাম্রাজ্য সম্প্রাসরণ করেন। তিনি ৮০ বছরের বেশি সময় বয়সে মারা গেলে ছেলে ইয়াজিদ উত্তরসূরি হন। ইয়াজিদ[৩৩৭] ছিল মদ্যপ, ইয়াজিদ-প্রকৃত উত্তরসূরি নবীজির নাতি হযরত হোসাইন (রা.)-কে কারবালায় শিরচ্ছেদ করেন। তাঁর শাহাদাৎ ইয়াজিদকে মুসলিম সাম্রাজ্যে খলনায়কে পরিণত করে। অল্প বয়সে ৬৮৩ সালে ইয়াজিদের মৃত্যু হলে তার জ্ঞাতি মারওয়ান আমির হন। ৬৮৫ সালে মারওয়ান মারা গেলে তার ছেলে আবদুল মালিক দামেস্ক ও জেরুজালেমের আমির হন।[৩৩৮]

---

৩৩৭. Bmjvgx wek‡Kvl; ঢাকা: ইফাবা; ১৯৯৮, খ.২২, পৃ.৪৭

৩৩৮. মো. আছাদ পারভেজ, c¨v‡j÷vB‡bi e‡K BRivBj; ঢাকা: A peace Press Book 2017, পৃ. ৬১

মুয়াবিয়ার খেলাফতের পদে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি বিশ্বে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। মদীনা যুগের 'প্রজাতন্ত্র' পরিত্যাগ করিয়া নিজ বংশকে তিনি বাইজান্টাইন ও পারস্য ধাঁচে গঠন করেন। তবে ঐতিহ্যবাদীদিগকে দেখাইবার জন্য এবং জনসমক্ষে উপস্থিত হইবার রীতি প্রচলিত রাখিবার জন্য মুয়াবিয়া তাঁহার পুত্র ইয়াজিদকে আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট হাজির করেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করিবার সুযোগ দান করেন। কিন্তু এই রীতি শ্রীঘ্রই পরিত্যাগ করা হয়। ফলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বা পরিবারের মধ্যে যিনি সর্বশক্তিশালী তিনিই উত্তরাধিকারীরূপে পরিগণিত হন। এতদ্‌সত্ত্বেও কোনো খলিফাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না এবং উমাইয়া খলিফাদের তালিকা দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে একজন খলিফার রাজত্বকাল ছিল গড়ে মাত্র ছয় বৎসর। মাত্র চারিজন দশ বৎসরের অধিক রাজত্ব করেন। পরবর্তীদের মধ্যে তিনজন এক বৎসরও স্থায়ী হন নাই।

অনেকেই নিছক সুযোগ সুবিধার জন্য ইসলামের বাণী গ্রহণ করেন। উমাইয়া বংশের সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন মক্কাবাসীগণ নিশ্চয়ই এই দলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিরর্থক দেখিয়া তাহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন এবং নূতন আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহারা ইসলামের আইন মানিয়া চলেন এবং রীতিনীতি পালন করেন। কিন্তু তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি ছিল না বলিয়া তাঁহারা ইসলামের জন্য তাঁহাদের স্বীয় উন্নতি বিসর্জন দেওয়ার চিন্তা করিতেন না।

আবার অনেকে এরূপও ছিলেন যাহাদিগকে জোরপূর্বক ইসলামের আওতায় আনা হয়। ইহাদের অনেকেই ছিল বেদুইন আরবের গোত্রগুলির লোক। ইহাদিগকে হযরত'মুহাম্মদ (সা.) পরাজিত করেন কিন্তু পুনরায় আবু বকর (রা.)-কে ইহাদিগকে জয় করিতে হয়। তাহারা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তিতে আগ্রহী ছিল। বিদেশীদের সহিত তাহাদিগকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিতে পারিলেই শুধু তাহারা মদীনার আধিপত্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। উমাইয়াগণ তাহাদের পূর্বসূরীদের ন্যায় গোত্রীয় লোকদিগকে রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখে এবং তাহাদের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধেও ইহাদিগকে ব্যবহার করে। খাঁটি ইসলামপন্থীগণ উমাইয়াদিগকে ঘৃণা করেন এবং ওলামাগণ ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত উমাইয়াদিগকে ধ্বংস

করিবার সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। অপরদিকে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিল উমাইয়াদের হাতে। ফলে খেলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি যুদ্ধে তাহারা জয় লাভ করিতে সক্ষম হয়।[৩৩৯]

বিচারপতি আল্লামা তকী উসমানী, মুয়াবিয়ার রাজ্য বিস্তারের একটি সংক্ষিপ্ত ছক তার বইতে[৩৪০] উল্লেখ করেন-

সন	জিহাদ
২৭ হিজরী	নৌবহর যোগে সাইপ্রাস অভিযান। ইসলামী উম্মাহর ইতিহাসে এটা ছিল প্রথম নৌ যুদ্ধ।
২৮ হিজরী	সাইপ্রাস বিজয়
৩২ হিজরী	কনস্টান্টিনোপলের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে জিহাদ পরিচালনা
৩৩ হিজরী	বেশ কিছু রোমান দূর্গ দখল
৩৫ হিজরী	যীখশব যুদ্ধ পরিচালনা
৪২ হিজরী	সিজিস্থান যুদ্ধ এবং সিন্ধুর অংশ বিশেষ দখল
৪৩ হিজরী	সুদান বিজয় এবং সিজিস্থানের নতুন অঞ্চল দখল
৪৪ হিজরী	কাবুল বিজয় এবং হিন্দুস্থানের ভূখন্ডে মুসলিম ফৌজের প্রবেশ।
৪৫ হিজরী	আফ্রিকা অভিযান এবং বিস্তির্ণ ভূখন্ড ইসলামী খিলাফতের মানচিত্রে সংযোজন।
৪৬ হিজরী	সিসিলী অভিযান
৪৭ হিজরী	আফ্রিকার নতুন নতুন এলাকা দখল
৫০/৫১ হিজরী	কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধ। এটাই ছিল কানস্টান্টিনোপলের উপর মুসলিম ফৌজের প্রথম আক্রমণ
৫৪ হিজরী	আমু দারিয়া অতিক্রম করে মুসলিম ফৌজের বুখারায় প্রবেশ।
৫৫ হিজরী	সমরকন্দ যুদ্ধ।

মুয়াবিয়া সম্পর্কে Naziah N. Ayubi তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

The Umayyad dynesty was established in Damascus by Muawiye in AD 660, even though Ali was confirmed by his supporters as caliph in the same year Muawiya was aware of this Change in the Nature of government since he described himself as æthe first of the Arab Muslim Kings"

৩৩৯. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
৩৪০. বিচারপতি আল্লামা তকী উসমানী, (অনু. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ), ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মু'আবিয়া (রা:), কুতুবখানায়ে রশিদিয়া, ঢাকা ২০০৩, পৃ: ১৩৪

Muawiya died in 680 and his son Yazd succeeded him to the throne of the caliphate; the Shia (supporters of Ali) were outranged especially as they learned that Al-Husain, their third Imam in Mecca, had refused to recognize this succession. The drama of their unequal battle with the Umayyad army and their crushing defeat in Karbala in the same year provided a deeply felt source for their Collective memory and cognitive system from the time onwards:[341]

আমীর মু'আবিয়া (রা.) এর শাসনকাল রোমকদের সহিত যুদ্ধের কারণে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ৪৪ হি. ও ৪৯ হি. রোমকদের সহিত বেশ তিনি কয়েকটি সফল যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধসমূহের মধ্যে কনসটান্টিনোপল আক্রমণ ঐতিহাসিক ভাবে খুবই গুরুত্বহ।

৫৩ হি. রোডস (Rhodes) আক্রমন করা হয়। ইহা রোম সাগরের দ্বীপ আনাতোলীর নিকট অবস্থিত এবং খুবই উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে মুসলিমদের নতুন বসতি স্থাপন করা হয়।[৩৪২] এই সময়ে সি'কি'লিয়্যাঃ (Sicily)-ও আক্রমণ করা হয়, কিন্তু জয়লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই।[৩৪৩]

৫.২: বাইজান্টিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ: উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে সাম্রাজ্য বিস্তার

আরবদের জন্য তখনও বিজয়ের অসম্পূর্ণ কাজ ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। ইহার ধন-সম্পদ ইসলামের যোদ্ধাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালে মুয়াবিয়া বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে জলে ও স্থলে বিজয় লাভ করেন। কিন্ত বোধহয় উসমান (রা.) হত্যার দ্বারা সৃষ্ট গৃহযুদ্ধের ফলে তিনি এই বিজয়ের ফলভোগ করিতে পারেন নাই। আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মুয়াবিয়া সম্রাট তৃতীয় কন্সটান্সকে (৬৪২-৬৬৮) কর প্রদান করিয়াও শান্তি কিনিতে সম্মতি প্রদান করেন।

খলিফা হিসাবে তাঁহার অবস্থান দৃঢ় করিবার পরই মুয়াবিয়া বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কাজ আরম্ভ করেন। ৬৬৮ সালের শীতকালে তাঁহার একজন সেনাপতি পরে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ কর্তৃক সাহায্যপুষ্ট হইয়া কনস্টান্টিনোপল হইতে বসফরাসের অপর পাড়ে কালসিডনে (আধুনিক কাদিক)

341. Nazih N. Ayubi, Over-stating the Arab State politics and society in the middle East, I.B. Tauris publishers London, New York 1995 P. 61,62
৩৪২. আল-বালাযুরী, ফতুহু'ল-বুলাদান, পৃ.২৩৬
৩৪৩. বিস্তারিত- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, খ. ১৯, পৃ.৪১৬

পৌঁছেন। পরবর্তী বসন্তে তাহারা রাজধানী অবরোধ করে। তবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্ভেদ্য প্রমাণিত হওয়ায় এবং সম্রাট চতুর্থ কন্সটান্টাইল আরবদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট উৎসাহী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় সফলতা অর্জন সম্ভব হয় নাই। অবরোধ তুলিয়া লওয়া হয় কিন্তু এই অভিযান খলিফার নিকট রাজনৈতিক ভাবে অর্থবহ হইয়া উঠে। ইয়াজিদকে এই অবরোধের নায়ক বলিয়া স্বীকার করা হয়। ফলে খেলাফতের উত্তরাধিকারী হিসাবে ইয়াজিদের নাম ঘোষণা করিতে মুয়াবিয়ার পক্ষে সুবিধা হয়। [৩৪৪]

৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরবগণ তিউনিশিয়ার কায়রোয়ান নামক সামরিক নগরী নির্মাণ করিয়া ইহাকে উত্তর আফ্রিকা বা আরবদের কথিত ইফরিকিয়া বিজয়ের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে। ৩০ বৎসর ধরিয়া আরবগণ বাইজান্টাইনদিগকে এই অঞ্চল হইতে বহিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলমানগণ কর্তৃক কার্থেজ অধিকারের সাথে সাথে বাইজান্টইন শাসনের পরসমাপ্তি ঘটে। ৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে নিযুক্ত গভর্নরের নেতৃত্বে মিসর হইতে আটলান্টিক পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা আরব শাসনের আওতাধীনে আসে এবং পূর্বের ন্যায় মিসর হইতে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া সরাসরি দামেস্ক হইতে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে।

৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুসার একজন বার্বার সহকারী তারিক একটি সম্পূর্ণ বার্বার আক্রমণকারী বাহিনীর নেতৃত্বে স্পেনে প্রবেশ করেন। তারিক একটি বিশাল পাহাড়ের নিকটে তাহার কেন্দ্র স্থাপন করেন। 'জাবাল-আল-তারিক' বা তারিকের পাহাড় যাহা বর্তমানে জিব্রাল্টার নামে খ্যাত এখনও তাঁহার নাম বহন করিতেছে। তাঁহারা অভিযানের ফলে সে দেশের অতি গোলযোগপূর্ণ অবস্থা প্রকাশ পায়। ৭১১ সালের বসন্তে লুণ্ঠনাক্রমণ হিসাবে সূচীত অভিযানের দ্বারাই গ্রীষ্মকালের শেষ ভাগে স্পেনের অর্ধেক বিজিত হয়। [৩৪৫]

স্বীয় ভৃত্যের নয়নাভিরাম কৃতকার্যতার ঈর্ষান্বিত হইয়া মুসা ১০,০০০ আরব সিরীয় সেনাবাহিনী লইয়া স্পেনে প্রবেশ করেন এবং তারিক কর্তৃক পাশ-কাটাইয়া যাওয়া কিছু সংখ্যক নগরী তিনি জয় করেন। টলেডোতে তিনি তারিকের সহিত মিলিত হইবার পর তাহাকে তিরস্কার করেন এবং বিনা অনুমতিতে কাজ করিবার অপরাধে তাহাকে বন্দী করেন। অতঃপর স্পেনে মুসলমানদের অগ্রগতি দেশ বিজয়ের পরিবর্তে বিজয়ী বাহিনীর কুচকাওয়াজের রূপ পরিগ্রহ করে। ৭১৩ সালে মুসার সেনাবাহিনী বিস্কে উপসাগরে পৌঁছে।

৩৪৪. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৩৪৫. সৈয়দ আমীর আলী, (অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ), প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৬ - ৬৭

প্রায় ৮০০ বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণ স্পেনে অবস্থান করে। ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্ক হইতে বহিস্কৃত উমাইয়াগণ করডোভায় রাজধানী স্থাপন করিয়া স্পেনে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত পতিষ্ঠা করে। বহু শতাব্দী যাবত স্পেনের মধ্য দিয়া ইসলামি ভাবধারা পাশ্চাত্যে প্রবাহিত হয়। আরবগণ কর্তৃক বিজিত দেশগুলির মধ্যে স্পেনই একমাত্র দেশ যাহার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হয় নাই। আবার ইহাই একমাত্র দেশ যাহা খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক পুনঃবিজিত হয় এবং যাহার মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অবলুপ্ত।[৩৪৬] স্পেনের ইসলামের কাহিনী, অধিকাংশ বার্বার ও সিরীয় (মূর) কার্যকলাপের বিবরণ এবং হৃদয়গ্রাহী-যাহা এই গবেষণার আওতার বাহিরে।

৫.৩: উমাইয়া খলিফাদের আমলে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিসমূহকে পরবর্তীকালে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হত এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ (খলিফাগণ) অবিচলিত নিষ্ঠার সাথে এ আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন। আইনগত প্রকৃতির দিক থেকে এমন কি কাঠামোর দিক থেকে বিচার করলেও ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর সাথে খলিফাগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য এবং পরিবেশের পরিবর্তন হওয়ায় রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের তাগিদে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মীয় উদ্দেশ্য-প্রধান চুক্তিগুলো হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক শ্রেণির নয়া চুক্তির সৃষ্টি হল।[৩৪৭]

উমাইয়া শাসন আমলঃ উমাইয়া শাসন আমলে খলিফা ১ম মুয়াবিয়া ও আবদুল মালিক বাইজান্টীয়দের (রোমান) সাথে কতিপয় চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সেই সময় মুসলমানগণ গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় বাইজান্টীয় আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। এমতাবস্থায় তাদের আক্রমণ পরিহারের উদ্দেশ্যে তাঁরা শুল্ক দানের শর্তে তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। মুয়াবিয়া তখনো খলিফা হিসেবে স্বীকৃত লাভ করেননি। খেলাফত নিয়ে তিনি তখনো হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলো শর্তে তিনি বাইজান্টীয় সম্রাট দ্বিতীয় কন্সট্যান্স এর সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। ৬৫৮ খৃস্টাব্দে তাঁর নিজের কর্তৃত্ববলে মুয়াবিয়া এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি সম্রাটকে শুল্ক দিতে স্বীকৃত হন।

৩৪৬. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯
৩৪৭. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬৬

ইরাকের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাকালে অন্যতম উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকও (হিজরী ৬৫-৮৬; খৃস্টাব্দ ৬৮৫-৭০৫) বাইজান্টীয়দের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন। আইনবিদগণ অমুসলিম কর্তৃপক্ষকে শুল্ক দানের ব্যাপারে ইমামের কার্যের বৈধতা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। আল-আউযায়ী (মৃত্যুঃ হিজরী ১৫৭; খৃস্টাব্দ ৭৭৩) ও সুফিয়ান আস-সাউরী (মৃত্যু হিজরী ১৬১; খৃস্টাব্দ ৭৭৭) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রয়োজনের তাগিদে অনুরূপ শুল্ক প্রদান দোষাবহ নয়। এঁরা উভয়েই উমাইয়া আমলের লোক ছিলেন। তবে মুসলিম শক্তির গৌরবময় যুগের আইনবিদ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। হানাফী আইনবিদগণও অনিবার্য কারণ ব্যতীত (অর্থাৎ অতীব প্রয়োজনের ক্ষেত্র ছাড়া) অমুসলিম কর্তৃপক্ষকে শুল্ক দানের বিরোধিতা করেছেন। তবে অধিকাংশ আইনবিদই বার্ষিক শুল্ক দানের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন; অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প কালের জন্য অনুরূপ শুল্ক প্রদান করা যেতে পারে বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেবলমাত্র চরমপন্থী আইনবিদ আল-লুলু যে কোন পরিস্থিতেই হোক না কেন, শত্রুপক্ষকে শুল্ক দানের বিরোধিত করেছেন। এমন কি শক্তির দিক থেকে মুসলমানদের অবস্থা দুর্বল বলে মনে করলেও শত্রুপক্ষকে শুল্ক দানের পরিবর্তে ইমামের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত বলে তিনি রায় দেন।[৩৪৮]

৫.৪: উমাইয়াদের সময় আভ্যন্তরীণ উন্নতি

সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিলঃ

১। কুফা- যাহা ইরাক, ইরান, ও পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার ঘাঁটি হিসাবে কাজ করে;

২। হিজাজ, আরব উপদ্বীপের জন্য;

৩। জর্জিয়া, সিরিয়া ও উত্তরাঞ্চলের জন্য;

৪। মিসর এবং স্পেন;

৫। ইফরিকিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের জন্য।

প্রত্যেক প্রদেশে একজন প্রতিনিধি থাকেন, যাঁহাকে আমীর বা সাহেব বলা হয় যিনি খলিফার দ্বারা নিযুক্ত হন। প্রদেশের সমস্ত কাজের কৃতিত্ব থাকে প্রতিনিধির হাতে। তিনি বিভিন্ন এজেন্ট ও বিচারক নিযুক্ত করেন এবং প্রদেশের রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থার জন্য খলিফার নিকট দায়ী থাকেন। প্রদেশের উদ্বৃত খাজনা তিনি রাজধানী দামেস্কে প্রেরণ করেন। খলিফা প্রায়ই তাঁহার নিজস্ব কর আদায়কারী প্রেরণ করেন, কিন্তু

৩৪৮. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৮

উমাইয়া খেলাফতের শেষের দিকে খলিফাগণ এত দুর্বল ছিলেন যে, রাজ-প্রতিনিধিগণই কার্যত শাসক হইয়া যান। প্রতিনিধিগণ বিশাল ধন-সম্পদ আয়ও করেন। একমাত্র প্রতি শুক্রবার জুম্মার খোতবায় খলিফার নাম বিশেষভাবে পাঠ করিবার মাধ্যমেই প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা খলিফার অধীনস্থ লোক।[৩৪৯]

উমাইয়াদের মধ্যে ধার্মিক খলিফা দ্বিতীয় উমর[৩৫০] (৭১৭-৭২০) বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে খলিফা নিযুক্ত করিয়াছেন। একজন খলিফার প্রধান দায়িত্ব হইল জনগণকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা, কর আদায় করা নহে। ফলে তিনি সমস্ত মুসলমানদিগকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দান করেন। তবে জিজিয়া কর কিছু দিনের জন্য অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে। এই দোদুল্যমান অবস্থা অমুসলিম ও অনারবব ভদ্র সম্প্রাদায়কে একটি নিদারুণ অর্থনৈতিক অবস্থায় নিক্ষেপ করে, কারণ তাহারা জানে না এক খলিফা হইতে অন্য খলিফার কর প্রথা কিরূপ হইবে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশেষ্ত ইরানে অসন্তোষ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়, যাহা উমাইয়াদের পতনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। [৩৫১]

আলীর মৃত্যু এবং পরে মুয়াবিয়ার খেলাফতের গদীতে আরোহণের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হইয়া যায় যে, একমাত্র কোরাইশ বংশের লোকেরাই এই উচ্চপদের আশা করিতে পারে। খারেজীদের মতানুসারে যে কোনো লোক বংশ মর্যাদার সমর্থন ছাড়াই একমাত্র খাঁটি ধর্মীয় নৈতিকগুণাবলীর দ্বারা খলিফা হইবার উপযুক্ত- এই নীতি পরিত্যাক্ত হয়। আইনানুগ পন্থীদের (Legitimist) মতানুসারে খেলাফত একমাত্র আলী (রা.)-এর বংশধরদেরই প্রাপ্য-এই যুক্তিবাদীদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা কোরাইশদের দাবি সমর্থনের মাধ্যমেও এই সমস্যার সমাধান হয় নাই, কারণ কোরাইশদের মধ্যেও অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজেকে সর্বোত্তম বিবেচনা করিতেন।

কন্যা ফাতিমার মাধ্যমে খেলাফতের মালিক হযরত রাসূল (সা.)-এর বংশধরগণ ও তাঁহার সমর্থকগণ এই দাবি হযরত আলী (রা.)-এর মৃত্যুর পরও পরিত্যাগ করে নাই। ফলে হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসাইন (রা.) উমাইয়া-প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্ভাব্য কেন্দ্রস্থলে পরিণত হন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাসান (রা.) সাম্রাজ্যের দাবির চাইতে হেরেম রক্ষা করিতে অধিক উদ্যোগী বলিয়া মনে হয়। তাই বার্ষিক এক লক্ষ দিরহাম ভাতা

৩৪৯. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭২
৩৫০. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬
৩৫১. Bmjwg wek‡Kvl- ইফাবা,ঢাকা: ১৯৮৮, খ.৬, পৃ.১-৯

গ্রহণ করিয়া মদীনার নিকটবর্তী এক ভিলায় অবসর জীবন যাপন করিবার জন্য মুয়াবিয়া তাঁহাকে রাজী করাইতে সক্ষম হন।[৩৫২]

কনিষ্ঠভ্রাতা হোসাইন (রা.) ভিন্নপ্রকৃতির। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। পারস্য উপসাগরের উপরে অবস্থিত কুফা নগরীতে একত্রিত বিরোধী দলের তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াজিদ খলিফা হইলে হোসাইন (রা.) তাহাকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে অস্বীকার করেন এবং গোপনে মদীনা ত্যাগ করিয়া কুফার তাঁহার অনুসারীদের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এইসব অনুসারীগণ ইতিমধ্যে ইয়াজিদকে খলিফা বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। হোসাইনের দুর্ভাগ্য, ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনের ক্ষুদ্র দলটি আধুনিক বাগদাদের দক্ষিণে কারবালা নামক এক মরুদ্যানে হঠাৎ আক্রান্ত হয়। তথায় প্রায় সমস্ত পুরুষদিগকে হত্যা করা হয়, হোসাইনের শিরচ্ছেদ করা হয়, মহিলা ও ছেলে-মেয়েদেরকে বন্দী করা হয়।

হোসাইন (রা.) শহীদদের নেতায় পরিণত হন এবং দশই মুহররম (৬৮০) তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী খেলাফতের বিরোধীদের মহাসম্মেলনের উপলক্ষে পরিণত হয়। [৩৫৩]

আলীর বংশ খেলাফতের একমাত্র দাবিদার নহে। স্মরণ রাখিতে হইবেই যে আলীর সঙ্গে খেলাফত লইয়া প্রতিদ্বান্দ্বিতা করেন জুবায়ের (রা.)। তিনি এই প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ [হযরত রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র] প্রথমে হোসাইনের পক্ষ অবলম্বন করেন। হোসাইনের বিয়োগান্ত মৃত্যুর পর তিনি নিজেই খেলাফত দাবি করেন।

৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে ইয়াজিদ মদীনা ও মক্কায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই দুই শহরে আবদুল্লাহর শক্তিশালী সমর্থক ছিল। মক্কা্ অবরোধ করিয়া বোমা[৩৫৪] বর্ষণ করা হয়, ফলে কা'বা ভষ্মীভূত হয় এবং কৃষ্ণপাথর ভাঙ্গিয়া তিন টুকরা হইয়া যায়।

উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে সবচাইতে অন্ধ দেশহিতৈষী ছিলেন বোধ হয় আবদ-আল মালিক, যিনি তাঁহার ভৃত্য ইরানের শাসনকর্তা হাজ্জাজের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আদেশ জারি করেন যে, অতঃপর শাসনকার্যের

---

৩৫২. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০

৩৫৩. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৯১

৩৫৪. বোমা বর্ষণ বলিতে পাথুরে বোমাকে বুঝায়। ইহা মানজানিক নামক এক প্রকার হাতিয়ার হইতে নিক্ষেপ করা হয়। -অনুবাদক;সৈয়দ আমীর আলী, অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সম্পা. ড. মফীজুল্লাহ কবীর, Avie RwZi BwZnvm *'A Short History of the Saracens'* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ.১৭২

সমস্ত নথিপত্র পারস্য ও গ্রীক ভাষার পরিবর্তে আরবিতে লিখিতে হইবে। তিনি আরবি অক্ষরযুক্ত নূতন মুদ্রা চালু করেন এবং জনসাধারণকে চিঠিপত্র আরবি ভাষায় লিখিতে বাধ্য করেন। কথিত আছে যে, পারস্য ভাষায় লিখিবার অপরাধে হাজ্জাজ হাজার হাজার লোককে হত্যা করেন।

৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নবীর চাচা আব্বাসের বংশধর আব্বাসীয় খেলাফতে তাহাদের অধিকার দাবি করে। শীঘ্রই শীয়া, পারস্যবাসী এবং অন্যান্য যাহারা কোনো না কোনো কারণে উমাইয়াদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল তাহারা সবাই আব্বাসীয় পতাকাতলে সমবেত হয়। ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে খ্যাতনামা পারস্যবাসী যুবক আবু মুসলিম খোরাসানী আব্বাসীয়দের কৃষ্ণপতাকা উত্তোলন করেন। রাসূল (সা.)-এর পতাকার রংও ছিল কৃষ্ণ বর্ণ। পারস্যবাসীদের দ্বারা গঠিত একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে খোরাসানী, খোরাসানের রাজধানী মার্ভ অধিকার করেন। দুই বৎসর পর ইরাক অধিকার করা হয় এবং ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার আব্বাসের তৃতীয় দৌহিত্র আবুল আব্বাসকে কুফার খলিফা বলিয়া ঘোষনা করা হয়। শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জাব নদীর তীরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে দামেস্কের পতন হয়।[৩৫৫]

উমাইয়া বংশের সদস্যবৃন্দ এবং তাহাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগকে খুঁজিয়া বাহির করত: হত্যা করা হয়। তবে অন্তত একজন যুবরাজ, হিশামের দৌহিত্র আবদ-আল রহমান পলাইয়া যান এবং অনেক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার পর স্পেনে উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

আব্বাসীয়দের ক্ষমতা দখল এক নবযুগের সূচনা করে। প্রথম উমর (রা.)-এর সম্মিলিত আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। আব্বাসীয়দের জয় লাভের ফলে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ক্ষমতার ভারসাম্য সিরিয়া হইতে ইরানে চলিয়া যায়। নূতন রাজধনী হয় ইরানের সীমান্তে অবস্থিত কুফায়। অনারবগণ স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করে এবং নূতন সরকারে পারস্যবাসীগণ প্রধান প্রধান পদ অধিকার করে। আরব আধিপত্যের ভাবধারা আরবদের সহিত মরুভূমিতে চলিয়া যায় এবং বিংশ শতাব্দীর আরও ব্যাপ 'প্যান-আরব' ভূমিকার পূর্বে ইহা আর শোনা যায় নাই। আরবগণ চলিয়া গেলেও ইসলাম রহিয়া গেল এবং ইসলামের ছদ্মবেশে অনেক ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতির অগ্রগতি চলিতে এবং ইহা কখনও পারস্য কখনও উসমানীয় এবং কখনও ভারতীয়।[৩৫৬]

---

৩৫৫. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫
৩৫৬. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৫.৫: দামেস্কে ও স্পেনে উমাইয়া পররাষ্ট্রনীতি

বৈদেশিক নীতি (দামেস্ক)ঃ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী দ্বিতীয় উমর সমরনীতি পরিহার করেন। তিনি ছিলেন শান্তিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী নন। তাঁর আমলে সমস্ত সমরাভিযান স্থগিত করা হয়। মাসলামা কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। স্পেনে আল-হুরের শান্তিপ্রিয় ও সুযোগ্য আল-সামাহকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় উমর কোন সামরিক বিজয়ের সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। কারণ, আল-সামাহ ফ্রান্সের দক্ষিণে একুইটেনের রাজধানী তুলো-এর প্রচণ্ড যুদ্ধে চার্লস মার্টেলের সহায়তায় রাজা ডিউক উডেস-এর নিকট পরাজিত ও নিহত হন।[৩৫৭]

বৈদেশিক সম্পর্ক (স্পেন)ঃ আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে আবদুর রহমান আল-নাসির এক বলিষ্ঠ ও বন্ধুসুলভ বৈদেশিক নীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল উত্তর স্পেনের খ্রিস্টানদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ধূলিসাৎ করা এবং অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরে ফাতেমীয় নৌবহরের প্রভাব খর্ব করা। তাঁর বৈদেশিক নীতির অপর এক উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে মিত্রতা ও সৌহার্দ্র্য বাজায় রাখা। এ সম্পর্ক স্থাপিত হয় দূত বিনিময়ের মাধ্যমে। বৈরী ভাবাপন্ন নাভারী ও লিঁওবাসীদের আক্রমণ করে বশ্যতা স্বীকারে তিনি বাধ্য করেন। কূটনৈতিক দূরদর্শিতা তাঁর পররাষ্ট্র নীতিতে প্রতিফলিত হয়। ফাতেমীয়দের প্রতিহত করার জন্য তিনি স্বদেশীদের হাতিয়ার প্রদান করেন। তাঁর দরবারে কনস্টানটিনোপলের সম্রাট, জার্মান নৃপতি, ফ্রান্স ও ইটালির রাজাগণ দূত প্রেরণ করেন। আমীর আলী বলেন, “৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভায় বহু দূতের সমাগমের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।” এক কথায় তাঁর শক্তি, প্রতিপত্তি ও প্রভাব ইউরোপে ও আফ্রিকায় বিস্তৃতি লাভ করে প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ তাঁকে অনুকরণ করেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আবদুর রহমান একজন বিচক্ষণ নৃপতি ও ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ডোজীর মতে, “এই বিচক্ষণ ব্যক্তি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এর সম্পাদনকে তিনি সঙ্গতিপূর্ণ করেন। মৈত্রীবন্ধনে বস্তুত তিনি শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সহিষ্ণুতায় ভিন্ন মতাবলম্বীগণও তাঁর পরিষদে স্থান পায়। তিনি ছিলেন মধ্যযুগীয় খলিফা অপেক্ষা আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টান্ত। ” শত শত বছরেও ইউরোপে তার নীতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। ফ্রান্সের

৩৫৭. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

চতুর্দশ লুই এবং রাশিয়ার পিটার ও জার্মানির ফ্রেডারিক প্রমুখ অষ্টাদশ শতাব্দীর Enlightened Despot-রাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।[৩৫৮]

দামিশ্‌কের উমাইয়া খলিফাগণ[৩৫৯]

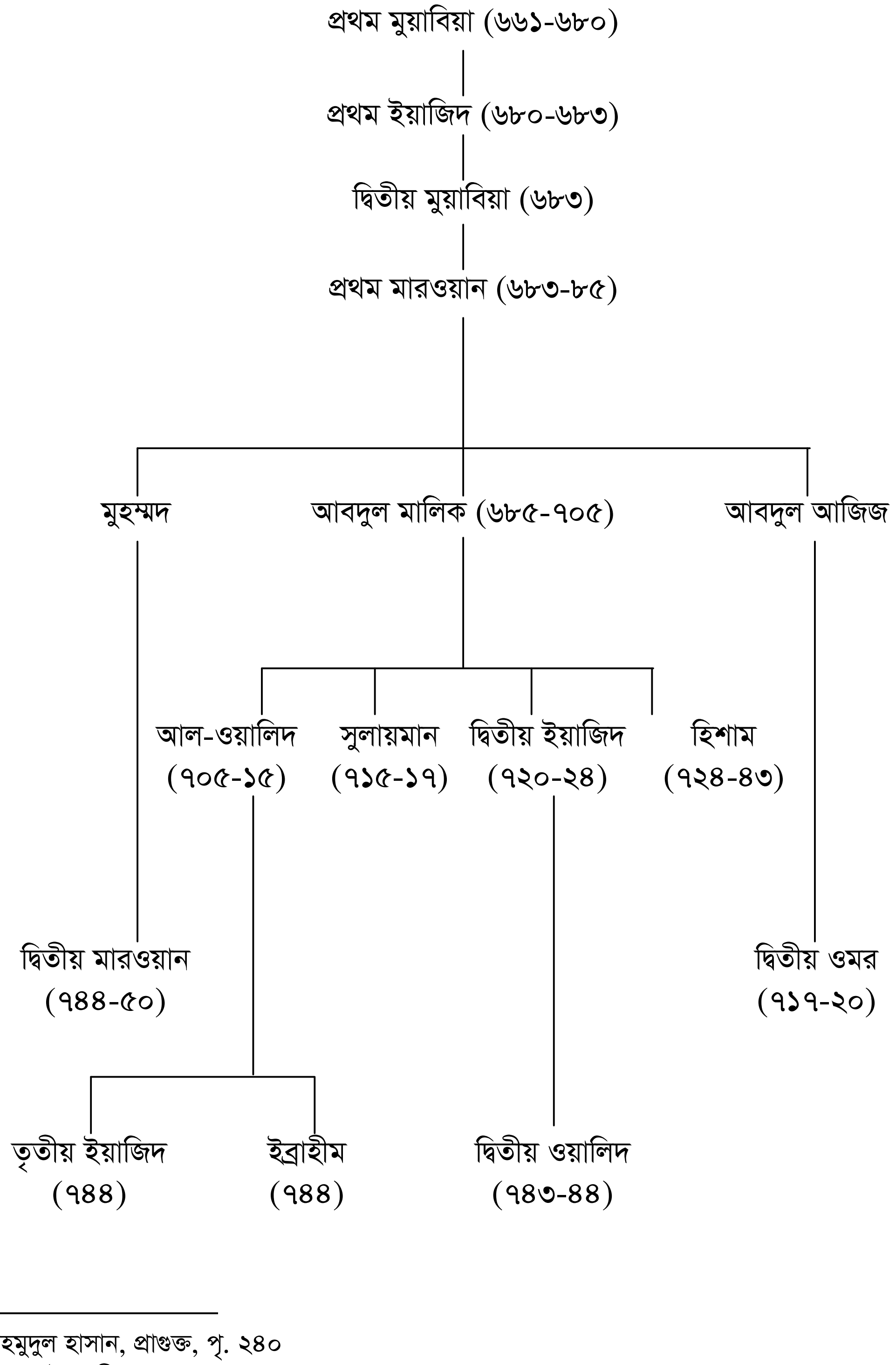

৩৫৮. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০
৩৫৯. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩

Dhaka University Institutional Repository

স্পেনের উমাইয়া আমিরগণ[৩৬০]

(১) আবদুর রহমান (৭৫৬-৮৮)

(২) প্রথম হিশাম (৭৮৮-৯৬)

(৩) প্রথম হাকাম (৭৯৬-৮২২)

(৪)দ্বিতীয়আবদুর রহমান (৮২২-৫২)

(৫) আবদুর রহমান (৮৫২-৮৮)

(৬) আল-মুনজির (৮৮৬-৮৮)

(৭) আবদুল্লাহ্ (৮৮৮-৯১২)

মুহম্মদ

(৮) তৃতীয় আবদুর রহমান
(৯১২-২৯, খলিফা-৯২৯-৬১)

৩৬০. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

Dhaka University Institutional Repository

স্পেনের উমাইয়া খলিফাদের তালিকা[৩৬১]

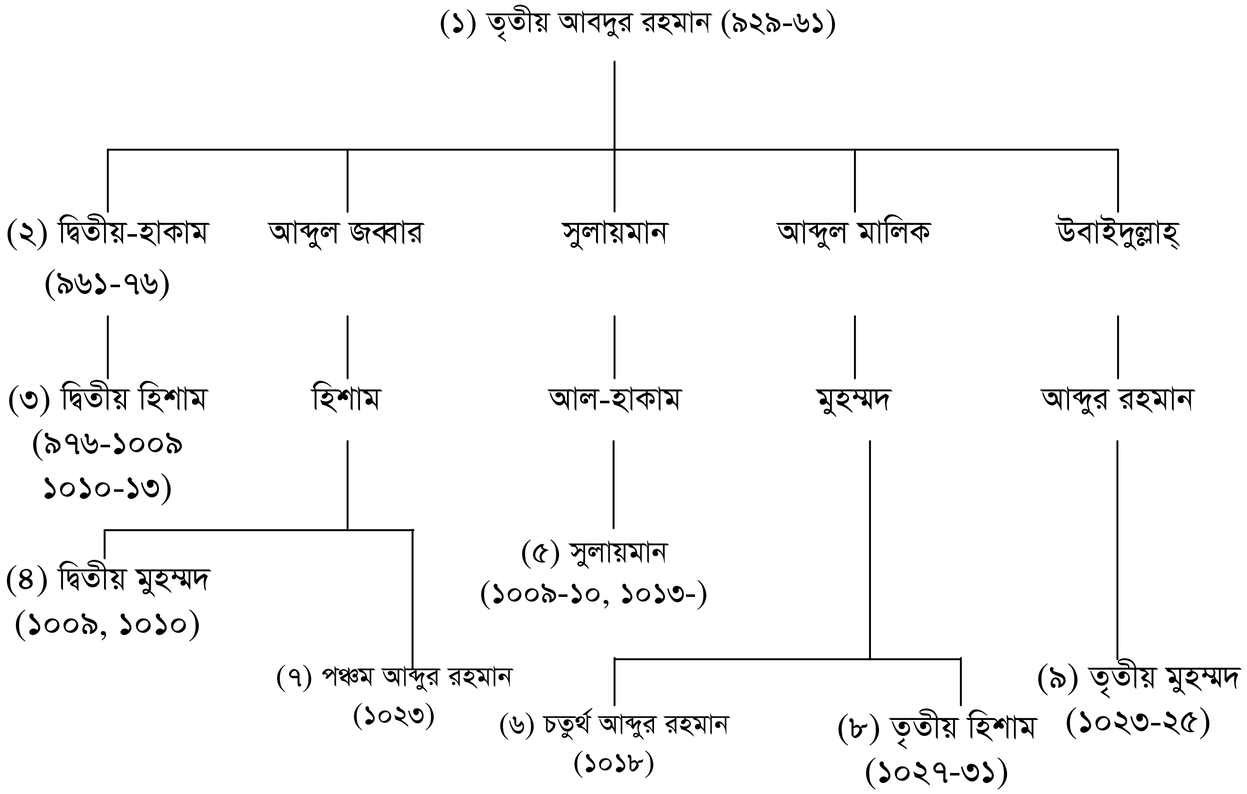

৩৬১. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ ইমাম[৩৬২]

(১) আলী (৬৬১)

(২) আল-হাসান(৬৬৯)

(৩) আল-হুসেন (৬৮০)

(৪) জয়নুল আবেদীন(৭১২)

জায়েদ

(৫) মহম্মদ আল-বাকির (৭৩১)

(৬)জাফর আস্-সাদিক (৭৬৫)

ইসমাইল (৭৬০)

(৭) মুসা আল-কাজিম (৭৯৯)

(৮) আলী আর-রিজা (৮১৮)

(৯) মুহম্মদ আল-জওয়াদ (৮৩৫)

(১০) আলী আল-হাদী (৮৬৮)

(১১) আল-হাসন আল- আসকারী (৮৭৪)

(১২) মুহম্মদ আল- মুনতাজার
(আল মাহদী ৮৭৮)

---

৩৬২. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আব্বাসী যুগের পররাষ্ট্রনীতি

৬.১: আব্বাসীয় খলিফাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: খেলাফত ও চুক্তি (৭৫০খৃ.-১২৫৮খৃ.)

নবীজির চাচা আব্বাসের বংশধরেরা জর্ডানের পূর্ব দিকের একটি গ্রামে বসবাস করতেন। তারা গোপনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সঙ্গে রক্তের সম্পর্কহীন উমাইয়াদের শাসনের বিরোধীতা করেন। তাদের নেতা ছিলেন আবু-আল-আব্বাস। উমাইয়াদের আমলের শেষ সময়ে এক ভূমিকম্পে 'আল-আকসা' মসজিদ ও প্রাসাদ গুলো ক্ষতি গ্রস্থ হয়। যাকে মহা প্রলয় বলা হয়। এমন সময় আবু-আল-আব্বাস নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। উমাইয়াদের সবাইকে হত্যা করেন। ৭৫০ সালে শুরু হয় নবীজির চাচা আব্বাসের বংশধরদের শাসন ব্যবস্থা। কিছু দিনের মধ্যে আবু-আল-আব্বাস মারা গেলে তার ভাই মনসুর খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি জেরুজালেম সফর করেন। 'আল-আকসা' মসজিদ সংস্কার করেন এবং সংস্কার কাজের ব্যয় ভারের জন্য খলিফা আবদুল মালিক কর্তৃক নির্মিত সোনা ও রূপার দরজাগুলো গলিয়ে তুলে নেন। অতপর খলিফা নিযুক্ত হন হারুন অর রশিদ।

খলিফা হারুন অর রশিদের মৃত্যুর পর তার ছেলে মামুন খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন জ্ঞান পিপাসু। তিনি ইসলামের জয়যাত্রার জন্য জ্ঞানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন । তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'বায়তুল হিকমা'। বিশ্ব মানচিত্র তৈরি করেন। তিনি ৮৩১ সালে কনস্টানটিনোপলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তিনি টেম্পল মাউন্টে নতুন নতুন গেট তৈরি করেন। তিনি গম্বুজ থেকে খলিফা আবদুল মালিকের নাম মুছে নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেন।

৮৪১ সালে এক কৃষক বিদ্রোহী জেরুজালেম লুণ্ঠন চালায়। এতে অধিকাংশ জনগণ পালিয়ে যায়। খলিফা মামুনের উত্তরসূরি হন মুস্তাসিম। খলিফা মুস্তাসিম তুর্কির নব মুসলিম বালকদের চাকুরীতে (ঘোড় সওয়ার তীরন্দাজ) নিয়োগ দেন। পরে এইসব নব মুসলিম তুর্কি বালকেরা খলিফা মুস্তাসিমের দেহরক্ষী হন। অথঃপর তারা খিলাফতের লৌহমানবে পরিণত হয়।[৩৬৩]

৩৬৩. মো. আছাদ পারভেজ, c¨v‡j÷vB‡bi e‡K BRivBj; ঢাকা: A peace Press Book 2017, P. 63-64

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসীয় শাসন আমলঃ আব্বাসীয় আমলে খলিফাগণ নানাবিধ কারণে বাইজান্টীয়দের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। প্রথমতঃ উপর্যুপরি সীমান্ত লঙ্ঘন বন্ধের জন্যে উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয়। কারণ, আব্বাসীয়-বাইজান্টীয় সীমান্তে প্রাকৃতিক আড়ালের স্বল্পতা হেতু উভয়পক্ষ প্রায়ই জবরদস্তিমূলক পরস্পরের সীমানা লঙ্ঘন করত। আব্বাসীয় বংশের শাসন আমলের প্রথম দিকে এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী বাইজান্টীয় সম্রাটগণ বাগদাদ কর্তৃপক্ষকে বার্ষিক শুল্ক দিতে বাধ্য হন। এ ভাবেই বাইজান্টীয় সম্রাজ্ঞী ইরিন (মৃত্যু খৃস্টান ৮০২) খলিফা হারুনুর রশীদকে শুল্ক দিয়ে তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তকে বার বার হামলার হাত থেকে রক্ষা করেন। সম্রাট নিসিফোরসের রাজ্যভিষেক পর্যন্ত এই চুক্তি অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু নিসিফোরস সাম্রাজ্যিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বাইজান্টীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক বাগদাদ কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত সমস্ত শুল্ক ফেরত চেয়ে বাগদাদে একটি অবমাননাকর পত্র প্রেরণ করেন। খলিফা হারুন এতে খুব ক্রুব্ধ হন এবং নিসিফোরসকে সমুচিত জওয়াব দানের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে, নিসিফোরস বাগদাদ কর্তৃপক্ষকে পুনরায় নতুনভাবে শুল্ক প্রদান করতে বাধ্য হন। কিন্তু পরে বাগদাদের খলিফাদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ক্ষীয়মাণ হয়ে আসলে কন্সট্যানটিনোপলের (বাইজান্টীয়) সম্রাটগণ তাঁদের শুল্ক দান বন্ধ করে দেন; এমন কি তাঁরা তখন আব্বসীয় সাম্রাজ্যের সীমান্তের ওপরও হানা দিতে শুরু করেন। মুসলিম কর্তৃপক্ষ ও ক্রুসেড যুদ্ধের নায়ক রাজন্যবর্গের সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদিত হয়। আঞ্চলিক খণ্ড সংঘর্ষের অবসান, অবাধভাবে সাধারণ লোকদের বিভিন্ন এলাকায় চলাচল বা পরিভ্রমণ, ধর্মস্থানসমূহ পরিদর্শন, হজব্রত পালন প্রভৃতি উদ্দেশ্যেই এই শ্রেণির চুক্তি হয়। হজব্রত পালন কিংবা পবিত্র ধর্মস্থানসমূহ পরিদর্শনের সুযোগ-সুবিধার বিশেষ উদ্দেশ্যে ১১৯২ খৃস্টাব্দে সুলতান সালাউদ্দীন ও ক্রুসেড[৩৬৪] নায়ক রিচার্ড কু'র-ডি-লায়নের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে আরেক শ্রেণির চুক্তিও সম্পাদিত হয়। এগুলো 'ফিদা-চুক্তি' (ক্ষতিপূরণ বা মুক্তিমূল্য চুক্তি) নামে অভিহিত। বন্দী বিনিময়ের ভিত্তিতে কিংবা স্বীকৃত অর্থ প্রদান করে যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করাই ছিল এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে বিজয়ী তাঁর রাষ্ট্রীয় তহবিলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করতে পারতেন। অপরপক্ষে, এর ফলে হাজার হাজার হতভাগ্য যুদ্ধবন্দীর জীবন রক্ষা পেত। এ চুক্তির ব্যবস্থা না থাকলে হয় এরা নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করত কিংবা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।[৩৬৫]

---

৩৬৪. Bmjwg wek‡Kvl- ইফাবা,ঢাকাঃ ১৯৮৮, খ.৯, পৃ.৩৭৫
৩৬৫. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫-১০৭

উমাইয়া আমলে ফিদা-চুক্তির কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে বন্দী বিনিময় করার রেওয়াজ তখনো ছিল। আরব ইতিহাসবিদদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, চুক্তির মাধ্যমে সুসংহত ব্যবস্থা হিসেবে ফিদা-চুক্তি খলিফা হারুনুর রশীদের আমলেই প্রথম প্রবর্তিত হয়। হিজরী ১৮১ সালে খলিফা হারুন অর রশিদ চুক্তিটি সম্পাদন করেন। এর ফলে প্রায় ৩ হাজার ৭শ' মুসলিম বন্দী মুক্তিলাভ করে। ইতিহাসবেত্তা আল-মাসুদী বলেন যে, খলিফা হারুনের আমল থেকে তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত অনুরূপ মোট ১২টি ফিদা-চুক্তি-সম্পাদিত হয়। বিশেষ অনুষ্ঠানাদির পর বন্দীদের মুক্তিদান কার্য সম্পন্ন হত। উভয়পক্ষই এই উপলক্ষে নানাবিধ আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করতেন।

চুক্তির শর্তাদি কার্যকরী করার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে প্রতিভূ (রাহাইন) বিনিময়েরও ব্যবস্থা সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়। প্রাচীন চীন ও রোমে এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। প্রাচীন রীতিতে এইরূপ বিধান ছিল যে, চুক্তির বাধ্যবাধকতা ও শর্তাদি যথাযথভাবে কার্যকরী করা হলে প্রতিভূদের নিরুপদ্রবে তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে দেয়া হত। আর যদি কোন কারণে চুক্তি লঙ্ঘন করা হত, প্রতিভূদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গণ্য করা হত এবং অনেক সময় তাদের উৎপীড়ন ও দুদর্শাও ভোগ করতে হত। কিন্তু মুসলমানগণ প্রতিভূদের নিজেদের আমানত হিসেবে মনে করতেন এবং তাদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা দান করতেন। প্রতিভূদের সঙ্গে তাঁরা ন্যায়বিচার ও সহৃদয় ব্যবহার করতেন। চুক্তিভঙ্গ হলে এবং যুদ্ধ ঘোষিত হলে মুসলমানগণ প্রতিভূদের তাদের নিজ দেশে পাঠিয়ে দিতেন; কিন্তু যুদ্ধ না বাধলে প্রতিভূদের হয় আগের মতই নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখা হত কিংবা তাদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া হত।[৩৬৬]
আবাসীদের সম্পর্কে Nazih N. Ayubi বলেন-

The Abbasid dynasty (C.AB 750 to c. 1258) Made much political Capital of their Quraishi lineage and set about Constructing a prosperous state, by developing the economy improving the hydraulic system and reclaiming more land, and also by improving the tax and financial system.[367]

৩৬৬. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৭

367. Nazih N. Ayubi, *Over-stating the Arab State politics and society in the middle East*, I.B. Tauris publishers London, New York 1995 P. 12

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসীয় খলীফাগণ কর্তৃক লিখিত চুক্তি

কুদামা ইবনে জাফর (মৃত্যুঃ ৩১০ হিজরী) হতে অবগত স্থল ও নৌবাহিনীর সেনাপতিদের নিকট উপেদেশাবলী। আমি ইস্তাম্বুলে রক্ষিত দুস্পাপ্য অতুলনীয় কপি হতে উদ্বুদ্ধ করছি। তা অনুবাদের চেষ্টা করি নি, কারণ, যদিও এইগুলি সুন্দর ভাষায় লিখিত আছে ইহাতে সারবস্তুর তুলনায় কথার আধিক্য বেশী এবং বাহিনীর বাইরের আচার-ব্যবহারের তুলনায় বাহিনীর আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয়ে আদেশ-নির্দেশ বেশী আছে।[৩৬৮]

মধ্য-এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ঃ সাম্রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা অধিকৃত অঞ্চলে আব্বাসীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা সুদৃঢ়করণে হারুন বিশেষ অবদান রাখেন। ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র কাবুল ও সানবাদ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সাম্রাজ্যের সীমানা হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর খলিফা এশিয়া মাইনরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো সাধারণ প্রদেশসমূহ থেকে পৃথক করে “সুরক্ষিত অঞ্চল” বা “আওয়াসিম” নামকরণ করে সামরিক প্রশাসনের অধীনে আনেন। তিনি সিরিয়ার টুরসাসে পুনঃবসতি স্থাপন করে সেটিকে একটি সুরক্ষিত সীমান্ত দুর্গে পরিণত করেন।[৩৬৯]

আল-মনসুরঃ আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী, আব্বাসী বংশের দ্বিতীয় খলিফা, শাসনামল ৭৫৪খ্রি.— ৭৭৫ খ্রি. তিনি একজন সূদক্ষ রাজনৈতিক পরিকল্পনাবিদ ছিলেন। খিলাফতের উন্নয়ন সম্পর্কে তাহার পরিজ্ঞান ছিল সুস্পষ্ঠ, তাহার শাসন নীতি ছিল নির্ভরযোগ্য, বেতন ভুক্ত সেনাবাহিনী এবং রাজস্ব সংগ্রহের এক কার্যকরী পদ্ধতি ভিত্তিক একটি কেন্দ্রীভূত বৃহৎ রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করা।

৭৫৭-৭৫৮ সালে আবদুল জব্বার আল আযদীর বিদ্রোহের পর আল মানসুর তদীর পুত্র মুহাম্মদকে প্রেরন করিয়া পরবর্তী কালে খলীফা আল-মাহদীকে আর রায় এর রাজ্য প্রতিনিধি (Viceroy) হিসেবে প্রেরণ করিয়া প্রদেশের সমস্যার সমাধান করেন। ফলে খুরাসানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় সুযোগ সৃষ্টি হয়। তখন পূর্নাজ্ঞ আব্বাসী কর্তৃত্ব নিশ্চিত হয়। [৩৭০]

---

৩৬৮. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৯

৩৬৯. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৩

৩৭০. নিরাপত্তা বিধান কল্পে খলিফা বাগদাদে রাজধানী স্থাপনের মনস্থ করেন। তার ডাক নাম “আবদুদ দাওয়ানীক” “Father of Farthing” সিকি বা পেনির জনক অথাৎ ‘ধনাঢ্য ব্যক্তি’। তাহার শাসনামলের ২১ বছর পর্যন্ত খলিফার নিয়ন্ত্রনাধীনে কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবীদ ছিলেন।
we¯ÍwiZ- সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৬), খ. ১৭, পৃ. ৪৯২-৪৯৪

আব্বাসীয় খেলাফত

আব্বাসীয় খেলাফতের ইতিহাসকে দুইভাগে ভাগ করে যায়।

প্রথমাটি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং

দ্বিতীয়টি ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল হালাক খাঁ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস পর্যন্ত। আব্বাসীয় শাখায় সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে দুইজন, হারুন-আল-রশীদ ও মামুন প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। অন্য ছয়জন খলিফা রশীদ ও মামুনের ন্যায় তেমন বিখ্যাত না হইলেও তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন এবং রাষ্ট্রের কার্যবলীতে স্ব স্ব কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। ক্ষমতার দিক হইতে মূলত আব্বাসীয় বংশ ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়। ইহার পর খলিফাগণ নামে মাত্র ক্ষমতায় ছিলেন, যাহাদের সাম্রাজ্যের উপর কোনো আধিপত্য ছিল না এবং প্রাসাদের উপরও কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। এই সমস্ত খলিফাদের মধ্যে অনেকে এমন অধঃপতিত ছিলেন যে, রাজধানী বাগদাদ নগরীতেও তাঁহারা শক্তিশালী উমরাহদের হাতে প্রায় বন্দী দশায় বসবাস করিতেন। এইসব ক্ষমতাবান লোক কিছু কিছু পারস্যবাসী ছিল, কিন্তু অধিকাংশই ছিল তুর্কি, যাহারা ইচ্ছা অনুযায়ী খলিফাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিত কিংবা সিংহাসনে বসাইত এবং জীবনের প্রত্যেক কর্মই তাহাদের আদেশানুযায়ী করান হইত। বাগদাদের বাহিরে এবং রাজধানীর আরও দূরে সাম্রাজ্য এমনভাবে বিভক্ত ছিল যে কখনও কখনও দুর্বল খলিফাগণ তো দূরের কথা, খলিফাদের শাসনকারী ক্ষমতাবান লোকদেরও কোনো আধিপত্য থাকিত না। ঐ সমস্ত জায়গায় বাগদাদের পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইগুলি খলিফাদের অবস্থিতির প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায় কাজ করিত।[৩৭১]

খলিফা হিসাবে নাম ঘোষণা হইবার পর আবুল আব্বাস কুফার মসজিদে একটি উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সেই অনুষ্ঠানে তিনি আল-সাফফাহ উপাধি ধারণ করেন, যাহার সর্বজনস্বীকৃত অনুবাদ হইল 'রক্তপত্র।' ইহার দ্বারা তিনি দুইটি রীতির সূচনা করেন। পরবর্তী প্রত্যেক আব্বাসীয় খলিফাও এক একটি উপাধি ধারণ করেন যথা মনসুর, মেহেদী, রশীদ প্রমুখ। বস্তুত খলিফাগণ তাঁহাদের উপাধি দ্বারাই প্রধানত পরিচিত। দ্বিতীয় রীতি হইল খলিফার পার্শ্বে জল্লাদের দণ্ডায়মান থাকা।

৩৭১. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক আব্বাসীয়গণ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও পূর্ব-কোরাইশ বংশের[৩৭২] সহিত তাঁহাদের সম্পর্কে

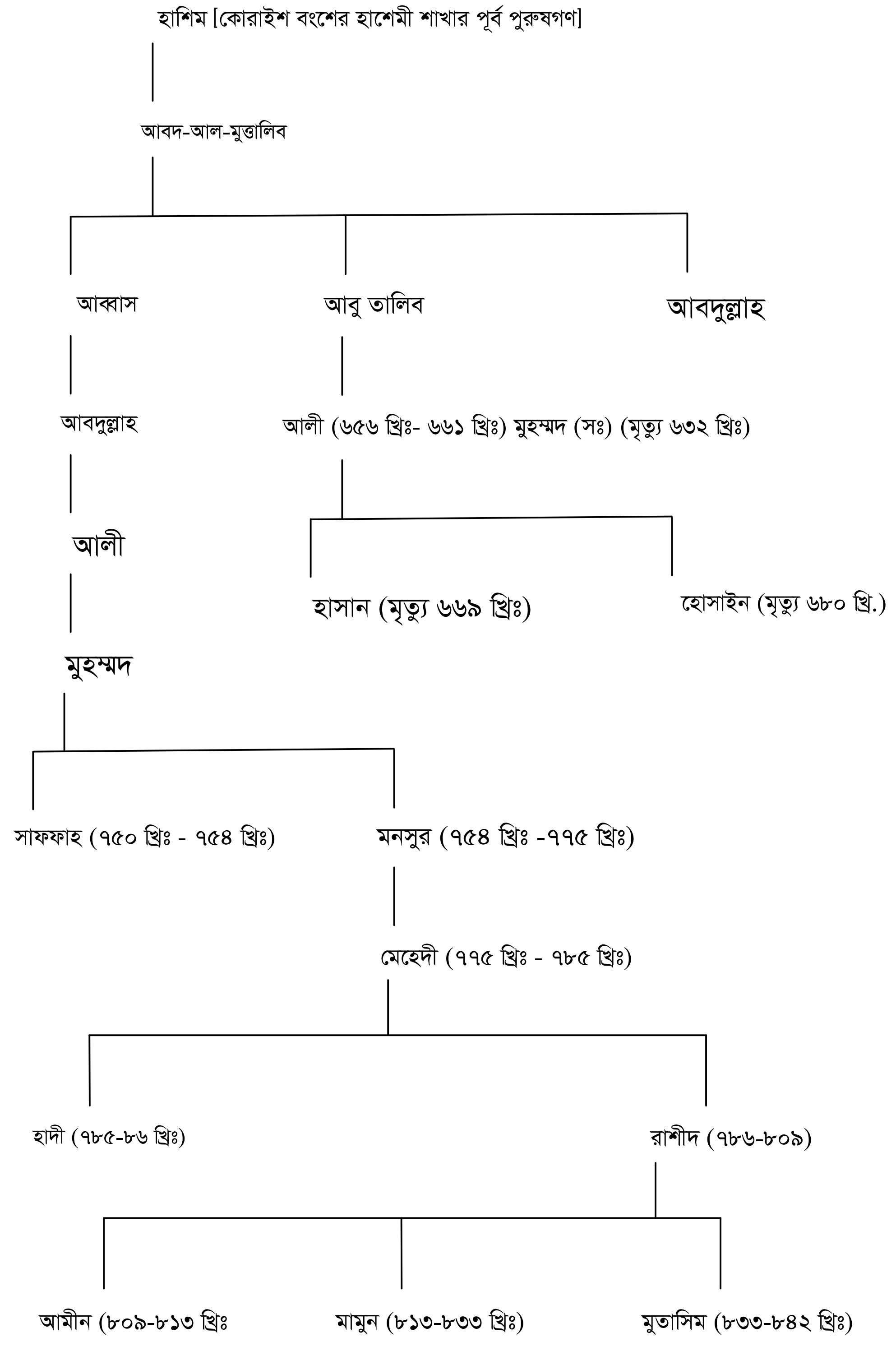

৩৭২. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আব্বাসীয়গণ মূলত ক্ষমতায় আসেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড দল যথা শিয়া, খারেজী, রক্ষণশীল ধর্মপন্থী, পারস্যবাসী এবং অন্যান্যদের ক্ষোভকে ব্যবহার করিয়া। প্রত্যেক দলের নিকট আব্বাসীয়গণ ন্যায্য কাজের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, ফলে প্রত্যেক দল স্ব স্ব উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য তাহাদিগকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিতে সাহয্য করে। ঝুঁকি ছিল প্রবল, কিন্তু তাহাদের পদক্ষেপে কোনো বাধাই রাখা হয় নাই।

নূতন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাফফাহ্ এবং আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মনসুর উমাইয়া বিরোধীদের হাত হইতে নিজ দিগকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। এক অভিনব পদ্ধতিতে তাহারা এক দল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অন্য কোনো দলের পক্ষাবলম্বন করেন। আব্বাসীয়দের এই সমস্ত বন্ধুদের শেষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইলেন প্রসিদ্ধ আবু মুসলিম খোরাসানী। এই উল্লেখযোগ্য পারস্যবাসীর প্রকৃত নাম বেহযাদান। বাহ্যত তিনি মুসলমান কিন্তু জরথুস্ত্র হিসাবে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। যাহাই হউক, তিনি আব্বাসীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাই তাহাদের কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁহার সৈন্যগণ কালো উর্দি পরিধান করে বলিয়া তাহারা ব্লাক-শার্ট হিসাবে পরিচিত। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, সফলতার জন্য আব্বাসীয়গণ আবু মুসলিম ও তাঁহার পারস্য সৈন্যদের নিকট অনেকাংশে ঋণী। খুব সম্ভবত আব্বাসীয়দের দ্বারা উমাইয়াদিগকে ধ্বংস করিবার পর তিনি তাহাদের কবলমুক্ত হইতে চাহেন। মোটামুটিভাবে আব্বাসীয়দেবও অনুরূপ একটি পরিকল্পনা ছিল। উমাইয়াদিগকে পরাজিত করিবার জন্য আবু মুসলিমকে ব্যবহার করিয়া তাহারাও তাঁহার কবলমুক্ত হইতে চাহেন। স্বীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য আব্বাসীয়গণ অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সহিত অগ্রসর হয়। ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মনসুর তাঁহার প্রাসাদে আবু মুসলিমকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন এবং সেই খানে তাঁহাকে হত্যা করেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়া ইরানে বিশেষত খোরাসানে এমন প্রবলভাবে দেখা দেয় যে, ইহা দমন করিবার জন্য আব্বাসীয়দের প্রায় এক শতাব্দী সময় লাগে। [৩৭৩]

আব্বাসীয়গণ কর্তৃক রক্ষণশীল জনসাধারণের সমর্থন লাভের এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল উমাইয়াদের তথাকথিত ধর্মবিমুখতা। উমাইয়াদের পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আব্বাসীয়গণ একটি খাঁটি ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দান করেন। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তাঁহারা অগ্রসর হন। সঠিকভাবে বলিতে গেলে, আব্বাসীয়গণ তাঁহাদের উমাইয়া সমগোত্রীয়দের চাইতে কোনো অংশে কম জাগতিক ছিলেন না,

৩৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

তবে তাঁহারা ধার্মিকতার ভান করিতে জানিতেন। তাঁহারা ধর্মীয় নেতাদের মতামতকে সম্মান প্রদর্শন করেন, জনসাধারণের উপর ইসলাম চাপাইয়া দেন এবং ইসলামে সর্বপ্রথম তাঁহারাই একটি অনুসন্ধিৎসু সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ধার্মিকতার প্রতীক হিসাবে আব্বাসীয় খলিফাগণ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে এবং জুময়ার নামাজে রাসুলুল্লাহ (সা.) জামা পরিধান করিতেন। আব্বাসীয় খলিফাগণ রাজনৈতিকভাবে যতই দুর্বল হউন না কেন, ধর্মীয়ভাবে তাঁহারা গোঁড়া ধার্মিকতার লক্ষণ হিসাবে মুতাসিম হইতে আরম্ব করিয়া অন্যান্যা খলিফাগণ তাঁহাদের নামের শেষে আল্লাহ্ শব্দ যুক্ত করেন, যথা আল-মুতাসিম বি-আল্লাহ্ (বিল্লাহ উচ্চারিত)।[৩৭৪]

পারস্য বিরোধিতার প্রথমরূপ হইল ধর্মীয়। আব্বাসীয়দের ধর্মনীতি যেহেতু জনসাধারণের জীবন ও আচার ব্যবহার পদ্ধতিকে বিচলিত করিয়া তোলে, তাই সাধারণ মানুষ তাহাদের একমাত্র উপকরণ লইয়া ইহার প্রতিবাদ করে। তাহারা বিভিন্ন ধর্মীয় বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। আবু মুসলিমের হত্যার পর মার্গীর ধর্মাবলম্বী সিন্‌বাদ নামক তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কাবা ধ্বংস করিতে অগ্রসর হন। অতি স্বল্প আয়াসে খলিফা তাঁহাকে ধ্বংস করেন। তবে ৭৬৭ সালে অসতাডসিস (Ostadsis) নামক আরেকজন নিজেকে নবী বলিয়া দাবি করেন এবং আবু মুসলিমের পুনরাবির্ভাব বলিয়া ঘোষণা করেন। অসতাডসিসের পর আর ও একজন নবীর উদয় হয়। তাহাদের সবাই হতাশাগ্রস্ত ও ক্রুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে তৃড়িৎ সমর্থন লাভ করে বলিয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। নবীদের মধ্যে সবচাইতে প্রসিদ্ধ ছিলেন মুকান্না বা খোরাসানের পর্দাবৃত নবী যিনি ৭৭৬ সালে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁহার সহস্রাধিক অনুসারী সাদা বস্ত্র পরিধান করিত এবং তাহাদিগকে 'শ্বেত-জমা' বলা হইত।[৩৭৫] তাহাদের কাজ ছিল কাফেলা লুট, মসজিদ ধ্বংস এবং যাহারা আজান দেয় বা আজানের জবাব দেয় তাহাদিগকে হত্যা করা। মুকান্না দাবি করেন যে, আবু মুসলিম একজন দেবতা ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে পুনরাবির্ভুত হইয়াছেন। তাঁহার বিদ্রোহ এমন ধ্বংসাত্মক ছিল যে, খলিফা মেহদীকে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। প্রায় মুসলিম ঐতিহাসিক পর্দাবৃত নবীর উপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আলোচনা করেন।[৩৭৬]পর্দাবৃত নবীর বিদ্রোহকে অদ্‌ভুত ও বিভ্রান্তিকর ধরা হইলেও বাবক

---

৩৭৪. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৩৭৫. ইয়াহ্‌ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৩৭৬. মিশৌরীর সেন্ট লুই ও কেনসাস সিটিতে "দি ভেইলড প্রফেট অব খোরাসান" (খারাসানের পর্দাবৃত নবী) নামে একটি ভ্রাতৃবৎ সংগঠ আছে, তাহারা বিশ্বস করে যে. "পর্দাবৃত নবী" ছিলেন খোরাসানের নেভার, নেভারল্যান্ডের পৌরাণিক ব্যক্তি। বোধহয় এই প্রতিষ্ঠান ইহার নামকরণ করিয়াছে টমাস মূরের "লালারুখ" কাহিনী হইতে যাহার নায়ক খোরাসানের পর্দাবৃত নবী।

খোররামদীনের বিদ্রোহ ছিল সুবিন্যস্ত ও ভয়াবহ। আবু মুসলিমের হত্যায় বৎসর পরে বাবক তাঁহার অনুসারীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য এই ঘটনাকেই ব্যবহার করেন। বাবকের ধর্ম ছিল জরুথুস্ত্র ও মার্যদাকীয় ধর্মের সংমিশ্রণ, যাহাকে বলা হয় খোররামদীন, 'উত্তম ধর্ম'। তাঁহার অনুসারীদিগকে বলা হয় 'উত্তম ধর্মের অনুসারী' এবং তাহাদের উর্দীর জন্য তাহারা রেড শার্ট বা 'লাল-জামা' নামে সুপরিচিত। তাঁহার আন্দোলনও ছিল ইসলাম বিরোধী এবং বিশ বৎসরেরও অধিককাল পর্যন্ত তিনি খলিফা মামুন ও মুতাসিম-এর শরীরের বিষফোঁড় হিসাবে অবস্থান করেন।

আব্বাসীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে পারস্যবাসীদের বিদ্রোহের দ্বিতীয় স্বরূপ ছিল রাজনৈতিক। বাবকের বন্দীকারী পারস্য সেনাপতি আফশীন ছিলেন এই দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একজন পারস্য অভিজাত হিসাবে তিনি ছিলেন আরব বিরোধী কিন্তু গণবিদ্রোহ তিনি পছন্দ করিতেন না। উচ্চশ্রেণীর পারস্যবাসীগণ জনসাধারণের মতামতকে আমল দিতেন না। তাঁহারা মনে করেন যে ভিতরে থাকিয়া ধূর্ততার সহিত এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে তাঁহারা তাঁহাদের আরব বিরোধী উদ্দেশ্য হাসিল করিতে পারিবেন। বাবকের বিদ্রোহের ন্যায় বিভিন্ন গণবিদ্রোহ পারস্য অভিজাতদের মূল আন্দোলকে নস্যাৎ করিয়া দিবে মাত্র। [৩৭৭] আব্বাসীয়দের এক অনুশাসন বাক্য প্রচলিত আছে, যে ব্যক্তি উজীরকে মান্য করে সে খলিফাকে মান্য করে এবং যে ব্যক্তি খলিফাকে মান্য করে সে আল্লাহকে মান্য করে।

প্রধান উজীরের পদের প্রথম অধিকারী ছিলেন খালেদ-ইবনে-বারমাক। তিনি এক উল্লেখযোগ্য পরিবারের কর্তা ছিলেন, যে পরিবার অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল প্রধান উজীরের পদে বহাল থাকে।

আব্বাসীয় ক্ষমতার প্রতি পারস্য বিরোধিতার তৃতীয় স্বরূপ ছিল সাহিত্যিক। ইহাকে শো'বিয়া আন্দোলন বলা হয়। ইহা উমাইয়া বংশের সময় আরবদের জাতীয় প্রাধান্যকে প্রতিহত করিবার জন্য অনারব মুসলমানগণ (পারস্য ও অপারস্য) কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের অধিকাংশ উদ্যোক্তা ছিলেন সরকারি অফিসসমূহের অনারব সেক্রেটারিগণ। লেখনীর মাধ্যমে তাহারা একদিকে আরবদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালায়, অন্যদিকে নিজেদের জাতীয়তাকে অনুপ্রাণিত করিয়া কৃতিত্ব প্রকাশ করে।

৩৭৭. অদৃষ্টের পরিহাস, অনতিবিলম্বে ধর্মত্যাগের অভিযোগে স্বয়ং আফসীনেরও বিচার করা হয় এবং তাহাকে হত্যা করা হয়। বিচারালয়ে তাহাকে দুইজন ইমামকে মারিবার অভিযোগে তাহার গৃহে জয়থুস্ত্র ধর্মগ্রন্থ সসম্মানে রাখিবার অভিযোগে এবং খতনাহীন থাকিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এই সমস্ত অভিযোগ তিনি স্বীকার করেন।

খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী বিদেশী সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বিভিন্নকক্ষের সম্পদ ও সৌন্দর্যে এতই হতবাক হইয়া যান যে তাহারা প্রায়ই গৃহাধ্যক্ষের দফতরকে দরবারকক্ষ বলিয়া ভ্রম করিতেন। এই পরিবেশে প্রাথমিক আব্বাসীয়গণ তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। [৩৭৮]

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়-খাতের দুইটি ছিল রাজপ্রাসাদ এবং রাজকীয় দেহরক্ষীর জন্য খরচ। খলিফার শোচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হয় এইভাবে যে, ৮৬৭ সালে দেহরক্ষীয় খরচ ছিল বিশ কোটি দিনার, যা সমগ্র সাম্রাজ্যের বার্ষিক ভূমিকরের দ্বিগুণ। বাকি অর্থ ধনী নাগরিকদিগকে বহন করিতে হইত। ব্যয় খাতের অন্যান্যগুলি হইল পবিত্র নগরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, সীমান্ত চৌকি, হাশেমীয় শাখার সদস্যদের ভাতা এবং আমলাদের বেতন।

উমাইয়াদের ন্যায় আব্বাসীয়গণও চিরাচরিত উত্তরাধিকারের সমস্যার সম্মুখীন হয়। উমাইয়াদের ন্যায় খলিফা কর্তৃক উত্তরাধিকারী নিযুক্তির প্রথা চলিতে থাকে। কিন্তু ইহা আব্বাসীয়দিগকে উমাইয়াদের মতোই তেমন কোনো সাহায্য করে নাই। অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয় হারুন-আল-রশীদের মৃত্যুর পর। তিনি তাঁহার উভয় পুত্রকে বয়স অনুপাতে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করেন-প্রথমে আমীন এবং তারপর মামুন। মামুন-যাঁহার মাতা ও স্ত্রী উভয়েই পারস্যবাসী - পারস্যবাসীদের পূর্ণ সমর্থনে খেলাফত দাবি করেন। তিনি বাগদাদ অভিমুখে অভিযান করেন এবং স্বীয় ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া খলিফা হন। তবে চারি বৎসর পর তিনি শিয়াদের সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন এবং অষ্টম শীয়া-ইমাম আলী আল রেজাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেন। এই ঘটনা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁহাকে রাজধানী ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয় এবং দুই বৎসরের সংগ্রামের পর তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। তিনি খেলাফত পুনরায় লাভ করেন। কথিত আছে যে তিনি খোরাসানে ইমাম রেজাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতপর ইমামের মৃত্যুতে সংঘটিত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তিনি তাঁহার বিশ্বাসী সেনাপতি তাহেরকে খোরাসানে প্রেরণ করেন। তাহের তাহার জন্মভূমি খোরাসানে যাইয়া পূর্বাঞ্চলের প্রথম স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও জুমার নামাজ হইতে খলিফার নাম প্রত্যাহার করেন।[৩৭৯]

---

৩৭৮. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০২

৩৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৫

Dhaka University Institutional Repository

৬.২: আব্বাসীয় যুগে সমাজ, বানিজ্য, শিল্প ও কৃষি

আব্বাসীয় সমাজ

আব্বাসীয় যুগের অতি গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণের মধ্যে একটি হইল-আরব স্বাতন্ত্র্যনীতি পরিহার করিয়া সমাজ আন্তর্জাতিক হইয়া উঠে। সাম্রাজ্যের বিশালত্ব, ক্রীতদাস-দাসী প্রথার কল্যাণে আরব, পারস্যবাসী, সিরীয়া, মিসরীয়, বার্বার, তুর্কি ও ভারতীয়গণ একে অন্যের মধ্যে সংমিশ্রিত হইয়া যায়। এই সংমিশ্রণ বিশেষভাবে কার্যকরী হয় শহরের কেন্দ্রগুলিতে। আঘানীর গ্রন্থকারের ন্যায় মুসলিম লেখক প্রধানত খলিফা ও উচ্চশ্রেণীর লোকদের জীবন ও অবসর বিনোদনের কথা বর্ণনা করেন। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আমরা এতটুকু জানি যে অসংখ্য সরকারি স্নানাগার ব্যবহার করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহাদের ছিল। আধুনিক যুগের ন্যায় ছোট ছোট শহর এবং বড় বড় গ্রামগুলিতে এই ধরনের সুযোগ ছিল। নবাগতদের জন্য হোটেলের সুবন্দোবস্ত ছিল এবং অত্যন্ত দরিদ্র হইলে তাহারা সর্বদা মসজিদে নিদ্রা যাইতে পারিত। ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যান্য মহিলাগণ পৃথক জীবন যাপন করিত এবং তাহাদের কাজ ছিল গৃহস্থালী ও শিশুদের লালন পালন করা। চারিজন আইনানুগ স্ত্রী পর্যন্ত সিদ্ধ ছিল। সমাজে ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকার দরুন আমরা অনুমান করিতে পারি যে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিত এবং চারিজন স্ত্রী না হইলেও কমপক্ষে অর্ধ-ডজন ক্রীতদাসী উপপত্নী রাখিত। মধ্যপ্রাচ্যে কখনও চেয়ার-টেবিল ব্যবহৃত হয় নাই। উচ্চশ্রেণীর লোকজন মাদুরাবৃত কেদারা ও কুশানে বসিত এবং নিম্নশ্রেণীর লোকজন মাদুরের উপর বসিত। বৃহৎ গোলাকার তাম্রনির্মিত পাত্রে খাদ্য পরিবেশন করা হইত। যেসব পরিবারে মাথাপিছু বাসন যোগাইতে পারিত না তাহারা একটি সাধারণ পাত্রের চতুর্দিকে বসিয়া আহার করিত।[৩৮০]

বানিজ্য, শিল্প ও কৃষি

আরবগণ ব্যবসার তুলনায় কৃষিকার্যকে অবজ্ঞা করিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং একজন কৃতকার্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম সর্বদাই ব্যবসায়ীদিগকে শ্রদ্ধা করে। বাগদাদ, বসরা, সিরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোকে কেন্দ্র করিয়া সাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে বেশ তৎপরতার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। বাগদাদের ঘাটে চীনা জাহাজগুলির আনাগোনা ছিল অতি সাধারণ দৃশ্য। এক অংশ হইতে আরেক অংশে

৩৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

উৎপন্ন দ্রব্য বন্টন করিবার জন্য সাম্রাজ্যের চারিদিকে প্রশস্ত রাস্তাঘাট ছিল। কাফেলার সারি চাউল, লিনেন কাপড়, পশম, মদ, মুক্তা, কাঁচ ধাতব দ্রব্য, ফল, সুগন্ধী, মার্বেল, কার্পেট, টেবিল, ভাজা করিবার পাত্র, ট্রে-গামলা, ঔষধ এবং অন্যান্য অসংখ্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া শহরে আনিত। একমাত্র দক্ষিণ ইউরোপ ব্যতীত বিশ্বের সমস্ত অংশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল অতি জাঁকালো ও লাভজনক। চীনে মুসলমানগণ একটি ব্যবসায়ী কলোনী স্থাপণ করিয়া সেখান হইতে চীনাপত্র ও পশমী কাপড় আমদানি করিত। ভারতবর্ষ হইতে তাহারা মসল্লা ও রং আমদানি করিত। রাশিয়ার সহিত তাহারা উলের ব্যবসা করিত এবং আফ্রিকার সঙ্গে হাতীর দাঁতের ব্যবসা করিত। রাশিয়া ও জার্মানিতে আব্বাসীয় মুদ্রা আবিষ্কার একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসার সাক্ষ্য বহন করে।[৩৮১]

এমন একটি লাভজনক বাণিজ্যের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিবার জন্য শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিতে হয়। বাহরাইনের মুক্তা, ইয়েমেনের ইস্পাত-তরবারি, শিরাজের মদ, কাশানের টালি এবং ইরানের কম্বল ছিল বিশ্ব বিখ্যাত। চীনাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া ইরাক, ইরান ও মিসরে আব্বাসীয়গণ অনেকগুলি কাগজের কল চালু করে। তবে সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ছিল সামগ্রিকভাবে কৃষিভিত্তিক। প্রাথমিক আব্বাসীয় খলিফাগণ এবং বিশেষত বারমাকীয়গণ ইরাক, খোরাসান এবং সমগ্র এলাকা বর্তমানের চাইতে অধিক উর্বর ছিল। ইহা এখনকার তুলনায় অধিক গম, চাউল, খেজুর, সূতা, ফল, সুপারি, কমলা, তরমুজ ও তরি-তরকারি উৎপন্ন করিত এবং বন্টন করিত। উপরন্ত সাম্রাজ্যের অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হিসাবে ক্রীতদাস প্রথা তো ছিলই। [৩৮২]

৬.৩: আব্বাসীয় যুগে মুসলিম কূটনীতি ও বিশ্ব রাজনীতি

আব্বাসীয়দের সময়ে মুসলিম রাষ্ট্র সব চাইতে বেশী সুসংহত হয়। এই সময়ে দুনিয়ায় চারটি বড় বড় শক্তি ছিল। প্রাচ্যে ছিল আব্বাসীয় ও বাইজান্টীয় সাম্রাজ্য। এরা রোম ও পারস্যের বিরোধিতারই যেন জের টেনে চলেছিলেন। একে অপরের রাষ্ট্রে এঁরা হামলা করতেন ও ঘন ঘন শান্তিচুক্তি অমান্য করতেন। আর ইউরোপে ছিল ফ্র্যাঙ্কীয় সাম্রাজ্য ও স্পেনের উমাইয়া সাম্রাজ্য। এই দুই দলেও বিরোধ লেগেই ছিল। এই বিরোধিতার শুরু হয় তুরস্কের যুদ্ধে চার্লস মার্টেলের হাতে আবদুর রহমানের পরাজয়ের মাধ্যমে (৭৩২ খৃস্টাব্দ)

৩৮১. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৩৮২. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

প্রাচ্যের দুই শক্তি ও পশ্চিমা দুই শক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহু বছর ধরে চলে। ফলে, তৃতীয় পিপীন (খাটো পিপীন নামে পরিচিত) বাইজান্টীয়দের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছতে চান। তিনি এ উদ্দেশ্যে কন্সট্যানটিনোপলে এক কূটনৈতিক মিশন পাঠান (৭৫৭ খৃস্টাব্দ)। বাইজান্টীয় সম্রাট এতে সাড়া দেন এবং পিপীনের নিকট তাঁর পক্ষ হতে একটি কূটনৈতিক মিশন পাঠন। কিন্তু পোপের নীতি ছিল, ফ্রাঙ্ক ও বাইজান্টীয়দের মধ্যে যাতে কোন রকম চুক্তি না হয়। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই আব্বাসীয়গণ স্পেনকে বশে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সফল হয়নি। এভাবেই দুটো মুসলমান রাষ্ট্র ও দুটো খৃস্টান রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে লাগল। এ জটিল অবস্থার ফলেই শেষ পর্যন্ত ফ্র্যাঙ্কীয় শাসকগণ ও আব্বাসীয় খলিফাগণ ও পরস্পর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হন। আর এর ফলেই কর্ডোভা ও কন্সট্যানটিনোপলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ল্যাটিন ইতিহাস ও সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও ফ্র্যাঙ্কীয় ও আব্বাসীয় শাসকদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের কোন বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, মুসলিম ইতিহাসে এর কোন উল্লেখ নেই। এ নীরবতার ফলে ‘এ্যাচেন’ ও ‘বাগদাদের’র মধ্যে যেভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় বলে পশ্চিমী ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে, মুসলিম ঐতিহাসিকদের নীরবতার দরুণ অনেকে এ সব সম্পর্ক আদৌ স্থাপিত হয়েছিল কিনা, এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।[৩৮৩]

পশ্চিমা ইতিহাসের সূত্র থেকে জানা যায় যে, ফ্র্যাঙ্ক ও আব্বাসীয়দের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রথমে পিপীনই এগিয়ে আসেন (খৃস্টাব্দ ৭৬৫)। তিনিই প্রথম কূটনৈতিক মিশন পাঠান দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের দরবারে। আল-মনসুর তখন বাইজান্টীয় সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিন বছর পর একটি আব্বাসীয় কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল এবং খলিফার প্রদত্ত উপহার সঙ্গে নিয়ে পিপীনের প্রেরিত মিশনটি ফিরে আসে। মুসলিম কূটনীতিকদের পিপীন সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে তাঁদের মার্সাই হতে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করে দেন।

পিপীনের পুত্র শার্লম্যানও প্রাচ্যে কয়েকটি মিশন পাঠান। খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে তিনি দুটি (৭৯৭ খৃস্টাব্দ ও ৮০২ খৃস্টাব্দ) ও জেরুজালেমের মহামান্য প্রধান যাজকের নিকট ১টি মিশন পাঠান (৭৯৯ খৃস্টাব্দ)। ৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দু'জন ফ্র্যাঙ্কিশ প্রতিনিধি ও একজন ইহুদী দোভাষীকে পাঠান। উপরোক্ত দুইজন ফ্রাঙ্ক প্রাচ্য দেশেই মারা যান এবং চার বছর পর দোভাষীটি একটি হাতী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ৮০২ খৃস্টাব্দে শার্লম্যান বাগদাদে দ্বিতীয় মিশন পাঠান। তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং শার্লম্যান ‘পবিত্র ও মহান রাজশক্তি’ রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। বাকলার বলেন যে, এ

৩৮৩. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮৫

কূটনৈতিক আদান-প্রদানের ফলে শার্লম্যান জেরুযালেমের ওপর অনেকখানি কর্তৃত্ব লাভ করেন। বাকলার আব্বাসীয়দের অধীনে জেরুযালেমের ওয়ালী হিসেবে শার্লম্যানের পদমর্যাদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, আল-মাওয়ার্দীর পুস্তকে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে এ ধরনের পদ অমুসলিমের ওপর বর্তাতে পারে।[৩৮৪]

৭৯৯ খৃস্টাব্দে জেরুযালেমের প্রধান যাজক শার্লম্যানের নিকট একটি মিশন প্রেরণ করেন। শার্লম্যান এর পরিবর্তে প্রাসাদ-সামগ্রী ও উপঢৌকন সহ প্রধান যাজকের নিকট একটি ফিরতি মিশন পাঠান। ৮০০ খৃস্টাব্দে প্রধান যাজকের কাছ থেকে আর একটি মিশন আশীর্বাদস্বরূপ পবিত্র সমাধি ও হযরত ঈসার ক্রুস-স্থানের চাবি ও একটি প্রতীক নিশান নিয়ে শার্লম্যানের দরবারে উপস্থিত হয়।

ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের প্রচলিত বর্ণনা মেনে নেয়া হলে একথা বলা চলে যে, দু'জন শক্তিমান শাসকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনই এ সব কূটনৈতিক মিশনের উদ্দেশ্য ছিল। নিজেদের মর্যাদা বাড়াবার জন্যই তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শাসক শার্লম্যান ও খলিফা হারুন অর রশিদ উভয়েই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। কন্সট্যান্টিনোপল ও কর্ডোভার বিরুদ্ধে মিলিত হওয়াও তাঁদের অপর উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী দুই শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, শার্লম্যানের পক্ষে ফিলিস্তিনের দখল পাওয়া ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মুসলিম রাজশক্তির পতনের যুগে ক্রুসেড যোদ্ধাগণ ফিলিস্তিন দখল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসলমানদের কাছে তাদের ঘোর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

জেরুযালেমের প্রধান যাজক ও শার্লম্যানের মধ্যে যে দৌত্যের আদান-প্রদান চলে তার উদ্দেশ্য থেকে বোঝা যায় যে, এটা ছিল একটা নিছক ধর্মীয় ব্যাপার–রাজনৈতিক বিষয় নয়। কারণ, খলিফাকে না জানিয়ে বা তাঁর অনুমতি না নিয়ে ফিলিস্তিনের খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রদান পাদ্রীর পক্ষে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালান সম্ভব ছিল না। বোধহয়, তিনি শার্লম্যান ও হারুনূর রশীদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করেন। পশ্চিমা খৃস্টান শাসকদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। যাতে করে প্রাচ্য দেশে নৈতিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে চর্চার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। প্রধান পাদ্রীর রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করার কোন ক্ষমতা ছিল না। তাই তিনি শার্লম্যানের কাছে উপহার হিসেবে চাবি ও প্রতীক নিশান পাঠিয়েছিলেন।[৩৮৫]

---

৩৮৪. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫
৩৮৫. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, (অনু. মোহাম্মদ এনামুল হক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

আব্বাসীদের বৈদেশিক নীতি

বাইজানটাইনদের সাথে সম্পর্ক ঃ অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের সফল বাস্তবায়নের পর খলিফা হারুন-অর রশীদ বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করেন। বাইজানটাইনদের সাথে সংঘর্ষ তাঁর রাজত্ব কালের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা। উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার আমলে মুসলমানদের সাথে বাইজানটাইনদের প্রথম সংঘর্ষ হয় এবং তা মাহদী ও হারুনের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রায় একশ বছর স্থায়ী হয়। দামেস্ক থেকে রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হলে বাইজানটাইন সম্রাট প্রথম কনস্টানটাইন আর্মেনিয়া এবং এশিয়া মাইনরে মুসলিম রাজ্যের সীমানা অতর্কিত আক্রমণ করেন। বাইজানটাইন আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য আল-মাহদী যুবরাজ হারুন এবং খালিদ বার্মেকীর নেতৃত্বে এক লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী বসফোরাসে সাফল্য অর্জন করে রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এর ফলে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে চতুর্থ লিওর বিধবা পত্নী সম্রাজ্ঞী আইরীন খলিফা মাহদীর নিকট সন্ধি প্রার্থনা করেন। বার্ষিক ৭০ হাজার থেকে ৯০ হাজার দিনার কর প্রদানে স্বীকৃত হয়ে বাইজানটাইন সম্রাট খলিফার সাথে মিত্রতা করেন। বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে সমরাভিযানে বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য আল-মাহদী হারুনকে “আর-রশীদ” (ন্যায়নিষ্ঠ) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আল-হাদীর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে হারুন বাইজানটাইনদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিরুদ্ধাচরণের মোকাবিলা করেন। তিনি একজন দক্ষ তুর্কী সেনাপতির নেতৃত্বে টুরসাসে একটি পৃথক সেনাবাহিনী গঠন করেন। মুসলিম-বাইজানটাইন সংঘর্ষ প্রতি বছরই হতে থাকে এবং কখনও কখনও খলিফা স্বয়ং এসব অভিযানে অংশগহণ করেন। ৭৯১ থেকে ৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরব নৌবাহিনীর তৎপরতায় ক্রীট এবং সাইপ্রাস অধিকৃত হয় এবং বাইজানটাইন সেনাপতি বন্দী হন। ৭৯৭-৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা স্বয়ং একটি বিশাল বাহিনীসহ অভিযান করে ইফিসাস এবং আনসিরা দখল করেন। খলিফা স্কুটারীর নিকট তাঁবু ফেলে বাইজানটাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে সম্রাজ্ঞী আইরীন (৭৯৭-৮০২ খ্রিঃ) কর দানে সম্মত হয়ে চার বছরের জন্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন।[৩৮৬]

৮০২ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি নাইসিফোরাস সম্রাজ্ঞী আইরীনকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখল করে খলিফার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করেন। কনস্টান্টিনোপলে স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে নাইসিফোরাস

৩৮৬. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত,, পৃ.২৬৪

খলিফার নিকট একটি অপমানজনক পত্র পাঠান। নাইসিফোরাসের ঔদ্ধত্যমূলক আচরণে খলিফা স্বয়ং একটি বিশাল বাহিনীসহ তার বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন। তিনি অতি সহজে হিরাক্লিয়া[৩৮৭] ও টিরানা অধিকার করে নাইসিফোরাসের বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন। বাইজানটাইন সম্রাট পরাস্ত হয়ে খলিফার সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও কর প্রদানে বাধ্য হন। কিন্তু খলিফা বাগদাদে ফিরে গেলে বিশ্বাসঘাতক নাইসিফোরাস পুনরায় অস্ত্র ধারণ করে মুসলিম সীমান্ত অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। হারুন তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে তৃতীয়বারের মত সমরাভিযান করেন। উত্তরে বিথিনীয়া এবং পশ্চিমে মাইসীয়া এবং কারিয়া পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া মাইনর জয় করে খলিফা নাইসিফোরাসকে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত কনে। বাইজানটাইন সম্রাট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা মঞ্জুর করে বার্ধিত হারে কর আরোপ করা হয়। হারুন দয়াপরবশ হয়ে কপট ও বিশ্বাসঘাতক নাইসিফোরাসকে উৎখাত না করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কারণ তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কর্তৃক ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম-বাইজানটাইন সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। এ কারণে আমীর আলী বলেন, “বাইজানটাইন শাসনের অবসান ঘটলে এবং কনস্টান্টিনোপল মুসলমানগণ দখল করলে তা পৃথিবীর শান্তি ও সভ্যতার জন্য মঙ্গলজনক হত।”[৩৮৮]

আব্বাসীয়রা যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন আরবদের রাজ্য জয়ের উৎসাহ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং আরব যোদ্ধাগণ হয় মরুভূমিতে ফিরিয়া গিয়াছে অথবা জনস্রোতের সহিত মিশিয়া গিয়ছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূখণ্ডের সঙ্গে আব্বাসীয়গণ অতি অল্প যোগ করিতে সক্ষম হয়। বাগদাদে অবস্থানকারী দেহরক্ষীগণ ছাড়া তাহারা কোনো স্থিতিশীল সেনাবাহিনীও রাখে নাই। ফলে তাহাদের অধিকাংশ বিদেশী সম্পর্ক নির্ভর করে প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং উপঢৌকন দেওয়া ও নেওয়ার উপর।

তবে এই সাধারণ অবস্থার একটি ব্যতিক্রম হইল বাইজান্টিয়ামের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক। কনস্টান্টিনোপলের সম্পদরাশি তখনও হাতছানি দিতেছিল এবং এশিয়া মাইনর বিজয় একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। আব্বাসীয় ও উমাইয়াদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ লইয়া সম্রাট পঞ্চম কনস্টান্টাইন (৭৭১-৭৭৫) আরব আক্রমণকারীদিগকে এশিয়া মাইনরের সর্ব দক্ষিণ সীমান্তে হটাইয়া দেয়। ৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে মেহদী তাঁহার পুত্র হারুনের অধীনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন যাহা বসফরাস পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

৩৮৭. Bmjvgx wek‡Kvl; ঢাকা: ইফাবা; ১৯৯৮, খ. ২৫, পৃ.৭১০
৩৮৮. সৈয়দ আমীর আলী, (অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সম্পা. ড. মফীজুল্লাহ কবীর), প্রাগুক্ত,পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাজ্ঞী আইরীন শান্তি করিলে শান্তি স্থাপন করা হয়। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তখন উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় আরব শক্তির পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল কিন্তু আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত শক্তি তাঁহাদের ছিল বলিয়া আরবগণ শান্তির মাসূল আদায় করিয়া ও শান্তি স্থাপন করিয়া খুশি হয়। অপরদিকে বাইজান্টাইনদেরও নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ হয়। [৩৮৯]

পরে সম্রাট প্রথম নাইসফরাস (৮০২-৮১১) চুক্তি ভঙ্গ করেন। এই খবর শুনিয়া হারুন এতই রাগান্বিত হন যে তিনি একখানা পত্র লেখেন। এই পত্রখানা এত প্রসিদ্ধ যে প্রত্যেকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকই তাহা হইতে উদ্ধৃতি দেন। "বিশ্বাসীদের অধিনায়ক হারুনের নিকট হইতে একজন রোমান কুলাঙ্গার নাইসফরাসের নিকট....."। হারুন একটি অভিযান প্রেরণ করেন। তাহারা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর আদায় করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করে। এশিয়া মাইনর অধিকার করা আরবদের ভাগ্যে ছিল না। কিন্তু তুর্কিদের মাধ্যমে ইসলাম ইহা জয় করে।

ইউরোপীয় লেখকগণ প্রমাণ করেন যে, হারুন-আল-রশীদ ও শার্লেমেন সমসাময়িক ছিলেন। শার্লেমেনের প্রতিনিধিবৃন্দ পারস্যের সম্রাটের নিকট হইতে উপঢৌকন আনয়ন করেন। তবে মুসলিন ঐতিহাসিকবৃন্দ এই সম্পর্কের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। খুব সম্ভবত স্পেনের উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় খলিফা শার্লমেনের বন্ধুত্ব কামনা করেন। বাগদাদ ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে বিবাদমান অবস্থা শার্লেমেনকে উপকৃত করে। তবে উপঢৌকন বিনিময় ব্যতীত আর কোনো লাভ ইহাতে হয় নাই।[৩৯০]

৩৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
৩৯০. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সহিত আব্বাসীয় খলিফাগনের সম্পর্ক [৩৯১]

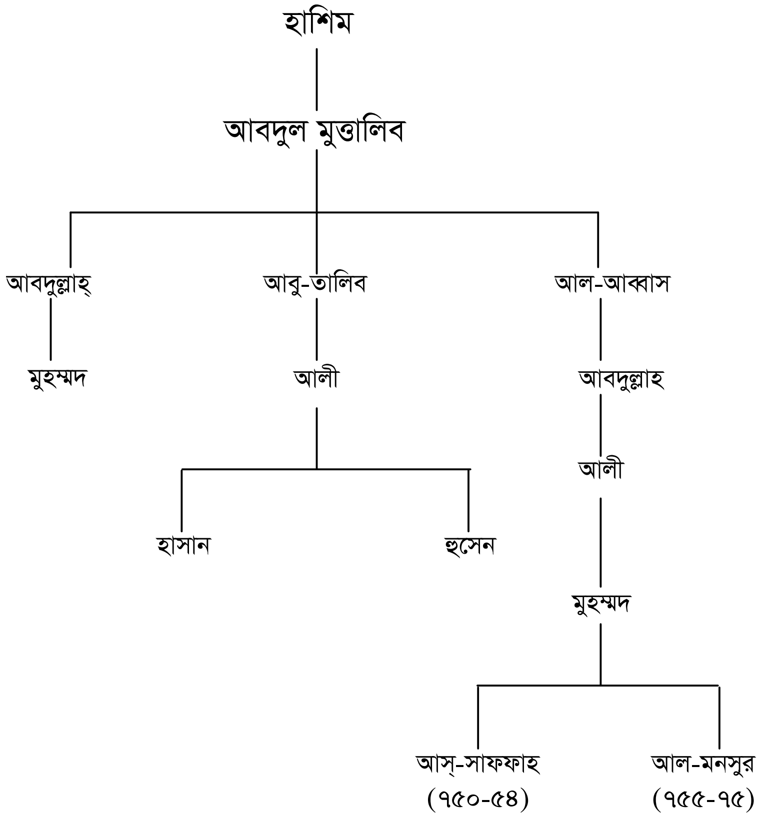

৩৯১. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৪০২

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক যুগের আব্বাসীর খলিফাগণ[৩৯২]

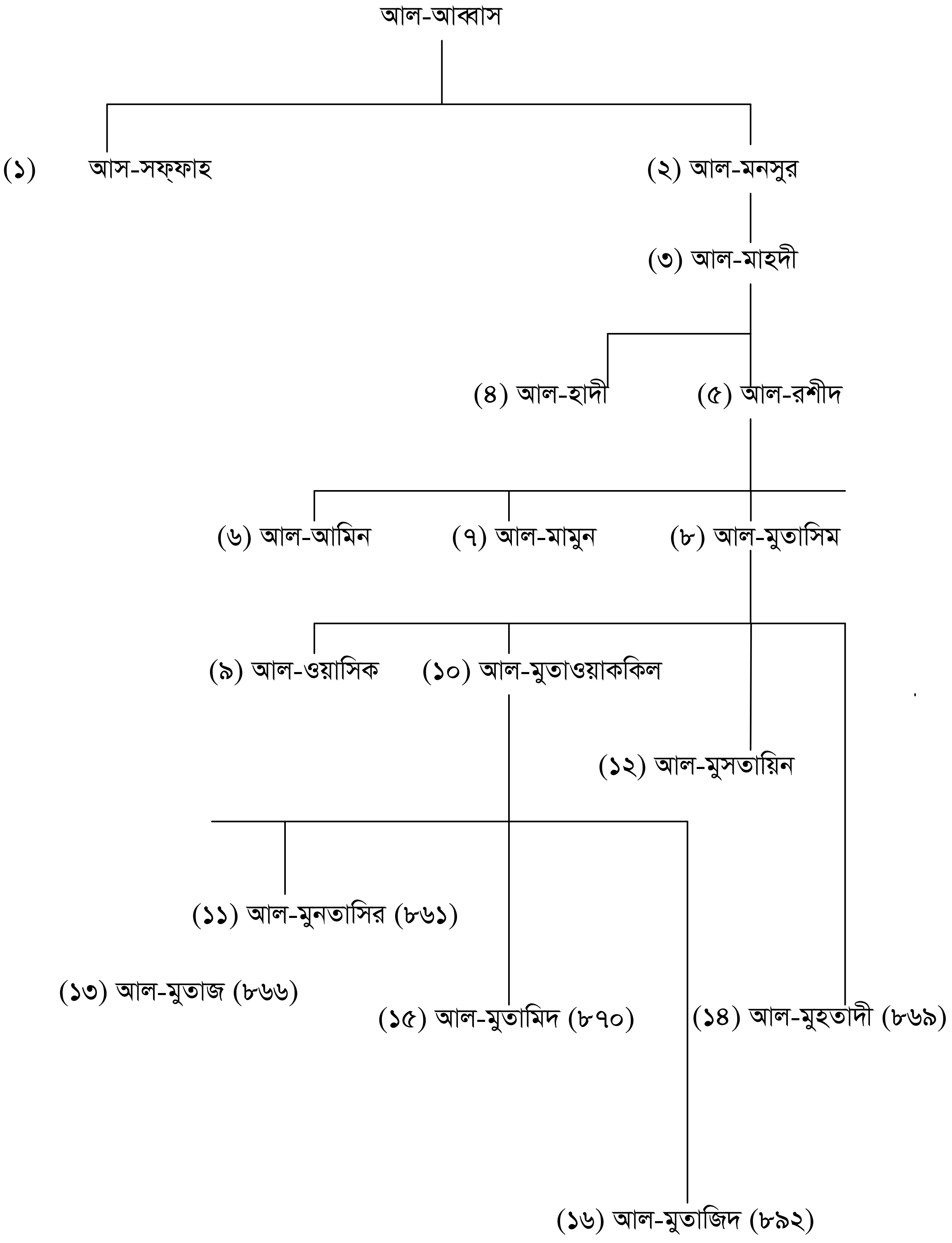

৩৯২. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৪০৫

Dhaka University Institutional Repository

বুওয়াইদ আমলের আব্বাসীয় খলিফাগণ [৩৯৩]

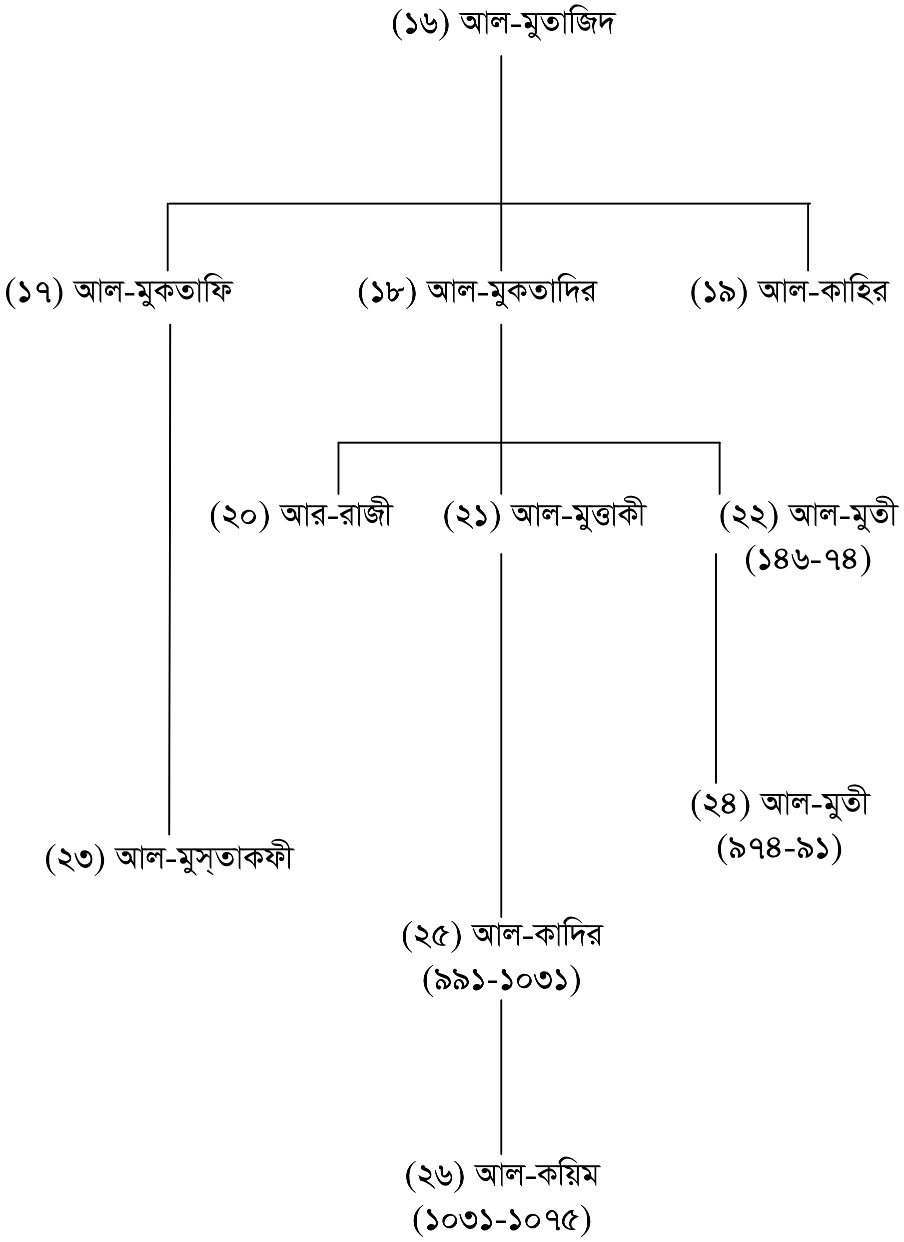

৩৯৩. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

সেলজুক আমলের ও সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফাগণ[৩৯৪]

(২৬) আল-কায়িম

মুহম্মদ

(২৭) আল-মুকতাদী (১০৭৫-৯৪)

(২৮) আল-মুসতাজ্হির (১০৯৪-১১১৮)

(২৯) আল-মুসতারশিদ (১১১৮-৩৫)

(৩০) আর-রাশীদ (১১৩৫-৩৬)

(৩১) আল-মুকতাফী (১১৩৬-৬০)

(৩২) আল-মুসতানজিদ (১১৬০-৭০)

(৩৩) আল-মুসতাজী (১১৭০-৮০)

(৩৪) আন্-নাসির (১২২৫-২৬)

(৩৫) আজ-জাহির (১২২৫-২৬)

(৩৬) আত-মুসতানসির (১২২৬-৪২)

(৩৭) আল- মুসতাসিম (১২৪২-৫৮)

৩৯৪. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৭

এই মানচিত্রটি নেওয়া হয়েছে[৩৯৫]

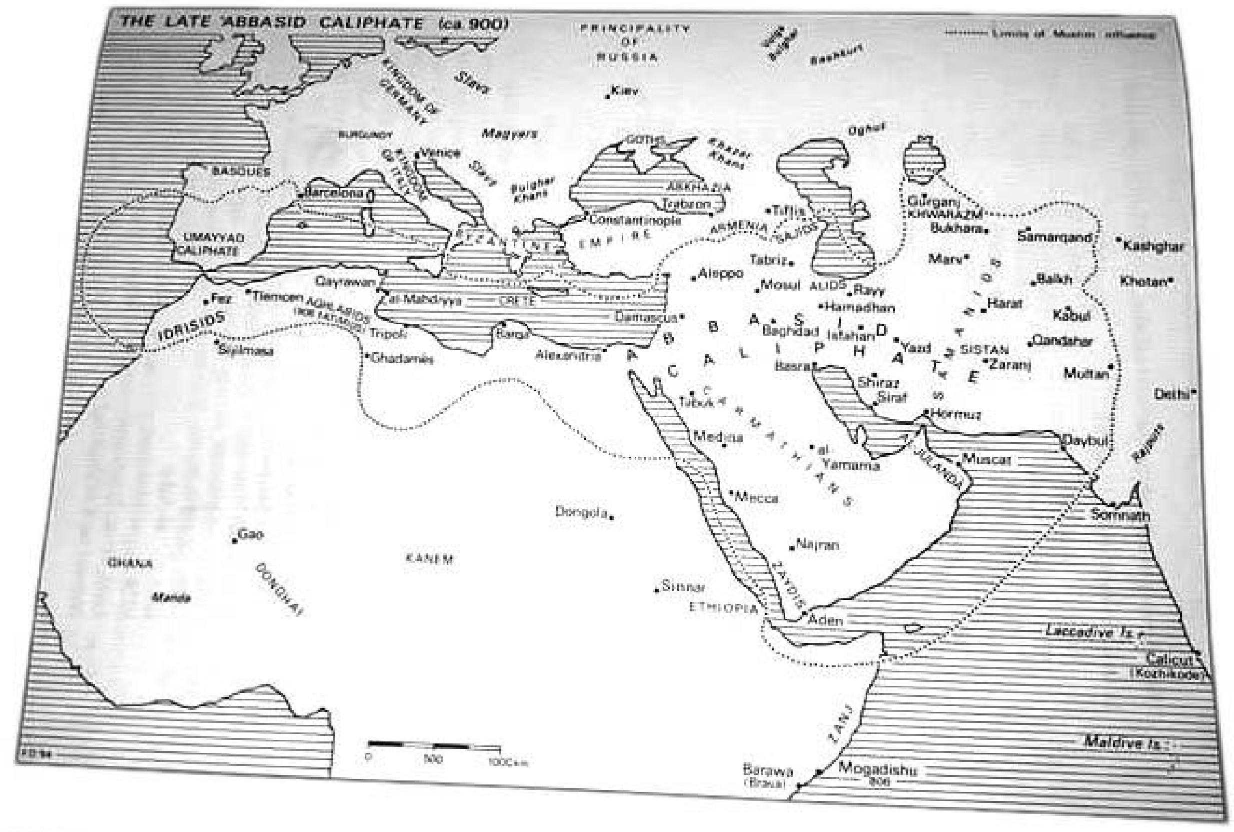

395. Yehuda Lukacs (Edi*). The Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record*, Cambridge, New York, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, 1992, p.191

এই মানচিত্রটি নেওয়া হয়েছে[৩৯৬]

---

৩৯৬. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
ফাতেমীয় ও উসমানীয় শাসনামলে পররাষ্ট্রনীতি

৭.১: ফাতেমি রাজবংশ ও শাসকদের বংশ তালিকা

আব্বাসীয় রাজবংশ যখন ৭৫০ থেকে ৯৬৯ পর্যন্ত জেরুজালেম, মিসর ফিলিস্তিন ও সিরিয়া শাসন করেন তখন বর্তমান তিউনিসিয়ায় শাসন করেন ফাতেমি রাজবংশ। ইহুদি বণিকের ছেলে মুসলিম হয়ে নাম ধারণ করেন ইয়াকুব বেন ইউসুফ (ইবনে কিলিস)। যিনি আব্বাসীয় খলিফা কাফুরের আর্থিক উপদেষ্টা হন। কাফুর মারা গেলে তিনি ৯৬৯ সালে তিউনিসিয়ায় পালিয়ে গিয়ে শিয়া মতাদর্শ গ্রহণ করেন ও ফাতেমি রাজবংশের খলিফা মুইজের আস্থা অর্জন করেন। ইবনে কিলিসের পরামর্শে খলিফা মুইজ মিসর আক্রমণের নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে ৯৬৯ সালের জুনে সেনাপতি জহহার আল-সিকিলি মিসর জয় করেন। ৯৭৩ সালে খলিফা মুইজ উত্তর আফ্রিকার তৃণভূমি অঞ্চল সিসিলা, মিসর, ফিলিস্তিন ও সিরিয়া জয় করেন। রাজধানী 'আল-কাহিরা আল- মুইজ্জিয়ারায়' (বর্তমান কায়রো) নিয়ে আসেন। মুইজের মৃত্যুর পর খলিফা হন আজিজ।

১০১১ সালে প্যালটিয়ার মারা যান। খলিফা আজিজের মৃত্যুর পর তার ছেলে হাকিম খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন পাগল রাজা। তার আমলে মুসলমানদের অকেন ক্ষতি সাধিত হয়ে ছিল। ১০২১ সালে তার মৃত্যুর পর তার ছেলে জাহির সিংহাসনে বসেন। খলিফা জাহির 'আল-আকসা' মসজিদ সংস্কার করেন।[৩৯৭]

ফাতি'মীঃ শাসক বংশ ২৯৭/ ৯০৯ সন হইতে ৫৬৭/১১৭১ সাল পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় এবং পরবর্তী কালে মিসরে রাজত্ব করে।

ফাতি'মী (প্রকৃতপক্ষে উবায়দী) শাসকদের বংশ তালিকাঃ উবায়দুল্লাহ (আল-মাহদী) ২৯৭-৩২২/৯০৯-৩৪। আল-কাই'ম ৩২২-৩৪/৯৩৪-৪৬। আল-মানসুর,৩৩৪-৪১/৯৪৬-৫৩। আল-মু'ইয, ৪৩১-৬৫/৯৫৩-৭৫ আল-আযীয, ৩৬৫-৮৬/৯৭৫-৯৬। আল-হাকিম, ৩৮৬-৪১১/৯৯৬-১০২১। আজ-জাহির, ৪১১-২৭/১০২১-৩৬। আল-মুস্তানসির, ৪২৭-৮৭/১০৩৬-৯৪। আল-মুস্তালী, ৪৮৭-৯৫/১০৯৪-১১০১।

৩৯৭. মো. আছাদ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

আল-আমির, ৪৯৫-৫২৫/১১০১-৩০। আল-হাফিজ, ৫২৫-৪৪/১১৩০-৪৯। আজ-জাফর, ৫৪৪-৯/১১৪৯-৫৪। আল-ফাইয, ৫৪৯-৫৫/১১৫৪-৬০। আল-আদিল ৫৫৫-৬৭/১১৬০-৭১।

এই বংশ হযরত ফাতিমা (রা.) হইতে ইহার নাম ধারণ করিয়াছে। কারণ ফাতিমী খলীফাদের নামের উৎস আলী ও ফাতিমা (রা.)। সম্ভবত হুসায়ন (রা.) এর কন্যা, অপর ফাতিমা যিনি তাঁহার মাতামহীর কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করেন, এই নামকরনে একটি ভূমিকা পালন করেন।[৩৯৮]

অধিকন্ত এইখানে ইহাও উল্লেখ্য যে, আলীর মাতা ফাতিমা বিনত আসাদ[৩৯৯] একজন হাশিমী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আহল-ই হা'ক'ক'দের অন্তর্গত[৪০০] তিনি ফাতিমী ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ফাতিমী খিলাফাতের অধীনে আফ্রিকাঃ প্রথম চারিজন ফাতিমী খলীফা 'উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহদী, আল-কাইম, আল-মানসুর ও আল-মুইযা উত্তর আফ্রিকায় বসবাস করেন, শেষোক্ত জন ৩৬২/৯৭৩ সাল পর্যন্ত-যখন তিনি মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং মিসর তাঁহার সেনাপতি জাওহার কর্তৃক বিজিত হয়।[৪০১] '

উত্তর আফ্রিকার ফাতিমী খলীফাগণকে স্বাভাবিকভাবেই সিসিলিতে বসবাসকারী বায়যানটীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিকে চালিত করে এবং তাহাদের সহিত দূত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। ইফরীকিয়্যাঃ হইতে কয়েকবার ইতালী ও সিসিলিতে অবস্থিত বায়যানটীয়দের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ও নৌবহর প্রেরিত হয়। উবায়দুল্লাহ্র রাজত্ব কালে একটি অনির্ধারিত তারিখে (৯১৪ ও ৯১৮ সালের মধ্যে) বায়জানটীয় সম্রাট বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ কর হিসাবে বার্ষিক ২২,০০০ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে সিসিলির গভর্নরের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন।

---

398. L. Massignon, *Fatima bint al-Husayn et l'origine du nom dynastique 'Fatimi-tes,* মিউনিথ ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৩৬৮

৩৯৯. ইব্‌ন হাজার, Bmvev, কায়রো ১৩২৮,৪খ, পৃ. ৩৮০

৪০০. আল-মোকরি, Le sccret indicible....inJA, ১৯৬২খৃ., পৃ. ৩৭৫

৪০১. Bmjvgx wek‡Kvl; ঢাকাঃ ইফাবা; ১৯৯৮, খ.১৪, পৃ.৫৭৭

৭.২: ফাতেমীয় শাসনামলে মিসর, উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলির সহিত সম্পর্ক

মিসর বিজয়: উত্তর আফ্রিকায় আল-মু'ইয্য এর সফলতা তাঁহাকে একটি পূর্বাঞ্চলীয় নীতির অনুসরণ এবং মিসর বিজয় অভিযান প্রেরনে নিজেকে নিয়োজিত করিতে অনুপ্রাণিত করে। মিসর অভিযানে উবায়দুল্লাহ ও আল-কাইম ব্যর্থ হইয়াছিলেন। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিধ্বস্ত ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে বাস্তব দিক হইতে সতর্কতার সহিত পরিকল্পিত ও মনস্তাত্বিকভাবে দক্ষ রাজনেতিক প্রচারনা[৪০২] সম্বন্ধে এই বিজয়টি জাওহার কর্তৃক উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই অর্জিত হইয়াছিল।

উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলর সহিত সম্পর্কঃ ইতিমধ্যেই আল-আযীযের রাজত্বকালে মাসুর ইব্ন বুলুককীনের শাসনাধীনে (৩৭৩/৯৮৪-৩৮৬/৯৯৬) উত্তর আফ্রিকা ফাতিমী খিলাফতের সহিত ইহার যোগসূত্র শিথিল হইতে থাকে। আল-হাকিমের সময়ে বারাকাঃ ও ত্রিপোলীর প্রশ্নে অসুবিধার উদ্ভব হয়। মুইয্য ইব্ন বাদীস (৪০৬/১০১৬-৪৫৪/১০৬২) কর্তৃক ফাতিমী খিলাফাতের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ কতিপয় পদক্ষেপ গৃহীত হইলে ৪৪৩/১০৫১ সালে তাহার সহিত সম্বন্ধচ্যুতি ঘটে। [৪০৩]

ফাতেমীয় শাসনকালে মিসরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

রাজধানীর ঐশ্বর্যঃ পারসিয়ান, ইসমাইলী প্রচারক নাসির খুসরো ১০৪৬ হইতে ১০৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসের ছিলেন। তাঁর বর্ণনায় মিসরের অভ্যন্তরীন অবস্থা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। খলিফার প্রাসাদে ৩০,০০০ লোক বাস করিত; তাহাদের মধ্যে ১২,০০০ ভৃত্য এবং ১০০০ অশ্বরক্ষী ও পদাতিক রক্ষী দল। খলিফাগণ জাঁকজমকের মধ্যে সময় কাটাইতেন এবং উৎসবের সময় যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেন। রাজধানীতে খলিফার ২০,০০০টি ইষ্টক নির্মিত পাঁচ বা ছয়-তলাবিশিষ্ট গৃহ ছিল এবং অনুরূপ সংখ্যার দোকানপাটও ছিল। রাজপথগুলি ছাদবিশিষ্ট ও আলোকমালায় সজ্জিত ছিল। নির্ধারিত দামে জিনিসপত্রের কেনাবেচা হইত; এমনকি অলঙ্কার বিক্রেতাদের এবং পোদ্দারের দোকানেও তালা লাগানো হইত না। প্রাচীন ফুসতাত নগরীতে সাতটি এবং কায়রোতে আটটি মসজিদ ছিল। নাসির খুসরো যখন মিসরে গিয়াছিলেন, তখন বোধহয় দেশের অবস্থা ভালো ছিল; তাই তিনি মিসরের ধন-ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্মিত

402. G.Wiet, *L'Egypte arabe*, খ.৪, Hist. de la Nat, Egypt. খ.৪, পৃ. ১৪৭ গ. এবং M. Canard, *L'imperialisme des Fatimideset leur Propagande*, in AIEO-Alger, খ.৬, পৃ.১৬৭

৪০৩. Bmjvgx wek‡Kvl; ঢাকা: ইফাবা; ১৯৯৮,খ.১৪, পৃ.৫৭৮

Dhaka University Institutional Repository

হইয়াছিলেন। খলিফা মুসতানসির সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদে বিভিন্ন ধরনের দামি ব্যবহার-দ্রব্য ও শিল্প-দ্রব্য ছিল। কিন্তু ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাঁহাকেও আর্থিক সঙ্কটে ভুগিতে হইয়াছিল।[৪০৪]

শাসন ব্যবস্থাঃ ফাতিমীয় শাসন-ব্যবস্থা অনেকটা আব্বাসীয় বা প্রাচীন পারসিয়ান ব্যবস্থার অনুকৃতি ছিল। সেনাবাহিনী তিনটি স্তর বিন্যাসে চিহ্নিত ছিল। প্রথম শ্রেণীতে থাকিত আমিরগণ, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীগণ এবং খলিফার দেহরক্ষীগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকিত রক্ষীদের উর্ধ্বতন কর্মচারীগণ ও খোজা রক্ষীদল। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট তৃতীয় শ্রেণী অন্তর্ভূক্ত ছিল। ওয়াজিরগণ বিভিন্ন স্তরে বিভিক্ত ছিলেন। তাঁহারা সামরিক ও বেসামরিক কার্যে নিযুক্ত হইতেন। শাসকদের সর্বনিম্ন স্তরে থাকিত বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারি ও কেরানীগণ। মিসরের শাসন-ব্যবস্থার স্রষ্টা ছিলেন খলিফা মুইদ ও আজীজের মন্ত্রী ইয়াকুব ইবনে কিল্‌লিস্‌।

সাংস্কৃতিক কার্যাবলীঃ ইব্‌নে কিল্‌লিস্‌ সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে চিকিৎসাবিদ মুহাম্মদ আত-তামীমী মিসরে বাস করিতেন। মুহাম্মদ ইব্‌নে ইউসুফ আল-কিনদী ইব্‌নে সালমা আল-কুজায়ী এ যুগের দুইজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক। খলিফা আজীজ কবি ও পণ্ডিত্যের সমঝদার ছিলেন। তিনি আজহার মসজিদটিকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। এ যুগের অধিকাংশ পণ্ডিত ছিলেন ধর্মশাস্ত্রবিদ। সাংস্কৃতিক মনের দিক দিয়া ফাতেমীয় যুগটি বিশিষ্ট নয়; শিয়া ভাবধারায় প্রভাবিত রাসভায় ধর্মভীরু সুন্নি পণ্ডিতগণ আসিতে চাহিতেন না; ইহা ছাড়া ফাতেমীয় আমলের শেষদিকে দেশে নিরাপত্তার অভাব ছিল। 'দার-উল্‌-হিক্‌মা' [৪০৫](জ্ঞানের গৃহ) ছিল এ যুগের একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। শিয়া মতবাদের শিক্ষা ও প্রসারের জন্য হাকিম কর্তৃক ইহা ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রস্তুতকরণ, গ্রন্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে নির্দিষ্ট অর্থ ধার্য করা হইয়াছিল। 'দার-উল্‌-হিক্‌মা' প্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং ইহাতে পাঠাগার ও সভাগৃহ ছিল। ইসলামি বিষয়বস্তু ছাড়া এখানে জ্যোতিবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত।

---

৪০৪. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৯

৪০৫. দারু'ল হিকমা 'বিজ্ঞান ভবন', জ্ঞানাগার, আরব গ্রন্থকারগণ সাধারণভাবে একাডেমিকে বুঝাইতে ব্যবহার করিতেন। ইসলাম পূর্ব যুগে একাডেমিতে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত এবং বিশেষ অর্থে ফাতিমী খলিফা আল-হাকিম দ্বারা ৩৯/১০০৫ সালে মিসরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বুঝানো হয়। আল- মামুনের স্বল্পস্থায়ী বায়তুল হিকমার পর ইরাক এবং পারস্যে অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইখানে শুধু হাদিস শিক্ষা দেওয়া হইত না, বরং ধ্রুপদ (classical) বিজ্ঞান বিষয় (ulum al-awail) ও শিক্ষা দেওয়া হইত। ফাতিমীদের সময়ে মিসরে এইরূপ প্রতিষ্ঠান অনেক সফলকাম হয়,সেইখানে শী'আঃ মতবাদের পক্ষে গ্রীক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। we¯ÍwiZ- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৬, খ. ১৩, পৃ.২৯৩

হাকিম আল্-মুকাত্তামে একটি মানমন্দির নির্মান করিয়াছিলেন। দুইটি মিনারে এ্যাস্ট্রোলেব জাতীয় তাম্রযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। হাকিমের সভায় বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী ইব্নে ইউনুস এবং বিখ্যাত পদার্থবিদ ও চক্ষুশাস্ত্রবিদ আবু আলী আল-হাসান ইব্ন-উল-হাইসাম বাস করিতেন। ইব্নে ইউনুস প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার সাধন করিয়াছেলেন। অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর লিখিত একশত খানার মতো গ্রন্থ ইব্নে-উল্-হাইসাম লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে চক্ষু সম্বন্ধে লিখিত 'কিতাব'-উল-মানাজির' খুবই প্রসিদ্ধ। জেরাড অব ক্রেমনার সময়ে অনূদিত হইয়া এই গ্রন্থের ল্যাটিন সংস্করণ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ মধ্যযুগের চক্ষুশাস্ত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। আম্মার ইব্নে আলী আল-মাওসিলি, 'আল-মুনতাখার ফি ইলাজ-উল-আইন' (চক্ষু চিকিৎসা সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ) হাকিমের রাজত্বকালেই রচিত হয়।[৪০৬]

রাজকীয় গ্রন্থাগারে ২,০০,০০০ বই ছিল। প্রসিদ্ধ হস্ত লিখুন-শিল্পীদের পাণ্ডুলিপি এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছিল। তাবারীর হস্তলিখিত একখানি গ্রন্থও এখানে ছিল। তুর্কিগণ এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশ ধ্বংস করিয়াছিল। মুসতাসিরের পরবর্তী খলিফাগণ নতুন নতুন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ফাতেমীয় যুগে স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আজহার মসজিদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন। ইহা ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে জাওহার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে সূক্ষ্মাগ্র খিলান আছে। এই মসজিদে ইব্নে তলুনের মসজিদের অনুকৃতি ও পারসিয়ান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার মিনার বর্গাকৃতি। আল-হাকিমের মসজিদটির নির্মাণকার্য ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার নক্শা আজহার মসজিদের অনুরূপ। ইহার গোলাকার মিনার দেখিয়া মনে হয় যে, কারিগরগণ উত্তর ইরাক হইতে আসিয়াছিল। ইট অপেক্ষা পাথরের ব্যবহারই অধিকতর প্রিয় ছিল। ১১২৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত আল-আকসার মসজিদে এবং ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত সালিহ ইব্নে রুজ জিকের মসজিদে কুফিক লিপি ও স্পষ্ট ডিজাইন দৃষ্ট হয়। এই সময়ে বহু প্রবেশদ্বার নির্মিত হয়। এই যুগের স্থাপত্যের বিভিন্ন নির্মাণ পদ্ধিতি পরবর্তীকালের আইয়ুবী ও মামলুক স্থাপত্য শিল্পকে প্রভাবিত করে। এ যুগের কাঠ, ব্রোঞ্জ, বস্ত্র ও মৃৎশিল্পে সাসানীয় বা পারসিয়ান প্রভাব দেখা যায়। বই বাঁধাই শিল্পের উপর অবশ্য কপটিক প্রভাবই অধিকতর স্পষ্ট। [৪০৭]

৪০৬. মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭০
৪০৭. প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭১

Dhaka University Institutional Repository

ফাতিমীয় খলিফাদের বংশতালিকা[৪০৮]

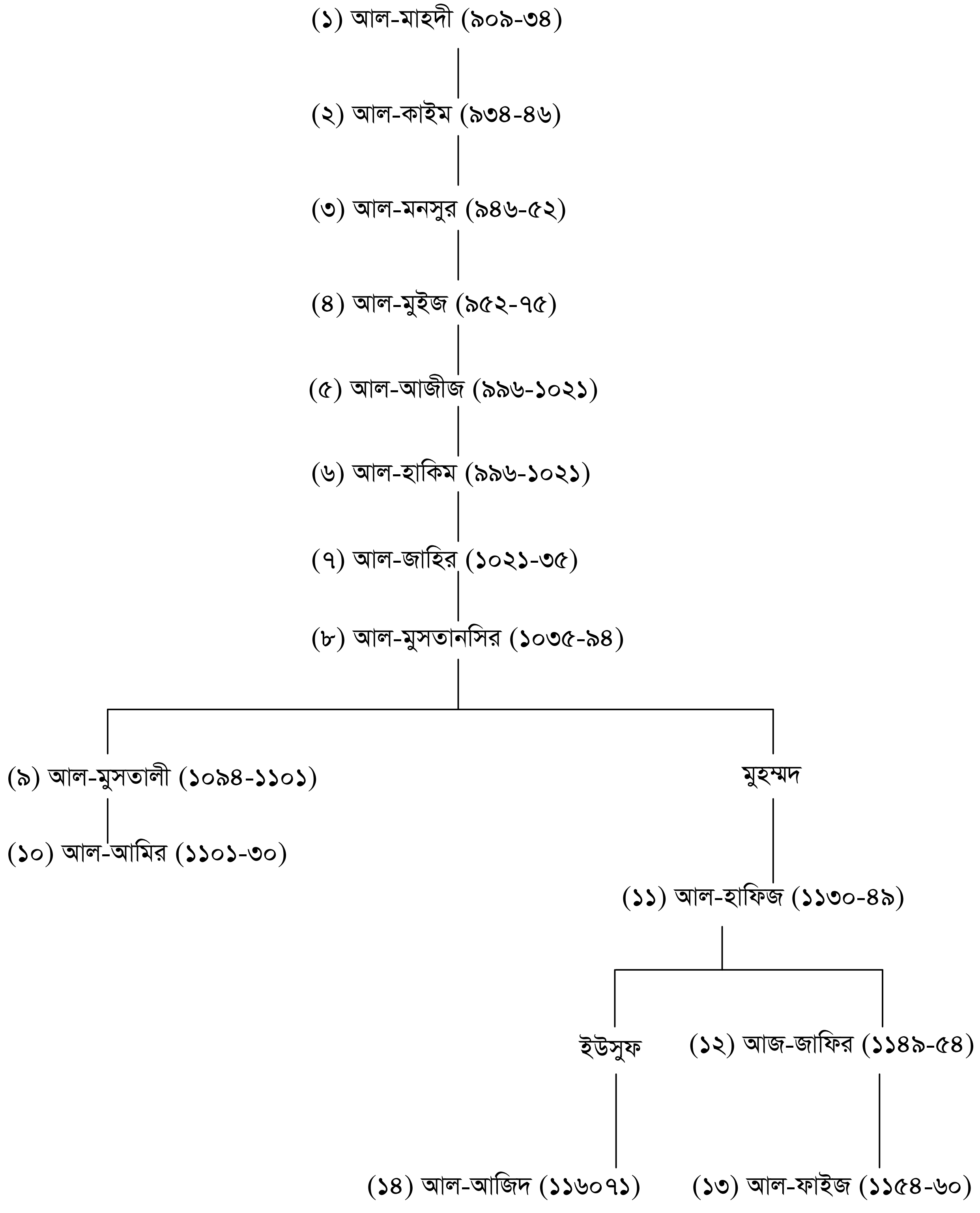

৪০৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৯

এই মানচিত্রটি নেয়া হয়েছে[৪০৯]

৪০৯. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, (অনু. মোহাম্মদ এনামুল হক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

উসমানীয় শাসনামলে পররাষ্ট্রনীতি

৭.৩: উসমানীয় সাম্রাজ্য ও সেনাবাহিনী

মুহাম্মদ ১ম (১৪১২-১৪২১)	সেলিম ১ম (১৫১২-১৫২০)
মুরাদ ২য় (১৪২১-১৪৫১)	সোলাইমান (১৫২০-১৫৬৬)
মুহাম্মদ ২য় (১৪৫১-১৪৮১)	সেলিম ২য় (১৫৬৬-১৫৭৪)
বায়েজীদ ২য় (১৪৮১-১৫১২)	মুরাদ ৩য় (১৫৭৪-১৫৯৫)

আহম্মদ ১ম (১৫৯৫-১৬০৩)

বায়েজীদের বন্দী হইয়া মৃত্যুবরণ, তাঁহার পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে, এবং এশিয়া মাইনরে উসমানীয় আধিপত্যের অবসানের আশঙ্কা প্রতীয়মান হয়। দশ বৎসর পর্যন্ত বায়েজীদের চারি পুত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। পুত্রগণ হইলেন মুসা, ঈসা, মুহাম্মদ ও সোলাইমান। এশিয়া মাইনরের গাজী আমীরগণ কোনো এক পক্ষ অবলম্বন করে অথবা তাহাদের স্বাধীন পথে চলিতে থাকে। সংঘর্ষের প্রথম দিকে ঈসাকে সরাইয়া ফেলা হয়। কিছুকালের জন্য মনে হইল সোলাইমানই জয়ী হইতেছেন, কারণ রাজধানী ইদীর্নের সভাসদবৃন্দ তাঁহাকে সমর্থন করেন। তবে মুসা ও মুহাম্মদ তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা একত্রিত হইয়া সোলাইমানকে হত্যা করে। জীবিত দুই ভ্রাতা অতঃপর একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইহা ছিল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত উসমানীয় শক্তির মৌলিক ভিত্তিসমূহের প্রতি যিনি সমধিক আস্থাশীল ছিলেন তিনিই জয়ী হন [৪১০]

উসমানীয় সেনাবাহিনী : সিংহাসন লাভ করিয়াই মুহম্মদের কাজ সম্পূর্ণ হইল না। এশিয়া মাইনরের তুর্কিগণ কোন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনতা স্বীকার করিতে রাজি ছিল না। গাজী আমীরগণ প্রথমত এবং প্রধানত তাহাদের নিজেদের স্বাধীন কর্মধারা বজায় রাখিতে উদগ্রীব ছিল। আর অন্যদিকে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ঘৃণা করিত। ওরহান কর্তৃক গঠিত জান-নিসারী বাহিনী এবং পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনী যদি না থাকিত তবে উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই সম্ভবপর হইত না।

৪১০. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, (অনু. মোহাম্মদ এনামুল হক), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

মুহাম্মদ ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন এবং প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। তিনি একটি প্রসিদ্ধ বিজয় ও দুইটি পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তবে, তিনি তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ বিজয়ের জন্য সুপরিচিত। কনষ্টান্টিনোপন অধিকার করিবার জন্য তাঁহাকে ফাতিহ (বিজয়ী) উপাধি দেওয়া হয়। সুলতান হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই নগরী অধিকার করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অবরোধ আরম্ভ হয় ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল এবং ইহা ৫৩ দিন স্থায়ী হয়। নগরের দেওয়ালে বিরাট বিরাট পাথরের গোলা নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। সোনালী শৃঙ্গের (Golden Horn) প্রবেশদ্বার রুদ্ধ ছিল, ফলে তুর্কিগণ ইহাতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। ৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কিয়েভের ভ্যারানজিয়ানগণ কর্তৃক অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করিয়া মুহাম্মদ ৭০টি জাহাজকে চর্বিযুক্ত সড়কে পাহাড়ের উপর টানিয়া তুলিতে আদেশ দেন এবং বেড়ী পশ্চাৎভাগে শৃঙ্গের (Horn) উপর ছাড়িয়া দেন। এই ধরনের ঘটনা নগরের অধিবাসীবৃন্দ আশা করে নাই। ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৯শে মে তুর্কি বাহিনী দেওয়ালের একটি স্থান ভঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। সম্রাট প্যালিওলোগস, যিনি পোপের সাহায্য পাইলে ক্যাথলিক হইয়া যাইতে সম্মত হইয়া নাগরিকদের বিরাগভাজন হন, তিনি নিহত হন এবং ঐদিন অপরাহ্নে মুহাম্মদ নগরে প্রবেশ করেন। নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি সরাসরি হ্যাজিয়া সফিয়া নামক বিরাট গীর্জায় গমন করেন এবং ইহাকে মসজিদে রূপান্তরিত করিতে আদেশ প্রদান করেন।[৪১১]

মুহাম্মদ নিশ্চয়ই কনস্টান্টিনোপলে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারণ চিরাচরিত ধ্বংস সাধন তিনি বেশিদিন স্থায়ী হইতে দেন নাই। কথিত আছে যে, তিনি একটি সৈন্যকে হ্যাজিয়া সফিয়া হইতে একটি মোজাইক পাথর সরাইয়া ফেলিতে দেখেন এবং তাহাকে এই বলিয়া হত্যা করেন যে, "আমি বন্দী ও অস্থাবর সম্পত্তিগুলি আমার অনুসারীদিগকে দিয়াছি, কিন্তু ইমারতগুলি আমার।" অধিকাংশ গীর্জাগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। তিনি নগরে তুর্কি ও খ্রিষ্টানদিগকে বসতি স্থাপন করিতে দেন। অরথোডক্স চার্চের ধর্মযাজকদের মৃত্যু হইলে তিনি একটি নূতন ধর্মযাজক নির্বাচন করিতে আদেশ দান করেন এবং বাইজেন্টাইন সম্রাটদের রীতি অনুসারে তিনি তাহাকে একটি সোনার 'ক্রুশ' দান করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, বাগদাদের পতনের ন্যায় কনস্টান্টিনোপলের পতন ছিল একটি চরম আঘাত। তুর্কিগণ অনুভব করে যে, ইহা তাহাদিগকে দখল করিতে হইবে। তবে ইহা কেবল এইজন্য নহে যে, ইহা তাহাদের বাণিজ্যিক, সামরিক অথবা রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। পর্বতে আরোহণ করিবার

৪১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

সুপরিজ্ঞাত কারণের ন্যায়, উসমানীয়দিগকে এই নগরী অধিকার করিতে হইয়াছিল কারণ ইহা সেখানে অবস্থিত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের অভাবে এই নগরী এমন জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, সুলতান ইহাকে পুনরায় বসতিপূর্ণ করিতে বাধ্য হন।[৪১২]

৭.৪: উসমানীয়দের কূটনৈতিক ব্যর্থতা ও পতন

পতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে সেনাবাহিনীর দোষ সর্বাগ্রে ধরা পড়ে, কারণ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও দুর্বলতা ছিল ইহার সামরিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেনাবাহিনীর অন্তরাত্মা জান-নিসারীগণ বিবাহের অনুমতি লাভ করিয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার দ্বারা সৈন্যগণ তাহাদের প্রাথমিক আনুগত্য সুলতানকে না দিয়া তাহার পরিবারকে প্রদান করে, যাহার সবটুক বিবাহের পূর্বে সুলতানেরা পাইতেন। তৃতীয় মুরাদের সময় এই সংগঠনের সদস্যদের পুত্রদিগকেও বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে প্রয়োজনের খাতিরে বেকার মুসলমানদিগকে ভর্তি করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে দেভশিরমেহ পন্থা ত্যাগ করা হয় এবং জান-নিসারীগণ পার্শ্ব ব্যবসায় নিযুক্ত পড়ে। তাহারা যেহেতু আর ক্রীতদাস ছিল না, তাই তাহারা একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যাহাদের উপর সুলতানের আধিপত্য লোপ পায়। সংখ্যায় তাহারা বৃদ্ধি লাভ করে এবং দেরে অর্থনীতির উপর এক বিরাট বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জান-নিসারীদের বেতনের টিকিট প্রকাশ্য বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিবার সময় দেখা যায় তালিকাভুক্ত ১৫০,০০০-এর মধ্যে মাত্র ২০০০-এর সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল।[৪১৩]

সেনাবাহিনীর অপর গুরুত্বপূর্ণ শাখা, সিপাহীগণ, যাহারা ছিল সামন্ত অশ্বরোহী বাহিনী, তাহারাও তেমন ফলপ্রসূ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। তৃতীয় মুরাদের সময় সামন্ত প্রভু ও দরবারের সদস্যগণ তাহাদের চাকর, ক্রীতদাস, খোজা ও অন্যান্যদিগকে সিপাহীর তালিকাভুক্ত করিয়া তাহাদের বেতন পকেটস্থ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে উসমানীয় অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তি বিলীন হইয়া যায়।

412. DONALD EDGAR PITCHER, An Historical Geography of the OTTOMAN EMPIRE, from earliest times to the end of the sixteenth century. Jordan: Leiden E.J. BRILL, 1972, P. 41-47
৪১৩. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ক্রমাবনতির বর্ণনা করিবার সময় আরও দুইটি কারণ অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। একটি হইল অর্থনৈতিক। আমেরিকার নূতন বিশ্ব আবিষ্কার ও ইউরোপের ব্যবসানীতি বহিঃপ্রকাশের ফলে বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি পরিবর্তিত হইয়া যায়। ভূমধ্যসাগরীয় ব্যবসা গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে এবং সমুদ্রপথ স্থলপথের স্থান দখল করে। ইহা উসমানীয় অর্থনীতিতে মর্মাঘাত হানে বলিয়া পুঁজি খাটাইবার আর কোনো উৎসাহ দেখা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং সামগ্রিকভাবে স্বাধীন জাতিসমূহের মহাদেশ হিসাবে ইউরোপের উত্থান একই সময় সংঘটিত হয়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও দুঃসাহসিক লোকজন বাজার ও কাঁচামালের খোঁজে চতুর্দিকে যাইতে আরম্ভ করে এবং এই প্রক্রিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় একটি পতনোম্মুখ বিশাল প্রতিমূর্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইতে বাধ্য। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড উসমানীয়দের ক্ষতির বিনিময়ে বিস্তৃতি লাভ করে। মূলত সমগ্র ইউরোপের অংশগ্রহণে স্বাক্ষরিত **১৬৯৭** খ্রিষ্টাব্দের কার্লোভিজের (Karlowitz) চুক্তি হইল ইউরোপে উসমানীয় আধিপত্যের পরিসমাপ্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সূচনা।[৪১৪]

৪১৪. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

An Historical Geography of the Ottoman Empire –Pithcher[415]

---

415. DONALD EDGAR PITCHER, *An Historical Geography of the OTTOMAN EMPIRE, from earliest times to the end of the sixteenth century.* Jordan: Leiden E.J. BRILL, 1972, Map No. XXXIII

An Historical Geography of the Ottoman Empire –Pithcher[416]

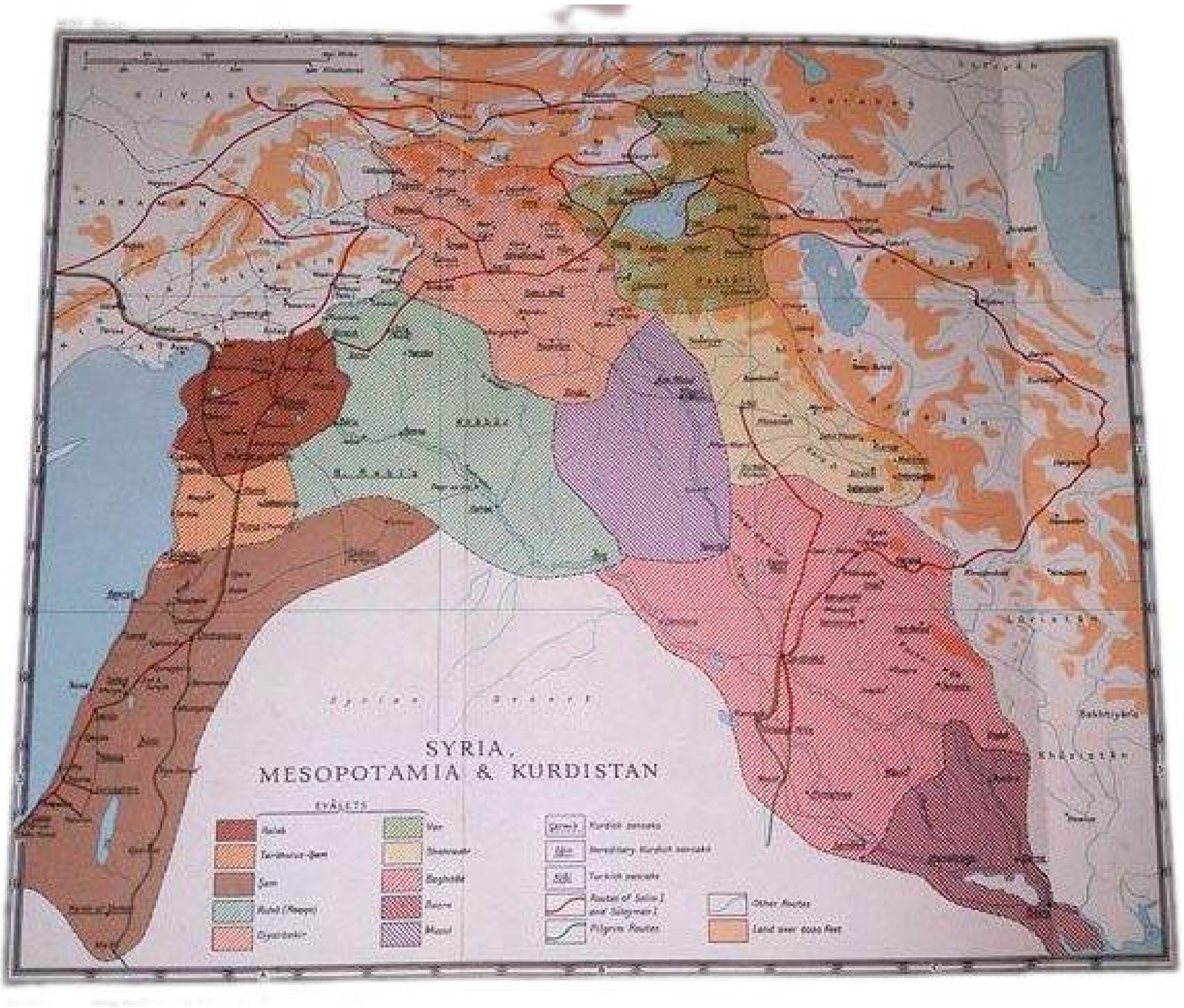

416. DONALD EDGAR PITCHER, Ibid, Map No. XXXII

Dhaka University Institutional Repository

An Historical Geography of the Ottoman Empire –Pithcher[417]

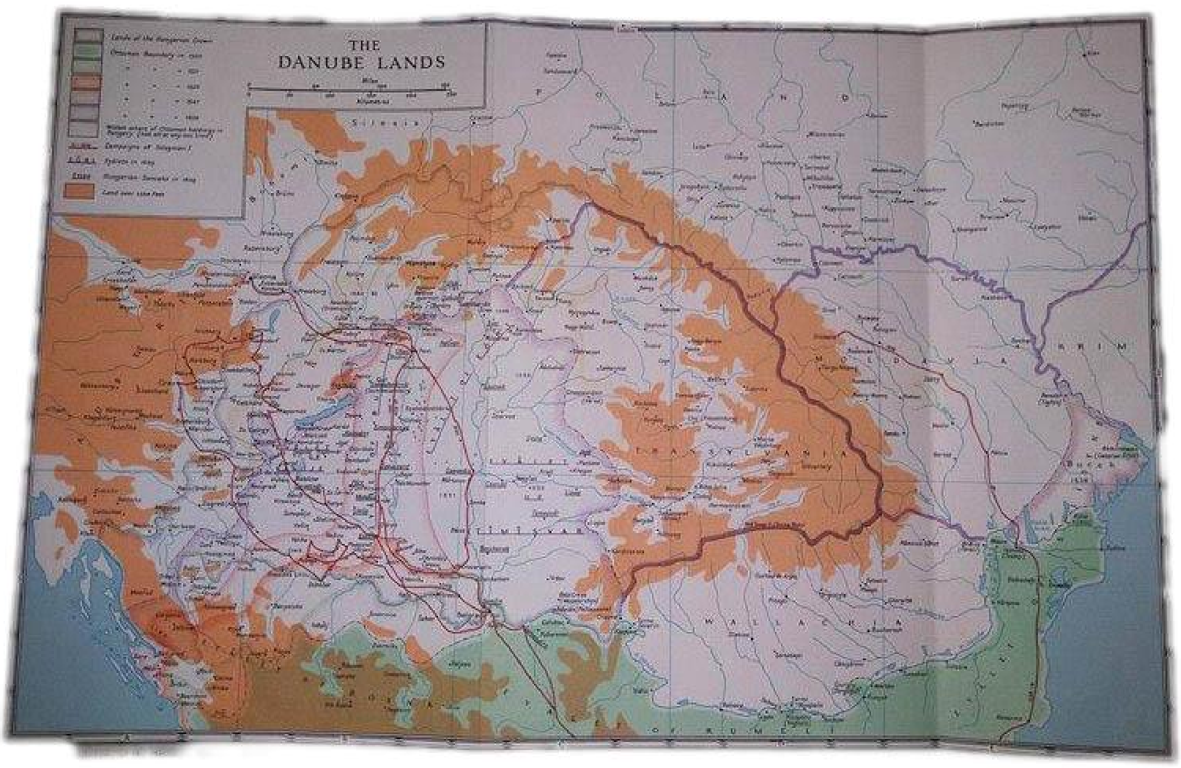

417. DONALD EDGAR PITCHER, Ibid, Map No. XXIII

Dhaka University Institutional Repository

এই মানচিত্রটি সংকলন করা হয়েছে[৪১৮]

৪১৮. সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০১

Dhaka University Institutional Repository

৪১৯

ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়

রাজনৈতিক পটভূমিতে

- রাসূলে করীম (সা.) এর জীবনী অবদান (৫৭০-৬৩২)
- খোলাফায়ে রাশেদীন (৬৩২-৬৬১)
- উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০)
- আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮)

সামাজিক পটভূমিতে

- ইসলামী রাষ্ট্রের পত্তন, সংগঠন ও প্রজাতন্ত্র
- ইসলামী রাষ্ট্রের সংহতি ও সম্প্রসারণ; প্রজাতন্ত্র
- ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ও বৈদেশিক (বাইজানটাইন) প্রভাব ঃ আরব রাজতন্ত্র
- খিলাফতের পূর্ণাঙ্গতা ও পারস্য প্রভাব ঃ দৌউলা অথবা ইসলামী সাম্রাজ্যঃ বিশ্বজনীন রূপ

ধর্মীয় পটভূমিতে

- আল-কুরআন ও সুন্নাহ
- আল-কুরআন ও সুন্নাহ্
- বিদাত, নৈতিক অবনতি ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ
- বিদাত অনৈসলামিক কার্যকলাপ

কৃষ্টি ও সভ্যতার পটভূমিতে

- ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা
- ইসলামী সমাজের সম্প্রসারণ, কৃষ্টি ও শিল্পকলার উন্মেষ
- সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা
- ইসলামী শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা চর্চার স্বর্ণযুগ

---

৪১৯. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, D"P gva¨wgK Bmjv‡gi BwZvnm, প্রথম পত্র, ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ২০০৩, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পৃ. ৩২৭

অষ্টম অধ্যায়
ইসলামে যুদ্ধ বিগ্রহ

আল সারাখসির ধারণা মতে 'সিয়ার[৪২০] এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

সিয়ার বিশ্বাসীদের (মুসলিম) সাথে ঐ সমস্ত লোকদের আচরণ বর্ণনা করে যারা শত্রু ভূ–খন্ডের অবিশ্বাসী (অমুসলিম) এবং ঐ সমস্ত লোক যাদের সাথে চুক্তি করা হয়েছে এবং যারা সাময়িকভাবে এমন কোন রাষ্ট্রের প্রজা, যে রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং যাদেরকে মুসলিম ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করতে নিরাপদ আচরণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে অথবা স্থায়ীভাবে মুসলিম ভূখণ্ডে অবস্থানকারী যিম্মি-(মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা) ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) এবং বিদ্রোহী (বাঘুন)। এতদসংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে আমরা কিছু প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

৮.১: সেনাবিভাগীয় আদালত

মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় কোনো অভিযানের সংগে বিচারক থাকার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা ছিল বলে কোনো উল্লেখ নাই, সেনাপতি স্বয়ং বিচারকের কাজও করতেন। খলীফা উমর (রা.) সময়ে প্রথম সেনাবাহিনীর সংগে বিচারপতি থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা সেনাবাহিনীর সভ্যদের অভিযোগই কেবল ফয়সালা করতেন না, অধিকন্তু জলে-স্থলে প্রাপ্ত গণিমতেরও বিলি-ব্যবস্থা করতেন। মুসলিম ফৌজদারী বিধির কিছু আইন অভিযানকালে কার্যকরী হত না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিনী শত্রু এলাকায় থাকত।[৪২১]

সেনাপতির প্রতি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ

যখনই মহানবী (সা.) কোন বাহিনীর উপর সেনাপতি নিযুক্ত করতেন তিনি তাঁকে নিজের সম্পর্কে ও তাঁর সঙ্গী-সহচর মুসলমানদের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে, আল্লাহকে ভয় করার জন্য উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেনঃ

'আল্লাহর নামে ও আল্লাহর পক্ষে যুদ্ধ কর। নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর, প্রবঞ্চনা করো না, বিশ্বাস ভঙ্গ কর না, অঙ্গচ্ছেদ করো না, নাবালকদের হত্যা করো না।

---

৪২০. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
৪২১. মজিদ কাদ্দুরী, অনু. অধ্যাপক হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৩

যদি তুমি কাফেরদের মধ্যে কোন শত্রুর মুকাবিলা করো, তাহলে তাদেরকে তিনটি বিকল্প পন্থা দাও। যে কোনটি তারা গ্রহণ করে তাতে সম্মত হও এবং তাদের বিরোধিতা হতে বিরত থাক।[৪২২]

অতএব তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও, অর্থাৎ ইসলাম কবুল করতে আমন্ত্রণ জানাও। যদি তারা কবুল করতে সম্মত হয় তাহলে তাদের বিরোধিতা করো না। অতঃপর তাদেরকে তাদের এলাকা হতে হিযরতকারীদের এলাকায় (অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রে) হিযরত করতে বল এবং তাদের জানিয়ে দাও যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরই মত (মুসলমানদের মত) তারাও সমান অধিকার ও দায়িত্বের অধিকারী হবে। যদি তারা হিযরত করতে না চায়, তাহলে জানিয়ে দাও, তারা বেদুঈন মুসলমান বলে গণ্য হবে, এবং অন্যান্য মুসলমানদের মত আল্লাহর আইনের প্রতি তারাও বাধ্য থাকবে। কেবল ব্যতিক্রম হবে এই যে, তারা গনিমতের কোন অংশ পাবে না, যদি তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে অন্যান্য মুসলমানদের সংগে যুদ্ধ না করে।

যা হোক, যদি তারা সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে বলো। যদি তারা রাজি হয়, তাতে সম্মত হও এবং তাদের বিরোধিত করো না।

'যদি তারা দাবি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ করো।

যদি তুমি দুর্গে অবস্থানকারী লোকদের অবরোধ করো এবং তারা আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ ও রাসুলের নামে প্রতিশ্রুতির ভরসায় যে, তারা নিরাপত্তা পাবে, তা হলে তুমি অন্যথা কর না; বরং তোমার ও তোমার সাথীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরাপত্তার আশ্বাস দাও। কারণ আল্লাহ ও রসুলের প্রতিশ্রুতি ভংগ করা অপেক্ষা তোমার ও তোমার সহচরদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করা অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ।

যদি তোমরা দুর্গের লোকদেরকে অবরোধ কর এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির নামে তারা আত্মসমর্পণ করতে চায়, সেক্ষেত্রে সে ভাবে আত্মসমর্পণ করতে না দিয়ে তোমাদের প্রতিশ্রুতির উপর আত্মসমর্পণ করতে দাও। কারণ তোমরা নিশ্চিত হতে পারো না যে, তোমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে কাজ করেছ কিনা।[৪২৩]

অতঃপর মহানবী (সা.) আব্দুর রহমান বিন আওফের লিখিত হাতে পতাকা দেওয়ার জন্য হযরত বেলাল (রা.)কে আদেশ করলেন। তিনি তা-ই করলেন। অতঃপর মহানবী (স.) আল্লাহর প্রশংসা করে তাঁর

[৪২২] মফিজুল্লাহ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

[৪২৩] ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২

অনুগ্রহ কামনা করে তার জন্য প্রার্থনা করলেন। বললেনঃ ওহে আওফের পুত্র! এটা নাও। যুদ্ধ হবে আল্লাহরই পথে এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। বিশ্বাস ভঙ্গ করো না, অথবা প্রতারণা করো না, অথবা কারও অঙ্গচ্ছেদ করো না, অথবা কোন নাবালক কিংবা স্ত্রী লোককে হত্যা করো না। এটাই আল্লাহর চুক্তি ও রাসূল (সা.)-এর আচরণ তোমাদের হিদায়তের জন্য।

৮.২: স্থল-যুদ্ধ কৌশল ও নিহতদের প্রতি আচরণ

জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য- জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কুফ্‌রের শক্তিনাশ। আইন ও বিধান কেবল মহান আল্লাহ্‌রই চলবে। দীন ইসলাম আর সব ধর্মের উপর শক্তিশালী হবে তা অন্যান্য বাতিল ধর্ম বিদ্যমান থাকুক, যেমন খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে হয়েছিল কিংবা সেগুলো খতম হয়ে যাক, যেমন হযরত মাসীহ (আ.) এর পুনরাগমনের পর হবে। যা হোক, যে যাবত না উপরিউক্ত উভয় লক্ষ্য অর্জিত হয়, তাবত মুসলিম জাতির জন্য আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধমূলক উভয় প্রকার জিহাদ বিধেয়। হাদীছে ইরাশদ হয়েছে- (জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে)। জিহাদের বিস্তারিত বিধি-বিধান ও শর্তাবলী ফিক্‌হী গ্রন্থাবলীতে দ্রষ্টব্য।[৪২৪]

প্রকাশ্যে যারা কুফ্‌র ও অন্যায়-অনাচার ত্যাগ করবে, তাদের সাথে যুদ্ধ নয়। তাদের মনের অবস্থা এবং ভবিষ্যত গতিবিধি আল্লাহ্‌ তা'আলার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা যে কাজই করুক, তা মহান আল্লাহ্‌র চোখের আড়ালে করতে পারবে না। মুসলিমগণের প্রতি আদেশ, তারা কেবল বাহ্য অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। হাদীছে আছে, আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবত না তারা বলে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। যখন তারা তা বলবে, তখন আমার পক্ষ হতে তারা তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে ফেলবে। তবে সে জানমালের কারণেই যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, সে ভিন্ন কথা, তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার হিসাব মহান আল্লাহ্‌ই নেবেন।

অর্থাৎ মুসলিমগনের উচিত মহান আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধান ও সাহায্যের উপর ভরসা রেখে জিহাদ করা এবং কাফিরদের ধন ও জনবল দেখে ভয় না পাওয়া। বদর যুদ্ধে তো প্রত্যক্ষ করেছ, আল্লাহ্‌ মুসলিমগণকে কীভাবে সাহায্য ও অভিভাবকত্ব দান করেছেন।[৪২৫]

আইনবিদগণ হযরত আবু বকরের (রা.) নসিহতগুলোর মধ্যে অকারণে অমুসলিমদের ধনসম্পদ বিনষ্ট না করার নীতি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। বর্তমানে যে সব

৪২৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান), প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫
৪২৫. শায়খুল হিন্দ্‌ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩

বিবরণ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তা থেকে জানা যায় যে, কেবলমাত্র আল-আউযায়ী (খৃষ্টীয় ৭৭৪) ও আস-সাউরী (খৃষ্টীয় ৭৭৮) অকারণে ধ্বংস না করার নীতি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন।[৪২৬]

আল-কোরআনের নিম্নলিখিত নির্দেশের মধ্যেও এর ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (৫)

অর্থ: “অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হইলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদেরকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[৪২৭]

কোরআনের এ নীতি পরবর্তীকালে আর একটি নীতি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। সেটা হল এই ঃ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ * وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢١٧)

“পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে; বল, ‘উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়।’ কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাঁধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদাপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়’ তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হইতে ফিরাইয়া না দেয়, যদি তাহারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় দীন হইতে ফিরিয়া যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহারাই দোজখবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।”[৪২৮]

---

৪২৬. মজিদ কাদ্দুরী, (অনু. অধ্যাপক হাসান জামান), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫
৪২৭. আল-কুরআন, ৯ : ৫
৪২৮. আল-কুরআন, ২ : ২১৭

দারুল হারবের অমুসলমানগণকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানাবার পর তারা যদি বিভিন্ন বিকল্পপন্থায় যে কোন একটি (ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান) গ্রহণ না করেন, তবে জেহাদীগণ নীতিগতভাবে জেহাদের মারফত তাদের হত্যা করতে পারেন। তারা যুদ্ধে যোগ দিন আর না দিন।

অবশ্য তাদের বিশ্বাসভঙ্গ করে হত্যা বা অঙ্গচ্ছেদ করা কোন মতেই অনুমোদিত হয় নি। নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও ইসলামের মধ্যে যে কোনটি বেছে নিতে হলে হারবীদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েই তার মীমাংসা করতে হবে।

জেহাদীগণ শত্রুপক্ষকে অবরোধ করতে এবং নগরের প্রাচীন ও গৃহ ধ্বংস করতে আগ্নেয়াস্ত্র (নিক্ষেপাস্ত্র) ব্যবহার করতে পারেন। শত্রু-অধিকৃত স্থান দগ্ধ করতে বা প্লাবিত করতে পারেন। তাঁরা খালের পানি অবরুদ্ধ করতে পারেন ও শত্রুপক্ষ যাতে পানি না পায়, সেজন্য পানি সরবরাহও বন্ধ করে দিতে পারেন। বিষাক্ত দ্রব্য, রক্ত বা অন্যান্য জিনিস পান করার পানিতে বা খালে নিক্ষেপ করা যেতে পারে্ এতে শত্রুগণ আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হবে। সাধারণভাবে বিষাক্ত ও অগ্নিবহ তীরও যুদ্ধে ব্যবহার করতে অনুমতি দেয়া হয়।[৪২৯]

যদি হারবীগণ (অমুসিলম যোদ্ধা) নারী ও শিশুসমেত মুসলিমদের ধরে ফেলে এবং তাঁরা ও অমুসলিমগণ জেহাদীদের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকেন, তবে জেহাদীগণ হিংসাত্মক কার্যকলাপ সীমিত করবেন। এটাই হল আইনবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত। হিংসাত্মক কার্যকলাপের পরিসীমা সম্পর্কে অবশ্য তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। বক্তিগতভাবে জেনে হারবীদের যদি আক্রমণ করা না যায়, তবে প্রত্যক্ষ আক্রমণ থেকে বিরত থাকার জন্য আল-আউযায়ী উপদেশ দিয়েছেন। আল-কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের ওপর ভিত্তি করে তিনি এ মতামত প্রকাশ করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে এটি নাযিল হয় ঃ

"তোমাদের অজান্তে বিশ্বাসী নারী-পুরুষের তোমরা হয়ত মথিত করতে পার এবং তার ফলে তোমরা গোনাহগার হয়ে যেতে পার।"[৪৩০]

আল্লাহ্ তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে একশ' জন ধৈর্যশীল থাকলে দু'শ' জনের উপর বিজয়ীহবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে মহান আল্লাহ্র হুকুমে দু'হাজারের উপর বিজয়ীহবে। মহান আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন।

---

৪২৯. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭

৪৩০. আল-কুরআন, ৪৮ : ২৫

বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে,[৪৩১] পূর্বের আয়াতে মুসলিমগণকে তাদের দশ গুণ বেশী কাফিরের মুকাবিলায় অবিচলিত থাকতে আদেশ দেওয়া হবে তাদের পক্ষে সেটা কঠিন মনে হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এক প্রকার দুর্বলতা ও অলসতা দেখে পূর্বের আদেশ তুলে নিয়েছেন। এখন নিজেদের তুলনায় দ্বিগুণ শত্রুর বিরুদ্ধেই কেবল অবিচলিত থাকা জরুরী এবং পলায়ন নিষিদ্ধ। এই যে দুর্বলতা ও আলস্যের পরিপ্রেক্ষিতে হুকুমকে সহজ করা হয়, তার কারণ কয়েকটি হতে পারে। হিজরতের প্রথম দিকে মুসলিমগণের সংখ্যা ছিল হাতে গণা কয়েকজন। তাদের শক্তি ছিল সুবিদিত কিছুকাল পর তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েন। নতুন যারা তাদের মধ্যে পুরানো আনসার ও মুহাজিরদের মত বিচক্ষণতা, ধৈর্য-স্থৈর্য এবং তাঁদের মত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের পারাকাষ্ঠা ছিল না। সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নিজেদের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক দৃষ্টে আল্লাহ্-নির্ভরতার মধ্যেও ঈষৎ ঘাটতি দেখা দিয়ে থাকবে। এটাও মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য যে, কোন কঠিন কাজ স্বল্প সংখ্যক লোকের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হলে কর্মীদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা বেশী হয়। প্রত্যেকেই নিজ সাধ্যের অতিরিক্ত হিম্মত দেখায়। সে কাজই যখন অনেক বড় দলের উপর অর্পির হয়, তখন প্রত্যেকেই অন্যের অপেক্ষায় থাকে এবং মনে করে দায়িত্ব তো আর আমার একার নয়। এ হিসাবেই আগ্রহ, উদ্দীপনা ও হিম্মতে কমতি দেখা দেয়। হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, প্রথম দিকের মুসলিমগণ ইয়াকীন ও প্রত্যয়ে ছিলেন পরিপূর্ণ। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল নিজেদের চেয়ে দশগুন কাফিরদের সঙ্গে জিহাদ করতে হবে। পরবর্তীকারের মুসলিমগণ এক কদম পিছনে ছিলেন। তাদের প্রতি আদেশ হয়, দ্বিগুণ বেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। এখন এ আদেশই বলবত আছে। কিন্তু দিগুণের বেশী সংখ্যকের উপর আক্রমণ চালাতে পারলে সে বড় ফযীলতের কথা হযরত (সা.) এর আমলে এক হাজার মুসলিম আশি হাজার কাফিরের সঙ্গে লড়াই করেছেন। মূতার যুদ্ধে মুসলিমগণের সংখ্যা ছিল তিন হাজার আর শত্রু বাহিনী দুই লাখ। এ ধরনের ঘটনা দ্বারা আল-হামদু লিল্লাহ্ ইসলামের ইতিহাস পূর্তি হয়ে আছে।[৪৩২]

সুফিয়ান আস-সাউরী ও ইমাম আবু হানিফা প্রয়োজনবোধে তীর-ধনুক দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। এতে জেহাদীগণ কর্তৃক অমুসলিম আক্রান্ত হওয়ার ফলে যদি অস্ত্র-শস্ত্রের আঘাতে কোন মুসলমানের মৃত্যু হয়, তবু আক্রমণ করা বাঞ্ছনীয়। মুমিনদের (মহিলা ও শিশুসমেত) হত্যা তখন ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছে বলে মনে করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, যুদ্ধার্থে সুরক্ষিত কেন্দ্র ও দুর্গসমূহ আক্রমণ করা চলে। কিন্তু বাড়ী-ঘরের ওপর হামলা চলবে না। যদি যুদ্ধের এলাকা খুব পাশাপাশি হয়,

---

৪৩১. মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযীঃ Av j -RwgÕAvZ-wZi wghx, দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তাবি. হাদিস নং-৩২০৫
৪৩২. শায়খুল হিন্দ্ মাও. মাহমুদুল হাসান (র.) ও শায়খুল ইসলাম মাও. শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), (অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম), খ.২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

তবে মুমিনদের মৃত্যু ঘটলেও তীর না ছুঁড়ে (আক্রমণ না করে) হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। শাফেয়ী আইন ও ধর্মবেত্তা ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন যে, হারবীদের ওপর বেপরোয়া আক্রমণকালে জেহাদীদের তীরের আঘাতে দুর্ঘটনাক্রমে কোন মুমিন নিহত হলে তা' দোষাবহ হবে না। অর্থাৎ এ অবস্থায় 'ইসতিসলাহ' বা জনকল্যাণের তাগিদে কয়েকজন মুমিনের হত্যা অনুমোদিত হয়েছে। কারণ, জেহাদকালে এ ধরনের আক্রমণে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে।[৪৩৩]

যুদ্ধের সারঞ্জাম

আল্লাহ্র উপর ভরসা করার অর্থ বৈধ ও জরুরী আসবাব-উপকরণ পরিত্যাগ করা নয়। বরং মুসলিমগণের পক্ষে যথাসাধ্য যুদ্ধ-উপকরণ সংগ্রহ করা ফরয। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পবিত্র যুদ্ধে যুদ্ধ সামগ্রী বলতে বুঝাত, ঘোড়া চালানো শেখা, তরবারি চালনা ও তীরন্দাজী ইত্যাদির প্রশিক্ষণ নেওয়া। বর্তমানে রাইফল, কামান, যুদ্ধ বিমান, রণতরী, সামরিক পোশাক-আশাক ইত্যাদি তৈরী করা, ব্যবহার করতে শেখা তথা সমর-বিষয়ক যাবতীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ যুদ্ধ সামগ্রীর অন্তর্ভূক্ত, এমন কি ব্যায়াম, প্যারেড ইত্যাদিও। ভবিষ্যতে যেসব রণ-উপকরণ আবিস্কৃত হবে, তাও আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্যভূক্ত। ঘোড়া সম্পর্কে তো রাসূসুল্লাহ (সা.) স্বয়ং ইরশাদ করেন, ' ঘোড়ার কপালে কিয়ামত কাল পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে।' হাদীছে আরও আছে, যে ব্যক্তি জিহাদের নিয়্যতে ঘোড়া পালে, সে তার পনাহার তথা প্রতি কদমে কদমে ছওয়াব পায়। তর খোরাক ইত্যাদি পর্যন্ত কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে।[৪৩৪]

রণ-সামগ্রী ও প্রস্তুতি হচ্ছে শত্রুদের উপর প্রভাব ফেলার ও তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার বাহ্য কারণ বিশেষ। বিজয় ও সাফল্যের আসল কারণ তো আল্লাহ্র সাহায্য, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর নির্দিষ্টভাবে যাদের তোমরা জান না তারা হচ্ছে, মুসলমানীর মুখোশ পরিহিত মুনাফিক অথবা ইয়াহূদী গোত্র বনূ কুরায়যা কিংবা রোমপারস্য প্রভৃতি দেশের অধিবাসী, যাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এর দ্বারা আর্থিক জিহাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ জিহাদের প্রস্তুতিতে যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে, তার পরিপূর্ণ বিনিময় পাবে। এক দিরহামের বদলে সাতশদিরহাম। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন । অনেক সময় দুনিয়াতেও তার বহুগুণ বেশী বিনিময় লাভ হয়ে যায়।

---

৪৩৩. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬-৭৭

৪৩৪. হাফেজ আল্লামা ইমামুদ্দিন ইবনু কাসীর (র), (অনু. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান), Zvdmxi Beb Kvmxi, ঢাকাঃ ১৯৯৬, পৃ.৩১৫

৬৯. মুসলিমগণের প্রস্তুতি ও বীরত্বসুলভ ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে কাফিররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করবে ও সন্ধি প্রস্তাব করবে। তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলা হয়েছে। আপনিও নিজ বিবেচনা অনুযায়ী সন্ধির হাত বাড়িয়ে দিন। কেননা, জিহাদ দ্বারা রক্তপাত নয়, বরং মহান আল্লাহ্র কালিমাকে বুলন্দ করা ও ফিতনার মূলোৎপাটন উদ্দেশ্য্ যদি রক্তপাত ছাড়াই এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়,তবে অনর্থক রক্তপাতের কী দরকার? কাফিররা সন্ধির আড়ালে যদি প্রতারণা করতে চায় তবে পরওয়া করবেন না, মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন। তিনি তাদের অভিপ্রায় জানেন এবং তাদের গোপন পরামর্শ শোনেন। তাঁর সাহায্যের সামনে তাদের দুরভিসন্ধি কোন কাজে আসবে না। আপনি নিজের নিয়্যত পরিষ্কার রাখুন।[৪৩৫]

নিহতদের প্রতি আচরণ

মৃত শত্রুর অঙ্গচ্ছেদ মুসলিম আইনে কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ। মৃতকে সর্বদা সম্মান করতে হবে। সুতরাং মহানবী দাঁড়িয়ে পড়তেন এমনকি যদি অমুসলমানেরাও লাশ নিয়ে অন্ত্যাষ্টিক্রিয়ার জন্য যেত। পরাজিত শত্রুর লাশকেও মুসলমানদের লাশের মতই সমাধিস্থ করতে হবে। যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে কোনো লাশ তাদেরকে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ আসে, তা অগ্রাহ্য করা যেতে পারে না। সুতরাং খন্দকের যুদ্ধকালে মহানবী (সা.) ঐরূপ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন, এমনকি লাশ ফেরত দেয়ার বিনিময়ে শত্রুদের তরফ থেকে অর্থ প্রদানও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যাহোক, আবু হানিফার মতে শত্রুদের তরফ থেকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব এলে বা দিতে চাইলে তা গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁর যুক্তি হল যে, মুসলমানরা শত্রুর সম্পত্তি দখল করতে পারে এবং যদি তারা স্বেচ্ছার দান করতে চায়, তা হলে তা গ্রহণ নিষিদ্ধ হতে পারে না। লাশ বিনা অর্থে মহানবী (সা.)এর ফেরত দেওয়ার তাৎপর্য ছিল তাঁর মহত্ত্ব, তা আইনের ব্যাপারে ছিল না। তাকওয়া ফতোয়া নয়, মাত্র টাকা অপেক্ষা গভীরতর মানসিক উদ্দেশ্য ও প্রচারণার উদ্দেশ্য হাসিল করে।[৪৩৬]

হারবীর মৃত্যুর পর তার মৃতদেহকে অবমাননা করা, তার মাথা কেটে ফেলা বা বর্শার অগ্রভাগে তার মাথা তুলে নেয়া চলবে না। আবু ইয়ালা বলেন যে, মৃতব্যক্তি মাত্রকেই দাফন করা উচিত। তবে শবাধারে রাখা

৪৩৫. মাহমুদুল হাসান (র.) ও শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), (অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম), Zvdmx‡i Dmgvbx, খ.২, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৩-১৫৬

৪৩৬. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩

বা কাফন না পরালেও চলবে। বদরের যুদ্ধের পর হযরত মুহাম্মদের (সা.) সুন্নার ওপরই তাঁর এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪৩৭]

৮.৩: ইসলাম ও মুসলিম সামদ্রিক আইন

ইসলামী আইনবিজ্ঞানে সমুদ্রপথে যুদ্ধের বিষয়টির আলোচনা অনেকখানি অপূর্ণ রয়ে গেছে। গোড়া থেকেই মুসলমানেরা সমুদ্রপথ এড়িয়ে চলতেন। তাছাড়া সব চাইতে বড় কারণ হল এই যে, মুসলিম শক্তি স্থলপথেই সীমাবদ্ধ ছিল। পানিপথে তাঁদের শক্তি দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। ফলে বিষয়টি তাঁরা অবহেলা করেই এসেছেন। স্থল এলাকায় ইসলামের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মরুপ্রদেশ থেকে বাইজান্টীয় ও ইরানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তা ছড়িয়ে পড়ে। ইরানী সাম্রাজ্যের দ্রুত ও চরম অধঃপতন ঘনিয়ে আসল। কারণ, ইরান হল এমন একটি স্থলশক্তি, যাকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করতে পেরেছিল। কিন্তু মুসলমানরা যখন আলেকজান্দ্রিয়া ও সিরিয়ার সমুদ্রতীরে বাইজান্টীয়দের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁরা বিপুল বাধার সম্মুখীন হন। বাইজান্টীয়দের নৌ শক্তি তখনও অটুট ছিল। এ পর্যন্ত বহুদিন ধরে মুসলমানগণ স্থলশক্তির সাহায্যেই তাঁদের বিজিত দেশ নিয়ন্ত্রণ করে এসেছেন। জাবিয়া, কুফা ও ফুসতাত মরুভূমিতে অবস্থিত এসব ঘাঁটি থেকে স্বাচ্ছন্দে বিজিত এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু সমুদ্রপথে মুসলমানদের সর্বক্ষণ আক্রমণের মোকাবিলা করতে হত। তাই নৌবাহিনী গঠন করে সাম্রাজ্যকে বিদেশী আক্রমণ থেকে রক্ষা করার বন্দোবস্ত করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থান ও হযরত মুয়াবিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে মুসলমানগণ নৌ-শক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেন। কারণ, যতদিন ভূমধ্যসাগর বাইজান্টীয়দের কবলে রয়ে গেল, ততদিন মিসর ও সিরিয়ায় ইসলামের অবস্থা মোটেই নিরাপদ ছিল না।[৪৩৮]

খৃস্টীয় ৬৪৮ সালে হযরত মুয়াবিয়া কর্তৃক সাইপ্রাস অধিকারের পরই মুসলিম নৌ-শক্তির গোড়াপত্তন হয়। ফলে সিরিয়ার ওপর তাঁর আধিপত্য অনেকটা মজবুত হয়ে আসে। রোডস ও সিসিলি দ্বীপের ওপর আক্রমণ মুসলমানদের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দেয় এবং ৬৫৫ সালে প্রথম বৃহৎ নৌ-সমরে তাঁরা জয়ী হন। কয়েকটি নৌ-কৌশল প্রয়োগের ফলেই মুসলিমগণ যাত-আস সাউরীর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এতে বোঝা গেল যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণও সামুদ্রিক যুদ্ধে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। বাইজান্টীয় শক্তি সমুদ্রপথে অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকা সত্ত্বেও ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য কেবলমাত্র খৃস্টান শক্তির মধ্যে আর সীমাবদ্ধ রইল না। নৌ-আধিপত্যের ব্যাপারে খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল। কারণ প্রতিবার কেউ না

৪৩৭. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮
৪৩৮. এ.জে. এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.198

কেউ নতুন নতুন রণ-কৌশল বা অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করতে লাগল। ইস্তাম্বুলের মুসলিম অবরোধ গ্রীকদের অগ্নিপ্রক্ষেপ কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে যায় (খৃষ্টীয় ৬৭৩-৬৯৭)। আবার অপরপক্ষ হয়তো বা একই অস্ত্র আকস্মিকভাবে প্রয়োগ করতেন অথবা নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে পালটা আক্রমণ চালাতেন। এ কারণেই উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলের একটানা আক্রমণ সত্ত্বেও (৭১৭ খৃস্টাব্দে ইস্তাম্বুলের ওপর আর একটি আক্রমণ) বাইজান্টীয় সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পেরেছিল।[৪৩৯]

পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইসলামের নৌ-শক্তি দ্রুতগতিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে সমগ্র উত্তর আফ্রিকার সমুদ্র অঞ্চল ও স্পেনের ওপর সুদৃঢ় আধিপত্যের ফলে এবং সিসিলি, সাডিনিয়া ও দক্ষিণ ইতালী অধিকারের ফলে ইসলাম সর্বাঙ্গ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। ভূমধ্যসাগরের ওপর প্রভাবের তাৎপর্য খুব সুদূরপ্রসারী ছিল। এর ফলে যে কেবল পূর্ব ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই কেবল সম্ভব হল তাই নয়, নতুন পদ্ধতিতে (যেমন স্বর্ণ-দিনারের ব্যবহার ও ব্যাংকিং ইত্যাদি) সামুদ্রিক বাণিজ্য, নৌ যুদ্ধ ও নৌ-চলাচল ব্যবস্থা পরিচালনার নতুন নতুন পন্থা ও রীতি-নীতির পত্তন হল। মুসনলিম নৌ-শক্তির অবণতির সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টান শক্তিগুলো পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। ইবনে খালদুন সুস্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন, কি করে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর নৌ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও স্পেনের কোন কোন অঞ্চল মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে উসমানীয় তুর্কিগণ কর্তৃক পূর্ব ভূমধ্যাসাগরের এক বৃহৎ অঞ্চল ও আফ্রিকার উপকূলে প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের নৌ-শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে এ প্রভুত্ব বজায় ছিল।[৪৪০]

মুসলিম সামুদ্রিক আইন ও যুদ্ধ বিগ্রহ

অধিকাংশ আইনবিদই সমুদ্র সম্পর্কে প্রায় একরকম কিছুই বলেন নি। অল্প কয়েকজন সমুদ্রের আইন সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা থেকে যুদ্ধ ও শান্তিকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামুদ্রিক আইনের নিখুঁত ছবি দাঁড় করানো কঠিন। আল-কোরআনে সমুদ্র সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি আছে। একটিতে এই সাবধান বাণী

৪৩৯. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, iwmj (m) Gi miKvi KvVv‡gv: প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৮
৪৪০. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯-৮০

রয়েছেঃ "আল্লাহ ফেরাউনের সৈন্যদের সমুদ্রে নিমজ্জিত করে শাস্তি দিয়েছেন"।[৪৪১] আবার অন্য আর একটিতে দু'রকমের সমুদ্রের কথা আছে– স্বাদু ও মিঠে পানির সাগর আর নোনা এবং তেতো পানির সাগর। আল্লাহ বলেন, "উভয় প্রকারের সমুদ্র থেকেই বিশ্বাসীগণ মাছ ধরে খেতে পারবেন, মণি-মুক্তা সংগ্রহ করতে পারবেন ও বিভিন্ন প্রকার সুবিধা লাভের জন্য সমুদ্রে অভিযান চালাতে পারবেন"।[৪৪২] আল-কোরআনের যে সব নির্দেশের মধ্যে 'সমুদ্রকে অধীন করে দিয়েছেন' যাতে করে 'সেখানে জাহাজ চলাচল করতে পারে' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

اَللّٰہُ الَّذِیۡ سَخَّرَ لَکُمُ الۡبَحۡرَ لِتَجۡرِیَ الۡفُلۡکُ فِیۡہِ بِاَمۡرِہٖ وَ لِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِہٖ وَ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ ﴿ۚ۱۲﴾

অর্থ: "আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আদেশে উহাতে নৌযানসমূহ চলাচল করিতে পারে ও যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[৪৪৩]

আল-কোরআনে আরও আছে,

وَ ہُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ النُّجُوۡمَ لِتَہۡتَدُوۡا بِہَا فِیۡ ظُلُمٰتِ الۡبَرِّ وَ الۡبَحۡرِ ؕ قَدۡ فَصَّلۡنَا الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ ﴿۹۷﴾

অর্থ: "তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছে যেন তদ্দারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।"[৪৪৪]

খলিফা হযরত উমর (রা.) বিশ্বাসীদের নাকি সমুদ্র ভ্রমণ থেকে বিরত করেন। সেনাপতিদের তিনি এই নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন সামরিক অভিযান মরুভূমির দিকেই পরিচালিত করেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত উমর (রা.) হযরত মুয়াবিয়া কর্তৃক সাইপ্রাস দখলের প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন; আর অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হযরত উসমান (রা.) তা অনুমোদন করেন।

এ অবস্থায় আইনবিদগণ ইসলাম থেকে শান্তিকালে নৌ-চলাচল ব্যবস্থা কিংবা নৌ-যুদ্ধের আইন সম্বন্ধে প্রামাণ্য সূত্রে কোন নির্দেশ বের করতে পারেন নি। তাই তাঁদের স্থল-যুদ্ধের অনুরূপ অবস্থা থেকে বা অন্যান্য জাতির ব্যবহার-বিধি ও আচার-ব্যবহারের ওপরই এ ব্যাপারে নির্ভর করতে হয়েছে।[৪৪৫]

---

৪৪১. আল-কুরআন, ২ : ৪৭
৪৪২. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২
৪৪৩. আল-কুরআন, ৪৫ : ১২
৪৪৪. আল-কুরআন, ৬ : ৯৭

অষ্টম হিজরীতে মুতার অভিযানের উদ্দেশ্যে আয়লা নামক স্থানে মহানবী (সা.) মানুষ ও দ্রব্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য সামুদ্রিক অভিযানে বের হন, কারণ তথায় জনৈক মুসলিম দূত নিহত হয়েছিল। নবম হিজরীতে লোহিত সাগরের এক দ্বীপের বিরুদ্ধে এক বাহিনী প্রেরণ করেন, কেননা নিগ্রো জলদস্যুরা তথাকার মুসলিম অধিবাসীদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল। মুসলমান সেনাপতি ছিলেন আলকামা ইবনে মুজাযযিয। সেই বৎসরে আয়লার অধিবাসীগণের সঙ্গে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে নৌকা ও সমুদ্রিক বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী স্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত হয়। কুরআনে সামুদ্রিক অভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং এর বিপদাপদেরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই মহাগ্রন্থে কোনো অঞ্চলে বিদেশী জাহাজ দর্শনের প্রাক-ইসলামী অভ্যাসকে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তার উল্লেখ আছে, বা কুরআনে অন্যায় মনে করা হয়েছে। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা ইয়েমেন জয় করার জন্য নৌকা ব্যবহার করেছিল, যার ফলে মক্কার বিরুদ্ধে শাসনকর্তা আব্রাহার বিফল অভিযান চালাবার পথ প্রশস্ত হয়েছিল, শুধু তাই নয়, মহানবী (সা.) এর মক্কার সাহাবীরা আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিতে নৌকা ব্যবহার করেছিলেন। এমন কি মক্কাবাসী সুহায়েল ইবনে আমরের বক্তৃতার উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে তিনি মহানবী (সা.)এর মৃত্যুর পর তাঁর নাগরিকবৃন্দকে স্বধর্ম বর্জন করে ধর্মান্তর গ্রহণে বাঁধা দিয়েছিলেন এবং বক্তৃতাকালে বলেন, 'আমার উটের কাফেলা বাহিনীই কেবল নয়, সামুদ্রিক জাহাজও সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক আছে।'[৪৪৬]

রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় এইরূপ শান্তি ও যুদ্ধকালে নৌ-বাহিনীর ব্যবহারের ফলে উষ্ট্রচালকও অচিরে সুদক্ষ নাবিকে পরিণত হয়েছিল। আবু বকরের (রা.) খিলাফতকালে ইরাক অভিযানে নৌ-বাহিনী ব্যবহৃত হয়েছিল। উমর উবনে আ. আজিজ (রা.)-এর খিলাফতকালে ওমানের শাসনকর্তা করাচী, বোম্বাই, বারুস-এর (Bharoach) বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এবং ইনিই কায়রো থেকে লোহিত সাগর পার্যন্ত একটি খাল খনন করান মদিনার বন্দর জার-এ খাদ্য দ্রব্য পাঠাবার জন্য। আমীরুল মুমেনিনের নামে এই খাল নীল নদের ভিতর দিয়ে লোহিত সাগরে ও ভূ-মধ্যসাগরকে সংযুক্ত করেছিল তা আধুনিক কালের সুয়েজ খালের কাজ করত। খলিফা উসমান (রা.)-এর সময়ে নৌ-অভিযানসমূহ এবং অনেক দ্বীপ ও

৪৪৫. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১
৪৪৬. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮

বন্দরের বিজয় বৃহদাকারে ঘটেছিল এবং তাঁর বাহিনী স্পেনে প্রবেশ করে তথায় অবস্থান করার জন্য সাগর পাড়ি দিয়েছিল।[৪৪৭]

সেকালের নৌ-যুদ্ধের বিবরণ পাঠে, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থল-যুদ্ধ ও জল-যুদ্ধের আইন-কানুনের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। খলিফা মুআবিয়ার রাজত্বকালে তথাকথিত 'গ্রীক অগ্নি' মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল; প্রতিশোধ স্বরূপ শত্রুদের নৌ-বাহিনী ধ্বংস করার জন্য। যেহেতু মুসলমান ফকিহগণ নৌকা বা জাহাজকে স্থলের উপর দুর্গের মতোই মনে করতেন, তাই নৌ-অবরোধ ও ব্লোকেড সংক্রান্ত কোনো বিশেষ আইনের কথা তাঁরা উল্লেখ করেন নাই। একইভাবে সামুদ্রিক অভিযানে প্রাপ্ত গণিমত ও স্থল অভিযানে প্রাপ্ত গণিমত বন্টনের ব্যাপারে একই আইন প্রযোজ্য। শত্রুদের নিকট থেকে প্রাপ্ত নৌকা দখলকারী সৈন্যের ভিতর বন্টন করা হত কিংবা সরকার দখল করত, অন্যান্য জমি ও স্থাবর সম্পত্তির মতো, তা আমরা সঠিক বলতে পারি না। এমন কি প্রথম উমরের খিলাফতকালেও বাইযানটাইনরা মুসলমান রাজ্যভুক্ত মিসর ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান চালাত। এইসব হামলা এবং প্রত্যুত্তরে মুসলমানদের পাল্টা হামলা রীতিমতো সামুদ্রিক যুদ্ধে পর্যবসিত হত এবং প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষকে জলদস্যুতার অপরাধে অভিযুক্ত করত। প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্যাপিরাস রেকর্ড-পত্রে মুসলিম বন্দরগুলিতে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক ঘাঁটিগুলির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, শুধু তাই নয়, বরং জাহাজ নির্মাণ বাহিনী ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিবরণ মিলে। যদি আমরা একদিকে ভেবে দেখি যে, গোটা ভূমধ্যসাগর মুসলিম হ্রদে পরিণত হয়েছিল, যেখানে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং অপর দিকে দেখি যে, আরবি ভাষাতে বিবিধ প্রকার নৌকা ও জাহাজের জন্য তিন শতাধিক শব্দ প্রচলিত আছে এবং সেই সঙ্গে যদি বিবেচনা করি যে, আরবী শব্দসমূহ থেকে এ্যাডমিরাল (Admiral) আর্সেনাল (Arsenal) প্রভৃতি শব্দ ইউরোপীয় ভাষায় নেয়া হয়েছে, তাহলে আমরা যথেষ্ট উপকরণ পাই, যার ভিত্তিতে আমরা সমুদ্রে মুসলমানদের প্রভুত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। সুরা রূম-এর যে আয়াত

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٤١)

---

৪৪৭. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৫

অর্থ : "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে; যাহার ফলে উহাদেরকে উহাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি দিতে আস্বাদন করান, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসেন।"[৪৪৮]

কুরআন মাজিদে আছে (বাইযানটাইনদের সম্পর্কে) তাতে বলা হয়েছে, 'স্থলে-জলে উভয় স্থানে ফিতনা (অশান্তি) ছেয়ে গেছে মানুষের কর্ম ফলের দরুণ"– ইহাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূল (সা.)-এর জীবনকালেই আরবের চারদিকে সামুদ্রিক এলাকাসমূহে জলদস্যুতা ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীনকালে উত্তর আফ্রিকার মুসলমানরা সামুদ্রিক বীমা প্রবর্তন করেছিল, যার জন্য জীবনের অন্য এক দিকেও তাদের অবদানের কথা প্রমাণিত হয়।

৮.৪: নৌ-যুদ্ধের আইন-কানুন

হাদিসে আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'যাঁরা নৌ-যুদ্ধে শহীদ হন, তাঁরা স্থল-যুদ্ধের শহীদদের চাইতে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন'। সমুদ্র সম্বন্ধে যে চিরাচরিত ভীতি ছিল, এই পুরস্কার ঘোষণার মধ্যেই সমুদ্র-যুদ্ধে উৎসাহ দেবার প্রয়োজনীয়তা পরোক্ষভাবে সুপরিস্ফুট হয়েছে। শায়বানিও বলেছেন, কোন মুসলমান সমুদ্র অভিযানে শরিক হলে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবেন। জেহাদী জাহাজে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তিনি নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যান।[৪৪৯]

স্থলযুদ্ধে দূর্গ সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে, নৌ-যুদ্ধে সে আইনই জাহাজের ওপরও প্রযোজ্য হবে। আইনবিদগণ তুলনামূলক বিচার করে ঐক্যবদ্ধভাবে এ নীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। জেহাদীরা যেমন অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করে এবং বাইরের সাহায্য থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট করে দুর্গ অবরোধ ও আক্রমণ করতে পারেন, তেমনি সামুদ্রিক জেহাদীরা শত্রুপক্ষের জাহাজের লোকদের বশে এনে বশ্যতা স্বীকার না করানো পর্যন্ত আগুন ধরিয়ে বা ডুবিয়ে দিয়ে শত্রু-জাহাজকে আক্রমণ করতে পারেন ও তার ধ্বংসসাধন করতে পারেন। এ আইনের ওপর ভিত্তি করেই নৌ-জেহাদীগণ শত্রুপক্ষের মনোবল বিনষ্ট করে ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি করে জাহাজের ওপর সরাসরি আক্রমণ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। জাহাজের ওপর মুসলমান নৌ-সেনারা যে কেবল পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতেন তাই নয়, তাঁরা সাপ, বিচ্ছু ও ক্ষতিকর চূর্ণও ছুঁড়ে মারতেন। শত্রুপক্ষকে বিতাড়িত করার জন্য এবং জাহাজের লোকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও ভীতি সঞ্চারের জন্য তাঁরা এ পন্থা অবলম্বণ করতেন।

৪৪৮. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১
৪৪৯. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

স্থল-যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে শত্রু-দুর্গের চারদিকে শত্রুগণ কর্তৃক বন্দী মুসলিম নারী ও শিশুদের দিয়ে ঘিরে দিলেও যেমন সে দুর্গ আক্রমণ করা যেত, তেমনি জাহাজের চারদিক মুসলিম বন্দী দ্বারা ঘিরে রাখলেও তা হামলা থেকে রেহাই পাবে না। সাধারণ আইনবিদদের মতের বিরুদ্ধে আউযায়ী অবশ্য এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মুসলিম বন্দীদের দ্বারা দুর্গ ঘিরে রাখলে সে দুর্গ আক্রমণ করা চলবে না। তেমনি শত্রু-জাহাজও যদি মুসলমানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত করে দেয়া হয়, তবে সে জাহাজ আগুন ধরিয়ে বা অন্যান্য উপায়ে ধ্বংস করা চলবে না।

নৌ-যুদ্ধের সময় যদি মুসলমানদের কোন জাহাজ ঘায়েল হয়, তবে জেহাদী হয় জাহাজেই অবস্থান করবেন, নয় এক সঙ্গে ডুবে যাবেন অথবা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। যদি তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, তবে তাঁর শত্রুর হাতে পড়ার সম্ভবান খুব কম থাকে। তবু শত্রুর হাতে তিনি মারা পড়বেন না, এ কথা জোর করে বলা যায় না।[৪৫০]

নৌ-যুদ্ধের পর মুসলিম যুদ্ধ জাহাজ বন্দী ও ধন-সম্পদ লাভ করতে পারে। আইনবিদদের মতে, স্থল-যুদ্ধে অর্জিত ধন-সম্পদ যেভাবে বন্টন করা হয়, নৌ-যুদ্ধেও সেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যদি মুসলিম নৌ-সেনারা দেখেন যে, অর্জিত ধন-সম্পদ ওজনে এত ভারী যে জাহাজ ডুবে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে, তখন তাঁরা যে কেবল ধন-সম্পদই সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারেন তা নয়, নারী ও শিশু সমেত সব যুদ্ধবন্দীকে তাঁরা ফেলে দিতে পারেন। কিন্তু জাহাজে যদি মুসলিম নারী ও শিশু থাকে তবে তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করা চলবে না। কারণ, তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করা অবৈধ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এ দুরবস্থার কথা চিন্তা করেই সুয়ুতী প্রমুখ আইনবিদগণ বলেছেন যে, যুদ্ধ জাহাজে নারী ও শিশুদের নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। মুসলমানদের জাহাজে যদি যিম্মি বা আমানের (নিরাপত্তা) ভিত্তিতে আনীত অমুসলিম থাকেন, তবে তাদেরও সমুদ্রে নিক্ষেপ করা চলবে না। কারণ মুসলমানদের তাদের দেয়া ওয়াদা পালন করতেই হবে।

যদি শত্রু পক্ষের জাহাজ সমুদ্রযাত্রার পক্ষে অকেজো হয়ে পড়ে ও জাহাজীগণ আমান না নিয়েই দারুল ইসলামের উপকূলে এসে হাজির হন, তবে তাদের নিপীড়িত করা চলবে না। আউযায়ী বলেছেন যে, শত্রুপক্ষ যদি আমান প্রার্থী হয়, তবে তাদের তা প্রদান করতে হবে। তবে তারা যদি আমান না চান, তবে তাদের আক্রমণ করা যেতে পারে। যদি কোন শত্রু জাহাজ দারুল ইসলামের সমুদ্র উপকূলে এসে পড়ে এবং জাহাজের ব্যবসায়ীদের কোন আমান না থাকে, তবে তাদের শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া সম্পদ

৪৫০. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

ফাই[৪৫১] (Fay) হিসেবে মনে করতে হবে। কিন্তু তারা যদি কূটনৈতিক কার্যোপলক্ষে এসেছে বলে দাবী করে, তবে তাদের কূটনৈতিক নিরাপত্তা (Immunity) দান করতে হবে এবং ইমামের কাছে যেতে অনুমতি দিতে হবে। ইমাম যদি দেখেন যে, তাদের কাছে পরিচয়-প্রত্র নেই, তবে তাদের কয়েদীরা, দাসে পরিণত করা কিংবা হত্যা করা যেতে পারে। তাদের ধন-সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা চলবে।[৪৫২]

নৌ-বাহিনী সংগঠন

মুসলিম নৌ-বাহিনী যতই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে, এর দক্ষতা এবং সংগঠন-শক্তি ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সমুদ্রে এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতারূপে যখন মুসলিম নৌ-শক্তি সর্বাধিক শক্তিশালী হয়, তখন মুসলিম রণপোত ও বাণিজ্য বহর পরিচালনা-নৈপুণ্য, সামুদ্রিক জ্ঞান ও নৌ-কলাকৌশলের দিক থেকে সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করে এবং তদানীন্তন যুগের অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে; পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌ-বাহিনী ও নৌ-সংগঠন সম্পর্কে বিস্তর তথ্য পাওয়া গেছে। অন্যান্য মুসলিম এলাকার ব্যাপারেও বোধহয় এ তথ্যগুলো প্রযোজ্য। লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে চালু জাহাজের চাইতে ভূমধ্যসাগরের জাহাজগুলো ছিল আকারে অনেক বড় ও উন্নতমানের। জাহাজ তৈরীর জন্য মুসলমানেরা উৎকৃষ্ট কাঠ আমদানী করতেন এবং সুদক্ষ পরিচালনা ও দ্রুত গমনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংযোজিত করতেন। বিশাল সমুদ্রে চলাচলের সময় জাহাজের ফাটল ও ছিদ্র সহজেই মেরামত করে নেয়া চলত। চলমান জাহাজের চারদিকে কয়েকজন জাহাজীকে সাঁতার দেবার শিক্ষা দেয়া হত। এরা মোম ও সহজলভ্য অন্যান্য জিনিস দিয়ে জাহাজের ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিতেন।[৪৫৩]

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মত নৌ-বাহিনীর এডমিরাল বা 'আমীরুল বাহরকে' পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হত। স্বয়ং খলিফার অনেক ক্ষমতারও তিনি অংশীদার ছিলেন। স্থলে যেমন খলিফা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন, তেমনি 'আমীরুল বাহরের' কাজ হল সমুদ্র-পথে শাসন চালান। নৌ-জেহাদীদের পরিচালনা এবং অস্ত্রাদির তত্ত্বাবধানের জন্য একজন কায়েদ বা ক্যাপ্টেন নিয়োজিত হতে এবং পাল ও দাড় পরিচালনার জন্য একজন সরদার বা 'রইস' থাকতেন। যদি আমিরুল-বাহর নৌ-অভিযান পরিচালনা নিজহস্তে গ্রহণ না করতেন, তবে কোন নিম্নপদস্থ আমীরের হাতে এ কাজের ভার দেয়া হত। গ্রীকগণ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করার ফলে মুসলমানদের সমূহ ক্ষতি সাধিত হবার পর মুসলমানরা

৪৫১. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩
৪৫২. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫-১৭৬
৪৫৩. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

নিজেদের যুদ্ধ-জাহাজে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলন করেন। এসব জাহাজকে হারাক্কাস বা আগ্নেয় জাহাজ বলা হত। এগুলো থেকে শত্রু জাহাজে দাহ্য বস্তু নিক্ষেপ করা হত।

মুসলমানেরা কম্পাস ব্যবহার করতেন। তবে বোধহয় পরবর্তী যুগে এর প্রচলন হয়। প্রথম যুগের মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন-বিশারদগণ এর কোন উল্লেখই করেন নি। প্রাথমিক ইউরোপীয় কম্পাসের মত এ কম্পাস-পঞ্জীতে বত্রিশটি বিন্দু ছিল। কিন্তু এটুকু ছাড়া এ দুটোর মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য নেই। মুসলমানেরা চারটি প্রধান বিন্দুর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা এ বিন্দুগুলোকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করেন নি। বিভিন্ন তারকার নামের সঙ্গে মিলিয়ে এঁরা বিন্দুগুলোর নামকরণ করেছেন। প্রধান চারটি বিন্দুকে তাঁরা 'আল-জিহাত আল-আ'রবা' বা চারদিক বলে অভিহিত করেছেন। এগুলো হলো ঃ 'ইয়া' বা উত্তর (ধ্রুবতারারও ওই একই নাম); 'মাতলা' বা পূর্ব; 'মাগরিব' বা পশ্চিম। 'মাতলা' ও 'মাগরিব' সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত থেকে গৃহীত হয়েছে। 'কুতুব' বলতে দক্ষিণ বোঝায়, মেরুর ওই একই নাম। কম্পাসের বিন্দুগলো পশ্চিম দিকে উত্তর থেকে দক্ষিণে চিহ্নিত করা হয়। যে তারকা যে দিকে অস্ত যায়, সেই অনুসারেই হয় এক একটি বিন্দুর নামকরণ। পূর্বের দিকেও পর পর একই নামকরণ করে শুধু 'মাতলা' কথাটি জুড়ে দেয়া হয়।[৪৫৪]

আকাশ যুদ্ধ

আব্বাস বিন ফিরনিস (মৃত্যুঃ ২৭৫ হিঃ/৮৮৮ খ্রীঃ) একটি মানুষ দ্বারা চালিত,উড়োজাহাজ নির্মাণ করেছিলেন[৪৫৫] এবং কিরূপে তিনি সাফল্যের সঙ্গে উড়বার পর মাটিতে অবতরণকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর এই গবেষণা বন্ধ হয়ে যায় এবং আকাশে প্রভাব বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব হয় নাই। তথাপি এতেও কোনো সংশয় নাই যে, যদি এইরূপ প্রচেষ্টায় বেশী লোক রত থাকত এবং প্রয়োজনীয় পাইলট শিক্ষিত হত, তাহলে যুদ্ধকালে এদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেত, যেমন এক হাজার বৎসর পর ইউরোপীয় খৃষ্টানেরা করেছে। স্বাভাবিকভাবে আকাশযুদ্ধ সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রাচীন সাহিত্য নাই। যাহোক, সাধারণভাবে যে মূলনীতির উল্লেখ করা হয়েছে তা এই যে, মুসলমানরা চুক্তি ও সন্ধি দ্বারা আবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ সে অনুযায়ী কাজ করে। আকাশযুদ্ধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন-কানুন বা আচরণবিধি যদিও সাময়িক, তথাপি ঐগুলো মুসলিম আইনেরই অংশবিশেষ

৪৫৪. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত,৮৩-৮৪
৪৫৫. আল-মাককারী তাঁর 'নাফে' আতত্বিব পুস্ড়কে (২য় খ^, পৃ.২৫৪)

বলা যেতে পারে, কেননা এ যাবত স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ঐ সব আইন অনুসরণ করে চলেছে। এসব আচার-আচরণের জন্য ওপেনহেইম (Oppenheim) বা অন্য কোন লেখকের বই পাঠ করা যেতে পারে, যাতে আধুনিক এই সব আইন সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির সুবিধা হয়।[৪৫৬]

ইসলাম-পূর্ব আরবে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধোঁকা-প্রতারণা চরম আকার ধারণ করেছিল। তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এক গোত্র অপর গোত্রের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিত। আর একবার লড়াই শুরু হলে শত শত বছরেও যে আগুন ভিত না। পবিত্র মদীনার দুটি শক্তিশালী গোত্র ছিল আওস ও খাযরাজ। দীর্গদিন যাবত তাদের পরস্পরে শত্রুতা ও কলহ চলছিল, যা কোনক্রমেই শেষ হচ্ছিল না। এক গোত্র অপর গোত্রের রক্তের পিপাসা ও ইয্যতের ক্ষুধায় অনুক্ষণ তড়পাত। এমনই পরিস্থিতিতে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাওহীদ ও মা'রিফাত এবং এক্য ও ভ্রাতৃত্বের বিশ্বজনীন পয়গাম নিয়ে আবির্ভূত হন।[৪৫৭] পরিশেষে বলা যায় যে, মহানবী (সা.)-তাঁর আদর্শ দিয়ে বিশ্ব জয় করেছেন।

৮.৫: যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ

এই বিষয়টি দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা– শত্রু কর্তৃক বন্দী মুসলিম সেনাবাহিনী কিংবা অন্যান্য প্রজাগণ এবং মুসলমানদের হাতে অমুসলিম রাষ্ট্রের বন্দী প্রজা ও সৈনিকগণ।

শত্রুদের হাতে মুসলমান বন্দিগণ

যে সব মুসলিম যোদ্ধা শত্রুর হস্তে বন্দী হয়ে দারুল হারবে নীত হন এবং দারুল হারব কর্তৃপক্ষ বাধ্যবাধকতা ভিত্তিক (যেমন পলায়ন না করা কিংবা পুনরায় দারুল হারবে ফিরে আসার ওয়াদা) প্রতিশ্রুতি নিয়ে (On parole) তাদের মুক্ত করেন, তবে তাদের সে প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করতে হবে। যদি কোন মুসলমান যুদ্ধবন্দীকে ক্ষতিপূরণের (Ransom) টাকা আনবার জন্য দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হয়, তবে তিনি অবশ্যই তার প্রতিজ্ঞা পালন করবেন এবং টাকা সংগ্রহ না করতে পারলেও শত্রুর নিকট ফিরে যাবেন। কোন কোন আইনবিদ বিশেষ করে শাফেয়ীগণ বলেন যে, এ অবস্থায় ওয়াদাবদ্ধ হলেও মুসলমান বন্দীগণ ওয়াদা রক্ষা করার জন্য দারুল হারবে ফিরে যেতে বাধ্য থাকবেন না।

---

৪৫৬. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত,পৃ.৬০-৬১
৪৫৭. মাহমুদুল হাসান (র.) ও শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), Zvdmx‡i Dmgvbx, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৫৭

আর যদি বন্দীগণ কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে থাকেন, তবে তারা যে শুধু স্বাচ্ছন্দে পলায়ন করতে পারেন তাই নয়, দারুল ইসলামে ফিরে যাবার পথে তারা শত্রুপক্ষের ধন-সম্পদ বিধ্বস্ত করতে এবং শত্রুপক্ষের লোকদের হত্যা করতে পারেন।

দারুল হারবে অবস্থানকালে মুসলিম বন্দীগণ যে শুধু মুসলিম আইন পালন করতেই বাধ্য থাকবেন তা নয়, দারুল হারবের আইন যদি মুসলিম আইনের বিরোধী না হয়, তবে সে আইনও তারা পালন করবেন। তবে প্রতিকূল পরিবেশে তারা যদি মুসলিম আইন পালন করতে না পারেন, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। তারা যদি গানিমার অংশ লাভ করার প্রতিশ্রুতিও পান, তবু কোনক্রমেই তারা শত্রুপক্ষের সৈনিকদের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধে যোগদান করতে পারবেন না। ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর কোন তথ্যাদিও তারা শত্রুদের নিকট সরবরাহ করতে পারবেন না। মুসলিম আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ এমন কাজ করতে যদি বন্দীকে বাধ্য করা হয় (যেমন ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা), তবে এজন্য তাকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। মহিলা বন্দীকে যদি শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই প্রথমদিকে তা সহ্য করার চেষ্টা করতে হবে; কিন্তু পরে তিনি যদি মৃত্যুর আংশকা করেন, তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে শত্রুদের দাবীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারেন।[৪৫৮]

কোন মুসলমান বন্দী তার মর্যাদা ও প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্ততার সংগে রক্ষা করবে।

মুসলিম প্রজাদের বেলায় মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে জনসাধারণের কোষাগার (বায়তুলমাল) থেকে অর্থ দান করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা। কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের আয়ের কিয়দংশ ব্যয় করা হয় কিছু মস্তক রক্ষা করার জন্য ৯ : ৬০ অর্থাৎ বন্দী ও দাসগণকে মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এই মর্মে বুখারি ও মুসলিমের হাদিসে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ 'বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা করো'। খলিফা উমর হুকুম দিলেন ঃ অমুসলমানদের হাতে প্রত্যেক বন্দী মুসলমানকে মুসলিম বায়তুল মাল হতে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করতে হবে।পরবর্তী কালে আল মাসুদী ও আল মাকরিযি অনুসারে অর্ধ ডজনেরও অধিক মুসলমান বন্দী তাদের শত্রুর কবল হতে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। বিদেশী ঐতাহিসকগণও এর উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফিনলে (Finlay) বলেন ঃ '৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চতম কনষ্টানটাইনের রাজত্বকাল থেকে মুসলমানদের সঙ্গে বন্দী রীতি-মতো বিনিময় শুরু হয়ে গিয়েছিল। ৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বন্দী বিনিময়ের

---

৪৫৮. মজিদ কাদ্‌দুরী, অনু. অধ্যাপক হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫

চুক্তিতে একটি নতুন শর্ত যোগ করা হয়েছিল যার ফলে চুক্তিতে যোগদানকারী দুই পক্ষকে প্রতি ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট অর্থদানের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় স্বীকৃত হতে হয়েছিল।

মুসলমানদের হাতে শত্রু বন্দিগণ

বন্দী করা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে দুইটি আয়াত আছে ঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ٭ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَ اِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ۫ۚ ذٰلِكَ ؕۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ (۴)

অর্থ: "অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদেরকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। ইহাই বিধান। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে উহাদেরকে শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে। যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদের কর্ম বিনষ্ট হইতে দেন না।"[৪৫৯]

مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ

অর্থ: "দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়।"[460]

এই দুই আয়াতে (اَثْخَنَ) ক্রিয়াটি দেখা যায়, যার অর্থ পর্যুদস্ত করা, প্রভাব বিস্তার করা, বশীভূত করা। শেষ আয়াতটির তাফসীর করেছেন এভাবেঃ

حَتّٰى يَشْخَنَ فِى الْاَرْضِ اَىْ يَغْلِبُ ۔ حَتّٰ ، اِذَا اَخَذَ الْفِدَاءِ وَ سِرَحَهُمْ بَعْدَ مَا غَلِبَ فِى الْاَرْضِ لِيَكُوْنَ رَحُوْعِيْمُ اِلٰى غَيْرِ مَنْفَعَةٍ وَ سَرَكَةٍ (مَخْلُوْطَةُ لا له لِىْ فِىْ اِسْتَانْبُوْلَ)

অর্থ:"যখন দেশে তিনি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন বা তিনি এর উপর প্রভাব বিস্তার করেন তখন দেশটির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর যখন মুক্তিপণ আদায় করে তাদেরকে মুক্ত করে দেন তখন তারা

[৪৫৯]আল-কুরআন, ৪৭ : ৪

[৪৬০]আল-কুরআন, ৮ : ৬৭

এমন এক স্থানে যায় যেখানে তাদের কোনো লাভ হয় না এবং তাদের কোনো সংগী সহচরও থাকে না।"[৪৬১]

মুসলিম আইন অনুসারে কোনো বন্দীকে হত্যা করা চলবে না। ইবনে রুশদ এ বিষয়ে রাসূল (সা.) সাহাবীগণের মতৈক্যের উল্লেখ করেছেন। ইহা দ্বারা একথা বলা হচ্ছে না যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত অধিকারের বাইরে কোনো অপরাধের জন্য বন্দীকে শাস্তি দেওয়া চলবে না। এর প্রমাণ স্বরূপ মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় তাঁরই আদেশে বদর যুদ্ধে ধৃত দুজন বন্দীর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল আমরা জানি। মুসলমান ফকিহ্গণ স্বীকার করেন যে, বন্দীকে যুদ্ধ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দায়ী করা চলবে না ঃ

وَ كَذَالِكَ آهْلُ الْحَرْبِ لَا يَضْمَنُوْنَ بِالْاِجْ ع مَا اُتْلُقُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْاَمْوَالِ وَالنُّفُوْسِ وَاِنْ اَسْلَمُوْا اَوْ صَارُوْا رمَةٌ لَنَا وَيْلَهُمْ وَتَدْرِيْنَهُمْ وَمَنَعْتُهُمْ وَكَانُوْا كَالْمُسْلِمِيْنَ وَ كَذَالِكَ اَخْذُ الْمَال ـ

অর্থাৎ– অনুরূপভাবে মুসলমানদের জীবন ও ধনসম্পত্তির ক্ষতির জন্য যোদ্ধাদেরকে দায়ী করা হবে না বলেও মতৈক্য পাওয়া যায়। ইহা সত্য হবে যদি তারা ইসলাম কবুল করে কিংবা মুসলমান প্রজাগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ তারা ইহা করত বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের তাকিদে এবং যেকালে তাদেরকে এর জন্য বিধান দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এই দিক থেকে তাদের অবস্থা মুসলমানদের অবস্থার অনুরূপ। সম্পত্তি দখল সম্পর্কেও ঐ একই নীতি সত্য।

বন্দীকালে ব্যবহার সম্বন্ধে উদারতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) আদেশ দিয়েছিলেন ঃ বন্দীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের সুপারিশ সম্পর্কে সতর্ক হও। ফলে অনেক মুসলমান সৈনিক খেজুর আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হতেন এবং তাঁদের অধীনস্থ বন্দীদের রুটি আহার করাতেন। আবু ইউসুফ বলেছেন বন্দীদের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সুখাদ্য দিতে হবে এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের আহারের বিনিময়ে মূল্য লওয়া চলবে না এবং সে মূল্য বন্দীকারী মুসলমানদের রাষ্ট্র বহন করবে। কুরআনে নির্দেশ আছে– "শোন, ধার্মিকগণ জান্নাতে যাবে, কারণ তারা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট ব্যাপক এবং যারা অভাবগ্রস্থ দুঃস্থকে অনাথ বা এতিমকে এবং বন্দীকে আল্লাহর ভালোবাসার দরুণ আহার করায় বলে আমরা আল্লাহর

[৪৬১]তুলনীয় তাবারীর ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৮৫৫ এবং একই লেখকের লেখা তাফসীর। আলমাতুরিদী (মৃত্যুঃ ৩৩৩ খৃ.) কৃত (تَاوِيْلَاتِ الْقُرْانِ)গ্রন্থটিও দ্রষ্টব্য।

মহব্বতে তোমাদেরকে আহার করাই এবং তোমদের নিকট থেকে কোন পুরস্কার বা ধন্যবাদ আমরা কামনা করি না।"[৪৬২] বন্দীগণকে উত্তাপ ও শৈত্য ইত্যাদি থেকে রক্ষা করতে হবে। মহানবী (সা.) এর দৃষ্টান্ত ানুসারে তাদের বস্ত্র না থাকলে তাদেরকে বস্ত্র দান করা হত যদি তারা কোন অসুবিধা বা কষ্ট ভোগ করে, যথাসম্ভব তা দূরভিূত করতে হবে, যেমন মহানবী (সা.) অভ্যাস ছিল। নিজ গৃহে সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করার জন্য তার উইল করার অধিকার আছে। এই সব কথা যথারীতি শত্রু কর্তৃপক্ষকে অবগত করানো হবে। বন্দীদের মধ্যে কোনো মাতাকে তার সন্তান থেকে পৃথক করা চলবে না। অথবা কোনো আত্মীয়কে অন্য আত্মীয় থেকেও পৃথক করা চলবে না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্দীদের মান মর্যাদা রক্ষা করতে হবে রাসূল (সা.) এর এক হাদীসও আছে "কোনো জাতির সম্মানিত ব্যক্তিকে, যদি সে অপমানিত হয়েও থাকে, সম্মান করো। প্রাচীন ইসলামের ইতিহাসে বন্দীদের নিকট জবরদস্তি কাজ নেওয়া হয়েছে, এমন কোনো নযীর নাই। যদিও তারা পলায়নের চেষ্টা করত, কিংবা নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করবার চেষ্টা করত, তাহলে তাদেরকে দণ্ড দেওয়া হত। যদি তারা পালিয়ে নিরাপত্তা ভোগ করতে পারত এবং পুনরায় ধৃত হত, সেক্ষেত্রে প্রথমবার পলায়নের অপরাধে তাদের শাস্তি দেওয়া হত না। তবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে স্বতন্ত্র কথা।

মুসলিম আইন অনুযায়ী সেনাপতির উপর ভার দেওয়া হয় বন্দীদের সম্বন্ধে তিনি কি সিদ্ধান্ত করবেন

(ক) শিরশ্ছেদ করবেন

(খ) দাসে পরিণত করবেন

(গ) মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দান করবেন,

(ঘ) মুসলিম বন্দীদের সাথে বিনিময় করবেন, অথবা

(ঙ) বিনা অর্থে মুক্তি দেবেন। তিনি উল্লেখিত ৫টি সিদ্ধান্তের[৪৬৩] যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবেন। আমরা পৃথকভাবে তা আলোচনা করব ঃ

(ক) বন্দীদের শিরশ্ছেদকরণ

আমরা দেখেছি, বন্দীরা আত্মসমর্পণের শর্ত অনুসারে ব্যবহার পেয়ে থাকে। বিনাশর্তে সমর্পণের ক্ষেত্রে পূর্বেকার যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যকলাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। নিঃসন্দেহে অন্য অপরাধের দরুণ মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। আবু ইউসুফের মতানুসারে কেবল ইসলামের খাতিরে কোনো বন্দীর শিরশ্ছেদ করা যেতে পারে, যদিও তিনি অনেক বিশারদের অভিমত উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, সেই শিরশ্ছেদ করণকে

৪৬২. আল-কুরআন, ৭৬ : ৫-৯

৪৬৩. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৮

তাঁরা অপছন্দ (মাকরুহ) মনে করতেন। সারাখশীর মতানুসারে এমনকি প্রধান সেনাপাতিও তা করতে পারতেন না; একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানই নির্দিষ্ট বন্দীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন। আমরা দেখেছি যে, সাহাবীদের মধ্যে একমত ছিল যে, বন্দীদের শিরশ্ছেদ করা হবে না। সংক্ষেপে বলা যায় যে, যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদিত হতে পারে অতিরিক্ত প্রয়োজনের তাকিদে এবং রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণে।[৪৬৪]

(খ) দাসত্বে পরিণত করা

কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যাতে দাসত্বের আদেশ সোজাসুজি পাওয়া যায়, তথাপি কিছু পরোক্ষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّاۤ اَحۡلَلۡنَا لَـكَ اَزۡوَاجَكَ الّٰتِىۡۤ اٰتَيۡتَ اُجُوۡرَهُنَّ وَمَا مَلَـكَتۡ يَمِيۡنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ

অর্থ: “হে নবি শুনুন! আপনার জন্য ঐ সব স্ত্রীলোককে হালাল করেছি যাদের মহরানা আপনি দান করেছেন এবং ঐ সব স্ত্রীলোকও যাদের উপর আপনার দক্ষিণ হস্তের অধিকার বর্তেছে ঃ তারা ঐসব স্ত্রীলোক; যাদেরকে আল্লাহ আপনাকে গণিমাতস্বরূপ দান করেছেন।”[৪৬৫]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনে, অল্প হইলেও এরূপ দাসত্বে পরিনত করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বনু কায়নুকা নামক ইহুদী গোত্রের স্ত্রীলোক ও পরিবারবর্গকে তাদেরই নির্ধারিত বা মনোনীত সালিসের রায় অনুসারে গনিমাতের মতো দাসে পরিণত করে সকলের মধ্যে ভাগ কর দেওয়া হয়েছিল। এই সালিসের রায় ইহুদীদের আইন অনুসারে হয়েছিল। অষ্টম হিজরীতে হওয়াযিন নামক আরব গোত্রের বন্দীদেরকে সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর তাদের আবেদনের ফলে মুক্তি দেওয়া হয়। এই মুক্তি তারা অধিকার হিসাবে পায় নাই। কিন্তু মুসলমান সৈনিকগণ মহানবী (সা.) এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। আর যারা আযাদী দিতে চায় নাই তাদেরকে বায়তুলমাল থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত। ইহার কিছু পূর্বে বনু মুসতালিক নামক আরব গোত্রটি মুসলিম বাহিনীর নিকট তাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময়ে মহানবী (সা.) বন্দীদের ভিতর থেকে এক বালিকাকে বিবাহ করেছিল– তাকে মুক্তি দেওয়ার পর, এই বালিকাটি ছিল গোত্রের সর্দারের কন্যা এবং মুসলিম বাহিনী সমস্ত

৪৬৪. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭
৪৬৫. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫০

দাসদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। বনু আমবার গোত্রের বন্দীগণকে বিনা মুক্তিপণে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করা হয়েছিল।

মহানবী (সা.) এর নীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল যখন তিনি আদেশ জারী করলেন ঃ আরবদের কাউকে দাসে পরিণত করা যাবে না। খলিফা উমর (রা.) ফরমান জারী করলেন যে, যুদ্ধরত এলাকার কৃষক, শিল্পী, কারিগর ও অন্যান্য ব্যবসায়ীকে দাসে পরিণত করা উচিত হবে না। কুরআনে দাসমুক্তির জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এবং বিধান দেওয়া হয়েছে যে, দাস মুক্তির জন্য মুসলমান রাষ্ট্রের কিছু অর্থ ব্যয় করা হবে। খলিফা উমর (রা.) বলেছেন যে, যদি কোনো মুসলিম ক্রীতদাসের কাজ করে তার প্রভুকে মুক্তির বিনিময়ে অর্থ দান করে তাহলে তার প্রভু তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।[৪৬৬]

এইরূপ ইহা মন্তব্য করা যেতে পারে যে, যদিও ইসলাম দাসত্বকে হ্রাস করার চেষ্টা করেছে তথাপি ইহাকে নির্মূল করার চেষ্টা করে নাই। অবশ্য সর্বদা যুদ্ধবন্দিগণকে দাসে পরিণত করতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তবু ইহা অনস্বীকার্য যে, প্রধান সেনাপতিই স্থির করেন ঃ বন্দিগণকে দাসে পরিণত করবেন না অন্য কোনো ব্যবহার তাদের প্রতি করবেন। তবে একটি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না' ইসলামে দাসত্ব এবং অন্য সভ্যতায় যে দাসত্ব থাকে, তা এক জিনিস নয়। কারণ একজন মুসলমানের ক্রীতদাসের খাদ্য, পোষাক ও বাসস্থানের বেলায় তার প্রভুর সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে। ইহা অনস্বীকার্য যে, ইহা অমুসলমানগণকে ইসলামে দীক্ষিত করার ব্যাপারে একটি সহজ উপায় ছিল এবং উহা ছিল মুসলিম রাষ্ট্রের একটি প্রধান নীতি।

আমরা দেখেছি যে, নর বা নারী বন্দীকে দাস বা দাসীতে পরিণত করা বাধ্যতামূলক নয়। পক্ষান্তরে বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করা অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করা দুইটি বিকল্প পন্থা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

৪৬৬. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: "অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদেরকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে।"[৪৬৭]

অবশ্য একতরফা এইরূপ আচরণ বন্ধ করা সহজ নয়, যদি প্রতিপক্ষ ঐরূপ করতে ইচ্ছুক না হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইবনে জুবায়ের তার 'রাহলাত' নামক পুস্তকে জীবন্ত ও লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় ইতালীর বাজারে বন্দী মুসলমান নারী ও শিশুদের দাস-দাসী হিসাবে বিক্রয় হতে তিনি মক্কায় যাওয়ার পথে দেখেছিলেন। তথাপি ইসলাম দাস-দাসীদের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এবং হবহাউস তাঁর Morals in Evolution পুস্তকটিকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নাই যে, অমুসলিম দেশসমূহে এমন কি খৃষ্টানদের মধ্যেও দাসদাসীদের সঙ্গে উন্নততর ব্যবহারের প্রচলন বিশেষভাবে ইসলামী প্রভাবের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

যদি অবশ্য কর্তব্য নয় বলে মুসলমানরা স্বেচ্ছায় ইহা ত্যাগ করেন, তাদের কোনো অপরাধ হবে না এবং সেজন্য আইনের খেলাফও হবে না। বস্তুতঃ ইহা তাদের আদর্শ। যা হোক, এ ভুললে চলবে না যে, কোনো দেশ বা কালের মুসলমান কোনো অধিকারের দাবী ছেড়ে দিলে আল্লাহ্‌র আইন রদ হয়ে যায় না; এবং যদি কোনো না কোনো কারণে অন্যান্য মুসলমানরা একে আবশ্যক মনে করে– একে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে, তবে তারাও আইনভঙ্গ করবে না।[৪৬৮]

বাস্তবিকপক্ষে এমন অবস্থাও হতে পারে যে, মানবতার খাতিরে দাসপ্রথা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোনো জাতি মনে করে, যে সমস্ত বিদেশী অস্পৃশ্য এবং জীবজন্তুর চেয়ে মানুষকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং সেই সঙ্গে মানবতার উপদেশ বা আদর্শের প্রতি কর্ণপাত না করে, অথবা যদি এক বর্ণের মানুষ বিধাতার সৃষ্ট অন্য বর্ণের মানুষের প্রতি অতিরিক্ত বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করে– মানবতার খাতিরে সেইরূপ মানবতা বিরোধী জাতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং তাদেরকে দাসে পরিণত করা এবং ঐ জাতির অধীনে তাদের রাখা

৪৬৭. আল-কুরআন, ৪৭ : ৪

৪৬৮. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮

উচিত যাদের বর্ণ বৈষম্য নাই অথবা জাতিগত বা ভাষাগত বিদ্বেষ নাই। আমরা আশা করব এমন অবস্থার সৃষ্টি যেন না হয়।[৪৬৯]

(গ) মুক্তিপণ

কুরআনে মুক্তিপণের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত করা হইয়াছে [৪৭০] এবং মহানবীর জীবনে বিভিন্ন প্রকার মুক্তিপণ ও ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, মুসলমান বালকদেরকে লেখাপড়া তাদের শেখাতে হতো। কখনো কখনো স্বর্ণ বা রৌপ্য আদায় করা হতো। আবার কোনো সময় বর্শা এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করা হতো। সেই মুক্তিপণ বন্দীর নিজস্ব টাকা থেকে অথবা তাদের বন্ধুবান্ধব কিংবা সরকারের কাছে থেকে দেওয়া হতো। খলিফা দ্বিতীয় উমর বাইযানটাইনদের কাছ থেকে মালাতিয়া নগরীর বিনিময়ে পুরা এক লক্ষ বন্দী মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

(ঘ) বন্দী বিনিময়

মহানবী (সা.) এর জীবনে বিশেষ এক প্রকার মুক্তিপণের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কখনো একজনের বিনিময়ে একটি ও একাধিকের জন্য একটি মুদ্রা গ্রহণ করা হত। পরবর্তীকালে একসঙ্গে হাজার হাজার বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার মতো জটিল প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। কোনো কোনো সন্ধিতে বন্দীদের মুক্তিপণের পরিমাণ নির্দিষ্ট অর্থে নির্ধারিত হত।[৪৭১]

ইহাও স্পষ্ট যে, এই নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবহনকালে তারা যেন শত্রুতাপূর্ণ কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ না করে, যাতে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

---

৪৬৯. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
৪৭০. আল-কুরআন, ৪৭ ঃ ৪
৪৭১. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৫

(ঙ) বিনা পণে মুক্তি

আল কুরআনে ইহার বিধান আছে, যখন শত্রুতার অবসান হয়ে যায়। মহানবী (সা.) এর জীবনে এর দৃষ্টান্ত কম নয়। বদরের যুদ্ধ থেকে তাঁর মৃত্য পর্যন্ত প্রায়শঃ ঐরূপ বিনা পণে মুক্তি দেওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ধারণ করবে না এই প্রতিশ্রুতিতে মুক্তির দৃষ্টান্তও মিলে।

বিজয়ীদের মধ্যে গনিমত বন্টনের পূর্বে, যে গনিমতের মধ্যে মুসলিম আইন অনুসারে বন্দীও শামিল থাকে, সেনাপতি ইচ্ছামতো বন্দীদের সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য স্বাধীনতা ভোগ করেন। কিন্তু তাদের দাসে পরিণত করার ও বন্টন করে দেওয়ার পর গ্রহীতার সম্মতি প্রয়োজন। সেনাপতির ঐ সমস্ত কাজে তাদের ব্যবহার করতে পারেন যাতে দাসে পরিণত বন্দীদের মালিকের বিপুল ক্ষতি না হতে পারে। হাওয়াযিন বন্দীদের ক্ষেত্রে একটি ভালো দৃষ্টান্ত আছে। মহানবী (সা.) বায়তুল মাল থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা ঐ সব ব্যক্তিদের দান করেছিলেন, যারা তাদের গনিমত প্রাপ্ত ক্রীতদাসদিগকে ছাড়তে সম্মত হয় নাই।[৪৭২]

৮.৬: যুদ্ধমান পক্ষের সঙ্গে অ-বৈরীমূলক যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা

এইরূপ যোগাযোগের প্রথম উদাহরণ হল ভাব বিনিময়। এইরূপে যখন একপক্ষ প্রতিপক্ষের সংগে আলোচনা বা ভাব বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তখন সেই পক্ষ কিছু বোধগম্য ইংগিত ইশারার আশ্রয় লয়। অধুনা সাধারণতঃ শ্বেত বর্ণের পতাকা ব্যবহার করে এবং তার দ্বারা এই অনুরোধ জানানো হয় যে, ঐ পক্ষের দূতকে যেন অপর পক্ষের সেনাপতির নিকট যেতে দেওয়া হয়, যাতে সে তার নিকট যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যেন সেই সেনাপতির নিকট পেশ করতে পারে।

অনাদিকাল থেকে শত্রুর বাণী বাহক বা দূতের হিফাযতের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তা অলঙ্ঘণীয় মনে করা হয়েছে। ইসলাম এই যুক্তিপূর্ণ প্রথাকে মেনে নিয়েছে। এমনকি প্রত্যাবর্তন কালেও শত্রু পক্ষের দূতের উপর কোন নির্যাতন, কিংবা দৈহিক আঘাত বা অবমাননা করা চলবে না। তথাপি ইহা আবশ্যক নয় যে, সর্বদা প্রতিপক্ষের দূতকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হতে হবে; এবং সেরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের কথা অবশ্য ঘোষণা করতে হবে।[৪৭৩]

৪৭২. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৮
৪৭৩. এ.জে. এম শামসুল আলম, Bmjvgx ivó, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২

দূতকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়, তথাপি যদি সামরিক কারণে আবশ্যক হয়, তাহলে তার চোখ বেঁধে দেওয়া যেতে পারে; এবং তাকে দৈহিক কোনো উপায়ে বাধা দেওয়া হোক বা না হোক, সে মর্যাদার খাতিরে সামরিক তথ্য জানবার জন্য কোনো সুযোগ গ্রহণ করবে না। সচরাচর তাকে সামরিকভাবে ধরে রাখা হয় না, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে অবস্থার গুরুত্বের অবসান হওয়া পর্যন্ত তাকে সামরিকভাবে সমম্মানে রাখা যেতে পারে। প্রয়োজন বশতঃ তাকে অন্যত্র রাখা যেতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত সফরের জন্য ব্যয়ের কারণে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে; এবং তাকে নিরাপদ স্থানে অবশ্যই রাখতে হবে।

দূতের তরফ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ তার কঠোর শাস্তি হতে পারে এবং ইহা তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে ক্ষুন্ন করবে। কারণ, দূতদের অধিকার অন্যান্যদের মতো তাদের বাধ্য-বাধকতার উপর নির্ভরশীল।

মহান আল্লাহ বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ
অর্থ: "আল্লাহ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভাল যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফলন তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফলন তাহারই।"[৪৭৪]

বন্দী বিনিময়

যুদ্ধকালে কখনও কখনও বন্দী বিনিময় এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের আদান-প্রদানও পত্রালাপ ইত্যাদি ঘটতে পারে। যেহেতু এই সব বিষয় পারস্পরিক স্বার্থের ব্যাপারে সেজন্য এইগুলোকে স্বীকার করা হয়। বিশেষতঃ পূর্বের এই অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, মুক্তিপণের বিনিময়ে বা অন্যভাবে বন্দী মুক্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল বিশিষ্ট কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করা হয় এই উদ্দেশ্যে। তাদের মাঝে মাঝে শত্রুর এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয় এবং কখনও একটি স্থানে বেছে নেয়া হয়। তারা এবং জাহাজ ও যানবাহনের জন্য অন্যান্য গাড়ী ইত্যাদি যা নির্ধারিত স্থান থেকে যাতায়াত করে, সকলেই নিরাপত্তা ভোগ করে থাকে। অবশ্য এইসব যাত্রীদল সতর্কতামূলক কোন কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারবে না, কিংবা খাদ্যদ্রব্য

৪৭৪. আল-কুরআন, ২ : ২৮৬

বহন করার মতো আবশ্যকীয় কাজ ছাড়া বা যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে তা ব্যতীত, বিনা অনুমতিতে অন্য কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। অন্যথায় তারা তাদের নিরাপত্তা হারাবে।[৪৭৫]

৮.৭: যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি (গানিমা, স্থাবর সম্পত্তি ও দাস-দাসী)

মুসলিম আইনে সম্পত্তির ওপর অধিকার বিস্তারের দুটি পন্থা আছে ঃ 'ইহরায' ও 'নাকল'। 'ইহরায' বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন জিনিস দখল করা। একে মৌলিক দখলও বলা যেতে পারে। আর 'নাকল' হল সর্বজনস্বীকৃত চুক্তির মাধ্যমে বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির হস্তান্তর। বলপূর্বক হোক আর না হোক, যুদ্ধের ফলে অমুসলিমদের কাছ থেকে ধনসম্পদ লাভ করার সাথে সাথে বন্টনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার ওপর সামগ্রিকভাবে সব মুসলিম যোদ্ধার মৌলিক দখলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, যদিও অমুসলিমগণ এ সম্পদের অধিকারী, তবু ইসলাম গ্রহণ না করে অবিশ্বাস বজায় রাখার ফলে এবং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার শাস্তি হিসেবে ধনসম্পদের ওপর তাদের দখল বরবাদ হয়ে যায়।[৪৭৬]

'গানিমা' কথাটি কেবল জোরপূর্বক অমুসলিমদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়। এর মধ্যে যে কেবল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তা-ই নয়, যুদ্ধবন্দী বা 'আসরা' এবং নারী ও শিশু বা 'সাবিও' থাকে। গানিমা লাভ করতে হলে পূর্বাহ্নে শক্তি প্রয়োগ ও ইমামের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ, শক্তি প্রয়োগ না করে ধনসম্পদ অর্জিত হলে তা শত্রুপক্ষ থেকে অর্জিত সামগ্রিক সম্পদ (Fay) বলে গণ্য হবে। আর ইমামের অনুমতি যদি না থাকে এবং তা এক বা ততোধিক জেহাদী দ্বারা অধিকৃত সম্পত্তি হয়, তবে তাকে চুরি করা জিনিস মনে করা হয়, তা গানিমার পর্যায়ে পড়বে না। ইমামের অনুমতিই নিছক যুদ্ধকে জেহাদে রূপান্তরিত করে এবং যুদ্ধপরিচালনা ও যুদ্ধপ্রাপ্ত ধনসম্পদ অর্জন ও দাবীদারদের মধ্যে বন্টনের ব্যাপারে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করে। মুমিনদের মধ্যে যারা যুদ্ধে যোগদান করেন, গানিমা তাদেরই প্রাপ্য। যুদ্ধের শেষে যারা এসে হাজির হন, এতে তাদের কোন দাবীই নেই।

অবশ্য ধনসম্পদ দখলের পূর্বে যারা এসে উপস্থিত হন, তাদের কথা স্বতন্ত্র। খলিফা হযরত উমরের কাছ থেকে পাওয়া হযরত মুহাম্মদের (সা.) একটি বাণী এ আইনের ভিত্তি। এ বাণীতে আছে " 'জেহাদে যাঁরা শরিক হন, গানিমা কেবল তাঁদেরই প্রাপ্য।' আইনবিদগণও এ সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে একমত প্রকাশ

৪৭৫. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৬
৪৭৬. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

করেছেন। যুদ্ধে জয়লাভের পূর্বে যদি নব-প্রেরিত সেনাদল পথে থাকে, সে সব সৈন্য অথবা যদি কোন জেহাদী অসুস্থতা ও অন্যান্য বিশেষ কারণ হেতু যুদ্ধে যোগদান করতে অসমর্থ হন, তবে তাঁরাও গানিমার অংশ পেতে পারেন।' কোন কোন আইনবিদ এ সুপারিশ করেছেন। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই যদি কোন যুদ্ধরত জেহাদীর মৃত্যু হয়, তবে তাঁর প্রাপ্য গানিমার অংশ তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রদান করতে হবে।[৪৭৭]

গানিমা বন্টন

যুদ্ধ-জয়ের পর গানিমা বন্দোবস্ত করতে হবে। বিজয়ের পূর্বে গানিমা বন্টন করা নিয়ম নয়। কারণ, যুদ্ধ-জয়ের ওপরই গানিমা লাভ করা নির্ভর করে। বিজয়ের ফলেই সম্পত্তির ওপর শত্রুদের অধিকার বিলুপ্ত হয় এবং তাদের সম্পদের ওপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে তারা এ সম্পদ বন্টন করে দিতে পারেন। যদি মুসলমানরা যুদ্ধে জয়লাভ করেন ও যুদ্ধ চলতেই থাকে, তবে পরিপূর্ণভাবে বিজয়লাভ না করা পার্যন্ত গানিমা বেটে দেবার কাজ স্থগিত রাখতে হবে। যুদ্ধে জয়লাভ না করতে পারলে গানিমার সুষ্ঠু বন্টন ও গানিমা সম্পর্কিত আলোচনা চালানো উচিত নয়। কারণ, এতে জেহাদীদের মনোযোগ যুদ্ধক্ষেত্রের দিক থেকে গানিমা বন্টনের বিষয়ে নিবিষ্ট হতে পারে।[৪৭৮]

গানিমার বন্টন-কার্য দারুল হারবে চালানো যেতে পারে অথবা দারুল ইসলামে নিয়ে গিয়েই গানিমা বন্টন করা যেতে পারে। হানাফীপন্থীগণ দারুল হারবে গানিমা বন্টন করা বিরোধী, যদি না বিশেষ অবস্থায় পড়ে ইমাম দারুল হারবে গানিমা বন্টনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বানু মুস্তালিক, হাওয়াযিন, হোনায়েন ও খায়বারের যুদ্ধে দারুল হারবেই গানিমা বন্টন করেন। তাঁর ব্যবস্থা অনুসরণ করে আউযায়ী দারুল হারবেই গানিমা বন্টনের উপদেশ দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, রাসূল আকরাম (সা.) দারুল হারবেই গানিমা বন্টন করেছেন। কারণ এসব যুদ্ধ-জয়ের পরই দারুল হারবের কতকগুলো অঞ্চল দারুল ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। বদরের যুদ্ধের পর মুসলমানরা মদিনায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি গানিমা বন্টন করেন নি। এ বিষয়ে ইমাম মালিক আউযায়ীর সঙ্গে একতম পোষণ করেন। কিন্তু শাফেয়ীপন্থীগণ বিষয়টি নির্ধারণ ভার ইমামের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিবেচনা করবেন। দারুল হারবে গানিমা বন্টন করা যদি তিনি যুক্তিযুক্ত মনে

৪৭৭. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫
৪৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

করেন, তবে তিনি সেই হুকুমই দেবেন। আর তিনি যদি গানিমা বণ্টন স্থগিত রাখতে চান, তবে গানিমা দারুল ইসলামে নিয়ে যেতে হবে।[৪৭৯]

বদরের যুদ্ধের (খৃস্টীয় ৬২৪ সন) পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) গানিমা বন্টনের ব্যাপারে অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ করতেন। আরবীয় আচার-ব্যবহার অনুসারেই তখন তিনি গানিমা বন্টনের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাই আল্লাহ-প্রদত্ত এ আইন বিধান মারফত বিষয়টির মীমাংসা হয় ঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ

‘যখন তোমরা গানিমা লাভ কর, তখন তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য দান কর, এবং নিকট আত্মীয়, এতিম দরিদ্র ব্যক্তি ও মুসাফিরদের জন্যে রাখো।”[৪৮০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীরে উসমানীতে আছে গনীমতের মাল বন্টনের নীতিমালাঃ

সূরার শুরুতে ইরশাদ হয়েছে- বল, গনীমত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। এবার তার কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে যে গনীমত লাভ হবে, তার এক পঞ্চামাংশ মহান আল্লাহর প্রাপ্য। তাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁর নবী (সা.) সে অংশ বুঝে নেবেন এবং পাঁচটি খাতে তা ব্যয় করবেন। ক. নিজের ব্যক্তিগত কাজে, খ. তাঁর সেইসব আত্মীয়-স্বজন (বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব)-এর প্রতি যারা প্রথম থেকে মহান আল্লাহ্র কাজে রাসূলের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং ইসলামের জন্য কিংবা কেবল আত্মীয়তার স্বার্থে তাঁর সমর্থন করেছে। অন্যদিকে যাকাত ইত্যাদি গ্রহণ তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেছে; গ. ইয়াতীমদের প্রতি; ঘ. দরিদ্র মুসলিমগণের প্রতি এবং ঙ. মুসাফিরদের প্রতি। গনীমতের বাকি চার অংশ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে।[৪৮১]

গানিমার এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য। কিন্তু এ অংশ কি করে খরচ করা হবে, এ নিয়ে তীব্র মত-বিরোধের সৃষ্টি হয়। নেতৃস্থানীয় আইনবিদগণ তাঁদের মতামত এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এক পঞ্চমাংশ ছ'ভাগে ভাগ করা হত। এক ভাগ আল্লাহর জন্য (কাবা শরীফের জন্য ব্যয়িত হবে); দ্বিতীয় ভাগ রাসূলুল্লাহ’র (সা.) জন্য; তৃতীয় ভাগ নিকট আত্মীয়-

৪৭৯. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪
৪৮০. আল-কুরআন, ৮ : ৪১
৪৮১. শায়খুল হিন্দ্ মাও.মাহমুদুল হাসান (র.) ও শায়খুল ইসলাম মাও. শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

স্বজনের জন্য; চতুর্থ ভাগ এতিমের জন্য; পঞ্চম ভাগ গরীব লোকদের জন্য ও ষষ্ঠ ভাগ মুসাফিরদের জন্য বরাদ্দ করা হত। আতা ইবনে আবিরুবাহ ও আল হাসান ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এক পঞ্চমাংশের একটি অংশ পাবেন। আল্লাহর সম্পর্কে আয়াতটি অন্যান্য অংশের পূর্বসূচনা, তাই এ ভাগ গণনা করা উচিত নয়। হাম্বলী আইনবিদগণ এই একই মত পোষণ করেন।

হানাফী আইনবিদগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, গানিমার এক-পঞ্চমাংশ এ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা উচিতঃ একটি রসূলের (সা.) (যা তাঁর মৃত্যুর পর খলিফার অধীনে যাবে); অন্যটি নিকট আত্মীয়-স্বজনের এবং তৃতীয়টি এতিম, গরীব লোক ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে।[৪৮২]

মালিকী আইনবিদগণ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এক পঞ্চমাংশ গানিমা শত্রুপক্ষ থেকে উদ্ধার করা সামগ্রিক সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হবে; অর্থাৎ তা মুসলিম সমাজভুক্ত গরীব ও ধনীর মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করে দিতে হবে। ইমাম মালিক আরও বলেন যে, যদি ইমাম ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর অংশ নবি করীমের (সা.) আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও বন্টন করে দিতে পারেন।

শাফেয়ী আইনবিদগণ বলেন যে, এক পঞ্চমাংশ গানিমা আল-কোরআনের বিধান অনুসারে পাঁচভাগে ভাগ করতে হবে। আল্লাহ ও রাসূল এর একভাগ পাবেন।

হযরত মুহাম্মদের (সা.) ওফাতের পর আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) অংশ সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। এক মত অনুসারে অন্যান্য সবার মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। আবার অন্যান্য আইনবিদ বলেন, এ ভাগ ইমামকে দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, যুদ্ধের প্রস্তুতির কাজে এ অংশের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

নিকট আত্মীয় কথাটি নিয়েও তখন মতবিরোধ দেখা দেয়। কোন কোন আইনবেত্তা নিকট আত্মীয় বলতে বানু হাশিম গোত্র বুঝেছেন। আবার অন্যান্য আইনবিদ বানু হাশিম ও বানু আবদুল মুত্তালিবকে নিকট আত্মীয়ের পর্যায়ে এনেছেন।

পাঁচভাগের একভাগ পুরুষ ও সাবালক যুদ্ধরত জেহাদীদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। আউযায়ী বলেছেন, মহিলা এবং শিশুদেরও গানিমার অংশ দিতে হবে। কিন্তু অন্যান্য আইনবিদ এর বিরোধীতা করেছেন। ইবনে হাম্বল তাদের কিছু অংশ দিতে চান। কিন্তু তা পুরুষের অংশের চাইতে কম হবে।[৪৮৩]

বিভিন্ন আইনের মযহাব হিসেবে গানিমার চারভাগ বিভিন্ন উপায়ে বন্টন করতে হবে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেন, তিনভাগ অশ্বারোহী সৈন্যকে দিতে হবে (দু'ভাগে অশ্বের জন্য ও একভাগ অশ্বারোহীর

৪৮২. মফিজুল্লাহ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৪৮৩. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

জন্য) এবং একভাগ পদাতিক সৈন্যরা পাবেন। ইমাম ইবনে হাম্বল ও ইমাম মালিক ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা দু'ভাগ অশ্বরোহীকে দিয়েছেন (একভাগ অশ্বের জন্য ও অপর ভাগ অশ্বারোহীর জন্য)। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, পশুকে মানুষের চাইতে বেশী দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। পদাতিক সৈন্যকে তিনি এক অংশ দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফার সুবিখ্যাত শিষ্য আবু ইউসুফ তাঁর ওস্তাদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি অশ্বারোহীকে তিন ভাগ দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা ও শায়েবানীর মতে, যদি অশ্বারোহী একাধিক অশ্ব এনে থাকেন, সে ক্ষেত্রেও তিনি আর বেশী অংশ পাবেন না। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম ইবনে হাম্বল উর্ধ্বপক্ষে দুটি অশ্বর পর্যন্ত গানিমার অংশ দিতে চেয়েছেন। এছাড়া পদাতিক সৈন্যরাই কেবল অংশ পেতে পারবেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্ব ভিন্ন অন্যান্য পশু যারা আনবেন, তারা কোন অংশ পাবেন না।

ইমাম অবশ্য গানিমার বিশেষ অংশ দেবার জন্য যুদ্ধ-জয়ের পূর্বে কিংবা যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে প্রতিশ্রুতি দান করতে পারেন। আইনের ভাষায় বলতে গেলে, ইমামের 'তানফীলে'র ক্ষমতা রয়েছে, যার বদৌলতে তিনি প্রয়োজন মনে করলে জেহাদীদের অংশ বাড়িয়ে দিতে পারেন।[৪৮৪]

ইমাম বৈধ অধিকার অনুযায়ী অমুসলমানদের হত্যা করে তাদের সম্পত্তি অধিকার করার অনুমতি জেহাদীদের দিতে পারেন। এ ক্ষমতা প্রয়োগ করার ব্যাপারে অবশ্য মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক বলেন, ইমাম যদি তাঁর 'তানফীল' ক্ষমতার মারফত বিজয়ী জেহাদীকে ধন-সম্পদ অধিকার করার অনুমতি না দেন, তবে তিনি তা দখল করতে পারবেন না। বস্তুত্যাগী অমুসলিমদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি যদি আত্মসাৎ করা না হয়, তবে ইমাম শাফেয়ী বিজয়ী জেহাদীদের শত্রুপক্ষের ধন-সম্পদ দখল করার অনুমতি দেন। আর কোন কোন আইনবিদ বলেন যে, গানিমা বন্টনের সাধারণ নিয়ম অনুসারেও যুদ্ধ-লব্ধ ধন-সম্পদ বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে।

পরিশেষে, বিশ্বাসীদের ধন-সম্পদ যখন আবার অমুসলিমদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়, তার কথা ধরা যাক।

প্রথমতঃ হযরত আলী (রা.) মতামতের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন এ সম্পত্তি গানিমার অংশ বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, এ সম্পত্তি মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে।

৪৮৪. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭

তৃতীয়তঃ যদি উদ্ধারকৃত সম্পদ গানিমা হিসেবে বিভক্ত হবার পর সাবেক মালিক কর্তৃক দাবী করা হয়, তবে তাতে তার আর কোন অধিকার নেই। তবে বন্টন করার পূর্বে যদি তিনি দাবী পেশ করতে পারেন, তবে তিনি তার সম্পদ ফিরে পেতে পারেন।

চতুর্থতঃ যদি উদ্ধারকৃত সম্পদ মুক্তি-বলে অমুসলিমরা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে সাবেক মালিক এ সম্পদ বন্টনের পূর্বে ফেরত পেতে পারেন। তবে যদি অমুসলিমগণ এ মাল বিনা শক্তি প্রয়োগে ছিনিয়ে নিয়ে থাকে, তবে সাবেক মালিক গানিমা বন্টনের পূর্বে বা পরে ফেরত পেতে পারবেন।[৪৮৫]

"যুদ্ধে যে হালাল ও উত্তম গনীমত তোমরা লাভ করেছ, তা তোমরা ভোগ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" ।

উপরিউক্ত তিরস্কার ও ধমকের ফলে মুসলিমগণ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তারা মনে করলেন গনীমতের মাল আর স্পর্শ করা উচিত নয়। বন্দীদের মুক্তিপণও এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ আয়াতে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, তা মহান আল্লাহ্র দান, স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পার। হ্যাঁ, জিহাদ করতে গিয়ে গনীমতের মাল ইত্যাদিকেই লক্ষ্যবস্তু বানানো বা এতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, যদরুন উচ্চতর লক্ষ্য ও সামগ্রিক কর‌্যাণে ঔদাসীন্য দেখা দেয়া। সন্দেহ নেই, সাময়িক স্বার্থ ও পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তোমরা ভুল পন্থা অবলম্বন করে ফেলেছ, কিন্তু তাই বলে সম্পদের মধ্যেতো আর কোন দোষ নেই। আল্লাহ্ কে ভয় করে চললে তিনি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।[৪৮৬]

স্থাবর সম্পত্তি

শক্তি-বলে যখন অস্থাবর সম্পত্তির মত স্থাবর সম্পত্তিও অধিকার করা হয়, তখন তা গানিমার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। অস্থাবর সম্পত্তির বন্টন খুব বেশী সমস্যার সৃষ্টি করে নি। কিন্তু স্থাবর সম্পদের বন্টন ও মালিকানা বিভিন্ন জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশেষ আইন মারফত এ সমস্যার সমাধান করা হয়। বিভিন্ন মাযহাবে এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত রয়েছে। রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় জেহাদীদের মধ্যে জমি বন্টন থেকে শুরু করে সম্পত্তিতে রাষ্ট্রীয় অধিকার পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর জমি সম্বন্ধীয় নির্দেশের পূর্বে এ সম্পর্কে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল না। সামরিক কারণে হযরত উমর (রা.) নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেন যে, জমি থেকে তার মালিককে বঞ্চিত করা ও তাদের অপসারণ করা চলবে না। তবে তাদের খারাজ বা ভূমি-রাজস্ব এবং জিযিয়া দিতে হবে। এ শুল্ক থেকে পাওয়া অর্থ বিশ্বাসীদের ভরণপোষণের

৪৮৫. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬-৮৮
৪৮৬. মাহমুদুল হাসান (র.) ও শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

কাজে ব্যয়িত হবে। মুসলমানগণ যেমন কৃষিকার্যে নিযুক্ত হতে চাইতেন না, তেমনি তাদের এ বৃত্তি গ্রহণ করতে অনুমতিও দেয়া হত না। এ নিয়ম প্রথম সাওয়াত নামক ভূ-খণ্ডের ওপর (দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া বা ইরাক) বলবৎ করা হয়। পরে গানিমার অংশ হিসেবে নতুন জমি অধিকৃত বলে সেখানেও মৌলিকভাবে এ নিয়মেই প্রযোজ্য হতে থাকে। জমির তত্ত্বাবধায়কের ইসলাম গ্রহণ বা মুসলমানদের কাছে জমি বিক্রয়ের ফলে সাবেক কৃষকের কাছ থেকে জমি হস্তান্তর অনুমোদিত হয় নি। তবু ইমাম মাঝে মাঝে বিশেষ অবস্থায় এ অনুমতি প্রদান করেছেন।[৪৮৭]

অধিকাংশ লোকের ইসলাম গ্রহণ এবং জমি হস্তান্তর বৈধ বলে গণ্য হবার ফলে আইনবিদগণ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেন ও বিভিন্ন মাযহাবের লোকের বিভিন্ন মত পেশ করেন। হাম্বলী আইনবিদগণ বলেন যে, ইমাম ইচ্ছা করলে স্বাচ্ছন্দে জমি জেহাদীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন কিংবা জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে মনে করতে পারেন। আবার জমির মালিকদের জমি যে অবস্থায় আছে, তিনি সে অবস্থাতেও রেখে দিতে পারেন। এ জন্য তাদের অবশ্য খারাজ দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা খায়বারের নজির দেখিয়ে বলেন যে, রাসূলে আকরম (সা.) এ স্থানের জমি অংশতঃ বন্টন করে দেন ও বাকীটুকু রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। ইমাম মালিক (র.) সব স্থাবর সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের অধীনে সামগ্রিক সম্পদ হিসেবে এবং জমির ফসলের অংশকে সরকারী আয়ের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। মালিক আইনবিদদের মতে, জমি কখনই বন্টন করে দেয়া চলবে না। শাফেয়ী আইনবিদগণ সাধারণ-নীতি অনুসরণ করে অন্যান্য সম্পদের মত জমিকেও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছেন এবং জেহাদীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া যাবে বলে সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য জেহাদীরা যদি এ জমি গ্রহণ করতে অসম্মত হন, তবে তা সামগ্রিক সম্পদে পরিণত হয়।[৪৮৮]

দাসদের অবস্থা

যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে দাসে পরিণত করার রীতি খুবই প্রাচীন। পুরাকালে প্রাচ্যে এ নীতি প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ দাসই ছিল বিদেশী। অবশ্য আরবীয় দাস যে একেবারে ছিল না, তা নয়। এরা ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে পারত। ইসলামী আইনের ভিত্তি ছিল, আরবীয় আচার-বিধি। তাই এ আইন দাস প্রথাকে স্বীকার করেই নিয়েছিল। কিন্তু ইসলামী আইন ও ধর্মের চুলচেরা বিচারে দেখা যায় যে, ইসলাম দাসদের নৈতিক মান উন্নত করেছে এবং তাদের সামনে মুক্তির বিপুল সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। পুণ্যবান মুসলিমকে দাসমুক্ত করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আর দাস-মুক্তির ফলে বেহেশতে তাঁদের জন্য রয়েছে অপরিমিত নেয়ামত। যাই হোক, তবুও দাস প্রথা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হওয়া অবধি আংশিকভাবে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল।[৪৮৯]

---

৪৮৭. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৪৮৮. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯-৯০
৪৮৯. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বা যুদ্ধে অর্জিত গানিমা হিসাবে দাসদের ওপর কর্তৃত্ব ব্যাপিত হত। গানিমার মারফতই মুসলিম যুদ্ধ আইনে দাস প্রথা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ক্রয়-বিক্রয় আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ, তা বিক্রয়ের আইনের মধ্যে পড়ে। শত্রুপক্ষের পরাজয়ের পর ইমাম যদি বিজিত এলাকার সমগ্র অধিবাসীকে দাসে পরিণত করতে পারেন, তবে জেহাদীদের মধ্যে গানিমা হিসেবে তাদের বণ্টন করে দিতে পারেন। যখন বিজিত এলাকার অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করে না এবং তাদের জমিজমা বহাল রেখে তাদের কাছ থেকে খারাজ আদায় করতেও ইমাম রাজী হন না, তখনই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যারা দাস গ্রহণ করেন, তারা দাসদের নিজের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতে পারেন। আইনের এরূপ ব্যাখ্যাই দেয়া হয়েছে। কিন্তু নৈতিক দিক থেকে মুসলমানদের অভিমত এই যে, দাসদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং করুণা প্রদর্শন করতে হবে। গানিমা বন্টনের ব্যাপারে মহিলাকে তার স্বামীর কাছ থেকে এবং শিশুদের তাদের মাতা-পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না।[৪৯০]

সাধারণতঃ আরবদের দাসে পরিণত করা হত না। কিন্তু রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খলিফা আবু বকরের (রা.) আমলে কিছু কিছু আরবকে দাসে পরিণত করা হয়। রাসূল (সা.) বানু মুসতালিক গোত্রের আরবদের দাস করে নেন। কিন্তু যখন তিনি এ গোত্রের জুবাইরিয়া নাম্নী সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি এদের একশো জনকে মুক্ত করার আদেশ দেন। হাওয়াযিন গোষ্ঠীর কয়েক হাজার ব্যক্তিকে তিনি দাস করে নেন। কিন্তু আত্মীয়তা ও দাবী-দাওয়া পেশ করার দরুন তিনি ছ'হাজার দাস মুক্ত করে দেন। খলিফা আবু বকর (রা.) বানু নাজিরার লোকদের দাস করেন নেন। খলিফা উমর (রা.) কিন্তু আরবদের দাসে পরিণত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বার বার তাঁর বাণী উল্লিখিত হয়েছে, 'আরবদের ওপর মালিক হওয়া (অর্থাৎ তাদের দাসে পরিণত করা) চলবে না'। সিরিয়া ও ইরাকের অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের কৃষিকার্যে নিযুক্ত রেখে তিনি খারাজ গ্রহণ করতেন; এতেই তিনি অধিক উৎসাহী ছিলেন।

মুসলমানদের দাস প্রথার সঙ্গে দাসমুক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। প্রভুর কাছ থেকে দাস বিশেষ সুযোগের ভিত্তিতে বা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মুক্তি লাভ করতে পারত। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের তাগিদে আল-কোরআন ও হাদিসে দাসমুক্ত করতে আহ্বান করা হয়েছে। কাজেই মুসলিম সমাজে দাসদের স্থায়ীভাবে দাসত্বের নিগড়ে বন্দী করা হত না। দাস জীবদ্দশায়ই মুক্তির ভরসা পেত। মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী জগতের বাইরে দাস প্রথার রীতি নীতি তখনকার দিনে অনেক বেশী কঠোর ও অনমনীয় ছিল।[৪৯১]

৪৯০. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৪৯১. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩-৯৪

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

শান্তিচুক্তি: স্বরূপ ও আইন

৯.১: শান্তিচুক্তির স্বরূপ ও ফলাফল

মাঝে মাঝে চুক্তিতে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে ভবিষ্যত মিত্রতা ও সহযোগিতার কথা স্বীকৃতি লাভ করে। প্রায়শঃ ইহা শত্রুতার অবসান করে ও সুষ্ঠু প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। অপেক্ষাকৃত দুর্বলপক্ষ প্রায়ই ক্ষতিপূরণ ও কর দিতে স্বীকৃতি প্রদান করে। গাতফানের সংগে সাময়িক, অমীমাংসিত চুক্তিতে মহানবী (স.) মদিনার মরুদ্যান সমূহের উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ দিতে চেয়েছিলেন যদি তারা তাদের মিত্র মদিনার অবরোধকারীদেরকে পরিত্যাগ করতে পারত এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সংগে যদি তারা পৃথক একটি চুক্তি অবিলম্বে করতে পারত।

ইসলামী রাষ্ট্রনীতি এক ধর্মাবলম্বী বা উম্মার ভিত্তিতে গঠিত বলে অমুসলমানদের সংগে চিরন্তন মিত্রতা চুক্তি সম্পাদন করা অচিন্তনীয় ব্যাপার। যখন মহানবী (স.) মক্কায় হিযরত করার পর অনতিবিলম্বে একটি নগর রাষ্ট্র কায়েম করেন, তিনি ইহুদিগণের সংগে এক মৈত্রী সংঘের সংগঠনের জন্য সম্মতি দান করেন। অধিকন্তু মদিনার চতুষ্পার্শ্বে বিশেষতঃ ইয়াম্বু অভিমুখে বিধর্মী গোত্রদের সংগে, যে পথ দিয়ে কোরেশদের কাফেলা সিরিয়া যেত এবং সিরিয়া ও অন্যান্য উত্তরাঞ্চলের দেশ থেকে ফিরে আসত, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে চুক্তি করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের প্রারম্ভিককালে যে সকল সন্ধি সম্পন্ন হত সেগুলোতে কোনো সময়-সীমার উল্লেখ নাই। কুরআনে সময়সীমা বিহীন অনেক মিত্রতাচুক্তি যা অমুসলমানদের সংগে করা হয়েছিল সেগুলোর উল্লেখ আছে। শুধু হুদাইবিয়া চুক্তিতে দশ বৎসরের মেয়াদের উল্লেখ আছে, যে সময়ের মধ্যে চুক্তি বলবৎ ছিল।[৪৯২]

মহানবী (সা.) এর শেষ জীবনের দিকে কুরআন মাজিদের আয়াতে বলা হয়েছে-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (৫১)

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ (৫৫)

৪৯২. মজিদ কাদ্দুরী, (অনু. অধ্যাপক হাসান জামান), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ (۵۶٪)يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ
اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (۵۷)

"হে বিশ্বাসীগণ! ইহুদী ও খৃস্টানকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না। তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে সে তাদেরই একজন। দেখো ! আল্লাহ অন্যায়কারীদেরকে সুপথ দেখান না........ তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যারা মুমিন (বিশ্বাসী) এবং যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত (অতিরিক্ত সম্পদের উপর ধার্য কর) আদায় করে এবং সিজদা করে এবং যারা আল্লাহ, রাসূল (সা.) এবং মুমিনদেরকে বন্ধু মনে করে তারা দেখবে যে আল্লাহর দলই বিজয়ী হয়ে থাকে। হে বিশ্বাসীগণ! ঐ সব আহলে কিতাব (ঐশী গ্রন্থের অধিকারী) যারা তোমাদের পূর্বে ঐশী গ্রন্থ পেয়েছে এবং বিধর্মীদেরকে– যারা তোমাদের ধর্মকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে, তাদেরকে বন্ধু হিসাবে পছন্দ করোও না। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, আল্লাহর কর্তব্য করো।"[৪৯৩]

এমন কি আরও বলা হয়েছেঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ
ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (۲۳)

অর্থ: "হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তাহারই জালিম।"[৪৯৪]

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ لْمُشْرِكِيْنَ ؕ(۱)فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ
اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ (۲)

অর্থ: "ইহা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা.) পক্ষ হইতে সেই সমস্ত মুশরিকদের সঙ্গে যাহাদের সঙ্গে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। *অতঃপর তোমরা দেশে চার মাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জানিয়া রাখ, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করিতে পারিবে না এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন।"[৪৯৫]

[৪৯৩]আল-কুরআন, ৫ : ৫১, ৫৫-৫৭
[৪৯৪]আল-কুরআন, ৯ : ২৩
৪৯৫. আল-কুরআন, ৯ : ১-২

মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছিলেন, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে সমস্ত সন্ধি আছে তা কার্যকরী হবে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত। তথাপি বিধর্মীদের সংগে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য সমস্ত সন্ধি, যার কোনো সময় সীমা নাই, চার মাসের নোটিশ দিয়া রদ করা হত।

এই সব কারণে ফকিহগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, অমুসলমানদের সংগে স্থায়ী কোন সন্ধি করা উচিৎ হবে না। হুদাইবিয়া সন্ধির প্রেক্ষিতে ফকিহগণ সাধারণতঃ একমত হয়েছেন যে, খুব বেশী হলে দশ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদ রাখা যেতে পারে। যা হোক, সুহায়লী বলেন যে, হিজাজের ফকিহগণের মতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, এমন কি দশ বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত সন্ধি করা যেতে পারে, যদি কোন নিম্নস্তরের কর্তৃপক্ষ নয়, স্বয়ং সর্বোচ্চ শাসক যদি তা সঙ্গত মনে করেন।[৪৯৬]

শান্তিচুক্তির ফলাফল

প্রধান ফলাফল নিম্নে উল্লেখিত হল ঃ

১. যে বিষয় নিয়ে শত্রুতা ঘটেছিল তার মীমাংসা হয়ে যায়।

২. যুদ্ধকালীন অধিকারগুলি যথা হত্যা, বন্দীকরণ, লুণ্ঠন, দখল ইত্যাদি যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সব কার্যের অবসান হয়ে যায়।

৩. সন্ধিতে যদি বিপরীত কিছু না থাকে তাহলে সন্ধির পূর্বে যে অবস্থা ছিল, তাই স্থির থাকে।

৪. যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় হয় কিংবা মুক্তি দেওয়া হয়, যার জন্য সাধারণতঃ স্পষ্ট বিধান থাকে। অন্য গণিমত, স্পষ্ট নির্দেশ ব্যতিরেকে বিনিময় হয় না।

৫. যে মুহূর্তে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যে চুক্তি যুদ্ধকালে স্থগিত থাকে এবং যার পুনর্বিবেচনার আবশ্যক হয় না, স্বাভাবিকভাবে কার্যকরী হয়; এবং যুদ্ধকালে আচরণ সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়ে থাকে তা বাতিল হয়ে যায়।[৪৯৭]

এই নির্দেশ ও মহানবীর দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে শায়বানী ও অন্যেরা বলেন যে, চুক্তি অবশ্যই লিখিত হওয়া উচিত। চুক্তি লেখার তারিখ এবং যে তারিখ থেকে বলবৎ হবে এবং চুক্তির মেয়াদ সবকিছু সঠিকভাবে লিখতে হবে। কতকগুলো সাধারণ বিষয়বস্তু ছাড়া, যেমন যুদ্ধ বন্ধ হওয়া, যুদ্ধের কারণ সমূহের নিস্পত্তি; যে সব অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে যুদ্ধ ঘটেছিল সে সম্বন্ধে সম্মতি এবং অন্যান্য বিবিধ

৪৯৬. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৫
৪৯৭. মজিদ কাদ্দুরী, (অনু. অধ্যাপক হাসান জামান), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়সমূহ ছাড়া চুক্তিতে শর্তাবলী পালনের দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিশ্রুতির কথা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দরখাস্ত ও যামিন সংক্রান্ত ও মৃত্যুদণ্ড দান সংক্রান্ত কথাবার্তা থাকবে এবং আসল চুক্তির সংগে কখনো কখনো অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ, গোপন সংবাদসমূহ সন্নিবেশিত থাকে।

বস্তুতঃ চুক্তির বিষয় বস্তুর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নাই। সুতরাং চুক্তির অত্যাবশ্যকতা ও প্রাথমিক বিষয়সমূহ ছাড়া অধিক কিছু বর্ণনা করা সম্ভব হবে না।

চুক্তি ভঙ্গ:এসব প্রতারক বিশ্বাসঘাতকরা যদি প্রকাশ্যে চুক্তি ভংগ করে তোমাদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতরণ করে, তবে তাদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেবে, যা দেখে তাদের পশ্চাদবর্তী লোকেরা বা পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষা লাভ করে এবং কখনও অংগীকার ভংগের সাহস না পায়। যদি তারা প্রকাশ্যে চুক্তি ভংগ না করে, বরং লক্ষণ ও হাবভাব দেখে মনে হয় তারা চুক্তি ভংগ করতে প্রস্তুত, তা হলে তোমাদের জন্য অনুমতি আছে, তোমরা ভালো মনে করলে তাদের অংগীকার প্রত্যাখান করবে এবং চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যাতে কোনও পক্ষ পূর্বের চুক্তি সম্বন্ধে দ্বিধা-দ্বন্ধে না থাকে এবং উভয়পক্ষ সমানভাবে সতর্কতা অবলম্বনের সুযোগ পেয়ে নিজ নিজ প্রস্তুতি সমাধা ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লিপ্ত হতে পারে। তোমাদের পক্ষ হতে যেন কোনরূপ খিয়ানত ও অবিশ্বাস প্রকাশ না পায়। সব কিছু যেন সম্পূর্ণ পরিস্কার থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা কোনরূপ বিশ্বাস হনন পছন্দ করেন না, তা কাফিরদের বিরুদ্ধে হলেও। হাদীছের কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত মুআবিয়া (রা.) ও রোম সরকারের মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। মেয়াদ বাকি থাকতেই হযরত মু'আবিয়া (রা.) রোমের সীমান্ত এলাকার দিকে সেনাবাহিনী পাঠানো শুরু করলেন। উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে এভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকা, যাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া মাত্রই আক্রমণ করা যায়। যখন এ কাজের আয়োজন চলছিল,তখন জনৈক বৃদ্ধ আরোহী এই বলতে বলতে এগিয়ে আসলেন 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ! চুক্তি ভংগ নয় চুক্তি পূরণ! কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে চুক্তি হয়, তখন যেন তার কোন গ্রন্থি খোলাও না হয়, বাঁধাও না হয় যে যাবত না চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হয়। কিংবা অপর পক্ষকে সম আচরণের সাথে চুক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এ সংবাদ হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলেন। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সে বৃদ্ধ ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত 'আম্র ইব্ন আম্বাসা (রা.)।'

চুক্তিভংগ সম্পর্কে যে বিধান উপরে বর্ণিত হল, তা দেখে কাফিররা এই ভেবে খুশী হতে পারত যে, এটা মুসলিমগণের মাত্রাতিরিক্ত সরলতা। তাদের কাছে যখন বিশ্বাস ভংগ ও খিয়ানত জায়েয নয়, তখন আমরা অবগতি লাভের পর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করার মত সুযোগ পাব। তার উত্তরে বলা হয়েছে, তোমরা যতই ব্যবস্থা গ্রহণ কর ও প্রস্তুতি নাও, মুসলিমগণের হাতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে যখন পরাস্ত ও লাঞ্ছিত করতে এবং দুনিয়া বা আখিরাতে শাস্তি দিতে মনস্থ করবেন, তখন তোমরা কোন কৌশলেই তাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। এর দ্বারা যেন মুসলিমগণের আশ্বস্ত করা হল যে, তারা মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা করে যদি তাঁর বিধি-বিধান মেনে চলতে থাকে, তবে তারা সকলের উপর জয়ী হতে পারবে।[৪৯৮]

৯.২: ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

মুসলিম ব্যক্তিত্বের জন্য আমরা শাহাদা'র কথা বলেছি, এ শাহাদায় আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স.)কে বিশ্বাস করার সাক্ষ্য দেয়া হয়। আমরা কি ক্ষুদ্রতম একটি বিষয়ে একমত হতে পারি? যার ওপর ভিত্তি করে মুসলমানগণ তাদের সবার একটি পরিচয় ঠিক করে নিতে পারে? বিশ্বাসের এ মৌলিক সাক্ষ্যের বিষয়টাকে আমাদের ঠিক করতে হবে। এ বিশ্বাস আন্তরিকভাবে উচ্চারিত হলে মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। ব্যক্তি হিসাবে আল্লাহর সাথে আমাদের স্থায়ী সম্পর্ক হবে, তাঁকে আমরা স্মরণ করবো। আমরা তাঁরই, তাঁরই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে– এ চিন্তাগুলো আমাদের নিজেদের ওপর বিপুলভাবে আলোকপাত করে– যখন আমরা বুঝতে পারি যে, জীবনের একটা অর্থ আছে। প্রত্যেককেই তার কাজের জবাবদিহি করতে হবে। প্রতিটি কাজের এরূপ নিবিড় চিন্তা ইসলামী আধ্যাত্মিকতার একটা বিরাট প্রেক্ষিত তৈরি করে।

মুসলমানগণের দৈনন্দিন ধর্মচর্চা করার কারণে স্বাভাবিকভাবে তারা যে একই সম্প্রদায়ের লোক সে অনুভূতিটা তাদের অন্তরে গভীরভাবে অনুভূত হয়। ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। এর সকল শিক্ষা ও আদর্শ মানবজাতির জন্য চির কল্যাণকর। এজন্য ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রেও ইসলাম সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে। ইসলামে এতদুভয় বৈশিষ্ট্য ও গুণ অনুশীলনের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ইসলামে সকল মুসলমান ভাই ভাই। মুসলমানগণ বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক, সে কালো হোক বা সাদা, ধনী হোক কিংবা গরিব সকলেই ভাই-ভাই। এ অনুভূতি ইসলামী বিশ্বাস ও জীবন বিধান শক্তিশালী হয় আর সম্প্রদায়ের চেতনাবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় ও একই রূপ পরিগ্রহ করে।

৪৯৮. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, (অনু. শরীফ আব্দুল্লাহ্ হারুন ও অধ্যাপক গোলাম রসুল), প্রাগুক্ত,পৃ.১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ

অর্থ: "মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"[৪৯৯]

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, اَلْمُسْلِمُ اَخُوْا الْمُسْلِمِ

অর্থ: "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।"[৫০০]

বিশ্বের সকল মুসলমান ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তারা পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। একটি হাদিসে মহানবি (স.) মুসলমানদের এ ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "তুমি মুমিনগণকে পারস্পরিক করুণাপ্রদর্শন, সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ কষ্ট পায় তখন গোটা দেহই জ্বর ও নিদ্রাহীনতার মাধ্যমে এর প্রতি সাড়া দেয়।"[৫০১]

মুসলমানদের এ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব হলো ইসলামি ভ্রাতৃত্ব। ফলে দুনিয়ার দূরতম প্রান্তে কোনো মুসলমান কষ্টে পতিত হলে অন্য মুসলমানও তার সমব্যথী হয়, তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

ইসলামে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও একতায় উজ্জল দৃষ্টান্ত হল কাবা শরীফ। এতদসম্পর্কে Islam a comprehensive Guide Book গ্রন্থে Altaf Ahmed Kherie বলেন,

Qibla Symbol of Universal Brotherhood and Unity: The Qibla is thus a symbol of our unity. Needless to say, we do not worship the ka.ba: we worship the one and only god-Allah. Who is the lord of the House.[502] The lord of the East and west[503] to whom belong both the east and west.[504] ...[505]

---

৪৯৯. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০

৫০০. আবূ 'আব্দিলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল আল বুখারী আল জু'ফি, mwnn eLvix, বাব-লা ইয়াজলিমুল মুসলিমু আল মুসলিমা ওয়ালা ইয়াসলেমুহু, খ.৬, পৃ.২২৭, হাদিস নং- ২৪৪২

৫০১. আবু 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসমাইল আল বুখারী আল জু'ফি, সহিহ বুখারী, বাব-মানুষ ও চতুস্পদ জন্তুর প্রতি দয়া, খ.১৫, পৃ.১৯৪, হাদিস নং- ৬০১১

৫০২. আল-কোরআন, ১০৬:৩

৫০৩. আল-কোরআন, ২৬:২৮,৭৩:৯

৫০৪. আল-কোরআন, ২:১১৫,১৪২

505. Altaf Ahmed Kherie, Ibid, P.103

মুসলমানগণের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি ইসলাম আরও এক প্রকার ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা প্রচার করেছে। এটি হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ব। অর্থাৎ ইসলামের মতে, বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই। এতে দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই। বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ ভ্রাতৃত্ব হলো মানুষের মৌলিক ভ্রাতৃত্ব। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। কোনো মানুষই এ ভ্রাতৃত্ববোধ লঙ্ঘন করতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।"[৫০৬]

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, وَالنَّاسُ بَنُوْا اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ

অর্থ: "সকল মানুষই আদম (আ.)-এর বংশধর, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।"[৫০৭]

প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীতে সব মানুষ আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। এ হিসেবে সকল মানুষই একই বংশের, একই মর্যাদার ও পরস্পর ভাই-ভাই।

সুতরাং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতে হবে। সকলকে ভাইয়ের মমতায় দেখতে হবে, বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে, অন্য ধর্ম বা অন্য জাতি বলে কোনো মানুষের প্রতি অবিচার করা যাবে না। বরং সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সকল মানুষের মূলই এক এবং সৃষ্টিগতভাবে সকলেই ভাই-ভাই।

ইহকালীন শান্তির জন্য ভ্রাতৃত্ববোধের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বজায় রাখা অপরিহার্য। সমাজে বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। নিজ সম্প্রদায়ের বাইরের অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সাথেও সদাচরণ করতে হবে। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। তাদের বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে। পারস্পরিক মারামারি হানাহানির পরিবর্তে শান্তি স্থাপনে এগিয়ে আসতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ আছে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তাতে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে এরূপ করবে আমি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দান করব।"[৫০৮]

---

৫০৬. আল-কুরআন, ৪৯ :১৩

৫০৭. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, R¡‡g wZiwgwR, বাব- ফাসলিশ শামী আল ইয়ামান, তিরমিজি, খ.১৪, পৃ.১৩২, হাদিস নং-৪৩৩৭

৫০৮. আল-কুরআন, ৪ : ১১৪

মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এতে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন।

আমরা মুসলমান। আমাদের সমাজে অমুসলিম সম্প্রদায়ের বহু লোক বসবাস করেন। এদের কেউ আমাদের সহপাঠী, কেউ সহকর্মী, কেউ খেলার সাথী, কেউবা প্রতিবেশী আবার কেউ শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন। তাদের সকলের সাথেই ভালো ব্যবহার করতে হবে। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি।

মহানবি (স.) বলেছেন–

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلى عِيَالِه

অর্থ: "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।"[509]

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ

অর্থ: "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।"[৫১০]

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন–

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

অর্থ: "তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।"[৫১১]

ধর্মীয় স্বাধীনতা দানের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। এ জন্য তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায় অত্যাচার করা যাবে না, তাদের সম্পদ জবর দখল করা যাবে না। বরং তাদের জান-মাল-ইজ্জত সংরক্ষণ করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) এ বিষয়ে মুসলিমগণকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।"[৫১২]

---

৫০৯. আহমদ বিন হুসাইন আল-বায়হাকী: ïÒAvej Cgvb, বৈর ত: দার ল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি. হাদিস নং-২৩৭২

৫১০. mwnn gmwjg, বাব- কাওলুল্লাহি তাবারাকা ওয়া তাআলা কুল উদউ...,প্রাগুক্ত, খ.৬,পৃ.২৬৮৬, হাদিস নং-৬৯৪১

৫১১. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, mbv‡b wZiwgwR, বাব- মা জায়া ফি রাহমাতিল মুসলিমিন, হাদিস নং-১২২৫

৫১২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী:mnxûj eLvix, দেওবন্দ: দার ল কিতাব, তাবি. হাদিস নং- ১০৮৯

অন্য হাদিসে তিনি বলেন, "সাবধান! যে ব্যক্তি, কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে কোনো কাজ চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার কোনো সম্পদ নিয়ে যায় তবে কিয়ামতের দিন আমি সে ব্যক্তির প্রতিবাদকারী হব। (অর্থাৎ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব।)"[৫১৩]

ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য নানা বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেছে। আমাদের উচিত জীবনের সকল অবস্থায় এসব নির্দেশ অনুশীরন করা। ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক সম্প্রীতির আদর্শে সকলে পরিচালিত হলে এ গোটা বিশ্ব শান্তিময় হয়ে উঠবে।

মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আরব লীগ[514] ও আই সি (OIC) সহ অনেক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব মৃত প্রায় সংগঠনগুলোকে আরো উজ্জীবত করতে পারলে মুসলমানরা অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে।

মুসলমানগণ যেখানেই বসতি স্থাপন করেছে তারা সবার জন্য প্রযোজ্য নির্ধারিত ইবাদতের ভিত্তিতে একটি সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে। এভাবে নিজেদেরকে মুসলমান ভাবার সাথে সাথে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা মসজিদের চার পার্শ্বে বা অন্যান্য ইসলামী সংগঠনের মাধ্যমে তাদের সামাজিক কর্মকাণ্ড ঠিক করে নিয়েছে। ইসলামী বিশ্ব ও পশ্চিমা দেশের সর্বত্রই এ প্রক্রিয়া দেখা যায়। আমরা যেহেতু শাহাদার কথা বলি, সেহেতু মুসলিম পরিচয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক তাৎপর্যের সাথে সাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করতে হবে। দার্শনিক অর্থে এ অনুভূতি মুসলিম পরিচয়কে ধারণ করে থাকে। মুসলমানদের এ অনুভূতি একটি উল্লেখযোগ্য গুণ।

রাসূল (সা.) বলেন, "তোমাদেরকে এক হয়ে থাকতে হবে যাতে বাঘও তোমাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে।"[৫১৫]

---

৫১৩. সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আবু দাউদ:mbvb Avex 'vD', দেওবন্দ: দার"ল কিতাব, তাবি. হাদিস নং-৩২২০

514. Arab representatives met in Cairo and signed the pact of the League of Arab states on 22 March 1945. The founding members were Egypt, Saudi Arabia, Syria, Iraq, Lebanon, Yemen, and Transjordan. In addition to the original members, the following states have joined the League: Libya (1953), Sudan (1956), Tunisia and Morocco (1958), Kuwait (1961), Algeria (1962), South Yemen (1967, United in 1990 with Yemen), Bahrain, Qatar, Oman, and the United Arab Emirates (1971) Mauritania (1973), Somalia (1974), Palestine (1976) and Djibouti (1977).
Details: John L. Esposito (Editor in Chief), Ibid , P.111-120

৫১৫. আবু আব্দুলণ্ঢাহ আহমদ বিন হাম্বাল:gmbv‡' Avngv', বৈর"তঃ দার" সাদির, ১৯৬৯ খৃ. হাদিস নং- ৪১০৫

Dhaka University Institutional Repository

তাওহিদ, আল্লাহর একত্ববাদ উম্মাহর ওপর বিশেষ এক আলোকবর্ষণ করে আর উম্মাহর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে। সুতরাং উম্মাহর মধ্যে কোন কিছু ঘটলে পরিচয়ের অংশ হওয়ার কারণে এটি প্রত্যেক মুসলিমকেই প্রভাবিত করে।

রাসূল (সা.) এর এ সংক্রান্ত বক্তব্য স্পষ্ট : "যে মুসলমানদের কোন ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নয় সে আমাদের নয়।"[৫১৬]

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকেই মুসলিম হতে হলে উম্মাহর চেতনাবোধকে ধারণ করতে হবে, এর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এক দেহ আর এক অংগের ন্যায় উম্মাহকে অনুভব করতে হবে।

রাসূল (সা.) বলেন, "উম্মাহ একটি দেহের মত, এর এক অংশ অসুস্থ হলে পুরো দেহই অসুস্থ হয়।"[517]

শিল্পোন্নত সমাজে ইসলামের আলোচনায় পশ্চিমা দেশসমূহে মুসলমান পরিচয়ের প্রকৃতি একটি কঠিন প্রশ্নের অবতারণা করেছে। পরিচয়ের বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করা সত্যিকার অর্থেই কঠিন, কারণ সঠিকভাবে একে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে অনেকগুলো বিষয় এসে যায়।

মুসলমানদের কি কোন পরিচয় আছে, আর যদি থাকে তা কি ধর্মীয় না সাংস্কৃতিক?

- মুসলমানকে কি উম্মাহর আলোকে সংজ্ঞায়িত করা হবে?
- তাকে কি ইউরোপীয় জাতির মুসলিম নাগরিক হিসাবে বর্ণনা করা হবে?
- উম্মাহ, দেশ, অধিবাসী বা নাগরিক এভাবে সে কোন দলভুক্ত প্রথমে আমাদের তা ঠিক করতে হবে। এগুলো স্পর্শকাতর প্রশ্ন। [৫১৮]

তাওহিদের প্রতিকূলে মাতা-পিতার নির্দেশ

একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, এটি একটি মৌলিক কথা। এ বিশ্বাসের সাথে সাথে মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক প্রথমেই মানুষের মনে একটা দিগন্তবিস্তৃত বিশ্বাসের জন্ম দেয়। আল্লাহর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস আর তার উপাসনা, একান্ত শর্ত হিসাবে মাতাপিতার প্রতি উত্তম ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত। পারিবারিক বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা সামাজিক সম্পর্কের প্রথম এ স্থানটা মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত

৫১৬. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী:mnxûj eLvix, দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তাবি. হাদিস নং-১০৮৭
৫১৭. প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৭৭৫
৫১৮. তারিক রমাদান, (অনু. এম রুহুল আমিন), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের বহু আয়াতে মাতাপিতার ব্যাপারে তাওহিদের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰہِ اِلٰـہًا اٰخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُوۡمًا مَّخۡذُوۡلًا (٢٢)وَقَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاہُ وَ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُہُمَاۤ اَوۡ کِلٰہُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّہُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡہَرۡہُمَا وَقُلۡ لَّہُمَا قَوۡلًا کَرِیۡمًا (٢٣)وَ اخۡفِضۡ لَہُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَۃِ وَقُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡہُمَا کَمَا رَبَّیٰنِیۡ صَغِیۡرًا ؕ(٢٤)

"আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহা স্থির করো না; করলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে। তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক কথা। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[৫১৯]

মাতাপিতাকে মেনে চলা তাদের প্রতি ভাল আচরণের শামিল, তাদের এ আচরণ আল্লাহর প্রতিই যেন ভাল আচরণ করা। এটি ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার একটি। রাসূল (স.) সবসময় এ শিক্ষাটাই অত্যন্ত শক্তভাবে তাঁর সুবিখ্যাত হাদিসের মাধ্যমে মানুষকে দিয়েছিলেন :

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

অর্থ: "মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।"[৫২০]

একটা অবস্থাতেই শুধু সন্তান-সন্ততিরা তাদের পিতা-মাতাকে সম্মান করবে না। বরং এরপরও তারা পিতামাতার প্রতি সশ্রদ্ধ ও বিনয়াবনত থাকবে। সেটি হলো আল্লাহর বিধি-বিধানের বিরোধী পিতা মাতার কোন আদেশ। সন্তান সন্ততি তাদের পিতামাতার নির্দেশ সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। তারা এক্ষেত্রে অবশ্যই পিতামাতার কথা অস্বীকার করবে:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اِنۡ جَاہَدٰکَ عَلٰۤی اَنۡ تُشۡرِکَ بِیۡ مَا لَیۡسَ لَکَ بِہٖ عِلۡمٌ ۙ فَلَا تُطِعۡہُمَا وَصَاحِبۡہُمَا فِی الدُّنۡیَا مَعۡرُوۡفًا ۫ وَّاتَّبِعۡ سَبِیۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرۡجِعُکُمۡ

---

৫১৯. আল-কুরআন, ১৭ : ২২-২৪

৫২০. আহমদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসাঈ, mbv‡b bvmvC, বাব- আর রুখসাত ফিত তাখলিফ লিমান লাহু ওয়ালাদাহ, খ.১০, পৃ.২২৬, হাদিস নং-৩১১৭

“তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমার নিকট।”[৫২১]

পিতা-মাতার দেয়া চাপ না মানা থেকেই ইসলামী প্রেক্ষাপটে কর্তৃত্বের অগ্রাধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে: মুসলমান অবশ্যই আল্লাহ ও পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখবে। তবে পিতামাতাকে খুশী করতে গিয়ে কোন অবস্থাতেই আল্লাহকে অখুশী করা যাবে না। সাধারণভাবে রাসূল (সা.) এর বাণীতেই এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে: সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য দেখানো যাবে না”। (মুসলিম) এর দ্বারা এটাই বুঝায় যে, মুসলিম পরিচিতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে রক্ত সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ, তবে মানবিক সম্পর্ক নির্ণয়ে এগুলো একেবারে প্রথম ও মৌলিক শর্ত নয়। কোন মুসলমানকে যদি তার নিজের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন এবং ন্যায়বিচারের মধ্যকার কোন একটিকে বেছে নেয়ার জন্য বলা হয় তাহলে ঈমানদার হিসাবে তাকে অবশ্যই ন্যায়বিচারের বিষয়টিকেই মেনে নিতে হবে। ন্যায়বিচারের বাস্তবায়ন ও তাকে মানা আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। এটি আল্লাহর প্রতি ঈমানের আসল সাক্ষ্য।

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

ا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ بِالۡقِسۡطِ شُہَدَآءَ لِ ، وَلَوۡ عَلٰٓى اَنۡفُسِكُمۡ اَوِالۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ ۚ اِنۡ يَّكُنۡ غَنِيًّا اَوۡ فَقِيۡرًا فَاللّٰہُ اَوۡلٰى بِہِمَا ۟ فَلَا تَتَّبِعُوا الۡہَوٰۤى اَنۡ تَعۡدِلُوۡا ۚ وَ اِنۡ تَلۡوٗۤا اَوۡ تُعۡرِضُوۡا فَاِنَّ اللّٰہَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا (١٣٥)

“হে মু’মিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতার অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচানো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রাখ যে তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।”[৫২২]

মুসলিম প্রথমে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করবে, তার এ আনুগত্য সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষ ধরনের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে।

৫২১. আল-কুরআন, ৩১ : ১৫
৫২২. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতঃ সব ধরনের ইবাদতের মাধ্যমেই, বিশেষ করে যাকাতের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ববোধ সুনিশ্চিত হয় ও জোরালো হয়। যাকাত ধনীর নিকট থেকে অভাবী ও গরীবের প্রাপ্য এক ধরনের কর। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক যতই শক্তিশালী হবে ততই মানুষকে সেবা করার ইচ্ছা জোরদার হবে। যাকাতের ধারণাকে গ্রহণের বিষয়টি ইসলামের শক্তিশালী সামাজিক বাণী গ্রহণেরই নামান্তরঃ কেউ নামায আদায় করলো আর যেন সে কারো ভাই বা বোনকে তার পাওনা দিয়ে দিল। ইসলামের এরূপ ভিত্তিকে আবু বকর (রা.) বুঝেছিলেন। রাসূল (স.)-এর মৃত্যুর পর আবু বকর সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন যারা নামাজ আদায় ও যাকাত দেয়ার মধ্যে পার্থক্য করে।[৫২৩] অর্থাৎ তিনি নামায ও যাকাতকে একই গুরুত্ব সহকারে দেখেছিলেন (এ বিষয়টি ঘটেছিল দক্ষিণাঞ্চলের গোত্রগুলোর সাথে, তিনি শক্ত হাতে তাদের মোকাবেলা করেছিলেন)।

রোজাঃ রমযান মাসে রোযা রাখবার ব্যাপারেও একই অবস্থা দেখা যাবে। মুসলমানের জন্য রমযান মাস এমন হওয়া উচিত যাতে মু'মিনগণ এ সময়ে তাদের ঈমান ও আধ্যাত্মিকতাকে শক্তিমালী করতে আর সামাজিক ন্যায়বিচারের চেতনাকে সমুন্নত করতে পারে।

হজঃ অনুরূপভাবে হজ্জের দু'টো দিক আছে। মক্কায় জড়ো হওয়া মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য বড় ধরনের সাক্ষ্যের বিষয়। এ সাক্ষ্য মুসলমানগন হজের সময় লালন করে থাকে। নারী-পুরুষ, একই সম্প্রদায়ের মানুষ একই আশায়, আল্লাহকে খুশী করার লক্ষ্যে, আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য আর আখেরাতের পুরস্কারের আশায় একই কেন্দ্রে আল্লাহর ইবাদতে সমবেত হয়।

আনুগত্য মানে অন্যায়কে সমর্থন করা নয়

আনুগত্যের অনুভূতির দ্বারা এটা বুঝানো হয় না যে, নিজের ভাই হওয়ার কারণে কোন কাজে অন্যায়কে সমর্থন করা হবে। অপরপক্ষে ধর্মের কারণে তা নয়।

রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে জোর দিয়ে বলেন : 'তোমার ভাই ভুল করুক আর শুদ্ধ করুক তাকে তুমি সাহায্য কর বা কেউ যদি তার প্রতি অন্যায় করে থাকে তবু তাকে সাহায্য কর। রাসূল (সা.)-এর এ কথা শুনে জনৈক সাহাবী প্রতিবাদ করে বললেন, 'হে আল্লাহর বার্তাবাহক (সা.), কারো প্রতি যুলুম করা হলে

৫২৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারীঃ mnxûj eLvix, দেওবন্দঃ দার‍ুল কিতাব, তাবি. হাদিস নং- ৩২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তাকে সাহায্য করতে হবে সেটা বুঝলাম কিন্তু যখন সে নিজেই ভুল করে বা অন্যায় করে তখন তাকে কিভাবে সাহায্য করব?' রাসূল (স.) তার কথার জবাব দিয়ে বললেন, 'তাকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখ। এটিই তার প্রতি তোমার সাহায্য'।[৫২৪]

আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর নির্দেশ মোতাবেক এ আনুগত্য পরিচালিত হবে, না হয় এটি রক্তারক্তি বা গোত্রীয় সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এটি ইসলামের বিপরীত।

সবার উর্ধ্বে ন্যায় বিচার

ন্যায়বিচার থাকবে আবেগের উর্ধ্বে, স্নেহ মমতা ও দয়া দাক্ষিণ্যের উর্ধ্বে।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۫ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (٨)

"হে মু'মিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"[৫২৫]

ন্যায়বিচারের নীতি ও আল্লাহর একত্ববাদে (তাওহিদ) ইসলামী শিক্ষা নিহিত। এ শিক্ষা মুসলমানদের পক্ষে হোক আর বিপক্ষে হোক প্রথমেই এর প্রয়োগ হতে হবে। হৃদয়-মন, আবেগ বা স্নেহ মমতা সবকিছুই নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এগুলোর মাধ্যমেই মানুষ একত্রে বসবাস করবে।

মুসলমানদের জীবনে ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে এরপরও এখানে অন্যায়-অবিচার করার কোন সুযোগ নেই। মুসলমানরা বিশ্বাস, বিবেক আর ন্যায়বিচারের ধারণাতে আবদ্ধ। মুসলমান আর অমুসলমান কারো জন্যই এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। পশ্চিমের দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য এর কতকগুলো নীতি অনুসরণের বিষয় আছে। নাগরিক বা বাসিন্দা হিসাবে তাদেরকে চুক্তির শর্তাবলী অনুসরণ করে চলতে হয়। কুরআন ও সুন্নাহ তাদের রেফারেন্স হলেও তাদেরকে বসবাসকারী দেশের সংবিধানের শর্তাবলী মেনেই চলতে হয়। তবে বিবেকের মধ্যে থাকা পর্যন্ত এ

---

৫২৪. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ:mnxm gmwjg, দেওবন্দ: দারুল কিতাব, তাবি. হাদিস নং-৩২২৮
৫২৫. আল-কুরআন, ৫ : ৮

বিধিবিধান তাদেরকে মানতে হয়। কোন সময় বিবেকের প্রশ্নে অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় তাদেরকেও নৈতিক আপত্তি মেনে চলতে হয়। বিবেকের বিষয়টিকে আইন সমর্থন করে। অন্যভাবে বলতে গেলে অনুগত্যের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়া মানার ব্যাপারে কোন কোন পন্ডিতের বক্তব্য রয়েছে। তাদের মতে শরীয়ার বিধি হলো বসবাসকারী দেশের আইনী কাঠামো মুসলমানদেরকে মানতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে ইসলামী শিক্ষার নীতি ও আদর্শ মানার বিষয়টি দায়িত্বশীল নাগরিক জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে।

প্রতিশ্রুতি ও আমানত রক্ষা করার নির্দেশ

মুসলিম উম্মাহ যখন কোন প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বাধ্যবাধকতার মুখোমুখি হয় তখনই মুসলমানদেরকে এরূপ বিধিনিষেধ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট বাণী রয়েছে:

وَ اَوۡفُوۡا بِالۡعَہۡدِ ۚ اِنَّ الۡعَہۡدَ کَانَ مَسۡـُٔوۡلًا (٣٤)

"প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[৫২৬]

وَالَّذِیۡنَ ہُمۡ لِاَمٰنٰتِہِمۡ وَ عَہۡدِہِمۡ رٰعُوۡنَ ۙ(٨)

"তারাই বিশ্বাসী যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"[৫২৭]

এটা সত্য যে, কোন দেশে মুসলমানদের সাথে খারাপ আচরণ করা হয় বা নির্যাতন করা হয় যে দেশের সাথে অন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি আছে তখন শেষোক্ত মুসলিম চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে প্রথমোক্ত দেশের মুসিলম নির্যাতনে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কুরআনে বলা হয়েছে:

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَہَاجَرُوۡا وَجٰہَدُوۡا بِاَمۡوَالِہِمۡ وَاَنۡفُسِہِمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَالَّذِیۡنَ اٰوَوۡا وَّ نَصَرُوۡۤا اُولٰٓئِکَ بَعۡضُہُمۡ اَوۡلِیَآءُ بَعۡضٍ ؕ وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَلَمۡ یُہَاجِرُوۡا مَا لَکُمۡ مِّنۡ وَّلَایَتِہِمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ حَتّٰی یُہَاجِرُوۡا ۚ وَاِنِ اسۡتَنۡصَرُوۡکُمۡ فِی الدِّیۡنِ فَعَلَیۡکُمُ النَّصۡرُ اِلَّا عَلٰی قَوۡمٍۭ بَیۡنَکُمۡ وَ بَیۡنَہُمۡ مِّیۡثَاقٌ ؕ وَاللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌ (٧٢)

"যারা ঈমান এনেছে, হিযরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিযরত করেনি, হিযরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমার নেই। আর দীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।"[528]

এ আয়াতে এমন একটা অবস্থার কথা বলা হয়েছে যখন মদীনার ন্যায় একটা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল আর অমুসলিম প্রতিবেশী ছিল। এ প্রেক্ষিতে এখান থেকে আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

---

[৫২৬]আল-কুরআন, ১৭ : ৩৪
[৫২৭]আল-কুরআন, ২৩ : ৮
[৫২৮]আল-কুরআন, ৮ : ৭২

১. মুসলমানরা তাঁদের অনুসারী ভাইদের অন্য স্থানে বসবাসের জন্য দায়ী নয় যারা অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করতে বাধ্য (স্পষ্ট বা মৌন কোন চুক্তির মাধ্যমে),

২. মুসলিম কোন ভাইবোন ধর্মীয় কারণে কারো দ্বারা নির্যাতিত হলে মুসলমানদের উচিত তার প্রতিবাদ করা।

৩. ইবাদতের স্বাধীনতা একটি পবিত্র অধিকার, মযলুমদের ধর্ম যাই হোক ধর্মীয় অধিকারকে রক্ষা করতে হবে ও সমর্থন করতে হবে। এটি বর্তমান আয়াতের বিষয় না হলেও সেটির ওপর ইসলামের এটি একটি বাণী।

৪. কোন চুক্তি বিদ্যমান থাকাকালে নির্যাতিতকে উদ্ধার করা যাবে না (মিত্রতার চুক্তি বা হস্তক্ষেপ না করার চুক্তি)। চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ করা হলে চুক্তির শর্তাবলীর একতরফা লংঘন করা হবে।[৫২৯]

এ তিনটি বিষয় উম্মাহর আলোচনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম পরিবারের অংশবিশেষ ন্যায়বিচারের নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়, মুসলিমদের চুক্তিকৃত শর্তাবলীর দ্বারা, কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় হিসাবে যেকোন অবস্থায় মুসলিম পরিচয় লাভ করে।

প্রথমত: মুসলিমের বিশ্বাসের আলোকে ন্যায়বিচারের বিষয়টি যেকোন অবস্থায় তার নির্ণায়ক হতে বাধ্য। ‘আমরা সবাই মুসলিম’ এ ধরনের আনুগত্য এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়, মুসলমানকে প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে আল্লাহতে বিশ্বাস করে, সৃষ্টিকর্তা কখনো মিথ্যা, ব্যক্তি বা সমাজের অবিচার ও প্রতারণা গ্রহণ করে না। মুসলমানদেরকে হতে হবে সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য। দ্বিতীয়ত, চুক্তি আমাদের মর্যাদা, কর্তব্য, অধিকার কাজের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ধারণ করে। একবার রাযী হয়ে গেলে চুক্তির ধারা পূর্ণ করতে হবে, চুক্তিতে কখনো মুসলমানদের বিরোধী কিছু পাওয়া গেলে, মু’মিনদেরকে চুক্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কেননা কোন চুক্তি এককভাবে ভঙ্গ করার অধিকার মুসলমানদের নেই।

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

৫২৯. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৭

অমুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা যাবে না। ধর্ম পালনে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

اَلَّذِيۡنَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ يُحۡسِنُوۡنَ صُنۡعًا (١٠٤)اُولٰٓـئِكَ
الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ فَلَا نُقِيۡمُ لَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَزۡنًا (١٠٥)ذٰلِكَ
جَزَآؤُهُمۡ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوۡا وَاتَّخَذُوۡۤا اٰيٰتِىۡ وَرُسُلِىۡ هُزُوًا (١٠٦)

তারা ঐসব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই ব্যার্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারা ভাল কা করছে। তারা এমন লোক যারা রবের নিদর্শনাবলী ও তার সংগে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের যাবতীয় কর্ম নষ্ট হয়েছে। কেয়ামতের দিন তাদের আমলের জন্য কোন ওজনই প্রতিষ্ঠা করব না। এ জাহান্নামই হবে তাদের প্রাপ্য। কেননা, তারা কুফুরী করেছিল, এবং তারা আমার আয়াতসমূহ ও রাসূলদেরকে উপহাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।[৫৩০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِىَ دِيۡنِ ٪(٦)

অর্থ: "তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।"[৫৩১]

অন্য আয়াতে এসেছে,

لَاۤ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۙۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الۡغَىِّ ۚ فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَيُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ
فَقَدِ اسۡتَمۡسَكَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰى * لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ (٢٥٦)

অর্থ: "দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যে তাগূতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনিবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।"[৫৩২]

৯.৩: ইসলামী প্রবণতার মতবাদ সমূহ

৫৩০. আল-কোরআন, ১৮ : ১০৪-১০৬
৫৩১. আল-কুরআন, ১০৯ : ৬
৫৩২. আল-কুরআন, ২ : ২৫৬

ইউরোপের ইসলামী গ্রুপগুলোর জন্য এক্ষুণি বিশেষ কোন রাস্তা খোলা দেখা যাচ্ছে না। অনেক দলাদলির মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রবণতা আর কর্মকাণ্ডকে কষ্টের সাথে সনাক্ত করতে হবে। এ দলে কারা আসছে? তারা কি চায়? এ তৃতীয় দলের দর্শন কি? কেউ কেউ মতামতের সূক্ষ্ম তারতম্যের ব্যাপারে কোন কিছু মনে করে না, তারা কোন ভাবনা চিন্তা ছাড়াই মুসলমানদেরকে দু'টো শিবিরে ভাগ করে ফেলে: এক পক্ষে 'মৌলবাদী' বা 'আমূল সংস্কারবাদী' (এদেরকে বিশ্বাস করা হয় না), অপরপক্ষে 'মধ্যপন্থী' (তাদেরকেই কেবল সমর্থন করা হয়)। বিষয়টি দ্বি-মাত্রিক, অত্যন্ত সোজা ও সহজেই মোকাবেলাযোগ্য। তবে ভূ-খণ্ডের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন বিষয় অনেক জটিল ও প্যাঁছানো।[৫৩৩]

শিক্ষা সংক্রান্ত ঐতিহ্যবাদ

শিক্ষা বিষয়ক ঐতিহ্যবাদের আন্দোলনের বিষয়টি ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যান্ডে অবস্থিত ইন্দো-পাকিস্তানী বা জার্মানীর তুর্কীদের মধ্যে দেখা যায়। অন্যান্য দেশের ছোট ছোট গোত্রগুলোর মধ্যেও এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। তাদের আন্দোলনের বিষয়টি প্রথমত ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইউরোপে তাদের সামাজিক অঙ্গীকার, রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক কোন বিষয়ের সাথে এ আন্দোলনের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। কুরআন সুন্নাহর বিষয়ে তাদের মূল্যায়ন আর ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠানের ওপর অগ্রাধিকার প্রদানের কারণে তাদেরকে ইউরোপীয় সমাজে কোনরূপ হিসাবেও ধরা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে বাদও দেয়া হয়। শুধু তাই নয় কোন কোন সময় সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা অংশগ্রহণও করে না। তাদের যাবতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শিক্ষার বিষয়টি কোন মাযহাবের আইনগত নীতির ঐতিহ্যগত মূল্যায়নের নিরিখে করা হয়।[৫৩৪]

সালাফী ঐতিহ্যবাদ

এ মতবাদের বিষয়ের সাথে পূর্বে আলোচিত শিক্ষাগত ঐতিহ্যবাদের কিছু পার্থক্য রয়েছে। সালাফী ঐতিহ্যবাদীদের মূল্যায়নে কুরআন-সুন্নাহ'র ক্ষেত্রে মাযহাবের আর আলেমদের মধ্যস্থতার বিষয়টিকে গ্রহণ করা হয় না, তারা নিজেদেরকে 'সালাফ' বলে। তাদের মতে তারা রাসূল (সা.) ও ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের ধর্মভীরু মুসলমানদের অনুসরণ করে। সেজন্য তারা 'সালাফী'। এ মতবাদে কুরআন ও সুন্নাহকে মাযহাব নির্ধারিত সীমার বাইরে আলোচনা করা হয়। এ আন্দোলনটি তার আক্ষরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে

৫৩৩. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২
৫৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৪

ঐতিহ্যবাদ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। এ আন্দোলন কুরআন-সুন্নাহর কথা বলতে গিয়ে কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক মূল্যায়নে যায় না। এ মাযহাবের লোকজনকে আহলে হাদিস বলে।[৫৩৫]

"সালাফীরা' সবসময় কুরআন ও সুন্নাহর সত্যনিষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতন। তারা সব কিছুকে কুরআন সুন্নাহর নিরিখে মূল্যায়ন করে। ইবাদত আর সামাজিক জীবনের পোষাক-পরিচ্ছদ তাদের মতবাদের মূল বিষয়। আক্ষরিক অর্থে আর বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তারা শুধু কুরআন সুন্নাহকে অনুসরণ করে, এর কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তারা মানতে নারায, তাদের মতে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিদআত।

সৌদি আরব, জর্দান, মিশর বা সিরিয়ার কিছু কিছু উলামা (এসব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরাতন ছাত্রদের মাধ্যমে বিদ্যমান সম্পর্ক) আর 'সালাফী' ঐতিহ্যবাদী ও তাদের গ্রুপকে ইউরোপের যেকোন স্থানে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এখানে দারুল কুফর বা দারুল হারব ধারণা কাজ করে আর সামাজিক ক্ষেত্রে 'সালাফীদের' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 'সালাফীরা' নিজেদেরকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে আর আক্ষরিক অর্থে ধর্ম পালন করে এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে।

সালাফী সংস্কারবাদ

সীমানার ব্যাপারে সালাফী[৫৩৬] সংস্কারবাদীদের সাথে ঐতিহ্যবাদী সালাফীদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সংস্কারবাদী সালাফীরা কুরআন-সুন্নাহর আদি শক্তি পুনরুদ্ধারে মাযহাবের বাইরে নিজেদেরকে কল্পনা করে। তারা নিজেরদেরকে সালাফী বলে পরিচয় দেয়। এ সালাফীরা নিজেদের প্রথম প্রজন্মের মুসলমান বলে মনে করে। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে যেসব একক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়েছে সেগুলোকে পরিহারের লক্ষ্যেই তারা নিজেদেরকে ভেবে থাকে। ঐতিহ্যবাদীরা কুরআন-সুন্নাহর ওপর জোর দিলেও তারা যে বিভিন্ন আইনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আর ফিকহর ওপর গুরুত্ব দেয় সে বিষয়টি তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আহলুর রায়ের মতবাদ অনুযায়ী ইজতিহাদ লক্ষ্য অর্জনে স্থায়ী আর সকল যুগে ও সকল স্থানে ব্যবহারের জন্য ফিকহর প্রয়োগ জরুরী।

ইউরোপের বেশীর ভাগ সালাফী মতবাদীর অভ্যুদয় ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। সংস্কারবাদী চিন্তাবিদদের প্রভাবেই তাদের আবির্ভাব হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– আল আফগানী, আবদ, রিদা, আল নুসরী, ইকবাল, ইবনে বাদিশ, আল বান্না, আল ফাসী, বেন্নাবী, আল মওদূদী, কুতুব,

[৫৩৫] Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ.১৮, পৃ.৩১২
[৫৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৭

শরীয়তী। এ তালিকায় আরো নাম রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে তাদের প্রভাব সীমিত ছিল। এ সংস্কারবাদীদের সবাই যে একই ধারণা পোষণ করতেন তা নয়। তাদের মতের ভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে না। তবে এক জায়গায় তাদের মিল আছে। ধর্মগ্রন্থীয় সূত্র বা কুরআন-সুন্নাহর সূত্র ব্যবহারের অদম্য ইচ্ছার মিল এখানে পরিলক্ষিত হয়। তাদের যুগের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সমাজের রাজনৈতিক বিকাশ সাধনে উভয় গ্রুপই মূল সূত্র প্রয়োগে একই পন্থা অনুসরণ করে।[৫৩৭]

সংস্কারবাদী সালাফী বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপে আসার সাথে সাথে এবং মিশর, সিরিয়ার স্বাধীনতার পর মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে নির্যাতনের কাজে জড়িয়ে পড়ে (ষাট ও সত্তর দশকের মধ্যে)। পরের দিকে স্থানীয় রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জিতেও এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়। যেমন, তিউনিশিয়ার আল নাহদা আন্দোলন, মরক্কোর আল আদল ওয়াল ইহসান, আলজিরিয়ার আল জাজারা বা মুসলিম ব্রাদারহুড। এসব আন্দোলন ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য আন্দোলনের সাথে দু'টো ভিন্ন ধারার জন্ম দেয়। এর প্রথমটি হলো সবচেয়ে বিখ্যাত সালাফী সংস্কারবাদীদের আইনগত ঐতিহ্যের ধারা। এ ধারার উদ্দেশ্য হলো ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে সংস্কারবাদ গ্রহণ করা। পদ্ধতিগত বিষয় হিসাবে মূল মাযহাব একটা রেফারেন্স হিসাবেই থেকে যায়। এটির আবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সম্ভাবনাও থাকে আর জীবনের নতুন প্রেক্ষাপটে ইজতিহাদ প্রয়োগের সুযোগও এখানে সৃষ্টি হয়। সংস্কারবাদী দর্শন আর পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য দ্বারা কোন গ্রুপ বা সংগঠনের ন্যায় কোন কাঠামোগত অনুগামিতাকে (Structural adherence) বুঝানো হয় না। ইউরোপে এ দর্শনের অনেক বিকাশ ঘটেছে। সালাফীরা মূল সংস্কারবাদী চেতনার প্রতি অনুগত থেকেছে। এ দর্শনের লক্ষ্যই ছিল মুসলিম সত্তা, আল্লাহর ইবাদতের সংরক্ষণ আর ইউরোপের সাংবিধানিক কাঠামোর স্বীকৃতি, নাগরিক হিসাবে সামাজিক পর্যায়ে বিকাশ সাধন, দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে বসবাস করা। সালাফী দর্শন পশ্চিমা দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এ দলের কুরআন-সুন্নাহর মূল্যায়নের দ্বারা অনেকগুলো গ্রুপই প্রভাবিত হয়েছে আর প্রয়োজন মোতাবেক সেগুলোকে খাপখাওয়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।[৫৩৮]

রাজনৈতিক ও অক্ষরবাদী সালাফিয়্যা

---

৫৩৭. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৫৩৮. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

এ ধারার কিছু কিছু উলামা ও বুদ্ধিজীবী কঠোর ও ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক অঙ্গীকারের দিকে ঝুঁকে পড়ে (তারা ইসলামী বিশ্বের হলেও)। তাদের মতে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ছাড়া সংস্কারবাদের কিছুই ছিল না। তাদের মধ্যে এ ধারণার জন্ম হয় কুরআন-সুন্নাহর আক্ষরিক মূল্যায়নের কারণে। শুধু তাই নয়, তাদের এই ধারণার সাথে রাজনৈতিক সংশ্লেষণও বিদ্যমান ছিল। ক্ষমতার ব্যবস্থাপনা, খেলাফত, কর্তৃত্ব ও আইন বিষয়ের কাজই ছিল তাদের মূল কাজ। এর ফলে আমূল বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের (Redical revolutionary) ন্যায় মিশ্র জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়, সরকার আর সরকারের বিরোধীদের নিয়ে ছিল এর কর্মকাণ্ড। ইউরোপেও এ অবস্থা দেখা যায়। ইসলামী রাষ্ট্র তথা খেলাফত প্রতিষ্ঠার লড়াইও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ছিল। এ ধারার অনুসারীদের আলোচনা ছিল ক্ষিপ্র, রাজনীতিযুক্ত, র‍্যাডিক্যাল আর ইউরোপীয় সমাজে এর কোন দালালিপনার চিহ্নটুকুও ছিল না। এ দালালিপনাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ বিষয় হিসাবেই মনে করা হতো। এ জাতীয় আন্দোলনগুলোর মধ্যে ইউরোপে হিযবুত তাহরির বা মুয়্যাহিদুন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়েছিল। (পশ্চিমা দেশগুলোকে সবসময় দারুল হারব মনে করা হতো)। এ ধারাটি ইউরোপে বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হলেও ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানদের ০.৫% এর কম এ ধারা সমর্থন করেছিল।[৫৩৯]

উদারবাদী বা যুক্তিবাদী সংস্কারবাদ

এ ধারাটির সৃষ্টি হয় উপনিবেশবাদী যুগে পশ্চিমা দর্শনের প্রভাবে। এ সংস্কারবাদী মতবাদকে উদারবাদী বা সংস্কারবাদী বলা হয়। এ সংস্কারবাদীরা ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতির সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন পদ্ধতিকে ইসলামী বিশ্বে গ্রহণের বিষয়টি সমর্থন করে। উদারবাদীরা তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচীকে সমর্থন করে। এ পদ্ধতিতে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে দেয়া হয়। ইউরোপে উদারপন্থী সংস্কারবাদীরা মুসলমানদের আত্মীয়করণ-একীভূতকরণকে সমর্থন করে। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে তারা ইউরোপীয় জীবনধারাকে কবুল করার প্রত্যাশা করে। তারা দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগীর ওপর জোর দেয় না, তারা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপরই বা জন্ম সংস্কৃতির ওপরই জোর দিয়ে থাকে। এ ধারার অনেকেই বিশেষ ধরনের পোষাকের বিরোধী। তাদের মতে এ ধরনের পোষাক মানে এক ঘরে হয়ে যাওয়া বা মৌলবাদকে অনুসরণ করা। ক্রমবিবর্তনের ধারার কথা মনে রাখলে কুরআন ও সুন্নাহকে আচরণের মানদণ্ডের জন্য রেফারেন্সের কাঠামো হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। আর এর মধ্য দিয়েই সামাজিক আচরণের মানদণ্ড নির্ণয় করা হবে। উদারবাদ বা Liberalism

৫৩৯. তারিক রমাদান, (অনু. এম রুহুল আমিন), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

শব্দটি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে এসেছে, উদারবাদে যুক্তিবাদের সুযোগ আছে, এটি আবার ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ববাদের ওপর গড়ে উঠে।[৫৪০]

সুফীবাদ[৫৪১]

ইউরোপীয় দেশ থেকে চিন্তার সময় আমরা সুফীবাদকে বাদ দিতে পারি না। সুফীবাদ আসলে অনেক ধরনের আর অনেক বেশী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নকশবন্দিয়া, কাদেরীয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া বা অন্য যে কোন তরীকার সুফীবাদ। সুফীবাদ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন আর মরমী জীবন নিয়ে কথা বলে। এর দ্বারা এসব তরীকার মুরীদরা যে সামাজিক বা সম্প্রদায়িক কোন কাজে জড়িত হয় না তা নয়। বরং এর বিপরীতটাই প্রায় ঘটে থাকে। দিনের শেষে সর্বোপরি অগ্রাধিকারের বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বন্টন করা হয়। সুফী শিক্ষা অনুসারে ধ্যান কাজ আর উপলব্ধির জন্য সময়ের প্রয়োজন। ধর্মগ্রন্থীয় মূল পাঠের গভীর অর্থ রয়েছে। মানুষের আন্তঃজীবনের এটি এক আহ্বান। এখানে কোন ক্রোধ বা দ্বন্দ্ব নেই। কুরআন-সুন্নাহ হলো এখানে চূড়ান্ত সূত্র। এ সূত্রই আল্লাহর যিকিরের রাস্তা আর আল্লাহর সান্নিধ্যের উপায় : আল্লাহর কাছাকাছি পৌছার পথ। কোন বিশেষ বংশ পরম্পরায় অভ্যন্তরীণভাবে কম-বেশী সংগঠিত মুরীদদের দ্বারাই বিভিন্ন তরীকার উৎপত্তি। এ ভাবেই মুরিদ আর শায়েখের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রতিটি তরীকার আলাদা আলাদা কর্ম পদ্ধতি আছে।

ইউরোপেও খুবই সংগঠিত ও সরাসরি এশিয়া, উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার ব্রাদারহুডের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্রাদারহুডকে দেখা যায়। এ মুরীদরা একটা সীমিত পরিসরে তাদের কাজ করে থাকে। তবে এরপরও নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত কার্যকর নেটওয়ার্ক বজায় রাখে। তারা পরস্পরকে সমর্থন দেয়।

৯.৪: ইসলাম ও সালিশী

৫৪০. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

৫৪১. “মরমিবাদ মুসলিম দর্শনে সুফিবাদ (আত্তাসাউফ) নামে খ্যাত। মোল্লা জামি ও তাঁর অনুসারীরা ‘সাফা’ (পবিত্রতা) শব্দ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি নির্দেশ করেন। তাঁদের মতে সুফিরা পুত চরিত্রের অধিকারী। সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের ‘বাতেনি; (গূঢ়) দিকের পরিচায়ক, শরিয়ত যেমন এর সামাজিক বিধি-বিধানের নির্দেশক। ইমাম হাসান আল-বসরিকে (মৃত্যু ১১০ হিজরি) সাধারণত প্রথম সুফি হিসেবে মনে করা হয়। তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বসরায় বাস করেন।” we¯ÍwiZ: ড. রশীদুল আলম, gmwjg ‘k‡bi fwgKv; ঢাকাঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৯: পৃ.১৩২

ইসলাম-পন্থীদের মধ্যে শান্তি ও সংহতি অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে ইসলামের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে দুইটি বিবাদমান মুসলিম দলের মধ্যে আপোষ-রফা কিংবা বিরোধ মীমাংসার মাধ্যম হিসেবে ইসলাম আরবের সালিশী ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দান করেছে। ইসলামের নীতি লঙ্ঘন করা না হলে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সালিশী অনুমোদিত ছিল। আল-কোরআনের নির্দেশ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর (সা.) কার্যাবলীতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত (সা.) ও ইহুদী গোত্র বানু কুরাইজার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে সালিশীর নজিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে উভয়পক্ষই তাঁদের বিরোধ সংকান্ত বিষয়টি তাঁদের মনোনীত একজন লোকের নিকট মীমাংসার জন্য পেশ করতে সম্মত হন।

এ বিষয়টির কথা উল্লেখ করে আল-শায়বানি বলেন যে, ইমাম সমগ্র যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কিংবা কোন খণ্ড যুদ্ধের বিরোধমূলক বিষয়টি পেশ করতে পারেন। সকলের নিকট সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য একজন ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান মুসলমানকেই সালিশ নিযুক্ত করতে হবে। তাঁতে যদি উভয়পক্ষই স্বেচ্ছায় নিযুক্ত করে থাকেন, তবে তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন। অবশ্য যদি পূর্বাহ্নে তাঁদের মতামত না নিয়েই তিনি নিযুক্ত হয়ে থাকেন কিংবা তিনি এমন বিবাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, যার সঙ্গে তাঁর মাতা-পিতা, স্ত্রী অথবা তাঁর সন্তান-সন্ততি সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে সে ব্যাপারে তাঁর রায় গ্রাহ্য হবে না।[৫৪২]

প্রাক-ইসলামী যুগে সালিশী ব্যবস্থা

সাধারণভাবে স্বীকৃত সামাজিক রীতি ও প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিবাদমান পক্ষসমূহের বিরোধ মীমাংসার নীতি হিসেবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সালিশীর ব্যবস্থা চলে আসছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, শান্তিপুর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা। তবে প্রকৃতপক্ষে, কোন পক্ষের দাবীর যথার্থতা নিরূপণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে না পৌঁছে, পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ফলে সালিশী অনেকটা মীমাংসাভিত্তিক ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুতঃ এই ব্যবস্থা এত প্রাচীন যে, খৃস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে মেসোপটেমীর নগর-রাষ্ট্র লাগাশের শাসনকর্তা ইয়েনাটম ও মেসোপটেমিয়ার অন্যতম নগর-রাষ্ট্র উম্মার অধিবাসীদের মধ্যে সালিশীর মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা হয়। এ ব্যাপারে উভয়পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সালিশীর একটি ধারার সংযোজন

৫৪২. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

দেখা যায়। নিকট-প্রাচ্যের ইতিহাসে সালিশীর অনুরূপ আরো অনেক নজির পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন গ্রীসেই এ ব্যবস্থার ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়।[৫৪৩]

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সীমানা ও নদ-নদী নিয়ে এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিরোধ দেখা দিলে সালিশীর ব্যবস্থা করা হত। বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে ডেলফীর দৈববাণীও অনেক সময় সালিশের কাজ করত এবং এর রায় প্রায় সবাই মাথা পেতে স্বীকার করে নিত। বিবাদমান দেশগুলোর বাইরের তৃতীয় কোন রাষ্ট্রকেও সালিশ মানা হত। এই মধ্যস্থ রাষ্ট্র সাধারণতঃ বিরোধের কারণ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করত এবং এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিরোধমূলক বিষয় সম্পর্কে রায় প্রদান করতেন।[৫৪৪]

৯.৫: আন্তর্জাতিক বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপনই কূটনীতির লক্ষ্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধ কি আইনগত অথবা রাজনৈতিক অথবা অন্য কিছু তা বিবেচ্য বিষয়। এখানে আমাদের আলোচনা কেবল এদের মীমাংসার বিভিন্ন পন্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌঁছা হ'ল প্রথম এবং সহজতম পন্থা। স্থায়ী অথবা বিশেষ এবং অসাধারণ দূতদের মারফৎ এ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

মীমাংসাকরণ, মধ্যস্থতা, এবং প্রভাব বিস্তার (good offices) এই সব বিভিন্ন পরিভাষা দ্বারা এমন একটি তৃতীয় পক্ষের কথা বুঝায় যা বিবাদমান উভয় রাষ্ট্রের বন্ধু এবং যা পারস্পরিক সমঝোতার যোগসূত্র হিসেবে বিবাদমান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বন্ধুসুলভ পরামর্শ ও উপদেশ দান করে। ইবনে হিশাম উল্লেখ করেন যে, ১লা হিজরীতে প্রিয় নবী (সা.) মক্কা নগরী-রাষ্ট্রের কাফেলার বিরুদ্ধে প্রথম অথবা প্রথম দু'টির একটি অভিযান হামজার নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। ইয়ানবু সমুদ্র উপকূলে হামজা শত্রুর সম্মুখীন হন। শত্রুপক্ষের নেতৃত্ব করছিল আবু জাহিল। যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু মাজদী ইবনে আমর (যার সাথে মক্কা ও মুসলিম উভয় রাষ্ট্রের সদ্ভাব ছিল,) হস্তক্ষেপ করায় তাদের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি হয় এবং উভয় দল নীরবে যার যার পথে প্রস্থান করে। উবাই ইবনে সালুলের ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা

৫৪৩. সৈয়দ আমীর আলী, (অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সম্পা. ড. মফীজুল্লাহ কবীর), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৫৪৪. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

যেতে পারে। তিনি মুসলিম নাগরিক হলেও ইহুদী কাইনুকা গোত্রের একজন পুরানো মিত্র হিসেবে নবীর নিকট তাদের পক্ষে ওকালতি করেন এবং প্রিয় নবী (সা.)ও তার অনুরোধ রক্ষা করেন।[৫৪৫]

তৃতীয় এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হল সালিশী। সালিশী বলতে বুঝায় বিবাদমান দল কর্তৃক মনোনীত এক বা একাধিক সালিশের রায়ের মাধ্যমে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধের বিচার-নিষ্পত্তি। যে তাহাকে হাকাম (সালিশ) নিয়োগ করেছে এর অর্থ হল বিবাদমান দুটি দলের মধ্যে রায় প্রদানের নির্দেশ এবং উক্ত রায় উভয় দলের মধ্যে কার্যকরী করার সম্মতি। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে এই শর্ত সাপেক্ষ ইহুদী বানু কুরাইজা গোত্রের লোকেরা আত্মসমর্পণ করলে তাদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে যে সালিশী হয় প্রিয় নবী (সা.)-এর আমলে তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলা। নবী এই সালিশীর রায় সম্পূর্ণরূপে পালন করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে নিম্নোক্ত পর্যায়ের ব্যক্তিগণ সালিশ হিসেবে নিযুক্ত হবার যোগ্য নয় যেমন সম্মানীত মহিলাদেরকে অপবাদ দেওয়ার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত মুসলিম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, স্ত্রীলোক, দাস, অন্ধ, 'ফাসেক' সন্দেহ চরিত্র অথবা সর্বজন পরিচিত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি এমন কোন মুসলিম যে সালিশীর অন্যপক্ষের হস্তে বন্দী, বিপক্ষ দলের রাজ্যের মুসলিম ব্যবসায়ী, বিপক্ষ অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম প্রজা, চাই সে নিজের দেশে থাকুক কিংবা মুসলিম শিবিরে থাকুক। আমাদের এই লেখকের মতে একজন সালিশ অবশ্যই নিম্নোক্ত গুণের অধিকারী হবেন ঃ

"বিভিন্ন কার্যকলাপে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, ধর্মীয় ব্যাপারে নিষ্ঠাবান, মুসলমানদের মধ্যে আস্থাভাজন বলে যার প্রাধান্য রয়েছে এবং আইনে যার গভীর জ্ঞান রয়েছে এমন ব্যক্তিকে এরূপ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।[৫৪৬]

৯.৬: শত্রুদের সঙ্গে আচরণ

যুদ্ধ ঘোষণার পর শত্রু ইসলামী রাষ্ট্রে থাকতে পারত, যারা পূর্বে অনুমতিক্রমে আসত অথবা তাদের নিজ এলাকায় কিংবা যুদ্ধরত এলাকায় থাকতে পারত। এদের প্রত্যেকের সংগে আচরণ বিভিন্ন প্রকার হবে।

বসবাসকারী বিদেশী শত্রু

মুসতামিন শব্দের অর্থ মুসলিম আইনের পরিভাষায় বলতে গেলে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যে অনুমতিক্রমে সাময়িকভাবে বিদেশে বাস করে। অমুসলমান এলাকায় মুসলমান গেলে এবং মুসলমান এলাকায় অমুসলমান গেলে কিংবা মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকের ক্ষেত্রে যাকে মাওয়ালী বলে।

৫৪৫. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪
৫৪৬. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

কিন্তু এই অধ্যায়ে প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে তাকেও মুসতামিন বলা হবে, কিংবা মিত্রতার সম্পর্ক নেই এমন কি যুদ্ধমান রাষ্ট্রের নাগরিকের ক্ষেত্রে আরবীতে কোনো পৃথক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। সকলকেই মুসতা'মিন বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ শব্দগত অর্থ হল যে আত্মরক্ষা চায়।[৫৪৭]

এইরূপ একজন বিদেশী বসবাসকারী যে মুসলিম এলাকায় থাকত, পূর্বের মতো সে নিরাপদে থাকত। যদি তার রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। পাসপোর্টের আইন অনুসারে তার ইচ্ছামতো সে তার দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারত ঃ এমনকি সে তার সংগে বিষয়-সম্পত্তিও নিয়ে যেতে পারত। তথাপি সে যা সংগে এনেছিল তা সে ফেরত নিতে পারত। নতুন ক্রয় করা দ্রব্যাদি সে মুসলিম রাষ্ট্রে বিক্রয় অথবা কাকেও হস্তান্তর করতে পারত। সাধারণতঃ বিদেশী বসবাসকারী মুসলিম এলাকা থেকে যেদিকে খুশী যেতে পারত তথাপি তাদের বড় কোনো দলকে ঐ রাষ্ট্রে যেতে দেওয়া হত না, যার সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধ চলত, যদিও এরূপ আশংকা করা হত যে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধমান জাতির সঙ্গে হাত মিলাবে। যাহোক তারা নিরাপদে নিজেদের দেশে চলে যেতে পারে যদিও সে দেশ মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকে। কারণ তাদেরকে ধরে রাখলে চুক্তির খেলাফ হবে। যদি কোনো মুসতা'মিন গুপ্তচরবৃত্তি করে তা'হলে সে তার নিরাপত্তা হারাবে। এটা তখনই ঘটবে যখন কোনো যুদ্ধমান রাষ্ট্রের মুসতা'মিন ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহির্গত হয়। তখন সে সংগে সংগে সাধারণ যুদ্ধরত নাগরিকে পরিণত হয় এবং মুসলিম এলাকা থাকাকালে যে নিরাপত্তা সে ভোগ করত তারও অবসান হবে।

আভ্যন্তরীণ শত্রু

গৃহে অবস্থানকারী শত্রুদিগকে অবরোধের কারণে দুঃখ-কষ্ট ও অন্যান্য পরিস্থিতিকে সহ্য করতে হবে। যখন তাদের শহর মুসলিম বাহিনী কর্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হয়, তাদের প্রতি আচরণ কিরূপ হবে তা নির্ভর করবে আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর উপর অথবা প্রধান সেনাপতির সাধারণ ঘোষণার উপর।[৫৪৮]

যুদ্ধরত এলাকায় শত্রু সম্পর্কে

যুদ্ধরত এলাকায় শত্রু যোদ্ধা শুধু নয়, অন্যান্যরাও পূর্ণ নিরাপত্তা দাবী করতে পারত না। অবশ্যই মুসলমান সৈন্যগণকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের, স্ত্রীলোকগণেরও নাবালক এবং

৫৪৭. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
৫৪৮. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণের উপর কামানগোলা না ছুঁড়ে তথাপি যদি কোনো ক্ষয়-ক্ষতি অনিচ্ছায় হয়ে যায়, তাতে মুসলিম বাহিনীর উপর কোনো দায়িত্ব ন্যস্ত হয় না।[৫৪৯]

যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোনো শত্রু নাগরিক ও বিদেশী মিত্রদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু শত্রু সমর্থ যোদ্ধা এবং বাহিনীর অনুসরণকারী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, সংবাদ-পরিবেশকারী এবং অন্যান্য যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না, তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। শত্রু যোদ্ধাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণকেও যুদ্ধের দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয়।

৯.৭: আশ্রয় দান ও গুপ্তচরবৃত্তি

আশ্রয় দান সম্বন্ধে কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে বলা হয়েছে""যদি তোমাদের কোনো মিত্র (বিধর্মী) তোমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করে বা তোমাদের হেফাযত চায়, তাহলে (হে মুহাম্মদ) তাকে রক্ষা করো, যাতে সে আল্লাহর কথা শুনতে পায় এবং অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।"[৫৫০] একে ফকিহগণ এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

অর্থাৎ আশ্রয়দান অর্থে তাদের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা (অর্থাৎ যুদ্ধমান পক্ষের কথা বলা হচ্ছে)– আল্লাহর নামে তাদেরকে হত্যা বা বন্দী না করা।

শত্রুপক্ষকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে, যদিও তারা ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে তা চায়। যদিও বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ হয়, তাহলে তারা যুদ্ধবন্দী বলে গণ্য হবে এবং তাদের ধনসম্পত্তি গনিমত বলে বিবেচিত হবে। ইহা সাধারণতঃ ঘটে তখন, যখন তারা অবরুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধকালে চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। শর্তাধীন আত্মসমর্পণ হলে, যাকে ইংরেজীতে capitulation বলা হয়ে থাকে এবং বিজয়ী যদি শর্তগুলো মানতে রাজী হয়ে থাকে, তাহলে সেই শর্তগুলো বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতে হবে এবং মুসলমান বা তাদের শর্তাবলী মোতাবেক কাজ করবে।[৫৫১]

শত্রুপক্ষ আশ্রয় না চাইলেও সাধারণ ঘোষণার দ্বারা তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। অতএব মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) ঘোষণা করলেন যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা কাবার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবে, অথবা তাদের দলপতি বা সর্দার আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে কিংবা তাদের দরজা বন্ধ করে

৫৪৯. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০
৫৫০. আল-কুরআন, ৯ : ৬
৫৫১. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৬

রাখবে, কিংবা তাদের অস্ত্র ত্যাগ করবে, তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। এই সাধারণ ঘোষণার আওতা থেকে কিছু বাদ পড়ত যারা অসামরিক কোনো অপরাধে অপরাধী হত।

আশ্রয় সাময়িক বা শর্তসাপেক্ষ হতে পারে। মহানবী (সা.) মুআবিয়া ইবনে মুগীরাকে তিন দিন সময় দিয়েছিলেন মদিনা ত্যাগ করতে। খায়বারের ইহুদীগণকে বলা হয়েছিল যদি তাদের সম্পত্তি তারা গোপন করে তাহলে তাদের আশ্রয় থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

কোনো কোনো সময়ে অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকেও আশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে এবং আস্থা সৃষ্টি করার জন্য জরুরী নিশ্চয়তাও প্রদান করা হয়ে থাকে। ঐরূপ একটি উপলক্ষে মহানবী (স.) তাঁর শিরস্ত্রাণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

যদি কোনো আশ্রিত যুদ্ধরত ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে নির্যাতীত হয়, সে তার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবদ্দশায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ বনু আমীর গোত্রের দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা মদিনার বনু নাযির গোত্রের সংগে যুদ্ধ হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল।

সাধারণতঃ আশ্রয় কড়াকড়িভাবে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে এবং তা হস্তান্তরিত বা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যায় না। যদি স্পষ্ট উল্লেখ না থাকে তাহলে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পত্তি তো দূরের কথা তার পারিবারবর্গকেও রক্ষা করা যেত না। ইহা অবশ্য সত্য ছিল যখন সে সমূহ বিপদগ্রস্ত অবস্থায় থাকত। পক্ষান্তরে যখন কেহ স্বগৃহে নিরাপদে থাকত এবং আশ্রয় চাইত তখন আশ্রয়ের অধিকার স্বাভাবিকভাবেই জীবন, ধনৈশ্বর্য, স্ত্রী, নাবালক, পুত্রকন্যা, অনুঢ়া কন্যা, ভগ্নী, মাতা, মাতামহী এবং মাতা ও পিতা উভয় কুলের আত্মীয়দের (খালা, ফুফু ইত্যাদি) উপর বর্তাতো। প্রাচীন ফকিহগণের সময়ে ব্যবসায়ের লাইসেন্সের বেলায় ক্রীতদাস, ভৃত্য ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হত।

গুপ্তচর

মুসলিম সেনাপতিগণ গুপ্তচর বৃত্তির উপযোগিতা স্বীকার করতেন এবং এ প্রাচীন প্রথার উপযুক্ত ব্যবহার প্রচলন করেন। কিন্তু অন্যান্য জাতির মত তাঁরা বৈদেশিক গুপ্তচরদের কঠোর হস্তে শাস্তি দিতেন। যদি কোন হারবী নিরাপদভাবে (আমান) দারুল ইসলামে প্রবেশ করে থাকে ও পরে তার গুপ্তচর বৃত্তি ধরা পড়ে, তবে তাকে হত্যা করা হয়। আর ইমাম যদি সিদ্ধান্ত করেন তবে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করাও যেতে পারে। যদি কোন মহিলাও শিশু আমানের (নিরাপত্তা) ভিত্তিতে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে থাকে

এবং তাদের গুপ্তচরবৃত্তি ধরা পড়ে তবে মহিলাকে হত্যা করা উচিত, কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ করে নয়। শিশুকে শত্রুপক্ষ থেকে প্রাপ্ত দ্রব্য (Fay) বলে মনে করতে হবে; কিন্তু হত্যা করা যাবে না।

যদি মুসলমানগণ গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে শত্রুপক্ষকে খবর সরবরাহ করে, তবুও আইনে তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়া হয় নি। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক দেশের শাসনকর্তা বা ইমামের ওপর তার শাস্তি বিধানের বিষয়টি ন্যস্ত করেছেন। আল-আউযায়ী তাকে নির্বাসিত করার বা নিপীড়নমূলক শাস্তি বিধান করার সুপারিশ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন যে, সে তওবা (অনুশোচনা) না্ করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখা হবে। কেতাবিদের গুপ্তরচ বৃত্তির ব্যাপারে এই একই আইন প্রযোজ্য হবে।

প্রাচীনকালে গুপ্তচরগণ প্রতিপক্ষের এতোটা ক্ষতিসাধন করতে পারত না, যেমন আধুনিক কালে করে থাকে, কেননা গুপ্তচরবৃত্তি একটি কৌশল থেকে উন্নত হয়ে এখন রীতিমতো একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। প্রাচীনকালেও শত্রুর নিকট থেকে সংবাদ গোপন রাখতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হত। মহানবী (সা.) কখনো কখনো জনগণের যাতায়াতের জন্য সব পথ বন্ধ করে দিতেন যাতে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদ বাইরে যাওয়া সম্ভব হত না।[৫৫২]

মুসলিম আইনে বাস্তব ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন গুপ্তচর ও শান্তিকালীন গুপ্তচরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না। ঐ সব ব্যক্তি, যারা শত্রুর পক্ষে আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করে বা সংগ্রহ করতে প্রয়াস পায় এবং তা শত্রুর কর্ণগোচর করে দেয়, তাদেরকে গুপ্তচর বলে গণ্য করা হয়। এমনকি কোন মুসলমানও ঐরূপ ঘৃণ্য কাজ করতে পারে এবং বিদেশীর মতো ঠিক একই শাস্তি তাকেও দেয়া যেতে পারে।

স্বাভাবিকভাবে বিদেশী গুপ্তচরদের সম্পর্কে অনেক অল্প লৌকিকতা বা অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। মহানবীর (সা.) সময়ের দুইটি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায় মক্কাবাসীদের তরফ থেকে ভঙ্গ করার দরুণ। গোপনে অনেক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল সন্ধি বিরোধী প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। হাবীব ইবনে আবিবালতা নামে এক প্রবীণ মুসলমান কোথায় ঐ সকল প্রস্তুতি নেওয়া হত, তা অনুমান বা ধারণা করেছিলেন। তিনি মক্কার বন্ধুর নিকট পত্র দিলেন যে, প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ তা মক্কার বিরুদ্ধে, সুতরাং মক্কাবাসীরা যেন সর্তক থাকে। এই কাজের দ্বারা তিনি আশা করেছিলেন যে, মক্কায় অবস্থিত তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি

৫৫২. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭

তথায় হেফাযতে থাকবে সেগুলির প্রতি মক্কাবাসীদের সদয় দৃষ্টি থাকবে। পত্রটি ধরা পড়ে গিয়ে ছিল এবং যখন মহানবী (সা.) নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, পত্রের পিছনে কোনো কু-মতলব ছিল না অথবা তার দ্বারা কোনো ক্ষতি সাধিত হয় নাই তখন তিনি হাবীবকে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য এবং ইসলামের অন্যান্য খেদমত করার জন্য মাফ করে দেন।

আল-বুখারী ও আবু দাউদ একটি ঘটনার কিছু বিবরণ দিয়েছেন যাতে জানতে পারা যায়, কোন এক অভিযান কালে মহানবী জনৈক সন্দেহভাজন গুপ্তচরকে পশ্চাবান্ধবন করে ধরে ফেলার নির্দেশ দেন এবং ধরা পড়লে তার শিরশ্ছেদ করা হয়।

আবু ইউসুফের অভিমত হল– অমুসলমান গুপ্তচরকে, নাগরিক হউক বা বিদেশী হউক, অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এবং যারা মুসলমান তাদেরকে জেল বা দৈহিক শাস্তি দিতে হবে। তাঁর সমসাময়িক আশ-শায়বানী দস্যুতা থেকে গুপ্তচরবৃত্তিকে কম দূষণীয় মনে করেছেন এবং তাই তিনি নাগরিক গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষপাতী নন। বিদেশীদের জন্য তাঁরও কোনো দয়া নাই।

শাস্তির বেলায় পুরুষ ও রমণী গুপ্তচরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না। তথাপি মুসলমান ফকিহগণের মতে নাবালককে কোনোক্রমেই চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া উচিত হবে না।[৫৫৩]

৯.৮: আইনের জটিলতা সম্পর্কে ইসলামী ধারণা

জাতীয়তা

আমরা যাকে এখন জাতীয়তা বলি তার উৎপত্তি হয়েছিল রক্তের সম্পর্ক থেকে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে অন্যান্য বিষয়সমূহ বা উপকরণসমূহ রাজনৈতিক সংঘটনের মূলে কাজ করেছে এবং বস্তুতঃপক্ষে আমরা ভৌগোলিক, ভাষাগত, জাতিগত, গোত্রীয় ও অন্যান্য ধারণা পেয়ে থাকি যা বিভিন্ন দেশে ও কালে জাতীয় বৈশিষ্ট্য নামে আখ্যায়িত হয়েছে।

ইসলামের জন্মভূমি আরবেও জাহেলিয়াতের আমলে এইরূপ অবশ্যই রয়েছে। নিয়তির পরিহাস, গোত্রীয় আরব ভূমির সর্বাপেক্ষা গর্বিত ও অহংকারী কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর হিসাবে বা ইসলামের বাণীবাহক হিসাবে সর্বশক্তিমানের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

৫৫৩. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭

'হে মানবমণ্ডলী! দেখ, আমরা তোমাদেরকে এক জোড়া নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আমরা তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি– যাতে তোমরা পরস্পরকে পৃথক করে চিনতে পারো। দেখ, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত– আল্লাহর দৃষ্টিতে, যে তাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে। দেখ, আল্লাহ– বিজ্ঞ ও জ্ঞানী।'

জাতীয়তা সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারায় এ ছিল এক নতুন পরিবর্তন এবং এ ছিল মুসলিম জাতীয়তার এক বাস্তব সনদ। মহানবী (সা.) এর আমলে এ নীতি কার্যকরী ছিল এবং আমাদের কাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে এ নীতি কার্যকরী ছিল। এবং যেখানেই অর্ধচন্দ্র পতাকা উড্ডীন হয়েছে সেখানেই মানুষের সাম্য ও ধার্মিকদের প্রাধান্য স্বীকৃতি পেয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের আহলে যিম্মাদের (যারা শাসকদের ধর্মে বিশ্বাসী নয়) এবং অন্যান্য অধিবাসীদের কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ[৫৫৪]

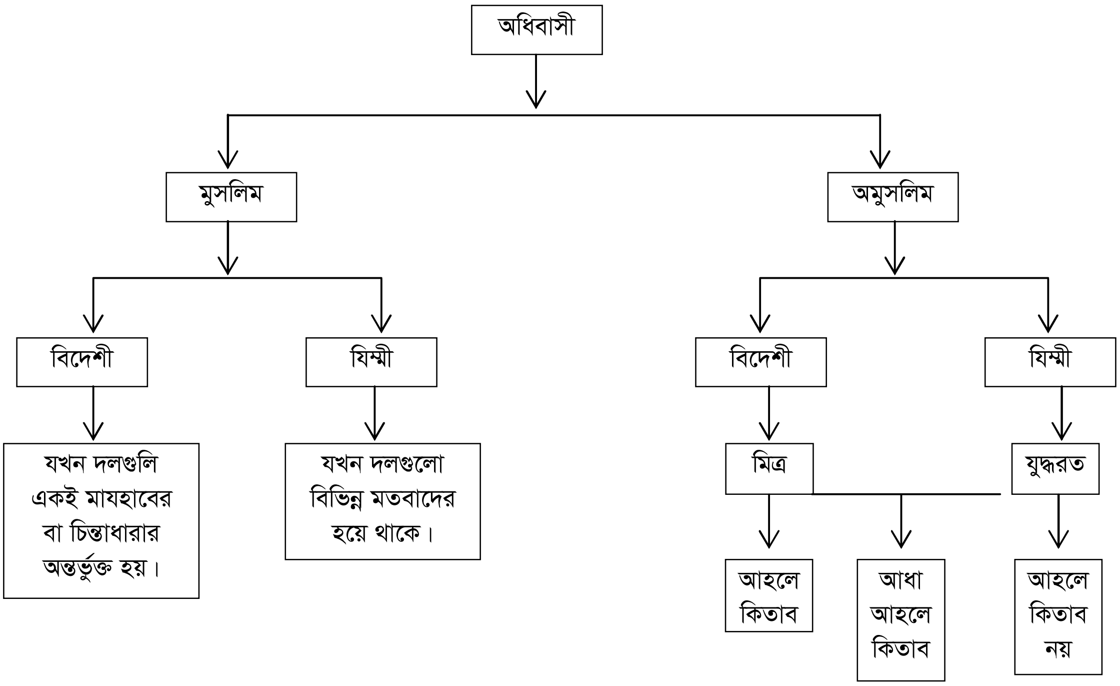

৫৫৪. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫০

মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ সাম্য বিদ্যমান এবং মুসলিম আইন কোন শ্রেণি বা বর্ণের পার্থক্য মুসলমানদের মধ্যে স্বীকার করে না। সমস্ত মুসলমান এক উম্মতভুক্ত, তারা যেখানেই থাকুক এবং এক আইনের অন্তর্ভুক্ত, এ কথা আবু ইউসুফ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। তথাপি কুরআন অনুসারে মুসলিম রাষ্ট্র মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে বাধ্য নয় যদি তারা অমুসলমানদের দেশে থাকে এবং মুসলিম আদালতও বিদেশের মুসলমানদের কার্যকলাপ ও দুঃখ দুর্দশা বা নির্যাতনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাদের রক্ষা করা নৈতিক দায়িত্ব মাত্র।[৫৫৫]

ইসলামী রাষ্ট্রে জনৈক মুসলমানদের ঔরসজাত শিশু মুসলমান বলে গণ্য হবে এবং কোন শিশুর পিতা-মাতার মধ্যে একজন মুসলিম নাগরিক এবং অন্যজন যদি বিদেশী হয়, তা হলে সেই শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হবে।

ইসলাম সমস্ত ধর্মাবলম্বীকে নাগরিক হিসাবে স্বীকার করে। কেবল আরব অর্থাৎ ইসলামের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে অমুসলমানকে চিরকাল বাস করতে দেওয়া হয় না। আবু ইউসুফ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বিধর্মী বা কাফের, মুশরিক, অগ্নিপূজক প্রস্তরপূজক, খ্রীষ্টান, ইহুদী, সকলেই মুসলিম রাষ্ট্রের যিম্মী হয়ে বাস করতে পারে।

অমুসলমান নাগরিক ও বিদেশীর মর্যাদা

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলমান নাগরিকদের যিম্মী নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমান ফকিহদের মতে মুসলিম কওম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে যিম্মীরা রাষ্ট্রের অনুগত হলে এবং জিযিয়া দিলে রাষ্ট্রে বাস করার অধিকার, বিবেকের বা স্বাধীন চিন্তার অধিকার জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তার অধিকার লাভ করে।[৫৫৬]

যিম্মী তার সমস্ত অধিকার হারায় যখন সে–

১. বিদ্রোহী হয়।

২. যখন সে জিযিয়া দান করার দায়িত্ব অস্বীকার করে।

৩. যখন সে সরকারের অবাধ্য হয়।

৪. স্বাধীন মুসলমান মহিলার সংগে ব্যভিচার করে।

---

৫৫৫. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫

৫৫৬. এ.জে. এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭

৫. রাষ্ট্রের শত্রুর পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে, কিংবা সেরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করে।

৬. আল্লাহ, রাসুল (সা.) ও ওহীর অবমাননা করে।

৭. একজন মুসলমানকে যখন সে ধর্মান্তরিত করে।

৮. দুস্যুতার মধ্যে যখন সে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৯. ইসলামের নীতির প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে কোন কাজ করে।

১০. সুদ, ঘুষ সহ ইত্যাদি হারাম কাজে যখন সে লিপ্ত হয়।[৫৫৭]

বিদেশে মুসলিম নাগরিক

(ক) মুসলিম দেশে মুসলিম :দুই সপ্তাহের জন্য অবস্থান করলে একজন মুসলমান স্থানীয় নাগরিক হয়ে যায় এবং নামাযের কসর ইত্যাদির সুবিধা সে পায় না।

(খ) অমুসলিম দেশে মুসলিম :প্রাচীন কালে মুসলমানরা অন্যান্য দেশে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। যেমন মহানবী (সা.) এর আমলে আবিসিনিয়ায়, চীনে, তুর্কীস্থানে, মালাবারে (ভারতে) ও অন্যান্য দেশে।

মসুদী বলেন, ক্যাম্পিয়ান সাগর এলাকার স্থানীয় অমুসলমান শাসক তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে মুসলমানদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং তাঁর দেশে বিবিধ নাগরিকদের জন্যে সাতটি আদালত ও সাত জন বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন এবং অনেক মোকদ্দমা মুসলিম আইন অনুসারে ফায়সালা হতো।[৫৫৮]

---

৫৫৭. শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৫৫৮. ইবন হিব্বান: mnxn Beb wneŸb, বৈর"তঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১২ হি. হাদিস নং-৫১২

Dhaka University Institutional Repository

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, জেহাদ দারুল হারবকে দারুল ইসলামে পরিণত করার একটি মাধ্যম বিশেষ। যদি কখনও পূর্ণাঙ্গভাবে এ উদ্দেশ্য সাধিত হত, তবে দারুল হারবের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, ইসলামী আইনবিজ্ঞানে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠা। শান্তিপ্রতিষ্ঠার অস্থায়ী হাতিয়ার হিসেবেই জেহাদের ভূমিকা কার্যকরী হয়েছে।

নানা কারণে অন্যান্য বিশ্বরাষ্ট্র ব্যবস্থার মতই ইসলামী রাষ্ট্র ও আদর্শ কেবল আংশিকভাবেই রূপায়িত করতে পেরেছিল। পশ্চিমা এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে বিশাল ভূখণ্ডের ওপর ইসলাম প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু বিশ্বঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যান্য প্রয়াসের মতই এ প্রচেষ্টা যুগপৎ আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের বিরোধিতার ফলে ব্যর্থ হয়। ইসলামের অভ্যন্তরে ক্রমশঃ ধর্মীয় ও আইনগত সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়ানোর ফলে আদি সংস্থার মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। সব লিখিত ইতিহাসেই দেখা যায়, সমস্ত বিশ্ব-সাম্রাজ্যের মধ্যে এই একইধারা বিদ্যমান ছিল। কারণ, প্রতিটি নতুন বিশ্ব-সাম্রাজ্য তার নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বিধি-ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানাদি পৃথিবীর এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।[৫৫৯]

যদি বাইরে থেকে কোন স্থায়ী শত্রুর হামলার সম্ভাবনা থাকে কিংবা কোন সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা থাকে, তবে আভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব। এর ফলে আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে একত্রিত হতে পারে এবং দলাদলিতে না মেতে বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে।

খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন মুসলিম শক্তি ক্ষমতার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, তখন বাইজান্টীয় হামলার আশঙ্কা কেবল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এর ফলেই উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে আসেনি। অধিকন্তু, পূর্বাঞ্চলে আব্বাসীয়দের ওপর বাইজান্টীয় চাপের ফলে স্পেনে উমাইয়াগণ আব্বসীয় আক্রমণ থেকে রেহাই পেল। তাই উমাইয়াগণ পশ্চিমা খৃস্টান রাষ্ট্রপুঞ্জের খণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করার সুযোগ পেলেন। খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো যেমন পাশ্চাত্য (রোমান) ও প্রাচ্য (গোড়া) এ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রেও বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হল। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি-সাম্যের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থার সৃষ্টি না হলে খৃস্টান রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্র দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একে অপরের সম্মুখীন হত এবং বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের জন্য তাদের মধ্যে সর্বক্ষণ বিরোধ লেগেই থাকত। খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে পূর্ব ও পশ্চিম ইসলামী সাম্রাজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভাগীকরণ আরম্ভ

৫৫৯. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩-৯৪

হল। ক্রুসেড[৫৬০] যুদ্ধের ফলে পূর্ব 'ইসলামী' সাম্রাজ্যে এ অবস্থা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। ক্রুসেড যোদ্ধাগণ দুশো বছর ধরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে এবং বাইরের শক্তির বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু পূর্বদিক থেকে মোঙ্গলদের আক্রমণ আভ্যন্তরীণ গোলযোগকে আরও মারাত্মক পর্যায়ে এনে পৌঁছায়। আব্বাসীয়দের পতনের ফলে আরো দুটো মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন হয়। এগুলো হল ঃ মামলুক ও উসমানীয় সাম্রাজ্য। পশ্চিম মুসলিম সাম্রাজ্যও এই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সার্বজনীন মুসলিম রাষ্ট্রব্যবস্থা বা ইসলামকে সার্বজনীন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা অসম্ভব প্রমাণিত হওয়ার ফলে অনিবার্যভাবে পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করা হল ঃ ইসলামী জগৎ ও সমর জগৎ। এখানে স্মরণযোগ্য যে, মুসলিম আইনবিজ্ঞানে এ শ্রেণী বিভাগ ছিল নিতান্তই সাময়িক। কিন্তু গোটা ইসলামী ইতিহাসে এ পার্থক্যবোধ সবসময়েই চলে এসেছে। আইনের দিক থেকে দেখা যায় যে, এ দুই জগতের সম্পর্ক কখনও শান্তিভিত্তিক হয়ে গড়ে ওঠেনি। এক জগৎ সবসময়েই আর একটির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল; কিন্তু এ যুদ্ধকে প্রকৃত যুদ্ধ বলে মনে করা উচিত হবে না। এটা এমন এক বিষয় যা পশ্চিমা আইনের ভাষায় 'অস্বীকৃতি' (Non-recognition) বলে আখ্যায়িত হতে পারে।[৫৬১]

৯.৯: আইনের আওতাভুক্ত যারা

ব্যক্তিঃ বিশ্বাসী

মুসলিম আইন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠীকে নয়। মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করলেও বিশ্বাসীকে মুসলিম আইন মেনে চলতে হবে। আবার অনুরূপভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম জনসাধারণ ঠিক মুসলমানের রীতি অনুযায়ী আইন-কানুন মানতে বাধ্য থাকে না। অবশ্য, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করার ফলে তাদের কতকগুলো কর্তব্য পালন করতেই হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আওতা (Jurisdiction) ব্যক্তির ধর্মের ওপরই নির্ভরশীল। আর ধর্মের ওপর ভিত্তি করেই ব্যক্তি মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন এবং একই সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেও গণ্য হতে পারেন। সাধারণভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী, কেবল তিনিই মুসলমান বলে পরিচিত হতে পারেন।[৫৬২]

---

৫৬০. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ.৯, পৃ.৩৭৫
৫৬১. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০৩
৫৬২. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

কোন কোন মুসলিম আইনবিদ বলেছেন যে, যেকোন ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদের (সা.) রিসালাতে বিশ্বাস করবেন এবং তিনি যে সব নীতি প্রচার করেছেন সেগুলো সত্য বলে জানবেন, কেবল তিনিই মুসলমান বলে গণ্য হবেন। এ ঘোষণার পরে তিনি যা-ই বলুন না কেন, তাতে কিছুই আসে যায় না। অন্যান্য আইনবিদরা বলেন যে ব্যক্তি ধর্মের পাঁচটি মূলনীতি পালন করেন বা যিনি কেবলমাত্র কাবা শরীফের দিকে মুখ করে ইবাদাত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তিনিই মুসলমান।

হযরত মুহাম্মদের (সা.) রিসালাত, তাঁর সার্বজনীন নবুয়ত, তাঁর আইনের শাশ্বত রূপ, তিনি যা আদেশ করেছেন সব সত্য বলে মনে করা, আল কোরআনকে আইনগত রীতি-নীতির উৎস-মূল বলে জানা এবং কাবা শরীফের দিকে মুখ করে ইবাদাত– যিনি এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন এবং যে ধর্মবিরোধী প্রবণতা তাঁকে অবিশ্বাসের পথে নিয়ে যেতে পারে, তা অনুসরণ করেন না– তিনিই সত্যিকার সুন্নীপন্থী বলে বিবেচিত হবেন।[৫৬৩]

ব্যক্তিঃ কাফের ও মুরতাদ

ইমানের বিপরীত হচ্ছে কুফর অবিশ্বাস। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে, সে কাফের। যে মুসলমান মুশরিক হয়ে যায় বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বলা হয়। কাফেরদের শাস্তি-বিধান সম্পর্কে ধর্মবেত্তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, কাফের পরকালে জাহান্নামী হবে এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। আবার কেউ বলেন যে, এ দুনিয়াতেও তাদের আংশিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাগণ এ সম্বন্ধে সম্মিলিত অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মুরতাদ হয়ে যাওয়া ইহকালে ও পরকালে আইনতঃ দণ্ডনীয়। সে ব্যক্তি কেবল পরকালের নাজাত থেকেই বঞ্চিত হবে তাই নয়, রাষ্ট্র তার মৃত্যুদণ্ডের বিধান করবে। আল-কোরআনের এ আইন নিম্নলিখিত নির্দেশাবলীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছেঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ * وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ
الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢١٧)

৫৬৩. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫-১০৬

অর্থ: "পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে; বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়।' কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিস্কার করা আল্লাহার নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।' তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হইতে ফিরাইয়া না দেয়, যদি তাহারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় দীন হইতে ফিরিয়া যায় এবং কাফিরস্বরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদের কর্ম নিস্ফল হইয়া যায়। ইহারা দোজখবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।"[৫৬৪]

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۙ(۸۹)

অর্থ: "তাহারা ইহাই কামনা করে যে, তাহারা যেরূপ কুফরী করিয়াছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর, যাহাতে তোমরা তাহাদের সমান হইয়া যাও। সুতরাং আল্লাহর পথে হিযরত না করা পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে তাহাদেরকে যেখানে পাইবে গ্রেফতার করিবে এবং হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করিবে না।"[৫৬৫]

যদিও এ দুইটি আয়াতের মধ্যে কেবল দ্বিতীয়টিতে ধর্ম পরিত্যাগকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, তবু সব ভাষ্যকারই এ সম্বন্ধে একমত প্রকাশ করেছেন যে, যে বিশ্বাসী খোলাখুলিভাবে বা গোপনে ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় এবং অবিশ্বাসে অটল থাকে, তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। ইসলাম থেকে যে ব্যক্তি দূরে সরে যায়, তাকে মৃত্যুদণ্ড দান সম্পর্কে হাদিসে আরও সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরম (সা.) বলেছেন যে, 'যে তার ধর্ম পরিত্যাগ করে, তাকে হত্যা করতে হবে।' ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়েও যারা শাস্তি ভোগ করে নি, তাদের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য। কিন্তু হযরত মুহাম্মদের (সা.) ওফাতের পর রিদ্দার (রিদ্দা–দল ত্যাগ বা পৃথক হওয়া) যুদ্ধ-জয়ের পর এ আইন খুব কঠোরভাবে কার্যকরী করা হয়। ধর্ম পরিত্যাগ করা সম্পর্কে আইনটি খোলাফা-ই-রাশেদীনের ব্যবহার বিধি দ্বারা

৫৬৪. আল-কুরআন, ২ : ২১৭
৫৬৫. আল-কুরআন, ৪ : ৮৯

সমর্থিত হয়েছে এবং ইজমা বা ঐক্যমত দ্বারা বিধিবদ্ধ রয়েছে। এ আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন মতবিরোধ নেই।[৫৬৬]

মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া চলবে না। তাকে প্রথমে সাবধান করে দিতে হবে এবং ইসলামে প্রত্যাবর্তন কিংবা মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেয়ার জন্য ৩ দিন সময় দিতে হবে। হানাফী ও হাম্বলী আইনবিদগণ ছাড়া আর সব আইনবিদই ধর্ম-ত্যাগের অপরাধের ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষদের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেছেন যে, নারীদের ইসলামে ফিরে আসতে বাধ্য করার জন্য প্রহার থেকে শুরু করে কারাবাস পর্যন্ত শাস্তি দেয়া যেতে পারে। শিশু ও উন্মাদদের হত্যা করা চলবে না, যে পর্যন্ত না উন্মাদ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক না হয়। তরবারীর সাহায্যে মুরতাদকে হত্যা করতে হবে, আগুনে পুড়িয়ে না। কারণ কেবল আল্লাহতালাই আগুনের মাধ্যমে শাস্তি বিধান করেন। ইমামের হুকুম অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। অবশ্য কোন কোন আইনবিদ বিশেষ করে শাফেয়ী আইনবিদগণ মনে করেন যে, দাস যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তবে তার প্রভু তাকে হত্যা করতে পারেন।

যদি একদল মুরতাদ সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে হুমকী প্রদর্শন করে, তবে ইমাম জেহাদ ঘোষণা করে জেহাদের বিধান কার্যকরী করবেন।[৫৬৭]

মুরতাদ সম্পর্কীয় আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদের (স.) আমলে কয়েকজন বিশ্বাসীর মুশরিক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়নি। মক্কাবাসীদের সঙ্গে মহানবির (স.) যে চুক্তি সম্পাদিত হয় (৬৩০ খৃস্টাব্দ), তার মাধ্যমে মক্কার যে সব অধিবাসী চুক্তিটি সম্পন্ন হবার পূর্বে মুসলিম সমাজে যোগ দিয়েছিল, তাদের নিজধর্মে ফিরে যাবার পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। রিদ্দার যুদ্ধের পর মুরতাদদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। কারণ, ইসলাম তখন আরব উপদ্বীপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তখন থেকেই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুদণ্ডের আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং তার সুষ্ঠু রূপায়ণ ইমামের কর্তব্যরূপে পরিগণিত হয়।[৫৬৮]

ধর্মত্যাগ

৫৬৬. মফিজুল্লাহ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮
৫৬৭. মজিদ কাদ্‌দুরী, অনু. অধ্যাপক হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫
৫৬৮. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬-১০৮

মহানবীর (স.) কথা ও কাজ খলিফা আবু বকরের সিদ্ধান্ত ও বাস্তব প্রয়োগ সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (সম্মিলিত মত) এবং পরবর্তীকালের মুসলিম ফকিহগণ (আইন বিশারদগণ) এবং এমন কি কোরআনের পরোক্ষ কিছু আয়াত– এইসব কিছুই ধর্মত্যাগীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান দান করেছে। ধর্মত্যাগের বেলায় মুসলমান পিতা-মাতার সন্তান এবং দীক্ষিত মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না এবং অনুরূপভাবে ইহুদী কিংবা খৃষ্টধর্ম, নাস্তিকতা কিংবা পৌত্তলিকতা অথবা যে কোনো ধর্ম গ্রহণের বেলায়ও কোনো পার্থক্য নাই। মুসলমান ফকিহগণ দৃঢ়ভাবে অভিমত পোষণ করেছেন যে, কোনো ধর্মত্যাগীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ও দণ্ড দেওয়ার পূর্বে তার সংগে বিষয়টির আলোচনা করা এবং ইসলামী মতবাদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তার সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন করা সরকারী পর্যায়ে জরুরী। চূড়ান্তভাবে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তাকে সময় দেওয়া হয় চিন্তা-ভাবনার জন্য আর সেজন্য এমন কি কয়েক মাসও সময় দেওয়া হয়ে থাকে।

মস্তিষ্কবিকৃত,হতচেতন, বিষন্ন ও হতবুদ্ধি সাবালক নেশাগ্রস্ত বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত এবং ইসলামের উপর যার ঈমানের কথা অজ্ঞাত বা সুদৃঢ় হওয়ার কথা জানা যায় নাই এমন সব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চরম শাস্তি দেওয়ার বিধান নাই। তেমনই ধর্মত্যাগী স্ত্রীলোক এবং নৃপুংসকগণও হানাফী মাযহাব অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে না কিন্তু কারাগারে রাখা হবে এবং এমন কি দৈহিক শাস্তিও পেতে পারে।[৫৬৯]

৫৬৯. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০১

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মত্যাগীর সংগে ব্যবহার

ধর্মত্যাগীকে ইসলাম ও তরবারির মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে; তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে না তাকে যিম্মী বলেও বিবেচনা করা হবে না।

আইনত সে মৃত। সুতরাং যদি সে পুনরায় ইসলাম কবুল না করে এবং কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে পালিয়ে যায়, তার বিষয়– আশয় তাকে মৃত জ্ঞান করে তার মুসলমান উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। অধিকন্তু তার প্রাপ্য ঋণও বাতিল গণ্য করা হবে যদি সে কোনো অমুসলিম দেশে চলে যায়।

মাওয়াদির মতে ধর্মত্যাগীদের এলাকার ভিতর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে যার দরুন সাধারণ যিম্মীদের এলাকা থেকে উহা পৃথক হয়ে যায়। যথা

১. সন্ধি বা চুক্তি সাধারণত ধর্মত্যাগীদের সংগে করা বিধেয় নয়; সাধারণ অমুসলিম বিদেশীদের বেলায় ঐরূপ কোনো নিষেধ নাই।

২. ধর্মত্যাগীকে যিম্মি হতে দেওয়া নিষিদ্ধ (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা); কিন্তু আদি অমুসলিমের বেলায় এ কথা প্রযোজ্য নয়।

৩. ধর্মত্যাগীর নিকট ইসলাম পুনর্বার কবুল করা অথবা নিহত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই, তাকে দাস হিসাবে কবুল করা এবং জীবিত রাখা যেতে পারে না।

৪. ধর্মত্যাগী ব্যক্তির নিকট থেকে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ বিজয়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে না; ইহা সাধারণের সম্পদ রূপে গণ্য হবে, অর্থাৎ বায়তুলমালে চলে যাবে।

হযরতের (স.) জীবদ্দশায় ভণ্ড মুসায়লামার দূতগণ মদিনায় এসেছিল। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারাও বলল যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে পাঠিয়েছিল তার মতো তারাও তাঁর (নবীর) সম্বন্ধে একই ধারণা পোষণ করত। ইহা শুনে মহানবী (স.) বললেন ঃ যেহেতু দূতগণকে হত্যা করা যায় না, নতুবা আল্লাহ, সাক্ষী আছেন, আমি তোমাদের উভয়কেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতাম।[৫৭০] (তারা ধর্মত্যাগী মুসলমান ছিল)। ইহা ছাড়া ধর্মত্যাগী ব্যক্তি তার মুসলমান আত্মীয়ের সম্পত্তির কোনো অংশ পাবে না।

---

৫৭০. সুলাইমান ইবনুল আশ’আস আবু দাউদ:mbvb Avex ‘vD‘, দেওবন্দ: দার“ল কিতাব, তাবি. হাদিস নং-১২৭০

Dhaka University Institutional Repository

৯.১০: রাষ্ট্রপ্রধান (ইমাম)

খিলাফতের প্রশ্নের মত আর কোন প্রশ্ন নিয়ে ইসলামে এতখানি বাকবিতণ্ডা হয় নি। অন্য কোন বিষয়ে আইনের মূলনীতি লংঘনের এমন নজিরও আর বড় একটা পাওয়া যায় না। কারণ, এ বিষয়টি নিয়ে দলগত বিভেদ ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাগণ ইমামতের (খিলাফতে) প্রকৃতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজের দলের মতামতকেই বড় করে তুলে ধরেছেন। কিন্তু খিলাফতের ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে কেউ বেশী আলোচনা করেন নি।[৫৭১]

ইসলামী আইনবিজ্ঞানে ইমাম রাষ্ট্রের প্রধান নন। স্বয়ং আল্লাহই রাষ্ট্রের মালিক। কার্যতঃ কিন্তু ইমামই সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কার্যপরিচালনা করেন। নির্বাচন বা মনোনয়ন, যে ভিত্তিতেই তাঁকে নিয়োগ করা হোক না কেন, তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রে আইনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি¡ ব্যাপারে সমগ্র রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করা। ইমামতের প্রকৃতি ও কার্যক্রম আসলে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। কাজেই এ বিষয়টা এখানে ততটুকু আলোচনা করা যাক, যতটুকু ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় প্রয়োজন হয়।

ইমামের কর্তব্য হল জেহাদের মারফত বিশ্বব্যাপী আল্লাহর বাণীর সার্বভৌমত্ব কায়েম করে ইসলামের মূল উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করা। যুদ্ধ ও শান্তিকাল উভয় সময়েই ইমাম এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং বিশ্বাসীদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের সম্পর্ক নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন বাস্তবায়িত করেন। যুদ্ধ পরিচালনার হুকুম তিনিই জারী করেন, নব বিজিত দেশে আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করেন এবং আইন অমান্য করলে শাস্তি-বিধান করেন।

জেহাদ কখন চালিয়ে যেতে হবে বা কখন তা স্থগিত বা বন্ধ রাখতে হবে এসব ব্যাপার তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শত্রুপক্ষের দাবী স্বীকার করে নিয়ে কখন তাদের সঙ্গে সন্ধি বা শান্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সমঝোতায় আসতে হবে, তা তিনিই স্থির করেন।

ইমামের ক্ষমতা ব্যাপক হলেও তারও সীমা আছে। আইনের আওতার মধ্যে থেকেই তাঁকে এ ক্ষমতা পরিচালনা করতে হবে; অর্থাৎ দেখতে হবে, যাতে সুষ্ঠুরূপে আইনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য সাধনের ওপর দৃষ্টি রেখে যদি ইমাম তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তবেই তিনি মুসলমানদের

---

৫৭১. এ.জে. এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. 51

Dhaka University Institutional Repository

আনুগত্য দাবী করতে পারেন নতুবা তাঁকে ইমামের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। তবে কি করে তাঁকে অপসপরণ করা যাবে, সেটাই সমস্যা। অপসারণ করা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।[৫৭২]

বৈদেশিক সম্পর্ক নিরূপণের ব্যাপারে ইমাম তাঁর ক্ষমতা সমরাঙ্গণে যুদ্ধরত সেনাপতিদের বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করতে পারেন। অনেক সময় এঁদেরকে আপোষ-আলোচনা চালানো, জেহাদ পরিচালনা এবং যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি বণ্টনের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হত। কিন্তু যে কোন বিষয়ে ইমামের অনুমোদন করার বিশেষ ক্ষমতা (Veto power) রয়েছে। এ ক্ষমতা বলে তিনি ইচ্ছা করলে কোন চুক্তি অনুমোদন নাও করতে পারেন এবং যে গৃহীত কর্মপন্থা বা ব্যবস্থা মুসলিম স্বার্থবিরোধী তা বাতিল করে দিতে পারেন। ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী কাজের জন্য তিনি তাঁর প্রতিনিধিদের (শাসনকর্তাদের) শাস্তি-বিধানও করতে পারেন।

পৃথিবীতে ইমাম আল্লাহর খলিফা। আল্লাহর খলিফা হিসেবে তাঁর কাজ হল আল্লাহর আইন কার্যে পরিণত করা। খারেজী দল ভিন্ন আর সব মাযহাব অনুযায়ী স্বাভাবিক এবং নীতিগতভাবে ইমামের শাসন অতীব প্রয়োজনীয়। ইমাম যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, কার্যপরিচালনায় অসমর্থ হয়ে পড়েন বা ইমামতের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন তবে নতুন ইমাম নিযুক্ত করা মুসলিম সমাজের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হয়। কিন্তু ইমাম যদি শত্রুর হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়, সে ক্ষেত্রে তিনিই আইনগত ইমাম বলে গণ্য হবেন। মুসলিম সমাজ অবশ্যই যুদ্ধ বা কূটনীতির মারফত তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।[৫৭৩]

৯.১১: মুসলিম অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ

মুসলিম আইনবিদগণ ইসলামী ভূখণ্ডকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নানা বিভাগ ও উপ-বিভাগে বিভক্ত করেছেন। কোন কোন লেখক গোষ্ঠীগত বা উপজাতীয় বিভাগের ওপর জোর দিয়েছেন। আবার কেউ বা রাজবংশের ওপর ভিত্তি করে বিভাগ নির্ণয় করেন (একটি অঞ্চলের এক এক রাজবংশের রাজত্বের ওপর ভিত্তি করে এ বিভাগ নিরূপণ করা হয়েছে, যেমন উত্তর আফ্রিকায় আগলাবিগণ, মিসরে ফাতেমিগণ ও ইরানে বুয়াহিদগণ)। অন্যান্য লেখক বিশেষ করে ভূগোল বিজ্ঞানীগণ আঞ্চলিক ভিত্তিতেই বিভাগ নির্ধারণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, আল মোকাদ্দসী দারুল ইসলামকে আরব ও আজমে (ইরান) বিভক্ত করেছেন।

৫৭২. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
৫৭৩. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮-১০৯

আজমকে আবার আটটি অঞ্চলে এবং আরবকে ছটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। 'হুদুদুল আলমে'র লেখক যে কেবল অমুসলিম অঞ্চল নিয়েই লিখেছেন তা নয়, অমুসলিম-অধ্যুষিত ভূখণ্ডের ওপরও আলোকপাত করেছেন। তিনি পৃথিবীকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ এশিয়া, ইউরোপ ও লিবিয়া। এ তিনভাগকে আবার একান্নভাগে ভাগ করা হয়েছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে ইসলামী অঞ্চলকেও বিভক্ত করা হয়েছে।[৫৭৪]

কিন্তু মুসলিম আইনে এসব শ্রেণীবিভাগের বৈধতা স্বীকৃত হয় নি। কারণ, এ আইন-বিধানে মুসলিম কর্তৃত্বের বিভাগ বা গোষ্ঠীগত এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়নি। কেবলমাত্র একটি উম্মা (উম্মতে মোহাম্মদী) বা জাতির অস্তিত্বই এ আইন ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে। যিনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেন, তিনি যে বংশের শাসক দ্বারাই শাসিত হোন না কেন এবং দারুল ইসলামের যে অঞ্চলের অধিবাসীই হোন না কেন, তিনি এই উম্মতের সদস্য বলেই গণ্য হবেন। মুসলমানরা নির্বিবাদে এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারতেন। এর ব্যাপারে আনুগত্যের কোন প্রশ্নই উঠত না। কারণ, সব মুসলিম শাসককে নিজ নিজ রাষ্ট্রে একই আইন-বিধি রুপায়িত করতে হয় এবং একই ধর্ম পালন করতে হয়। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (মৃত্যু ১৪০৬ খৃস্টাব্দে), মরক্কী দার্শনিক ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ১২৪০ খৃস্টাব্দ), ইবনে জুবাইর (মৃত্যু ঃ ১২২৭ খৃস্টাব্দ) ও ইবনে বতুতা প্রমুখ পরিব্রাজক ও প্রখ্যাত মুসলমান বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং স্বচ্ছন্দে তাঁদের বাসস্থান পরিবর্তন করেন। এ থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম জগতে সাংস্কৃতিক ঐক্য (রাজনৈতিক ক্ষমতা-বিভাগ ও মুসলিম ভূখন্ডগুলো ভৌগোলিক পার্থক্য সত্ত্বেও) স্থায়ী ঐক্য-বন্ধনীর কাজ করে।[৫৭৫]

নিরাপদ স্থানকে 'হারাম' বলে। কোন কোন আইনবিদের মতে এর মধ্যে মক্কা ও এর শহরতলীকে ধরতে হবে। অন্যান্যদের মতে মক্কা ও মদিনা এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। শেষের মতটাই নির্ভুল বলে সাব্যস্ত হয়েছে। পরবর্তী যুগের আইনবিদগণ দুটো 'হারাম' বা নিরাপদ স্থানের উল্লেখ করেছেন (আল-হারামাইন আশ শারিফাইন) মক্কা ও মদিনা। এ নগরী দুটির হেফাজত ও সংরক্ষণ খলিফার বিশেষ কর্তব্য বলে গণ্য করা হয়। হাদিসের মতে এ দুটো নগরী পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থানে অবস্থিত রয়েছে।

'হারাম' অঞ্চলে কেবল মুসলমানরাই গমনাগমন ও বসবাস করতে পারেন। কোন অমুসলিমকেই– তা সে কেতাবিই হোক আর মুশরিকই হোক– এসব নগরীতে বসবাস করতে দেয়া হয় না; কিংবা এ অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে দেয়া হয় না। ইমাম আবু হানিফা অবশ্য কেতাবিদের এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গমনাগমন করার ব্যতিক্রমটুকুও মেনে নেন নি। সাধারণতঃ হারামের বাসিন্দাগণকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়

৫৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ.১১২-১১৪
৫৭৫. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

না। কারণ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ অঞ্চলে রক্তপাত করা নিষিদ্ধ করে গেছেন। কোন কোন আইনবিদের মতে মক্কার অধিবাসীগণ যদি বিদ্রোহও করেন, তবু তাদের শাস্তি দেয়া চলবে না। কিন্তু অধিকাংশ আইনবিদ ইমাম কর্তৃক এসব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা অনুমোদন করেছেন। হারাম অঞ্চলের গাছপালা ও জীবজন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। তাই, এখানকার গাছপালা কেটে ফেলা বা জীবজন্তুকে ধ্বংস বা হত্যা করা অনুমোদন করা হয়নি। কিন্তু গৃহপালিত পশু ও হত্যা ও কৃষিজাত দ্রব্য কর্তন করা চলবে। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য এ নিয়মগুলো সব সময়ে প্রতিপালিত হয় নি। তবু, এ নিয়মগুলোর মধ্যে ইসলামের আদি আবাসভূমির প্রতি মুসলমানদের গভীর শ্রদ্ধা প্রতিভাত হয়েছে।

মুসলিম অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে হেজাযের স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে। মুসলমানদের দৃষ্টিতে হারাম অঞ্চলের পরেই হেজাযের স্থান। এ অঞ্চলে অমুসলিমগণ পরিভ্রমণ করতে পারেন। কিন্তু এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার তাদের নেই। হাদিসে বর্ণিত হযরত মুহাম্মদের (সা.) একটি বাণীই এ নিয়মের ভিত্তি রচনা করেছেন ঃ ‘আরব উপদ্বীপ থেকে অবিশ্বাসীদের বিতাড়িত কর।’ কোন কোন আইনবিদ সংকীর্ণভাবে এ নীতির ব্যাখ্যা করেছেন এবং আরব উপদ্বীপ বলতে শুধু মক্কা ও মদিনাকেই বুঝেছেন। কেউ কেউ হেজাযকেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ বা গোটা আরব উপদ্বীপকে এর মধ্যে ধরেছেন। যদি কোন অমুসলিম হেজায পরিভ্রমণকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে তার মৃতদেহ এখান থেকে অপসারণ করে এ অঞ্চলের বাইরে কবরস্থ করতে হবে। কারণ, এ অঞ্চলে কবর দেয়ার অর্থ স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দেয়া। কেননা, এ অঞ্চলে অমুসলিমের স্থায়ী বসবাস আইন-বিধানে অনুমোদিত হয় নি।[৫৭৬]

পরিশেষে বলা যায় যে, হেজাযকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখার কারণ এই যে, এই অঞ্চলেই রাসূলে আকরম হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুয়ত লাভ করেন, ইসলাম প্রচার করেন, আর তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় এখানেই অতিবাহিত করেন। রাসূলের (সা.) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সব কিছুই হেজাযেই ছিল। তাঁর বহিরাচ্ছাদন (আলখেল্লা) ও পোশাক অবশ্য হেজাযের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হযরতের খলিফাগণ খিলাফতে অধিষ্ঠিত হবার সময়ে এগুলোকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই রক্ষা করে এসেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে দারুল ইসলামের[৫৭৭] অবশিষ্ট অংশ। আরব উপদ্বীপের বাইরে যে সব অঞ্চল মুসলমানদের দখলে এসেছিল এগুলো এরই অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম আইনে এ বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করা হত না। কেতাবিগণ এ অঞ্চলে যিম্মি হিসেবে বসবাস করতে পারতেন। আমান

---

৫৭৬. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩
৫৭৭. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৯

লাভ করে হারবীগণও এ অঞ্চল সফর করার অনুমতি লাভ করতেন। জিযিয়া কর প্রদান সাপেক্ষে মুশরিকদেরও এখানে বসবাস করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত না। এ অঞ্চলকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ

ক. 'উশর' অঞ্চল ঃ যে অঞ্চলের আদি মালিক বা বাসিন্দাগণ মুসলমান হয়েছে।

খ. দখলীকৃত অঞ্চল (১) ঃ যা মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়; এ অঞ্চলও উশর ভূমি নামে অভিহিত।

গ. দখলীকৃত অঞ্চল (২) ঃ যার অধিকার সাবেক বাসিন্দাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়; কিন্তু এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের রাজস্ব বা খারাজ দিতে হত।

ঘ. মাওয়াত বা পতিত জমি ঃ মুসলমানগণ কর্তৃক সংস্কারের ফলে যে অঞ্চল উশর ভূমিতে রূপান্তরিত হয়।[৫৭৮]

৯.১২: মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল (দারুল ইসলাম)

যে অঞ্চল বা রাষ্ট্রের অধিবাসীরা মুসলিম আইন পালন করেন, তাকে দারুল ইসলাম[৫৭৯] (মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল বা রাষ্ট্র) নামে অভিহিত করা হয়।

দারুল ইসলামের সংজ্ঞাটি যে খুব ব্যাপক, তাতে সন্দেহ নেই। দারুল ইসলামের অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীকে কিংবা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যককে যথাযথভাবে আইনের বিধান পালন করতে হবে, এতে অন্য কোন শর্ত রয়েছে কিনা তা এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আবদুল কাহির আল-বাগদাদী বলেন যে, যে অঞ্চলের অধিবাসীরা দ্বিধাহীন চিত্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং যেখানে যিম্মিদের ওপর মুসলিম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নামই দারুল ইসলাম। আবার অনেক আইনবিদ বলেন যে, কোন মুসলিম ভূখণ্ড দারুল ইসলাম বলে পরিগণিত হবে, যখন বিশ্বাসীগণ ধর্মীয় কর্তব্য স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবেন।[৫৮০]

দারুল ইসলামের আর একটি মাপকাঠি হল এই যে, এখানে শুক্রবারে জুমার নামাজ এবং ঈদের উৎস প্রতিপালিত হওয়া চাই। আইনবিদগণ আরও বলেন যে, যেখানে খলিফার প্রতিনিধিরূপে ওয়ালী অবস্থান

৫৭৮. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩
৫৭৯. Bmjwg wek‡Kvl- ইফাবা,ঢাকাঃ ১৯৯২, খ.১৩, পৃ.২৮৫
৫৮০. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

করেন কেবল সেখানেই এ নামাজ পড়া যেতে পারে। ওয়ালীর কর্তৃত্বাধীনেই কেবল নামাজ সিদ্ধ বলে গণ্য হয়। আইনের সুপরিচালনার জন্য এখানে একজন বিচারকও (কাজী) থাকা চাই।

কিন্তু যদি স্বাধীনভাবে নামাজ পড়া সম্ভব না হয়, তবে সে মুসলিম ভূখণ্ড আর দারুল ইসলাম বলে গণ্য হবে না। হানাফী আইনবিদগণ দারুল ইসলামের দারুল হারবে পরিণত হবার তিনটি উপায় নির্দেশ করেছেন ঃ

প্রথমতঃ যদি অবিশ্বাসীদের আইন-ব্যবস্থা কার্যকরী হয়;

দ্বিতীয়তঃ যদি কোন ভূখণ্ড অমুসলিম অঞ্চল দ্বারা দারুল ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়:

তৃতীয়তঃ যদি এখানে মুসলমান ও যিম্মিদের পক্ষে নিরাপদে বসবাস করা সম্ভব না হয়।[৫৮১]

বৈধভাবে মুসলিম আইন প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ওপরে নির্ভর করেই মুসলিম আইনবিদগণ কোন রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হিসেবে গণ্য করেছে। যদি গুটিকয়েক বিশ্বাসীও মুসলিম আইন মেনে চলেন, তবে এ স্থানে আইনের চোখে মুসলিম অঞ্চল বলে সাব্যস্ত হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে নেতৃস্থানীয় মুসলিম সুধীবৃন্দ পাক-ভারত উপমহাদেশের ব্যাপারে এ ব্যাখ্যাকেই সমর্থন জানিয়েছেন। যদিও উপমহাদেশটি ইংল্যাণ্ডের অধীনে ছিল, তবুও তাকে মুসলিম অঞ্চল বলে গণ্য করা হয়; কারণ, শাসক মুসলমান না হলেও চলে যদি শরিয়তের অধিকাংশ বিধান রূপায়িত করা হয়। কোন দেশে কাজী অমুসলিম শাসক কর্তৃক নিযুক্ত হলেও (মুসলমানদের সম্মতি নিয়েই তাঁকে নিযুক্ত করা হত) তিনি মুসলমান হিসেবে যদি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন– যাতে নামাজ ঠিকমত আদায় করা হয় ও শরিয়তের বিধান সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা হয়– তবে সে দেশ মুসলিম দেশ বলে গণ্য হবে।

৭২. যারা ঈমান এনেছে, গৃহ ত্যাগ করেছে, নিজের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে এবং যারা আশ্রয়দান করেছে ও সাহায্য করেছে, তারা একেঅন্যের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে,কিন্তু গৃহ ত্যাগ করেনি,তাদের বন্ধুত্বের কিছু প্রয়োজন তোমাদের নেই- যে যাবত না তারা গৃহ ত্যাগ করে। তারা যদি দীন সম্বন্ধে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে,তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

---

৫৮১. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০-১১২

Dhaka University Institutional Repository

দারুল-হার্ব[৫৮২] ও দারুল-ইসলামের মুসলিমগণের মধ্যে যুদ্ধ ও সন্ধির বিধান পার্থক্য

কয়েদীদের মধ্যে কিছু এমনও ছিল, যারা অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে হিযরত করতে পারেনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে বদর যুদ্ধে কাফিরদের সাথে শরীক থাকতে হয়েছে। এরূপ মুসলিমগণের কী বিধান তা এ আয়াতে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। হযরত শাহ সাহেব (র.) লিখেন, রাসূলে কারীম (সা.) এর সাহাবী দু রকমের ছিলেন- মুহাজির ও আনসার। যারা দেশ ও জ্ঞাতি পরিত্যাগ করেছিলেন,তারা মুহাজির। আর যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন তারা আনসার। এ দুই দলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভ্রাতৃ-বন্ধন স্থাপিত করে দিয়েছিলেন। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সঙ্গে যত মুসলিম উপস্থিত,তাদের সকলের সন্ধি ও যুদ্ধ এক। এদের মিত্র সকলেরই মিত্র,এদের শত্রু সকলেরই শত্রু। বরং হিজরতের শুরু ভাগে উক্ত ভ্রাতৃবন্ধনের ভিত্তিতে একজন অপর জনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হত। যা মুসলিম নিজ দেশেই থেকে গেছে, যেখানে কাফিরদের আধিপত্য অর্থাৎ যারা দারুল-হার্ব থেকে হিযরত করেনি, তাদের যুদ্ধ ও সন্ধিতে দারুল-ইসলামের আনসার-মুহাজির কোন মুসলিমই শরীক নয়। দারুল-হারবের মুসলিমগণ যদি কোন কাফির গোষ্ঠীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়, তবে দারুল-ইসলামের স্বাধীন মুসলিমগণ তা মানতে বাধ্য নয়। বরং তারা ভালো মনে করলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। হ্যা, একথা ঠিক যে, দারুল-হারবের মুসলিমগণ যখন কোন দীনি বিষয়ে স্বাধীন মুসলিমগণের সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন নিজ সাধ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য করা কর্তব্য। কিন্তু যাদের সঙ্গে স্বাধীন দেশের মুসলিমগণ সন্ধিবদ্ধ আছে, তাদের বিরুদ্ধে সে সন্ধির মেয়াদের মধ্যে দারুল-হারবের মুসলিমগণ শামিল ছিল না।

যারা কাফির, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমরা এটা না করলে দেশে ফিতনা ওমহা বিপর্যয় দেখা দেবে।[৮০]

অর্থাৎ কাফির ও মুসলিমের মধ্যে না প্রকৃত বন্ধুত্ব আছে, না তাদের একে অন্যের ওয়ারিস হতে পারে। হাঁ, একজন কাফির অপর কাফিরের বন্ধু বটে এবং ওয়ারিসও। বরং তোমাদের সাথে শত্রুতা করতে দুনিয়ার ভাবত কাফির এক ও অভিন্ন। তারা যেখানেই পাবে দুর্বল মুসলিমকে উৎপীড়ন করবে। কাজেই, এর বিপরীতেএক মুসলিম যদি অপর মুসলিমের বন্ধুও সাহায্যকারী না হয় বা দুর্বল মুসলিম যদি নিজেকে

৫৮২. Bmjwg wek‡Kvl- ইফাবা, ঢাকা: ১৯৯২, খ.১৩, পৃ.২৯২

স্বাধীন মুসলিমদের বন্ধুত্বে আনয়নের চেষ্টা না করে,তবে কঠিন বিপর্যয় ও মারাত্মক ফিতনা দেখা দেবে। অর্থাৎ দুর্বল মুসলিমের নিরাপত্তা থাকবে না,তার ঈমান পর্যন্ত বিপদের মুখে থাকবে।[৫৮৩]

৯.১৩: বিদেশী নাগরিক ও মুসলিম আইন

মুসলিম আইনে কেবল মুসলমানেরাই পূর্ণ আইনগত অধিকার ভোগ করলেও অমুসলিমগণও মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করার অনুমতি পেলে মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কতকগুলো আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারেন। মুসলিম আইনে মুসলমানই পূর্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার ভোগ করেন; মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর নির্ভর করেই আর সবাই বিভিন্ন প্রকার অধিকার লাভ করেন। আইনের চোখে যারা পূর্ণাঙ্গ অধিকার ভোগ করেন না, তারা হচ্ছে হারবী, মুস্তামিন ও যিম্মি।

হারবী

মূলতঃ যে দেশের লোকই হোক না কেন, দারুল হারবে অবস্থানকারীদেরই হারবী বলা হয়। এদের মধ্যে কিতাবী ও মুশরিক উভয়ই থাকতে পারেন; যেহেতু আইনের দৃষ্টিতে দারুল হারবের সঙ্গে দারুল ইসলামের যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান থাকে, সুতরাং এ দিক থেকে বিদেশী হারবীদের সঙ্গেও মুসলমানদের যুদ্ধগত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। মুশরিক হারবী মুসলমানদের মোকাবেলা করলেই আল কোরআনের এ নির্দেশের

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

আওতায় এসে পড়বে ঃ "মুশরিকদের যেখানে পাও, মেরে ফেল।"[৫৮৪] কেতাবি হারবীর জীবনরক্ষা করা যেতে পারে; কিন্তু তাকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে কয়েদ করা চলবে এবং দাসেও পরিণত করা যেতে পারে। অবশ্য বিশেষ অনুমতি বা আমান (নিরাপত্তার সনদ) নিয়ে হারবী নির্বিবাদে দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে পারেন।

এ সনদ বলে তিনি তার পরিবার ও ধন-সম্পদ নিয়ে কিছুদিনের জন্য দারুল ইসলামে পরিভ্রমণ বা বসবাস করতে পারেন।

মুস্তামিনদের অধিকার ও কর্তব্য

৫৮৩. শায়খুল হিন্দ্ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৫৮৪. আল-কুরআন, ৯ : ৫

কোন হারবী যখন মুস্তামিন হিসেবে গণ্য হয়, তখন তার সঙ্গে তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে আসতে অনুমতি দেয়া হয়। হেজাযের পবিত্র নগরগুলো ছাড়া দারুল ইসলামের সব শহরেই সে পরিভ্রমণ করতে পারবে। যিম্মির মর্যাদা লাভ করে জিযিয়া প্রদান করলে সে দারুল ইসলামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। সে যিম্মি মহিলাকেও বিবাহ করতে পারে এবং তাকে দারুল হারবে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু হারবী যদি মহিলা হয় এবং কোন যিম্মিকে বিবাহ করে, তবে তার স্বামীকে সে দারুল হারবে নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ, এতে শত্রুপক্ষ দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পাবে। নিরাপদভাবে চলাফেরা করার অধিকার ভোগকালে মুস্তামিন আইনের আওতায় ব্যবসা-বাণিজ্যও পরিচালনা করতে পারবে।[৫৮৫]

আবার মুস্তামিনকে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদিকে সম্মানের চক্ষে দেখতে হবে এবং সে এমন কিছু বলবে না বা করবে না যাতে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেতে পারে। তার কার্যক্রমে ইসলামের স্বার্থ যাতে বিপন্ন না হয়, সে সম্পর্কে তাকে সর্তক থাকতে হবে। সে যদি মুস্তামিনের ছদ্মবেশে দারুল ইসলামে গুপ্তচর বৃত্তির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশ করে থাকে, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দান বিধিসম্মত। সামরিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র কিংবা দাস-দাসী বা অন্য কোন রকমের হাতিয়ার কিনবার অধিকার তার নেই। এগুলো তার পক্ষে নিষিদ্ধ পণ্য (contraband) হিসেবে গণ্য হবে; কারণ, এর ফলে দারুল হারব দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে। নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা অবৈধ। এ ধরনের দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে মুস্তামিনকে তার টাকা দিয়ে দিতে হবে এবং মুস্তামিনও বিক্রেতাকে অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দেবে। অস্ত্রশস্ত্রের বেচাকেনা যদি বন্ধ নাও হয়ে থাকে, তবু কোন মতেই হারবীকে এসব অস্ত্রশস্ত্র দারুল হারবে নিয়ে যেতে দেয়া চলতে পারে না। সুদভিত্তিক চুক্তিও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে।[৫৮৬]

মুস্তামিন যদি আইন ভঙ্গ করে বা কোন অপরাধ করে, তবু তার আমান নষ্ট হবে না। কিন্তু তাকে সমুচিত শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী দু'রকমের নিয়ম লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেছেন। যদি সে সম্মান ও আদব-কায়েদা বিষয়ক আচার লঙ্ঘন করে, তবে তার ফলে তার আমানের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে, একথা বলে তাকে সাবধান করে দিতে হবে। আবার সে যদি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিষয়ক কোন আইন ভংগ করে, তবে তাকে বিশ্বাসী বা যিম্মিদের মতই সমানভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ বলেছেন যে. মুস্তামিনকে শাস্তি দেয়া চলবে না; সে ব্যভিচার করলেও তার বিরুদ্ধে

৫৮৫. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭
৫৮৬. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

কোন শাস্তির বিধান নেই; তবে সে যদি চুরি করে বা ডাকাতি করে, তবে সে অপহৃত জিনিস তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। কিন্তু সে যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করে বা তার হাত কেটে ফেলে, তবে তাকে হত্যা করা বা তার হাত কেটে ফেলা বৈধ। যদি দুই বা ততোধিক মুস্তামিন মুসলিম বিচারকের কাছে হাজির হয়ে বিচারপ্রার্থী হয় ও শরিয়তের বিধান দ্বারা পরিচালিত হতে চায়, তবে তাঁরা সে বিচার পরিচালনা করতে পারবেন। কিন্তু যদি কোন মুসলমান মুস্তামিনকে আক্রমণ করে, তবে মুসলমানটি ইমাম ও তাঁর প্রতিনিধিদের (শাসনকর্তা) কাছে শাস্তি ভোগ করবে। মুসলমানরাও শরিয়ত বিরুদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হবার বা অবৈধভাবে জিনিসপত্র খরিদ করার অধিকার পাবে না।

৯.১৪: আমান (নিরাপত্তা চুক্তি)

আমানকে নিরাপত্তাচুক্তি বা সনদ বলা যেতে পারে। এর ফলে হারবী দারুল ইসলামে মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিরাপত্তা বা রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার লাভ করে। দারুল ইসলামে বসবাস করার সময় মুসলমানদের সঙ্গে তার যুদ্ধাবস্থার অবসান হয় এবং হারবী তখন 'মুস্তামিন' বা নিরাপদ ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করেন। আমানের মেয়াদ এক বছরের কম হতে হবে। এক বছরের অধিক সময়ের জন্য আমান প্রার্থী হলে তাকে জিযিয়া দিতে হবে এবং তিনি জিম্মী পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবেন।

অস্থায়ীভাবে যুদ্ধ-বিরতির (মুহা'দানা অথবা মুও'য়াদা) ফলে ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি কিংবা ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসী মুসলিমগণ আমান প্রদান করতে পারেন। প্রথমটির নাম সরকারী আমান। আর দ্বিতীয়টিকে বেসরকারী আমান বলা যেতে পারে।

সরকারী আমানের ক্ষেত্রে ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক সাধারণতঃ একটি ভূখন্ডের সমগ্র অধিবাসীকে বা একটি নগরের অধিবাসীকে বা জনকয়েক হারবীকে প্রদান করা হয়। শান্তিচুক্তিতে প্রায়ই এই ধরনের আমানের প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকে। এর শর্তানুসারে হারবীগণ নিরাপদভাবে চলাফেলা করতে পারেন। সেনাপতি আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য এক বা ততোধিক হারবীকে আমান প্রদান করতে পারেন। আমানের আওতায় থাকাকালে হারবীগণ মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে রক্ষণাবেক্ষণ দাবী করতে পারেন। আমানের উদ্দেশ্য সাধিত হবার পর মুস্তামিনকে তার নিজের দেশে নিরাপদভাবে পৌঁছে দেয়া হয়।

আমান প্রদানের পদ্ধতি খুবই সহজ। এ নিয়ে আইনবিদদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। যে ভাষাভাষীই হোক না কেন, হারবীর পক্ষ থেকে আমান লাভের মনোভাব জানবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতিসূচক একটি বাক্য বা ইশারাই আমান প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট। আমান প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে সামান্য একটি ইঙ্গিত দান বা

Dhaka University Institutional Repository

অভিবাদনই হারবীকে নিরাপত্তার অধিকার লাভের নিশ্চয়তা দান করে। যদি কোন বিশ্বাসী আমান না দেয়ার সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু তার ইঙ্গিতে হারবীগণ আমান লাভ করেছেন বলে মনে করে থাকেন, তবে তা বৈধ আমান বলে গণ্য হবে।[৫৮৭]

এ প্রসঙ্গে আল-হারমুযানের ঘটনাটি মনে করা যেতে পারে। এখানে আমান প্রদানের কোন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ছলে বা কৌশলে না হলেও অন্ততঃপক্ষে হারমুযান আমান পেয়ে গিয়েছে, এ কথাই অপ্রত্যক্ষভাবে ধরে নেয়া হয়েছিল। আমান না নিয়েই যদি কোন হারবী দারুল ইসলামে প্রবেশ করে এবং পরে আমান লাভ করতে না পারে, তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। ইমাম শাফেয়ী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তাকে চার মাসের সময় দেয়া উচিত। চার মাস পর তাকে হয় দারুল ইসলাম পরিত্যাগ করে যেতে হবে (তাকে নিরাপদে সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে দেয়া হবে), নতুবা জিযিয়া প্রদান করে যিম্মি পর্যায়ভুক্ত হতে হবে। অন্যান্য আইনবিদ বলেছেন যে, এই হারবীকে বহিষ্কৃত করা উচিত। অবশ্য দারুল হারবে পৌঁছা পর্যন্ত অবশ্যই তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোন হারবী কার্যোপলক্ষে ইমামের কাছে কোন বার্তা বহন করে নিয়ে আসে, তবে তাকে আমান ব্যতিরেকে ইমামের কাছে যেতে দেয়া হত। কারণ, তখন সে কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা (immunity) লাভের অধিকারী। কিন্তু ইমাম যদি বুঝতে পারেন যে, দূতের কোন পরিচয়-পত্র নেই কিংবা সে আদৌ কোন বাণী নিয়ে আসে নি, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দান বৈধ হবে।

ভুলক্রমে বা জাহাজডুবীর ফলে হারবী দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে পারে এবং আমান ব্যতিরেকে মুসলমানদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। অধিকাংশ আইনবিদ বলেন যে, এক্ষেত্রে ইমাম স্বেচ্ছায় হারবীকে মুক্ত করে দিতে পারেন বা অবস্থা বিবেচনা করে অবিলম্বে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। তিনি ক্ষতিপূরণ নিয়েও তাকে মুক্ত করতে পারেন।[৫৮৮]

আমানের মেয়াদের সমাপ্তি

আমানের মেয়াদ (এক বছরের বেশী নয়) ফুরিয়ে যাবার ফলে বা মুস্তামিন দারুল ইসলাম পরিত্যাগ করলে আমানের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। সে যদি আবার দারুল ইসলামে ফিরে আসতে চায়, তবে তাকে নতুন

৫৮৭. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
৫৮৮. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫-১২০

করে আমান সংগ্রহ করতে হবে। ইমাম যদি বুঝতে পারে যে, মুস্তামিন গোপনে দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত আছে বা তার কার্যাবলী মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী, তবে আমান নাকচ করে দেয়া যেতে পারে ও ইমাম মুস্তামিনকে ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করে দিবে। কোন মুসলমান যদি আমান দিয়ে থাকেন ও আমান ইসলামের পক্ষেক্ষতিকর বলে গণ্য হয়, তবে ইমাম সে মুসলমানকেও শাস্তি দিতে পারেন।[৫৮৯]

মুস্তামিন যদি তার ধন-সম্পদ দারুল ইসলামে রেখে ফিরে যায় এবং দারুল হারবে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীগণ দারুল হারবে নিয়ে যেতে পারবে না। ইসলামী রাষ্ট্র তা বাজেয়াপ্ত করে নেবে। কিন্তু মুস্তামিন যদি দারুল ইসলামে অবস্থানকালে মারা যায়, তবে তার প্রতি প্রদত্ত আমান এ সম্পত্তির ওপরও প্রযোজ্য হবে এবং তার উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পদ দারুল ইসলামের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে।

আমানের গুরুত্ব

মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে অস্থায়ী শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে আমান প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক সর্বক্ষণ যুদ্ধভিত্তিক ও অশান্তিপূর্ণ মনে করা হত। তাই আমানের অবর্তমানে অস্থায়ী শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনও এক রকম অসম্ভব ছিল। মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কের মধ্যে আমান এমন সহজ স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল, যার ফলে মুসলিম ও অমুসলিম একে অপরের রাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করার অনুমতি লাভ করে। মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করার সময় আমান বিদেশীদের পাসপোর্টের কাজ করে। সাধারণভাবে যখন মুসলমান ও অমুসলমানদের পক্ষে দারুল ইসলাম থেকে বাইরে যাওয়া বা দারুল ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না, তখন পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র ছাড়া কোন জিনিসপত্রের আদান-প্রদানও সম্ভব হত না। আমানের মারফত সীমান্তে লোক ও মালপত্র চলাচল অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। আমান না থাকলে দুটি বিরোধী দেশের মধ্যে বেআইনী আদান-প্রদান সংঘটিত হত ও এদের মধ্যে খুব বেশী মনকষাকষিও শুরু হয়ে যেত। যুদ্ধ-বিরতি কালে বার বার আমান প্রদানের ফলে মুসলিম ব্যবসায়ী ও বিদেশী রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা খুব সহজ হয়ে পড়ে।[৫৯০]

আমানের অধীনে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের কার্যাবলী

৫৮৯. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
৫৯০. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

মুসলমানরা যে পর্যন্ত আমানের অধিকার ভোগ করেন, সে পর্যন্ত তারা অমুসলিমদের কোন রকম ক্ষতিসাধন করতে পারবেন না। তা ছাড়া যদিও সুদ, মদ ও শুকরের গোশত বিক্রয় অমুসলিম রাষ্ট্রের আইন বৈধ বলে বিবেচিত হয়, তবু এগুলোর বিষয়ে অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে মুসলমানদের যে দেশেই বাস করুন না কেন, মুসলিম আইন তার ওপর সব সময়েই প্রযোজ্য হবে এবং দারুল হারবে থাকাকালে কোন মুসলমান যদি কোন ওয়াদা দিয়ে থাকে, বা চুক্তি সম্পাদন করে থাকে, তবে দারুল ইসলামে ফিরে গেলে ও তাকে তা পালন করতে হবে। আবার সেখানে থাকাকালে সে যদি টাকা কর্জ নিয়ে থাকে বা কোন জিনিস চুরি করে থাকে, তবে দারুল হারব ত্যাগ করে যাবার পরেও সে তা' ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু দারুল হারবে বসবাসকালে মুসলিম এমন কিছু করতে পারবে না, যাতে সে রাষ্ট্র দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দারুল হারবে বসাবসাকারী মুসলমানগণ দারুল হারব কর্তৃপক্ষের নিকট দারুল ইসলাম সম্পর্কে কোন গোপন তথ্য সরবরাহ করতে পারবে না। কিংবা দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে, এ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর সরঞ্জাম উৎপাদনের কাজে সাহায্য করতে পারবে না। কেতাবি হলেও মুসলমানদের পক্ষে হারবী মহিলাকে বিবাহ না করাই শ্রেয়। কারণ, এর ফলে তার সন্তান-সন্তুতিদের হয়তো দারুল হারবের জন্য কাজ করতে হতে পারে।[৫৯১]

আমান ব্যতিরেকে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের কার্যাবলী

মুসলিম আইন মতে আমানবিহীন মুসলমানের সঙ্গে অমুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় অমুসলিম রাষ্ট্রের আইন-বিধি মেনে নিতে তিনি বাধ্য থাকবেন না। যদি ইমামের অনুমতিক্রমে কোন মুসলমান দারুল হারবে প্রবেশ করেন, তবে যুদ্ধকালে জেহাদীরা যেমন শত্রুপক্ষের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন, এবং তাদের লোকদের বন্দী করতে পারেন, তিনিও সে ক্ষেত্রে তা করতে পারবেন। মুসলিম আইনে নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। কাজেই যদি কোন মুসলমান দারুল হারবে অবস্থানকালে ব্যভিচার করে, শূকরের গোশত খায় বা মদ পান করে থাকে, তবে দারুল ইসলামে ফিরে আসার পর তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।[৫৯২]

---

৫৯১. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫
৫৯২. প্রাগুক্ত, পৃ.১২২-১২৩

৯.১৫: অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম

দারুল ইসলাম হল সেই রাষ্ট্র যেখানে মুসলিম শাসক কর্তৃক মুসলিম আইন বাস্তবে রূপায়িত হয়; কিংবা সেই রাষ্ট্র যা অমুসলিমদের অধিকারে গিয়ে পড়লেও অনেকটা স্বাধীনভাবেই মুসলিম আইন পালন করতে সক্ষম হয়। আর যে রাষ্ট্রে অমুসলিম আইন রূপায়িত হয় এবং যেখানে মুসলমান তাঁর নিজস্ব বিধি-বিধান পালন করতে পারেন না, তা অমুসলিম ভূখণ্ড বলে বিবেচিত হবে। কাজেই দারুর হারব হল এমন একটি ভূখণ্ড যা মুসলিম আইনের সম্পূর্ণ আওতাবহির্ভূত। আইনগত সাম্যের ভিত্তিতে দারুল ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা দারুল হারবের নেই। কাজেই এ দু'ভূখণ্ডের মধ্যে কোন ব্যবস্থা বা চুক্তি সম্পাদিত হলে তা' স্বল্পস্থায়ী হতে বাধ্য। কারণ, এর মধ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতিও দেয়া হয় না, কিংবা উভয় রাষ্ট্রের স্বাভাবিক যুদ্ধাবস্থার ক্ষেত্রেও কোন পরিবর্তন হয় না।

মুসলিম আইনের বাইরে হলেও দারুল হারবকে পূর্ণ নৈরাজ্য (No man's land) বলে মনে করা চলে না; কারণ এ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে বলে দারুল হারব মুসলিম আইনের আওতায় দারুল ইসলামের সঙ্গে মুসলিম সামরিক আইন অনুযায়ী সম্পর্ক নির্ণয়ের অধিকার লাভ করে। যুদ্ধকালে মুসলমানেরা তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী অমুসলিম যোদ্ধা ও সাধারণ নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করতে বাধ্য হন।[৫৯৩]

জেহাদের বিরতিকালে যখন অস্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিদেশী শাসক বা শাসকদের ইসলাম আংশিকভাবে স্বীকার করে দেয়। কিন্তু ইসলামের এ স্বীকৃতি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতির (Recognition) পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ, অমুসলিম শাসকদের কার্যকলাপ ইসলাম অনুমোদন করলে তবেই বলা যায় যে, ইসলাম আধুনিক পরিভাষার সংজ্ঞা অনুযায়ী তাদের 'অনুমোদন' দান করেছে। ইসলাম যে অমুসলিম শাসনকে আংশিক স্বীকৃতি দেয় তার অর্থ হল এই যে, কোন অঞ্চলে শাসন ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অস্তিত্ব না থাকলে মানবসমাজ টিকে থাকতে পারে না। মুসলমানকে অমুসলিম রাষ্ট্রে পরিভ্রমণ বা বসবাস করতে হয়, তবে তিনি সেখানকার কর্তৃপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন কিংবা তার বিরোধিতা করতে পারবেন না।

৯.১৬: যিম্মিদের মর্যাদা

৫৯৩. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২

'যিম্মি' কথাটির অর্থ হল এমন চুক্তি, বিশ্বাসী মুসলিম যার মর্যাদা দিতে স্বীকৃত হন। এ চুক্তি লঙ্ঘন কররে তাকে নিন্দার্হ হতে হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে কেবল আহলে কিতাব ছিল তা নয়, এর মধ্যে পৌত্তলিক (আবদাত আল-আসনাম) ও অগ্নিপূজকও ছিল। এদের আবশ্য আরবীয় উপদ্বীপের বাইরে বসতি স্থাপন করতে হত। কেতাবিদের মধ্যে খৃস্টান, ইহুদী, মাজিয়ান (জরথ্রুস্টীয়), সামারীয় ও সেবীয়গণ রয়েছে। সাধারণতঃ আরব দেশে মুশরিক বা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসীগণকে যিম্মির মর্যাদা দেয়া হত না।

চুলচেরা বিচারে মাজিয়ানরা কেতাবি বলে গণ্য হতে পারেন না। কারণ, হাদিসে জানা যায় যে, আল্লাহর ওপর তাদের বিশ্বাস ছিল না এবং তাদের কোন কেতাবও ছিল না। যেহেতু তাদের একজন্য উপাস্য ছিল সেজন্য রাসূল মুহাম্মদ (সা.) ও প্রাথমিক যুগের খলিফাগণ তাদের কেতাবি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের যিম্মির মর্যাদা দান করেছেন।[৫৯৪]

দারুল ইসলামের অভ্যন্তরে বা বাইরে যেখানেই বাস করত না কেন, যাদের ধর্মীয় কেতাব ছিল তাদেরই 'আহলুল-কেতাব' বা কেতাবি বলে গণ্য করা হত। দারুল ইসলামে যে সব আহলুল কেতাব বাস করত ও যারা মুসলিম কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল তাদের যিম্মি নামে অভিহিত করা হত। আইনের বিচারে দেখা যায় যে, যিম্মি কথাটি বলতে একটি বিশেষ অবস্থা বুঝায়; এ অবস্থা লাভ করলে ব্যক্তি কতগুলো অধিকার লাভ করেন, যেগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ছাড়াও এ অধিকারের মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য আমান প্রদান করা হয়। কিন্তু এর ফলে সে ব্যক্তি পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করে না। কারণ, কেতাবি যদি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন কিন্তু রাসূলের (স.) ওপর ঈমান আনেন না। তাই তাকে সত্যিকার বিশ্বাসী বলে গণ্য করা যেতে পারে না। সেজন্য তিনি মুসলিম-ভ্রাতৃত্বের পূর্ণ সদস্যরূপে গণ্য হতে পারেন না। কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা নিপীড়ন থেকে রেহাই পাবার জন্য যিম্মিকে জিজিয়া প্রদান করতে হয়।[৫৯৫]

প্রশ্ন উঠেছে যে, দুনিয়াতে সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যখন ইসলামের উদ্দেশ্য, তার পরিপ্রেক্ষিতে জিজিয়া নিয়ে অবিশ্বাসী বা কুফুরীকে স্থায়ী করা যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে কি-না। সারাখসী বলেন যে, অর্থকরী দিকটা এখানে খুব বড় কথা নয়। অতি উদারভাবে অমুসলিমকে যে ইসলামে আহ্বান

৫৯৪. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫
৫৯৫. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮

করা হত, এর মধ্যে তা-ই মূর্ত হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের মধ্যে বসবাস করার অনুমতি লাভ করার ফলে যিম্মিগণ ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য দ্বারা আকৃষ্ট হন এবং তার ফলে ইসলাম গ্রহণ করতে তারা সম্মত হতেও পারেন।

যিম্মিদের অধিকার ও দায়িত্ব

ইসলামের অভ্যুত্থানের সময় থেকে আজ অবধি যিম্মিদের যে সব অধিকার, দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি গড়ে উঠেছে, তা এবার সংক্ষিপ্তরূপে দেখান যেতে পারে।

আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাগণ সংক্ষেপে বারোটি কার্যক্রম পেশ করেছেন। এগুলোকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ছটি অতি প্রয়োজনীয়। এগুলো লঙ্ঘন করলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়; পরের ছটি পালন করা প্রয়োজনীয়। এগুলো লঙ্ঘন করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়। নিম্নলিখিত ছটি[৫৯৬] নিয়ম-কানুন অবশ্য কর্তব্য, অন্যগুলো প্রয়োজনীয়ঃ

১. প্রত্যেক পুরুষ, বয়স্ক, স্বাধীন ও সুস্থ যিম্মিজিযিয়া দিতে বাধ্য থাকবে। তার পরিমাণ অবশ্য মুসলিম শাসক কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মালিকী আইনবিদেরা বলেন যে, ওয়ালী বা শাসকগণ জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবেন। হানাফী মতপন্থীগণ একে তিনভাগে ভাগ করেছেন ঃ

    (ক) স্বচ্ছল ব্যক্তিদের ৪৮ দিরহাম করে জিযিয়া দিতে হবে, (খ) গরীবগণ ১২ দিরহাম এবং (গ) যারা এর মাঝামাঝি, তারা ২৪ দিরহাম করে দেবে। শাফেয়ী আইনবেত্তাগণ বলেন যে, কমপক্ষে জিযিয়া মাথাপিছু এক দিনার হওয়া উচিত। যদি যিম্মি তার ধর্ম পরিত্যাগ করে, তবে তার ওপর থেকে জিযিয়া তুলে নেয়া হবে। যে সব যিম্মির জমি আছে, তাদের খারাজ দান করতে হবে। মুসলমান হলে জিযিয়া দিতে হয় না। কিন্তু মুসলমান হলেও ভূমি-কর দিতে হবে। অবশ্য ইমাম যিম্মিকে এ কর থেকে রেহাই দিতে পারেন।

    হানাফী মতে জিযিয়া না দিলেও চুক্তি ভঙ্গ হয় না। কারণ, এর মধ্যে সব চাইতে প্রয়োজনীয় বিষয় হল যিম্মি হওয়ার ব্যাপারটি– জিযিয়া প্রদান করা নয়। যিম্মি হওয়ার ফলেই জিযিয়া দিতে হয়। সেই কারণে আইনবিদগণ যিম্মিদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করার ব্যাপারে উদারতা অবলম্বন করতে বলেছেন। আবু ইউসুফ বলেন, 'জিযিয়া না দিলে তাদের প্রহার করা উচিত নয় অথবা রোদে দাঁড়

৫৯৬. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৬

Dhaka University Institutional Repository

করিয়ে রাখা উচিত নয়। জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত তাদের কয়েদ করা উচিত।' যিম্মিদের জেহাদে শরিক হওয়ার যখন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তখন জিযিয়াকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ও মুসলিম শাসনে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারের বিনিময়ে প্রদত্ত শুল্কও বলা যেতে পারে।

২. যিম্মিগণ ইসলাম ধর্মকে সমালোচনা করবে না, মুসলিম অনুষ্ঠানাদির অবমাননা করবে না।

৩. তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) বা আল-কোরআনের নিন্দাবাদ বা অসম্মান করবে না।

৪. তারা মুসলমানের জীবন বা ধনসম্পদ বিনষ্ট করবে না; কিংবা তার ধর্ম-বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরাতে কিংবা তাকে ধর্ম ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করবে না। কারণ, একে অবিশ্বাস প্রসারের অপচেষ্টা বলে গণ্য করা হবে।

৫. যিম্মি মুসলিম মহিলাদের বিবাহ করতে পারবে না কিংবা তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারবে না। (মুসলমানগণ অবশ্য ম্যাজিয়ান বা পৌত্তলিক ভিন্ন কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করতে পারে)

৬. তারা শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে পারবে না; অথবা হারবীকে (বিদেশী) সাহায্য করতে পারবে না বা গুপ্তচর নিয়োগ করতে পারবে না। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের গোপনীয় তথ্য শত্রুপক্ষের নিকট বলতে পারবে না কিংবা তাদের কোন সংবাদ সরবরাহ করতে পারবে না।

৭. মুসলমানদের সঙ্গে তারা ব্যবসায়ে সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার পেলেও তারা মদ বিক্রয় বা সুদের ব্যবসা করতে পারবে না' কিংবা প্রকাশ্যে তারা মদ ও শূকরের গোশত খেতে পারবে না।

৮. তারা বিশেষ কতগুলো পোশাক পরিধান করবে, যেমন গিয়ার পোশাকে একটা হলদে বন্ধনী; যুন্নার (girdle)এবং মাথার লম্বা ও রঙীন কালানসুয়া বা শিরস্ত্রাণ।

৯. তারা ঘোড়ায় চড়তে পারবে না বা অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে পারবে না। অবশ্য গাধা ও খচ্চরের পিঠে তারা চড়তে পারবে। তাদের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন হিসেবে জিনের ওপর তাদেরকে একটা কাষ্ঠ-গোলক বেঁধে দিতে হবে।

১০. তাদের বাড়ী-ঘর মুসলমানদের চাইতে উঁচু হবে না– নীচু হলেই ভাল।

১১. তারা তাদের গীর্জার ঘণ্টা জোরে বাজাবে না বা উচ্চস্বরে উপাসনা করবে না।

১২. মৃতদেহ নিয়ে তারা চিৎকার করে কাঁদবে না; মুসলিম জনপদ থেকে দূরে তাদের কবরস্থ করতে হবে।[৫৯৭]

এর ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়। এরা নিজ নিজ ধর্ম পালন করার অধিকার ভোগ করত নিজস্ব ধর্মীয় নেতার অধীনে এবং নিজেদেরকে পরিচালিত করত। ধর্মীয় নেতারা আবার

৫৯৭. ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

মুসলিম শাসকদের নিকট দায়ী থাকতেন। কাজেই যিম্মিকে দুটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য দেখাতে হত। তার নিজের সমাজ ও যে বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার সমাজের অস্তিত্ব ছিল। তার নিজের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত ছিল; কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তার ওপর কতগুলো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হত, যেমন সাক্ষ্যদান, ফৌজদারি আইন ও বিবাহ। সে মুসলমানদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারবে না। যদি তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করত, তবে হয় তাকেও নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে হত, নতুবা স্ত্রীকে তালাক দিতে হত। গানিমাতেও তার কোন অধিকার ছিল না। যুদ্ধে যোগদান করলে তাকে বেতন দেয়া হত।[৫৯৮]

৫৯৮. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৯-১৪২

দশম অধ্যায়
ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতি

ইসলাম এমন একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা, যার মধ্যে জাগতিক ও পরলৌকিক উভয়বিধ মূল্যবোধেরই সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসী মুসলমানকে দুনিয়াতে এমনভাবে জীবনযাপন করতে বলা হয়েছে যেন তিনি চিরকালই জীবিত থাকবেন; আবার সঙ্গে তাকে এমনভাবে নাজাত বা পারলৌকিক মুক্তির জন্য কাজ করে যেতে হবে যেন আগামীকাল তার মৃত্যুর দিন। আইনে অবশ্য পারত্রিক মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। পারত্রিক জীবনকে অস্বীকার করে ইহকালের জন্য কাজ করা ইসলামে অনুমোদিত হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য (তিজারা বা তিজারাত) এমন একটি বৃত্তি, যা আইনের সীমার মধ্যে পরিচালিত হলে, ধর্মীয় কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুনিয়াতে তা অনেক কল্যাণ সাধন করতে পারবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ্ সুদকে হারাম আর ব্যবসাকে হালাল করেছেন'। (আল কুরআন, ২:২৭৫)

যে পরিবেশে ইসলামের উন্মেষ সাধিত হয়, তা' বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ ছিল এবং ব্যবসায়ী হিসেবে হযরত মুহাম্মদের (সা.) প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতা খোদার বাণীর মধ্যেও প্রতিভাত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য আল-কোরআনে যে কেবল নিয়ামত অন্বেষণকারীর জন্য সমর্থিত হয়েছে তা' নয়, বস্তুতঃ ধর্মীয় ভাবধারা প্রকাশের ক্ষেত্রেও বাণিজ্যিক সংজ্ঞা ও শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী ইতিহাসে আগাগোড়া বাণিজ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির স্বর্ণযুগে ব্যবসায়ীগণই সমাজের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রসার এবং সমৃদ্ধি সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। যদিও ব্যবসায়ীগণ সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতিকে বড় একটা প্রভাবিত করতে পারেননি, তবু আইনবেত্তা ইমাম আবু হানিফার মত ব্যবসা-বাণিজ্য লিপ্ত ব্যক্তিগণের প্রভাব অনেক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের চাইতে বেশি ছিল। আরব দেশে প্রাক-ইসলামী যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পণ্যের আদান-প্রদানের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম সমাজে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে।[৫৯৯]

দারুল ইসলামের বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বসহ আইনবিদই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থাৎ দারুল ইসলাম ও দারুল

৫৯৯. এ.জে. এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

হারবের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের ব্যবস্থা অনুমোদন করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মালিকী আইনবিদগণ স্থল কিংবা সমুদ্রপথে দারুল হারবের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্য করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালিক অমুসলিমদের দারুল ইসলামে এসে মুসলমানদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু মুসলমানরা দারুল হারবে গিয়ে ব্যবসা করুক, এটা তিনি অনুমোদন করেননি। এর কারণ এই যে, ইমাম মালিক মুসলিমের পক্ষে এমন দেশে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি, যেখানকার লোকেরা পূর্ব পুরুষদের সম্মান করে না, মূর্তি পূজা করে এবং তাদের দেবদেবীর সাথে বিশ্বপালক রাহমানুর রাহিম আল্লাহর শরিক করে। অবশ্য অন্যান্য মাযহাবের আইনবিদগণ দারুল ইসলামের অভ্যন্তরে বা বাইরে অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তবে তাঁরা ব্যবসায়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট লোকজন ও পণ্য-দ্রব্যের চলাচলের ওপরে কতগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করেন।[৬০০]

১০.১: বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর কূটনৈতিক প্রভাব

মক্কার লোকজন তাদের ব্যবসায়িক কাজে মদিনার পথ ধরে তারা অন্যান্য রাষ্ট্রে গমনাগমন করত্ তাই বাণিজ্যিক রাস্তা নিরাপদ থাকা আবশ্যক।

“সা’দ বিন মুয়ায বলেন, তিনি উমাইয়া ইবনে খালফ ওরফে আবু সাক্ওয়ানের বন্ধু ছিলেন। যদি উমাইয়া মদিনার ভিতর দিয়ে কোথাও যেতে, সে সা’দের নিকট থাকত এবং পক্ষান্তরে সা’দ মক্কার ভিতর দিয়ে কোথাও গেলে উমাইয়ার নিকট থাকতেন। মদীনায় রাসূল (সা.) চলে আসার পর সা’দ মক্কায় যান উমরা সম্পাদন করতে এবং উমাইয়ার নিকট অবস্থান করে তাকে বললেন উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে, যখন তিনি কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করতে পারবেন। তাই তারা প্রায় দ্বিপ্রহরে বাইরে গেলেন। আবু জেহেলের সংগে তাঁদের সাক্ষাত হল এবং উমাইয়াকে প্রশ্ন করলেনঃ হে আবু সাকওয়ান, তোমার সংগে এই লোকটি কে? সে বললঃ সা’দ। অতঃপর তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ বেদাতীদেরকে (মুসলমানের উদ্দেশ্যে আবু জেহেল বলেছিল) আশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও দেখছি তুমি শান্তির সাথে মক্কার ঘর (কাবা) প্রদক্ষিণ করছ এবং তুমি ভানও করো যে, তুমি তাদেরকে সাহায্য করবে? আল্লাহর কসম, যদি তুমি আবু সাকওয়ানের সংগে না থাকতে, তা’হলে তোমার লোকদের কাছে নিরাপদে তুমি প্রত্যাবর্তন করতে পারতে না। সা’দ উচ্চৈঃস্বরে উত্তর

৬০০. মজিদ কাদ্‌দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৭

দিলেনঃ আল্লাহর কসম যদি আজ বাধা দিতে, তাহলে আমি তোমাকে বাধা দিয়ে তোমার পক্ষে অধিকতর অসুবিধা ঘটাতাম, অর্থাৎ মদীনাবাসীদের ভিতর দিয়ে তোমার যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হত।

আবদুর রাহমান ইবনে অওফ বলেন ঃ আমি উমাইয়া বিন খালফের সংগে একটি চুক্তি করলাম যাতে সে মক্কায় আমার মালপত্রের হেফাযত করে এবং আমি মদিনায় তার মালপত্রের হেফাযত করব। যখন আমি আমার নাম লিখলাম আবদুর রাহমান', সে বলল ঃ আমি ইহা জানি না, বরং তুমি তোমার প্রাক-ইসলামী নামটি লিখ। সুতরাং আমি 'আবদ আম্‌র' নামটি দস্তখত করলাম। এটা ছিল বদর যুদ্ধের দিন....... ।"[৬০১]

উভয় ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরতের প্রথম দিকে, বদর যুদ্ধের পূর্বে যা ঘটেছিল দ্বিতীয় হিজরীতে।
সুমামা ইবনে সাল ইয়ামামার জনৈক দলপতি ছিল। ষষ্ঠ হিজরীর গোড়ার দিকে এক মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় আনীত হয়েছিল। এখানে মহানবী (সা.) ভদ্র আচরণে সে এমনই মুগ্ধ হয় যে, সে ইসলাম কবুল করে ফেলে। প্রত্যাবর্তনের পথে সে মক্কার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় তার ইসলামে দীক্ষার জন্য কিছু বিরূপ মন্তব্য কানে এলো। সে বলল ঃ তোমাদের শহরে ইয়ামামার একটি কণাও আমদানী হবে না যে পর্যন্ত মহানবী (সা.) নির্দেশ না দেন। ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মক্কাবাসী বিনীতভাবে মহানবীকে অনুরোধ করল নিষেধ তুলে নেওয়ার জন্য যা তিনি দয়াপরবশত হয়ে করেছিলেন।

১০.২: দারুল ইসলামের সঙ্গে অমুসলিমদের ব্যবসা বাণিজ্য

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের নিকট দারুল ইসলামের দ্বার উন্মোচন করে মুসলিম শাসকগণ সত্যিই অভূতপূর্ব ঔদার্য প্রদর্শন করেছেন। সাধারণতঃ নীতিগতভাবে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম ব্যবসায়ীগণকে চার মাসের জন্য আমান (নিরাপত্তা) প্রদান করা হত। পণ্য দ্রব্যাদির আদান-প্রদান যদি এই সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব না হত, তবে সময় বর্ধিত করে নতুন আমান প্রদান করা হত। যদি কোন ব্যবসায়ী কমপক্ষে এক বছর দারুল ইসলামে অবস্থান করত ও জিম্মী হিসেবে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হত, তবে সাধারণতঃ তাকে কতিপয় সুবিধা দেয়া হত। মুস্তামিন হিসেবে সে দারুল ইসলামে অবাধে চলাফেরা করতে পারত; কেবলমাত্র বায়তুল হারাম বা হেজাযের পবিত্র স্থানসমূহে যাতায়াত তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।[৬০২]

৬০১. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
৬০২. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৫

পণ্যদ্রব্যাদির অবাধ আদান-প্রদানের ব্যাপারে আইনবিদগণ বিদেশী ব্যবসায়ীদের ওপর কতগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য ইমামকে উপদেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সাধারণ নীতি হল এই যে, দারুল ইসলামের সঙ্গে দারুল হারবের যুদ্ধগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি রফতানী করা চলে না; কারণ, এতে দারুল হারব দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। সব আইনবিদই এ সম্বন্ধে একমত যে, অস্ত্রশস্ত্র ও সমর-সম্ভার যুদ্ধকালীন নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য বলে বিবেচিত হবে। তাই, এগুলো বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে বেআইনী ঘোষিত হয়। তবে অনেকে এই মতও পোষণ করেন যে ঘোড়া খচ্চর ও দাসদাসী যুদ্ধে এত অধিক প্রয়োজনীয় যে, এগুলোর বিক্রয়ও নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক আরও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। তিনি কতিপয় খাদ্যজাত পণ্য এবং পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনের বিক্রয়ের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিদেশী ব্যবসায়ী দারুল ইসলামে অবস্থানকালে যদি অনুরূপ কিছু নিষিদ্ধ দ্রব্য ক্রয় করতে চান, তবে তার নিকট সেগুলোর বিক্রয় অবৈধ বলে গণ্য হয় না; কিন্তু দারুল ইসলাম পরিত্যাগ করারপূর্বে তাকে সেগুলো পুনরায় বিক্রয় করে যেতে হবে। বিদেশী ব্যবসায়ীদের তল্লাশী ও নিষিদ্ধ দ্রব্যের রফতানী বন্ধ করার জন্য আইনবেত্তা আবু ইউসুফ দারুল ইসলামকে সীমান্তে তল্লাশী ঘাঁটি ও প্রহরাকেন্দ্রসমূহ (মাসালিহ) স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। অবশ্য, বিদেশী সওদাগরকে শূকরের গোশত, মদ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয় করার অনুমতি দেয়া হয় না। কিন্তু শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এ সব নিয়ম খুব কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা যায়নি; ফলে অনেক সময় দারুল ইসলাম থেকে জিনিসপত্রের রফতানী এ দারুল হারব থেকে জিনিসপত্রের আমদানী অবাধে চলতে থাকে।

দারুল ইসলামে দু'শ দিরহামের অধিক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করলে বিদেশী ব্যবসায়ীকে সব পণ্যদ্রব্যের ওপর শতকরা দশভাগ পণ্যশুল্ক (উশর) দিতে হয়। ইমাম অবশ্য বর্হিবাণিজ্যের প্রসারের জন্য শুল্কের হার কমিয়ে দিতে পারেন কিংবা সরকারী আয় বাড়াবার জন্য তিনি শুল্কের হার বাড়িয়েও দিতে পারেন; কিন্তু বছরে একবারের বেশী এ শুল্ক আদায় হত না। যদি কোন বিদেশী সওদাগরের নিজ দেশে মুসলিম ব্যবসায়ীগণ বিনা শুল্কে ব্যবসায়ের সুযোগ পেতেন, তবে ইমামও অনুরূপভাবে অবাধ ব্যবসায়ের নীতি অনুসরণ করতেন। ব্যবসায়ের জন্য ইমামের অধীনস্থ জিম্মীদের কোন বাণিজ্য-শুল্ক দিতে হত না; তবে কেবলমাত্র হেজাযে ব্যবসায়ের জন্য জিম্মীদের অনুরূপ শুল্ক দিতে হত।[৬০৩]

৬০৩. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮-১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১০.৩: দারুল হারবের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য

মুসলিম ব্যবসায়ীদের দারুল হারবে[৬০৪] ব্যবসায়ের ব্যাপারে মুসলিম আইনবিদগণ অপেক্ষাকৃত কম উদারতা দেখিয়েছেন; কিন্তু দারুল ইসলামের সঙ্গে অমুসলিম ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যাপারে তাঁরা অধিকতর ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। মালিকী ও যাহিরী আইনবিদগণ মুসলমানদের পক্ষে দারুল হারবে যাওয়া পছন্দ করেননি; কারণ, এর ফলে তারা পৌত্তলিকতা ও দারুল হারবের আইনের আওতায় আসতে বাধ্য হবেন। ইবনে হাযম এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জেহাদের উদ্দেশ্য কিংবা রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে দৌত্য বা বাণী নিয়ে যাবার জন্য কেবল ইমাম দারুল হারবে গমনের অনুমতি দিবেন। ইমাম মালিক বলেন যে, দারুল ইসলামের সীমান্তে পরিব্রাজকদের গমনাগমন এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের দারুল হারবে যাওয়ার ব্যাপারেও ইমাম কড়া নজর রাখবেন।

তবে অধিকাংশ আইনবিদই বিশেষ করে হানাফীগণ এ ব্যাপারে অনেক বেশী উদারতা দেখিয়েছেন। হানাফীগণ ধর্মাধর্ম পদ্ধতি (আল-হিয়াল আশ-শারিয়া) দ্বারা অনেকগুলো বিধিনিষেধ অতিক্রম করেছেন। আন্তর্জাতিক বিষয়ের মুসলিম আইনবেত্তাগণ এই সব বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন, যেগুলো এখনও বিদ্যমান আছে। বিদেশ হতে কি ধরনের পণ্যদ্রব্য আমদানী করা যাবে এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে দ্রব্য বিনিময়কালে কি পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি হবে, আর ইসলামী রাষ্ট্র কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে, তা' তারা বিশদভাবে বিবৃত করেছেন।

দারুল ইসলামের ব্যবসায়ের বিধি অনুযায়ী মুসলমানদের শূকরের গোশত ও মদ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসা এবং সুদের ব্যবসা করতে দেয়া হয় না। যে সব পশু ও উদ্ভিদ যথাক্রমে নোংরা ও ক্ষতিকর, সেগুলো ব্যবসা থেকেও তাদের বিরত থাকতে হবে। কোন কোন আইনবিদ এই শ্রেণির বিলাস-উপকরণ ও প্রমোদ জাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবসায় না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, যেমন হাতীর দাঁত, পুতুল ও বাদ্য-যন্ত্রের ক্রয়-বিক্রয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, অন্ধ ও দাসদের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, আইনে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও উন্মাদের কোন কিছু বিক্রয়ের আইনানুগ যোগ্যতা নেই। সম্পত্তি দেখতে না পেলে সাধারণ ক্ষেত্রে বিক্রয় অসম্ভব; তাই অন্ধ ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি

৬০৪. মফিজুল্লাহ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১১৫

বিক্রয়ের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। অবশ্য, তার পক্ষ থেকে অন্য কোন ব্যক্তি তা বিক্রয় করতে পারে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দাসরা তাদের মালিকের সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত বলে এ অধিকার লাভ করেনি।[৬০৫]

যে কারণে অমুসলিমকে তার নিজের দেশে (দারুল হারবে) নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে যেতে দেয়া হয় না, ঠিক সেই কারণেই কোন মুসলমান ব্যবসায়ীকে নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হয় না। মুসলিম সওদাগরকে সাবী (গানিমা হিসেবে প্রাপ্ত মহিলা ও শিশু) এবং লোহা বা লৌহজাত দ্রব্য ও যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দারুল হারবে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় না। তবে নিজের নিরাপত্তার জন্য যদি মুসলিম ব্যবসায়ী তার সঙ্গে দাস-দাসী ও অস্ত্রশস্ত্র বহন করেন এবং দারুল ইসলামে ফিরে আসার সময় যদি তিনি নিশ্চিতভাবে এগুলো তার সঙ্গে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন, তবেই এসব নিয়ে তাকে ইসলামী রাষ্টের সীমান্তের বাইরে যেতে দেয়া হয়।

আমানসহ কিংবা আমান ব্যতিরেকে যেইভাবেই হোক, কোন মুসলিম সওদাগর দারুল হারবে পর্যটন বা অবস্থান করলে তাকে দারুল হারবের আইন ছাড়াও নিজ ধর্মের আইন পালন করতে হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম-মুস্তামিনের ওপর যে সব বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, তাকে তা পালন করতে হবে। যদি তিনি সেখানে অবস্থানকালে অন্য মুসলমানদের ওপর কোন অন্যায় করেন, তবে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পর তাকে তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। দারুল হারবে অবস্থানকালে মুসলিম মুস্তামিন বিদেশী সরকারকে শুল্ক দিতে পারেন; কিন্তু দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পর তার ওপর অনুরূপ ধরনের কোন শুল্ক ধার্য করা যাবে না। তবে অন্যান্য মুসলমানদের মত সাধারণভাবে তাকেও দারুল হারবে অর্জিত অর্থসহ তার মোট আয় অনুপাতে কর দিতে হবে।[৬০৬]

কোন জাতির সাথে সন্ধি চুক্তি করার পর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তা বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে তা বাতিল অবশ্য করা যায়, কিন্তু উত্তম হল চুক্তি তার নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্তপালন করে যাওয়া যেমন সূরা তওবার চতুর্থ আয়াতে বন যমারা ও বনূ মুদলাজ গোত্রের সাথে কৃত চুক্তি নয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ করার বর্ণনা রয়েছে।[৬০৭]

৬০৫. শামসুল আলম, Bmjvgx ivó, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫
৬০৬. মজিদ কাদ্দুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭১
৬০৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান), Zdmx‡i gv‡Avi‡id j-†KviAvb, খ. ৪, ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৬ পৃ.৩৬৭

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পররাষ্ট্রনীতি

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

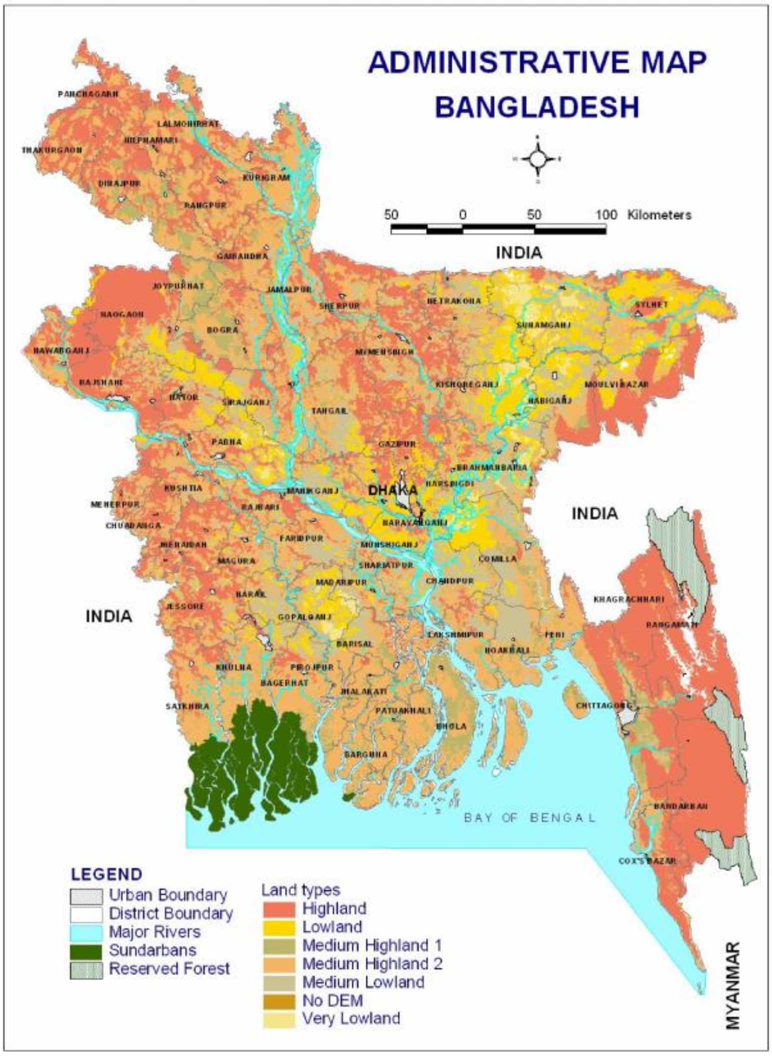

Dhaka University Institutional Repository

১১.১: বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সংক্ষিপ্ত তথ্য

সরকারি নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

রাজধানী ঢাকা। জাতিসংঘের আবাসনসংক্রান্ত উপাত্তের বিচারে ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর। ঢাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৪,৫০০ জন। NIPORT এর তথ্য অনুযায়ী ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বর্তমানে ১কোটি ৬৩ লাখ মানুষ বসবাস করছে। ঢাকা মহানগর এলাকায় প্রতিদিন ১৪১৮ জন মানুষ বাড়ছে। আর বছরে যুক্ত হচ্ছে ৫,১৭,৫০০ জন মানুষ।[৬০৮]

সরকার সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা; রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভূক্ত, ২০° ৩৪′ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১′ থেকে ৯২°৪১′ দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৪৪০ কিলোমিটার এবং উত্তর-উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৭৬০ কিলোমিটার।

সময় +৬.০০ ঘন্টা গ্রীনিচ প্রমাণ সময়।

আয়তন ও সীমা আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ; উত্তরে ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং সেই সঙ্গে মায়ানমার; এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। আন্তর্জাতিক স্থলসীমার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৪০০ কি.মি. এর মধ্যে ৯২ শতাংশ ভারতের সঙ্গে এবং বাকি ৮ শতাংশ মায়ানমারের সঙ্গে। উপকূলীয় সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪৮৩

৬০৮. মাসিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, বর্ষ২২, সংখ্যা ২৫২, জুন ২০১৭, পৃ. ১৫

কিলোমিটারের অধিক। ভূখণ্ডগত সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল (২২.২২ কি.মি.) এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৭০.৪০ কি.মি.) পর্যন্ত বিস্তৃত।[৬০৯]

পৃথিবীর নবাগত মানচিত্রে ১৯৭১ সালে স্থান করে নেয়া 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটি ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট এর পূর্বে১৯০ বছর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের অবৈধ শাসনকালসহ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের আওতাধীন বৃহত্তর 'বঙ্গদেশ' (বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য) এর অংশ ছিল। যাকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা 'BENGAL' বলত। তারও পূর্বে বঙ্গদেশকে 'BENGALA' বলত পর্তুগিজরা যা তারা মুগল সম্রাটদের ব্যবহৃত 'বঙ্গাল' নামকরণ থেকে নিয়েছিল। ১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবর এ বঙ্গাদেশ জয় করেন, আর তখন থেকে 'বঙ্গাল' নামকরণ আনুষ্ঠানিক ভাবে রূপ নেয়।[৬১০]

Bangalah as a territorial name came to be used from the 14th century onwards, more specially from the time of sultan Shamsuddin Iliyas Shah, denoting the terriory which now comprises the modern independent state of Bangladesh and the Indian state of west Bengal.[611]

প্রশাসনিক একক বিভাগ ৭: ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর; জেলা ৬৪টি; উপজেলা ৪৮৩ ও থানা ৫৯৯ (২০০৮); ইউনিয়ন৪,৪৯৮ (২০০৮); মৌজা ৫৯,৯৯০; গ্রাম ৮৭,৩৬২; সিটি কর্পোরেশন ৬ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল); পৌরসভা ৩০৯ (২০০৮)।

ভূ-প্রকৃতি বাংলাদেশ পলল গঠিত একটি আদ্র অঞ্চল। বাংলাদেশের ভূখন্ড মূলত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীগঠিত সুবৃহৎ বদ্বীপের সমন্বয়ে সৃষ্ট। বঙ্গী বদ্বীপ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপগুলোর একটি।

---

৬০৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; evsjv‡`‡ki RvZxq Ávb †Kvl, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০১১, খ.৯, পৃ.১

৬১০. মো. আছাদ পারভেজ, evsjv‡`‡ki mxgvbvq c‡Z¨‡KB Avgiv evsjv‡`wk ev½wj; ঢাকাঃ A peace Press Book 2017, পৃ. ৭৯

611. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Banglapedia, National Encyclopedia,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003,V.4; P.427

নদীমালা প্রধান নদীগুলোর শাখা ও উপনদীসহ মোট প্রায় ৭০০ নদী রয়েছে। এই নদীগুলো আবার তিনটি বৃহৎ নদীপ্রণালী অন্তর্ভূক্ত: গঙ্গা-পদ্মা নদীপ্রণালী, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীপ্রণালী ও সুরমা-মেঘনা নদী প্রণালী।

জলবায়ু বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি ধরণের। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা শীতকালে যথাক্রমে ২৯° সে. ও ১১° সে এবং গ্রীষ্মকালে যথাক্রমে ৩৪° ও ২১° সে।[৬১২]

পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুয়াকাটা (পটুয়াখালী), সুন্দরবন (খুলনা)। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয় দৃশ্যই অবলোকন করা যায়।

জনসংখ্যা (২০১৭) মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ১৭ লাখ ৫০ হাজার তন্মধ্যে পুরুষ ৮ কোটি ১০ লক্ষ ও মহিলা ৮ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার।[৬১৩]

ধর্ম মুসলমান ৮৮.৩%, হিন্দু ১০.৫% বৌদ্ধ ০.৬%, খ্রিষ্টান ০.৫% অন্যান্য ০.১%

ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা ‘বাংলা'; প্রায় ৯৯.৫০ শতাংশ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। ইংরেজি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভাষা।

রপ্তানি তৈরি পোষাক, কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য (পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শিল্পোন্নয়নে এর অপরিসীম গুরুত্বের জন্য পাটকে বাংলাদেশের ‘সোনালী আঁশ' বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাট এ দেশে জন্মে)।[৬১৪] চা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, চিংড়ি ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত মাছ, নিউজপ্রিন্ট কাগজ, হস্তশিল্প।

আমদানি গম, তৈলবীজ, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ, তুলা, ভোজ্যতেল, সার, সিমেন্ট, সুতা।

মাথাপিছু আয় ১৬০২ ডলার (২০১৭-১৮)[৬১৫]

জিডিপি প্রবৃদ্ধি আই এম এফের প্রতিবেদন অনুযায়ী (২০১৭-২০১৮) ৬.৮%[৬১৬]

মাথাপিছু ঋণ প্রায় ৪০ হাজার টাকা। আর অর্থমন্ত্রী আবুল আবদুল মুহিত নতুন যে বাজেট (২০১৭-১৮) দিলেন, তাতে মাথাপিছু ঋণ বেড়ে হবে ৪৬ হাজার ১৭৭ টাকা।[৬১৭]

---

৬১২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), evsjv wcwWqv, প্রাগুক্ত, পৃ.১-৫

৬১৩. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৩০ মে ২০১৭, পৃ. ১

৬১৪. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, মুহম্মদ আনসার আলী, লুৎফর রহমান, নাজনীন বেগম, mvgwRK weÁvb, সপ্তম শ্রেণী, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০০৯ পৃ. ১২২

৬১৫. দৈনিক প্রথম আলো, ২ জুন ২০১৭, পৃ.০২

৬১৬. দৈনিক প্রথম আলো, ১১ জুন ২০১৭, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় দিবস ২১ শে ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস', এই দিনটি এখন 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এটি পালিত হয়; ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস; পহেলা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) বাংলা নববর্ষ; ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস।

The identity of Bangladesh as a modern nation-state is derived from a cohesive ethnic and regional base in which Islam has long been a key element. Nearly all of the country's 114 million people are speakers of the Bengali Language and minor sectarian variation aside, some 85 percent are also Sunni Muslims governed by the Hanafi School of Islamic law. Most of the remaining 15 Percent are Hindus.[618]

১১.২ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি
Foreign Policy of Bangladesh

পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রর অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণ। পররাষ্ট্রনীতি হলো কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের গৃহীত সেসব নীতি যা রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে সম্পাদন করে থাকে। অন্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধতাকে তুলে ধরে।

১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে ভৌগোলিক অবস্থান, স্বল্প পরিসরের ভূখণ্ড এবং সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদ ইত্যাদি বিভিন্ন নিয়ামক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের সুযোগকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি মূলত বহিঃশক্তির প্রভাব থেকে দেশের সাবভৌমত্ব ও ভূখণ্ডকে রক্ষা করার মতো বিষয়েই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। [৬১৯]

৬১৭. দৈনিক প্রথম আলো, ১০ জুন ২০১৭, পৃ.০১

618 . John L. Esposito (Editor in Chief) The oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world. V.1, Oxford University Press, 1995, New York, P.187

৬১৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; প্রাগুক্ত,খ.৭, পৃ.১৩১

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেরও রয়েছে একটি স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি। বাংলাদেশ একটি সদ্য স্বাধীন বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও অবকাঠামোর দেশ। উপরন্তু ভৌগোলিক ক্ষুদ্র আয়তনের উপর বিশাল জনসংখ্যার প্রবল চাপ দেশটিকে পশ্চাৎপদতার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাই আন্তর্জাতিক সমাজ দেশটিকে একটি দরিদ্রক্লিষ্ট, দুর্যোগপূর্ণ ও বিবাদমান দেশ হিসেবে চেনে। রাজনৈতিক বিপর্যয় ও অনৈতিকতার দ্বারা বিপন্ন অর্থনীতি বিশ্ব দরবারে এ দেশটিকে একটি তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করেছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য এ দেশটির আজন্ম ভরসা ও অবলম্বন। গতিশীল যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাবে এবং রাজনৈতিক কুপ্রভাবে দেশটি গন্তব্যহীন, পথভ্রষ্টভাবে চলছে।[৬২০]

সদ্য স্বাধীন একটি দেশের সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথেষ্ট কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, নবজাতক দেশটিকে ‘আন্তঃউপনিবেশবাদ’ এর ভয়াল থাবা হতে উত্তোরণ ঘটাতে উন্নত দেশগুলোর সাহায্য অতি প্রয়োজন। তাই তিনি ১৯৭৩ সালে এক সরকারি সফরে জাপান যান এবং তাদের নিকট অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাহায্য কামনা করেন। অতঃপর আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে বিভিন্ন দেশের সাথে বিশেষত মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্যকারী বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ এক প্রকার বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে আসছে যা স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ নীতি বলে খ্যাত। এ নীতির মূলকথা হলো “সকলের সাথে বন্ধুত্ব এবং কারো সাথে শত্রুতা নয়” (Friendship to all and malice to none)।[৬২১]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বাংলা পিডিয়াতে উল্লেখ আছে-

Bangladesh has pursued its- foreign relations or foreign policy since its emergence as an independent state in 1971, although the policy underwent remarkable changes during the last 25 years. The provisional government formed during the WAR OF LIBERATION drew up an outline of the foreign relations of Bangladesh before the country came into being as an independent state. According to this outline Bangladesh declared the

---

৬২০. কাজী জাহেদ ইকবাল, evsjv‡`‡ki পররাষ্ট্রনীতি (1971-2001), ঢাকাঃ জাতীয়, গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১১, পৃ.৭৫

৬২১. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, Avš—R©vwZK ivRbxwZ cwiwPwZ *(Introduction to International Politics)*, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো; তা.বি, পৃ.১৮২

principles of non-alignment, peaceful coexistence, and opposition to colonialism, racialism and imperialism as the main aspects of its foreign policy.[622] Immediately after the country's independence these principles of Bangladesh were reiterated by the then Foreign Minister during his first visit to India in January 1972. in following these principles of foreign policy Bangladesh took a different stand on the issues of colonialism, imperialism, racialism and non-alignment in contrast with the foreign policy of the Pakistan period.

It is worth mentioning that from the very beginning Pakistan considered it important to seek close relations with the western countries including the United States, and it also joined the military alliances called SEATO and CENTO formed through the initiative of the United States. As ; result, the foreign policy of Pakistan was regarded as pro-western and vitiated with cold-war attitudes by India, a founder member of the Non- Aligned it, as well as by other countries. At that time AWAMI LEAGUE was a supporter of this foreign policy, and Prime Minister HUSSEYN SHAHEED SUHRAWARDY an Awami League leader, was of the opinion that it was sensible of Pakistan to side with the mighty. United States in pursuing its foreign policy. However, East Pakistan Awami League amended its political manifesto, and in the party's constitution published in 1969 it pronounced its unequivocal support to an independent and non-aligned foreign policy, a policy of peaceful coexistence, and to all the movements of the world against imperialism, colonialism and autocratic rule. A progressive section

622. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Banglapedia, National Encyclopedia,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003,V.4; P.239

of the main party and its students' front played a key role in shifting the party's position with regard to foreign policy.[623]

১১.৩ বাংলাদেশের সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতি

যে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার উপর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠিত তা বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ÒRvZxq mve‡fŠgZ I mgZvi cwZ k×v, Ab¨vb¨ iv‡ói Avf¨šÍixY wel‡q n¯Í‡ÿc bv Kiv, AvšÍRwZK we‡iv‡ai kwšÍcY mgvavb Ges AvšÍRwZK AvB‡bi I RwZms‡Ni mb‡' ewYZ bwZmg‡ni cwZ k×v-GB mKj bwZ nB‡e iv‡ói AvšÍRwZK m¤ú‡Ki wfwË Ges GB mKj bwZi wfwË‡Z iv‡ó|Ó

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।”[৬২৪]

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয় সাংবিধানিক বিধান বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্দেশনা রয়েছে। এই নির্দেশনাসমূহ বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এগুলি হলোঃ

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতি সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা, এ সকল নীতিই হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এ সকল নীতির ভিত্তিতে-

623. Sirajul Islam, (Chief Editor), Ibid, V.4; P.239

৬২৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৬তম সংশোধনী অক্টোবর ২০১১, ঢাকা) আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১১, পৃ.৭

১. রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকা এবং সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্ঠা করবে; প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অথনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে; এবং সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

২. রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবে। সংবিধানের ৬৩ অনুচ্ছেদে যুদ্ধ-ঘোষণা সংক্রান্ত নীতি উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে সংসদের সম্মতি ব্যতিত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না, কিংবা প্রজাতন্ত্র কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। অনুচ্ছেদ ১৪৫ (ক) তে বৈদেশিক চুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে: বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে, এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন। তবে শর্ত হচ্ছে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে।'[৬২৫] বাংলাপিডিয়ার ভাষ্য মতে,

Constitutional provisions and declaration on foreign policy

The CONSTITUTION provides that the foreign policy of Bangladesh would be guided by a number of fundamental principles. These principles were stated in the Articles 25(a), (b) and (c) of the Constitution. These are as follows: The State shall base its international relations on the principles of respect for. national sovereignty and equality, non-interference in the internal affairs of other countries, peaceful settlement of international disputes, and respect for international law and the principles enunciated in the United Nations Charter, and on the Basis of those principles shall (a) strive for the renunciation of the use of force in international relations and for general and complete disarmament; (b) uphold the right of every people freely to determine and build up its own social, economic and political system by

---

৬২৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৩১

ways and means of its own free choice; and (c) support oppressed peoples throughout the world waging a just struggle against imperialism, colonialism or racialism.[626]

১১.৪ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি ও নির্ধারকসমূহ

মূলনীতিঃ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিছু মূলনীতি অনুসরণ করে থাকে। জাতিসংঘ এবং ন্যামের মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এসব সংগঠনের মূলনীতিসমূহ মেনে চলে, এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান নীতিসমূহ এসব সংগঠনের নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান চারটি মূলনীতি হলোঃ

১.সকলের প্রতি বন্ধুত্ব কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, একটি দরিদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হবার কারণে বাংলাদেশকে বিভিন্ন মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হতে হয়। এ কারণেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি হিসেবে বলেছিলেন, আমাদের একটি ক্ষুদ্র দেশ, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, আমরা চাই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

২.অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখন্ড তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য। জাতিসংঘ সনদের ২(৪) ধারায় বলা হয়েছে ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল সদস্য-রাষ্ট্র আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সংঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো উপায় গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকবে’।

৩.অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা জাতিসংঘ সনদের ২(৭) ধারায় বলা হয়েছে যে, বর্তমান সনদ জাতিসংঘকে কোনো রাষ্ট্রের নিছক অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার দিচ্ছে না বা সেরূপ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কোনো সদস্যকে জাতিসংঘের দারস্থ হতে হবে না; কিন্তু সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে এই নীতি অন্তরায় হবে না’। জাতিসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্র

626. Sirajul Islam, (Chief Editor), Ibid, V.4; P.239

হিসেবে বাংলাদেশ এই মূলনীতির উপর তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছে, যা অন্য রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রকাশিত।

৪.বিশ্বশান্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রত্যাশা করে। যেহেতু জাতীয় নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন বিশ্বের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূলনীতি হিসেবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। বাংলাদেশ কর্তৃক অন্বেষিত শান্তির এই মূলনীতির বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, যেকোন বিবাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান এবং- আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনে বিশ্বাস করে। [৬২৭]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্দিষ্ট কিছু উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয় যা পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ভারত এবং মায়ানমারের মতো প্রতিবেশী দ্বারা তিন দিকে বেষ্টিত এবং দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। মূলত ভারত বাংলাদেশকে তিনদিক থেকে বেষ্টন করে আছে, যেখানে বাংলাদেশ বলা যায় বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। অন্যদিকে, বাংলাদেশ চীন ও ভারতের মতো এশিয়ার দুই শক্তিমান দেশের বলয়ে অবস্থিত হওয়ার কারণে দুই দেশের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষায় বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখিন হতে হয়। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০২০ জন লোকের বসবাস। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা একটি নেতিবাচক প্রভাব রাখে, যার দরুন সরকার কোনো গতিশীল পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে পারে না। সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতার সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জ্বালানী নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও ঐক্য জাতীয় স্বার্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিকট শান্তিপূর্ণ, নিশ্চিত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ প্রত্যাশা করে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে এই সম্পর্ক বিদ্যামান না থাকলেও নিজের পক্ষে শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায় না। বাংলাদেশের নিরাপত্তা কাঠামো মূলত দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়।[৬২৮] এছাড়াও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বাংলাদেশের অন্যতম বিবেচনার ক্ষেত্রে, যাতে দেশের জনগোষ্ঠীর কাঙ্খিত ন্যূনতম অর্থনৈতিক কল্যাণ অন্তর্ভূক্ত।

৬২৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৩১-১৩২
৬২৮. কাজী জাহেদ ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫

অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিবেচনার ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, রপ্তানি বৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি, বাংলাদেশি পণ্যের জন্য বাইরের বাজার সুবিধা বৃদ্ধি, শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত সুবিধা বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং আরো কিছু ক্ষেত্র। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এই ক্ষেত্রগুলি সফল করার লক্ষ্যে বাইরের রাষ্ট্রের সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রয়োজন এবং এ কারণে বাংলাদেশকে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক বজায় রাখার চেষ্টা করতে হয়। বাংলাদেশ তার মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সহযোগিতা লাভ করে এবং ভারত তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম জোটভূক্ত রাষ্ট্র। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে দুই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতেই সমাজতন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নতুন সরকারের নীতিতে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করার মাধ্যমে বামধারার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। সমাজতন্ত্রের ধারণা বাংলাদেশের সংবিধানেও সন্নিবেশিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির অক্ষমতার কারণে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মতো শক্তিশালী প্রতিবেশী দ্বারা বেষ্টিত হবার ফলে পররাষ্ট্রনীতিতে সব সময় প্রতিরোধমূলক নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব থেকেই আমরা ভারত এবং তার মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে জোটবদ্ধ। এ কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতিশীল নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। যদিও সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় স্বার্থের কারণে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করেছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখনও দেখা যায় যে অতীত সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই ভারতমুখী নীতি গ্রহণ করে থাকে।

শুরুতে বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আভির্ভূত হয়, এবং বর্তমানেও তাই। কিন্তু আশির দশকে মুসলিম বিশ্বের নিকট বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি পরিবর্তন করা হয় এবং সংবিধানে সংশোধনী আনা হয় শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে। অবশ্য বর্তমানে অপর একটি সংশোধনী দ্বারা তা রদ করা হয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম। এই জনগোষ্ঠী অনুভূতিগত দিক দিয়ে মুসলিম উম্মাহ বা ভ্রাতৃত্ব বোধে আবদ্ধ এবং এরা চায় মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্ক অব্যাহত থাকুক। তাই ধর্মীয় বিশ্বাস বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সংস্কৃতিগত দিক থেকে বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বরাবরই শান্তিকামী।[৬২৯]

বাংলাদেশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) সদস্য। সে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনেরও সদস্য। সুতরাং সে স্বভাবতই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ (Charter) ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতিসমূহ (Principls of the Non-aligned Movement) মেনে চলে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান মূলনীতিটি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমাদের একটি ক্ষুদ্র দেশ, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, আমরা চাই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব (We are a small country, we want friendship with all the malice towards none)। তাঁর এই উক্তির মধ্যেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য নিহিত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান দিকগুলো[৬৩০] নিম্নরূপঃ

১. সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়ঃ যেহেতু একটি গরিব দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে কোন একটির পক্ষাবলম্বন করে অন্যটির বিরাগভাজন হতে চায় না। এর চেয়েও বড় কথা হল যে, এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পর বাংলাদেশ চায় না যে, সে কোন বৃহৎ শক্তির ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

২. অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা : এ মূলনীতিটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের ২(৪) ধারার [Article 2 (4)] সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে (domestic affaris) হস্তক্ষেপ না করা : এ মূলনীতিটিও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের ২ (৭) ধারার [Article 2(7)] উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে ২ ও ৩ নম্বর মূলনীতি দুটি রাষ্ট্রীয় আচরণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আদর্শের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

---

৬২৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৩২

630. Fakhruddin Ahmed, Critical Times Memoirs of a South Asian Diplomate, Dhaka, 1994,

৪. বিশ্ব শান্তি : বাংলাদেশ যে শান্তি কামনা করে, তা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই ব্যক্ত করেছিলেন। তখন তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, "আমি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে দেখতে চাই।" [I would like it [Bangladesh] to become the Switzerland of the East.]। এ ব্যাপারে অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ যথার্থই বলেছেন যে, "বাংলাদেশ শুধু শান্তির উদ্দেশ্যেই শান্তি চায় না, এর আরও কারণ হল তার জাতীয় উন্নতি ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সুপরিকল্পিত বিবেচনা' (Bangladesh desires peace not only for the sake of peace but also for the strategic consideration of national development and security.)। বাংলাদেশ কর্তৃক অন্বেষিত শান্তির এই মূলনীতির কয়েকটি তাৎপর্য আছে। প্রথমত, বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে (peaceful co-existence) বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ যে কোন বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার (peaceful setlement of disputes) পক্ষপাতী এবং তৃতীয়ত, বাংলাদেশ চায় যে, যে-কোন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে (peaceful change)। এই প্রসঙ্গে এ-কথাও সবসময় মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ কখনও বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি প্রদর্শন না করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।[৬৩১]

১১.৫ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে এ দেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিকত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রই তার পররাষ্ট্রনীতি স্থির করেন জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিশ্ব সমাজে নিজের আসনকে একটি সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে উন্নিত করার লক্ষ্যে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে যে মৌলিকত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার করে নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবে। প্রতিটি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারণ ও গঠনের অধিকারকে সমর্থন করবে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের ন্যায়সঙ্গত ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সমর্থন করবে। জাতীয় সার্বভৌমত্ব, সাম্য মৈত্রীর বন্ধনকে অক্ষুন্ন রাখতে আন্তর্জাতিক আইন ও

৬৩১. মোঃ আবদুল হালিম, AvšÍRvwZK m¤ú‡Ki gjbxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৪৯

নীতিসমূহকে শ্রদ্ধার সাথে পালন করবে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন প্রচেষ্ঠায় সচেষ্ট থাকবে।[৬৩২]

যে কোন দেশে বহির্বিশ্বের কাছ থেকে তার উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশও এই প্রচলিত রাষ্ট্রীয় নিয়মের বাইরে নয়। তবে ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে যেটা সত্যি, রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রেও সেটা সমানভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিজীবনের ব্যাপারে আব্রাহাম মাসলো (Abraham H. Maslow) মানুষের সফল জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঁচটি চাহিদাকে গুরুত্বের ক্রমানুয়ায়ী (hierarchy of needs) সাজিয়েছেন। এগুলো হলোঃ

১. শারীরিক প্রয়োজন

২. নিরাপত্তার প্রয়োজন

৩. ভালোবাসা

৪. মর্যাদা ও সম্মান এবং

৫. কীর্তি ("i. physical needs, ii. safety needs, iii. love, iv. prestige and respect, v. achievement.")।

বাংলাদেশ ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে একটি ক্ষুদ্র, প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের নিরিখে দরিদ্র এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামরিক সামর্থ্যের বিবেচনায় অনুন্নত ও দুর্বল রাষ্ট্রবিধায় দেশটি পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণের সময় অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলিকে আমরা নিম্নরূপে বর্ণনা করতে পারি :

১. আত্মরক্ষা (Self-Preservation)

২. অর্থনৈতিক অগ্রগতি (Economic advancement)

৩. অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় নিজের জাতীয় শক্তিকে রক্ষা ও প্রয়োজনবোধে বৃদ্ধি করা (Safeguarding as well as augmenting national power)

৪. নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা (Ideology) ও

৫. জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করা (National prestige)।[৬৩৩]

---

৬৩২. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, Avš ÍRwZK ivRbxwZ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৮

৬৩৩. মোঃ আবদুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

Goals of foreign policy As for the goals of foreign policy, in the beginning it was as necessary to get international recognition as an independent state as it was essential to obtain foreign loan and assistance for economic reconstruction. In three and a half years', time following the country's liberation no countries except Saudi Arabia, Libya and China considered the reality of Bangladesh as unacceptable. The stand taken by these three countries with regard to Bangladesh were influenced by their own ideology and regional policy on South Asia.[634]

১১.৬ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও কার্যকরণ

কোন রাষ্ট্রেই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সুবিবেচনাপ্রসূত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে নির্ধারিত কৌশলসমূহ, পররাষ্ট্রনীতির উপাদানসমূহ, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি প্রভৃতি দিক বিশদভাবে বিবেচনা করে সুপরিকল্পিত উপায়ে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিশ্চয় পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের তত্ত্ব ও নীতি অনুযায়ীই সম্পাদিত হয়। তবে স্থান-কাল-পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে তা নিজস্ব আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির উপাদানসমূহই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উপাদান। বাংলাদেশের সংবিধান, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তিত ঘটনাপ্রবাহ, রাষ্ট্রীয় জনসমর্থন, সম্পদ প্রভৃতির উপর যথাযথ দৃষ্টি রেখে পররাষ্ট্রনীতির প্রণেতাগণ তা প্রণয়ন করেন।[৬৩৫]

উপরোক্ত বিষয়সমূহের সাথে গৃহীত পররাষ্ট্রনীতির সামঞ্জস্য রক্ষিত হলে তখন বিজ্ঞনীতি রক্ষা হয়। বাংলাদেশ অবশ্যই বৃহৎ শক্তির অধিকারী কোন উন্নত দেশের ন্যায় উচ্চাভিলাষী নীতি গ্রহণ করে না। তাকে নব্য স্বাধীন দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতির সমস্যা, সংকট চাহিদার কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হয়। দেশটি দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গ্রেট ব্রিটেনের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ সাহায্যের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এমনকি স্বাধীনতা‘ অর্জনের পরেও উদ্দেশ্যগুলোর উপর অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত দিক দিয়ে নির্ভরশীল থাকতে হয়েছিল। তবে দিনে দিনে আপন

634. Sirajul Islam, (Chief Editor), ibid, V.4; P.240

৬৩৫. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬

অবস্থার খানিকটা উন্নতি হয়েছে বটে। এর উপর করাল আঘাত নিয়ে চেপে বসেছিল এক ধাপ সামরিক শাসনের অভ্যুত্থান। ফলে অস্থিতিশীলতা ও বৈদেশিক নীতি দেশটিকে উন্নতির পথে বিলম্বিত করেছে। স্থিতিশীলতা অর্জনে সক্ষম হয় নি। এতে সাহায্যকারী দেশসমূহ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তবু আশার কাল যে বাংলাদেশ তবু কোন নতজানু পরারাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করে নি এবং নিরপেক্ষ নীতি ও অবস্থান গ্রহণ করে তাতে টিকে থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি সম্মানজনক অবস্থানে রয়েছে।

সচেতন অভিজ্ঞ ও পণ্ডিতদের সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নিম্নরূপ হওয়া উচিত :
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিধর ও শিল্পোন্নত দেশগুলোর সমর্থন, আঞ্চলিক শক্তি বিন্যাসে সুসম সমীকরণ ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস ঐতিহ্য, জনসমর্থন, পররাষ্ট্রনীতির ধারা ও ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুভূতি প্রভৃতির উপর সর্বাত্মক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এগুলোই পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত হবে। এগুলোর ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ অপরাপর উদ্দেশ্যও লক্ষ্য স্থির করা কর্তব্য।[৬৩৬]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই এর জনগণের ধর্ম বিশ্বাস ও অনুভূতি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর সমধিক গুরুত্ব থাকতে হবে। ৮৫% মুসলমান অধ্যুষিত দেশটিতে ইসলামের আদর্শ, চর্চা ও শিক্ষাকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা জরুরি। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বৈধ-অবৈধ বিবেচনার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলামী বিশ্বের সাথে এর মাধ্যমে সুসম্পর্ক স্থাপন ও বলিষ্ঠ করার এক অসাধারণ সুযোগও এনে দিয়েছে এ ধর্মবিশ্বাস ও অনুভূতি।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সহযোগিতার নীতি অব্যাহত রাখতে হবে। সেখানে পরিমিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও লক্ষ্য অর্জনকে ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক দিয়ে বিচার করতে হবে। বিশেষভাবে প্রতিবেশী বিশাল রাষ্ট্র ভারতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অবশ্যই এ নীতি গ্রহণ করা উচিত যে, কারো প্রভূত্ব বা বড়ভাইসুলভ আচরণকে স্পষ্টভাবে উপেক্ষা করে চলা। বড় রাষ্ট্রগুলো প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বিভিন্নভাবেই শোষণ করে থাকে। এটাই একটি অঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য। সে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাগণকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্মানজনক নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা উচিত।

---

৬৩৬. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, AvšÍRvwZK ivRbxwZ cwiwPwZ *(Introducation to International Politics),* প্রাগুক্ত,
পৃ.৩৮০-৩৮১

বর্তমান বিশ্বে পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতি আরো বেশি জোরদারভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর উপর একবিংশ শতাব্দীতে মুক্ত বাজার অর্থনীতির তত্ত্বে যে বিশাল প্রতিযোগিতার বিশ্বব্যাপী পদচারণা তার সাথে তাল মিলাতে হলে বাংলাদেশকে অনেক গুণ উন্নতমানের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও কৌশলপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে নিতে হবে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-বাণিজ্যকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে এর অগ্রগতি ও সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।[৬৩৭] বাংলাপিডিয়াতে উল্লেখ আছে-

The economic goal is still being pursued as a goal of the foreign policy of Bangladesh. Since the Pakistan regime, the issue of foreign loans and grant was one of the major concerns of the government against the backdrop of the overall economic backwardness of the country. Because of poor internal savings on account of low rate of per capita income and lower export earnings compared to import expenditure it was not possible to invest necessary capital for the economic development of the country. Lack of technological knowledge made the situation worse. Against this backdrop each of the governments that have come into power till now has explored sources of foreign assistance. Although after the country's liberation the government adopted socialist economy to expedite inflow of foreign assistance, it attempted to make the internal policies acceptable to the western donors in order to satisfy them. At this time the government, for the satisfaction of the United States, removed the Foreign Minister and Finance Minister who were regarded as 'leftists', and appointed people known as 'pro-Western' to those positions. The investment ceiling for the private sector was at first set at taka 25 lakh, but later it was raised to taka 3 crore in order to win the favour of the donors. As regards nationalization of industries, it was later declared that no more nationalization would take place in the future.

---

৬৩৭. মোঃ আবদুল হালিম, AvšÍRwZK m¤ú‡Ki gjbwZ (*Principles of International Relations*), প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৯-২৫০

In addition to maintaining good relations with the donors the later governments had to discard the policy of 'socialism' followed by the previous government, and to bring about changes in the economic policies in order to facilitate and expedite receiving of foreign assistance. There were no alternatives but to go for this change to comply with the World Bank policy of framework harmonization.

Since the 1990s the foreign policy makers of Bangladesh gave top priority to economic goal as the principle aim of diplomacy. As proponents^ of .Economic diplomacy' they meant to say that development of trade and attracting foreign investment were the prime objectives of diplomacy in the post-cold-war situation. As regards foreign trade, with a view to coping with the serious imbalance between the country's imports and exports, attempts were made to increase the export of conventional goods as well as non-conventional commodities (garments, fish, ceramics); and at the same time steps were taken to minimise the imbalance through setting up industries with foreign investment and exporting the goods produced.[638]

638. Sirajul Islam, (Chief Editor) ibid, V.4; P.241

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কার্যকরকরণ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিও অপরাপর দেশের ন্যায় বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করে; বিদেশে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের কূটনীতিক মিশনগুলোর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ দেশে অবস্থিত অন্যান্য দেশের কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে থাকে। কোন দেশে বাংলাদেশের কোন কূটনৈতিক মিশন না থাকলে বাংলাদেশ কূটনৈতিক কমিশন সে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশ তার আগ্রহ ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিভিন্ন দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-পরামর্শের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে। শুধুমাত্র শিক্ষা বিষয়ক ছাড়া আর সকল পত্রালাপের অনুলিপি কাঙ্ক্ষিত দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে আদান-প্রদান করতে পারে।[৬৩৯]

Foreign Service Academy a training institute to look after the training needs of the Ministry of Foreign Affairs and of the Bangladesh Civil Service (BCS) cadres. Formerly known as the Foreign Affairs Training Institute, it was merged with BANGLADESH CIVIL SERVICE ADMINISTRATION ACADEMY in 1987. The Academy was inaugurated on 1 January 1997, and temporarily housed at the State guest house 'Sugandha' at Eskaton in Dhaka city.[640]

Priorities in foreign relations The national interest of Bangladesh is interpreted in terms of the aims of the foreign policy of the country. As regards choice of countries for seeking foreign relations with, Bangladesh has mainly picked out South Asia, the predominantly Muslim countries including the Middle East, the United States, the industrialized European countries, Japan and the People's Republic of China. Foreign relations with chiefly these countries were pursued and strengthened by all the governments who

---

৬৩৯. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, Avš ÍRwZK ivRbwZ cwiwPwZ *(Introducation to International Politics)*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮২

640. Sirajul Islam, (Chief Editor), ibid,V.4; P.245

came to power till now. However, the foreign policy of each government did not attach equal importance to these countries or regions; the government in power determined its preference on the basis, of its ideology and the interpretation of its 'national interest'. The Awami League government put India and the Soviet Union at the top of its list of preferences. The issue of the 'special friendship' between India and Bangladesh assumed importance because of India's assistance during the WAR OF LIBERATION against Pakistan, and the ideological unanimity between the leaderships of the two countries. On the other hand, Bangladesh was interested in strengthening its relations with the Soviet Union in view of the country's support in the War of Liberation, and the contemporary global situation.[641]

১১.৭ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল্যায়ন

স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৬ বছর অতিবাহিত হবার পরেও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও সন্তোষজনক উন্নয়ন ঘটে নি। তাছাড়া দুইবার সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাবমূর্তিও বিশ্বসমাজে ক্ষুণ্ন হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি প্রণেতাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব, বহিঃবিশ্বে নিজের সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য কার্যকর ও যথার্থ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা।

বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বার্থ, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির প্রবণতা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিশ্বরাজনীতিতে বাংলাদেশ সম্মানজনক স্থান লাভ করতে প্রায়শই সক্ষম হচ্ছে না এবং তার বৈদেশিক নীতিতে পরনির্ভরশীলতা ও নতজানুনীতির ছাপ সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান।[৬৪২]

641. Sirajul Islam, (Chief Editor), Ibid, V.4; P.243

৬৪২. আবুল কালাম, BD‡ivcxq ivRbxwZ I KUbxwZ (1815-1871)ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮

স্বাধীনতার ৪৬ বছরকাল ব্যাপী বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশের নিরাপত্তা ছিল বহিঃশক্তির সাথে যোগসূত্রভিত্তিক। প্রতিবেশী বৃহৎ শক্তির সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিভিত্তিক। সে সময় স্পষ্টতই ছিল একটি মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমাঘেঁষা পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তানীতি। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেশী মিত্র দেশ ভারত বাংলাদেশের এ মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমাঘেঁষা নীতিকে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত-বিরোধী শক্তিসাম্য নীতিভিত্তিক নিরাপত্তা প্রবণতা হিসেবে বিবেচনা করে।

বাংলাদেশের নিরাপত্তাহীনতার বহুবিধ কারণ রয়েছে। এর আয়তন, ভূপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং আঞ্চলিক নদীতে ভাটি বা নিম্ন অঞ্চলে বাংলাদেশে অবস্থান। নদীব্যবস্থার সুবিশাল উপরিভাগ বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে– ভারত, নেপাল ও ভুটানে অবস্থিত। এসব দেশে বিগত কয়েক দশকে ব্যাপকহারে বন উজাড় হয়েছে। এতে বাংলাদেশকে প্রকট পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো অতিশয় জরুরি।[৬৪৩] বাংলাপিডিয়াতে এতদসম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে-

Evolution of foreign relations Bangladesh gives the highest priority to South Asia region with regard to establishing foreign relations. South Asia comes first if issues like geographical location, common historical background, economic condition, and, above all, territorial integrity and the security issues are taken into consideration. In 1980 Bangladesh presented the idea of forming SAARC in association with six other countries of this region, namely India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bhutan and Maldives. Cooperation in ten sectors out of the twelve mentioned in the plan prepared by Bangladesh, excepting joint investment and introduction of a common market, started at the outset of SAARC.

Apart from the SAARC set-up, relations between Bangladesh and the other countries of the region were also established within bilateral frameworks.

---

৬৪৩. কাজী জাহেদ ইকবাল, evsjv‡`‡ki পররাষ্ট্রনীতি (1971-2001), ঢাকাঃ জাতীয়, গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১১

As Bangladesh is bounded by India on its three sides, India remains a permanent factor that effects the foreign policy of the country. Despite India's immense contribution towards the War of Liberation Bangladesh soon found itself in dispute with the country about a number of issues. After independence, the bilateral relations between the two countries at the state level cooled because of clash of interests regarding border trade agreement, sharing of water of the Ganges, balance of trade, and defining the limits of territorial waters. Especially the INDIA-BANGLADESH FRIENDSHIP TRKATY signed by India and Bangladesh turned into a controversial issue. Later on, owing to change of government in Bangladesh different viewpoints of the governments of the two countries on resolving disputes together with their ideological differences resulted into clash of interests which eventually made the bilateral relations strained. The problem of sharing of the Ganges water was the most critical among the disputed issues, and Bangladesh was badly in need of immediate settlement of the problem.

Since Independence a number of agreements with the close and friendly state of India on sharing of the Ganges water were signed in succession, and a historic 30-year treaty, the Ganges Water Sharing Treaty, was signed in 1996 which is still in force.

Apart from the Farakka problem, there was a longstanding unsettled problem between India and Bangladesh regarding the transfer of the *'Tin Bigha'* corridor to Bangladesh in order to connect Dahagram and Angarpota, two. enclaves situated within Indian territory, to mainland of Bangladesh. With a view to resolving this problem India handed Tin Bigha over to Bangladesh in 1992 on condition that Bangladesh citizens would use this corridor for every other two hours. Later on the time-span was changed to

one hour. There are two other issues to be settled with India which still carry importance with regard to bilateralrelations. Bangladesh has been in dispute with India about the ownership of the-South Talpatti Island located in the estuary of the Hariahhanga River. On the other hand, the limits of the territorial waters of the two countries are yet to be defined. At times Bangladesh also confronts problems with 'push back' from the Indian side.

As for other countries in South Asia, Bangladesh's relations with Pakistan had not been normal since the beginning. The disputes over the repatriation of the Pakistani citizens stranded in Bangladesh (the Urdu-speaking people who opted for the citizenship of Pakistan after independence) and the claim of Bangladesh to the assets from the period of undivided Pakistan, which exists since the very beginning, are yet to be settled. The changes in the bilateral relations with Pakistan that took place after August 1975 were influenced by the bitterness with India which developed at this point.

As Nepal is very close to Bangladesh border, some common interests brought the two countries closer. Apart from trading, Bangladesh is in need of Nepal's cooperation with respect to increasing the How of the Ganges water for itself and controlling floods. On the other hand, there is a prospective alternative for Nepal of using the ports in Bangladesh which can reduce its dependence on the Port of Calcutta. Occasional strains in the relations of these two. countries with India drove them to come closer. As for Bangladesh's relations with other states of this region, beyond the bilateral trade relations are, opportunities for cooperation with Bhutan, Sri Lanka and Maldives within the scope of SAARC.

The makers of foreign policy of Bangladesh sought close relations with the United States from the very beginning. Despite the country's negative role in the War of Liberation various initiatives in establishing normal relations with it were taken right from the period of the first government of Bangladesh. The socialist policies of the first government or its intimacy with the Soviet Union at first made the government of the United States unhappy about Bangladesh. In spite of that Bangladesh grew interested in getting project aid modify aid and food aid from the United States as soon as diplomatic relations with the country were established. The food aid was the main among all, and it was supplied through PL-480. As Bangladesh decided to export jute-bags to Cuba in 1974, the United States suspended its food aid, and as a result Bangladesh was compelled to cancel its trade agreement with Cuba. Especially, as the export of readymade garments from Bangladesh began, the United States soon became the biggest buyer of this commodity. At present the export of readymade garments plays a key role in keeping the balance of trade with the United States in favor of Bangladesh. In the recent years in view of the bright prospect of obtaining oil and natural .gas the United States has been taking more interest in Bangladesh.

Apart from economic consideration, political reasons also made the two countries come closer. During the cold-war era Bangladesh was of importance to the United States as the country was expected to help reduce Soviet influence in the South Asia. Besides, the United States was in need of gaining Bangladesh's support for its foreign policy. On the other hand, the governments who have so far been in power in Bangladesh have sought political and security relations with the United States in view of its

influence in the international arena. The combined military exercise of the United States and Bangladesh in the past few years, and the frequent visits from the officers of the US armed forces to Bangladesh bear witness to this. Towards the middle of 1998 the United States proposed entering into an agreement called SOFA (Status of Forces Agreement) in order to gain) the right to free movement within Bangladesh for the American soldiers, but finally it was not signed because of the opposition by a section within the government and strong resistance by the masses. However, although SOFA was not signed, Bangladesh signed the agreement called HA-NA (Humanitarian Assistance Needs Assessment).

Bangladesh has economic relations of varying degrees with the countries of Western Europe. Among them Britain, Germany and Scandinavian countries are involved with projects dealing with technical training; infrastructure development, flood control and rural development.

Owing to the role of the Soviet Union in the War of Liberation Bangladesh formed special relations with the country". Sheikh Mujib picked out the Soviet Union as /the destination for his first visit abroad Things included in the joint communiqué issued during Mujib's visit to Moscow (support to the 7-point manifesto of the

revolutionary government of Vietnam, European Security and Cooperation Conference, etc) gave such an impression that Bangladesh was pursuing a pro-Moscow principle in its foreign policy. Although the Soviet assistance to Bangladesh did not match up to the country's expectations, Bangladesh was thoroughly dependent on the Soviet Union during the regime of Sheikh Mujib. After the overthrow of Sheikh Mujib the dependence diminished

drastically, and the political relations weakened at the same time. Recently steps were taken to improve relations with Russia and to purchase military equipment from it.

Immediately after independence, a bold initiative was taken in order to form relations with the predominantly Muslim countries including the Arab states.- This was specially important against the backdrop of Pakistan's continuous propaganda against Bangladesh. These countries gradually accepted the reality of Bangladesh and announced their recognition. The oil producing countries of the Arab .world came into possession of huge amounts of surplus money by selling oil at high prices during the oil blockade in 1973. As they decided to assist the developing countries in Asia and Africa with this money, Bangladesh availed itself of the opportunity. . Bangladesh also managed to secure employment for its skilled and unskilled workers in the newly-created labour markets of these countries. This way the Muslim world, or the Arab states for that matter, assumed importance in the foreign policy of Bangladesh not only because of relDgious consideration but also due to economic reasons. During different political crisis Bangladesh took active roles in favour of these countries. Apart from playing an important role in the OIC, Bangladesh has rendered strong support for various bilateral issues like Palestine issue, the interference in Afghanistan by the Soviet Army, Iraq-Iran War, the end of Iraqi occupation of Kuwait, etc.

The relations between Japan and Bangladesh are mainly based on economy. The emergence of Japan as the single donor country in 1979-80 was an important event. Japan stands second in terms of the assistance Bangladesh receives from different donor countries and agencies. Together with

receiving economic assistance Bangladesh also aimed at introducing its own products in the Japanese market and attracting Japanese investment. Besides, Bangladesh procures a huge portion of its imports from Japan. The relations between these two countries are gradually improving against the backdrop of the increasing Japanese interest in South Asia. As regards Japanese investment in Bangladesh, although no remarkable undertaking other than KAFCO (Karnaphuli Fertilizer Company) is noticed, Bangladesh has been trying to attract Japan as well as other industrialized countries to its market.

Bangladesh's relations with China, a country with whom it had no formal relations till August 1975, started to grow warmer this point. China, like the United States, opposed to the War of Liberation of Bangladesh mainly on account of its dislike of India and the Soviet Union. However, although the United States recognized Bangladesh, China did not do so; moreover, in unison with Pakistan, it continued to refer to Bangladesh as a land under Indian occupation. All possible means were tried by Bangladesh to normalise its relations with China. China did not respond to any of those efforts; moreover, it vetoed Bangladesh's admission to UN membership in 1972. Although it did not recognize Bangladesh during the rule of the Mujib government, after a tripartite agreement was signed between Pakistan, India and Bangladesh on 28 April 1974, China no longer objected to Bangladesh's inclusion as a UN member.

China announced its recognition of Bangladesh on 31 August 1975. From this point on, the relations between the two countries continued to improve rapidly. China also supported Bangladesh in raising the Farakka issue in the United Nations. Apart from political matters, Bangladesh entered into

cooperation with China in the fields of military and economic affairs. China came forward to provide the armed forces and the navy with weapons and training. The relations between these two countries continued to evolve in harmony with the interstate relations in South Asia.

As is the case with any other country, foreign relations of Bangladesh flourished in the country's own interest. The reason that the foreign policy of Bangladesh has not attached equal importance to all the countries can be explained by the reality that its rulers have established foreign relations entirely on the basis of the estimates of benefits that the country expected to receive.[644]

বাংলাদেশের অভ্যন্তরের ব্যাপক নদী ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের হাতে রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত ৫৭টি নদ-নদীর মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ ৫৪টি নদীর অংশীদার। ভারত এসব নদীর উজানে অবস্থিত হওয়ায় তার পক্ষে এসব নদীতে বাঁধ দিয়ে শুষ্ক মওসুমে পানি প্রবাহ সরিয়ে নেয়া সহজ হচ্ছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশের স্বার্থ বা মতামতকে তোয়াক্কা করছে না। এ ব্যাপারে ভারত অনেকটা একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করছে। পানি কূটনীতির ইতিহাসে দু'দেশের পঁচিশ বছরের 'বন্ধুপ্রতীম' সম্পর্কের সময়ে ভারত কর্তৃক পানি প্রবাহ প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় রয়েছে লবণাক্ত পলিজমা, মাটি ক্ষয়, বন্যায়, মরুকরণ ও বন উজাড় প্রভৃতি। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর পানি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বটে, কিন্তু বহু প্রচারিত ঐ চুক্তি তার মেয়াদের প্রথম বছরেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে পানির হিস্যা দিতে ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের দরিদ্র তালিকার শীর্ষ ভাগে। পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। অনেক গবেষক ও পর্যবেক্ষক ও পণ্ডিতগণ মনে করেন, আগামী কয়েক দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা, ভূমি ও খাদ্য দ্রব্য সংক্রান্ত চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সংকটের রূপ ধারণ

644. Sirajul Islam, (Chief Editor), ibid, V.4; P.243-245

করবে। তবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে জনসংখ্যার বিদেশ গমনের হার অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করতে পারে।[৬৪৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা সূত্রপাত ঘটেছে। পশ্চিমা বিশ্বে, বিশেষ করে ইউরোপ একদিন যে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন বা ইইসি গঠিত হয়েছিল এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে এ কমিশন যে অবদান রেখেছে, তারই সফল পরিণতিতে আজকে সেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করা সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে গড়ে ওঠা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অর্থনৈতিক এশীয় সাতটি দেশ– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, ভুটান, নেপাল ও শ্রীলংকার নেতৃবৃন্দের মনেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার বিষয়টি প্রেরণা যুগিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক বিরোধ না থাকলেও সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশের মধ্যে দ্বি-পক্ষীয় বিরোধ রয়েছে। যেমন: ভারতের সাথে গঙ্গা ও অন্যান্য নদীর পানি নিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে অসন্তোষ, কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ প্রভৃতি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় এবং সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী সহযোগিতার বিশদ দিক তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। তিনি প্রকৃত বন্ধু হিসেবে দু'দেশের রাজনৈতিক প্রত্যয় ও সংকল্পের সমন্বয় করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে সুযোগ সৃষ্টির উপর জোর দেন। তিনি এশিয়া হাইওয়ে ও এশীয় রেলওয়ে পরিকল্পনাধীন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন সম্পর্কিত প্রস্তাবের উপর সমর্থন প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমাদের অঞ্চলের দেশগুলো যেন উপ-আঞ্চলিক প্রক্রিয়ায় দ্রুততর উন্নয়নের পথে ধাবিত হতে পারে। তার প্রসারিত এ উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন দৃষ্টিকোণে তিনি বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং আমাদের দেশ সংলগ্ন ভারতীয় এলাকাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

শেখ হাসিনার এ ধরনের বক্তব্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেও প্রতিধ্বনিত হয়। তিনিও উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা, ট্রানজিট বা সীমান্ত সংযোগ পথ, রাজপথ ও রেলপথ, সড়ক প্রভৃতিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কথা বলেন। পরবর্তীকালে শেখ হাসিনা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন প্রদান করেন।

---

৬৪৫. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, AvšÍRwZK ivRbxwZ cwiwPwZ *(Introducation to International Politics)*,প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮৩

কুড়িগ্রাম সীমান্তে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের ঠিক আগে বিডিআর দীর্ঘ তিরিশ বছর ভারতের দখলে থাকা সিলেটের তামাবিল সীমান্তের পাদুয়া এলাকা পুনরুদ্ধার করে। এ নিয়েই সীমান্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ঐ ভূখণ্ডটি যে বাংলাদেশের, তা কুড়িগ্রামের রৌমারি সংঘর্ষে ১৬ জন বি.এস.এফ নিহত হবার পরেই ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমসহ সবাই বলতে শুরু করেছে। অর্থাৎ কুড়িগ্রাম সংঘর্ষ না ঘটলে পাদুয়া ভারতেরই একটি অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করত। বাংলাদেশের ভূখণ্ড ভারতের দখলে রাখা নতুন ঘটনা নয়। স্বাধীনতার পরে বেরুবাড়ি[৬৪৬] হস্তান্তরের বিনিময়ে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা[৬৪৭] পাওয়ার দীর্ঘসূত্রিতা এবং পরে ভারতেরই করিডোর দিয়ে বাংলাদেশের নিজ ভূখণ্ডে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা পাবার ঘটনা ঘটেছে। ঐ করিডোরের জায়গাটুকুও ভারত সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশকে দেয়নি। তাছাড়া তালপট্টিসহ চরাঞ্চলের ঘটনা নিয়ে সংঘর্ষ সব সময় লেগেই আছে।

বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সাথেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন বাংলাদেশ নিজের মর্যাদাকে অনেকাংশে ক্ষুন্ন করেছে। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক দৈন্যদশা, সার্বিক অব্যবস্থাও সাহায্য দাতাদেশ ও সংস্থাগুলোর উপর অপরিসীম নির্ভরশীলতাহেতু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের স্থান সম্মানজনক নয়।

বিদেশী শক্তির পরামর্শমাফিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণ হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও বিদেশী অর্থ লগ্নি করা হয়। বাংলাদেশে ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি এ্যান পিটার্স বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর এক প্রকার সম্মান হানিকর মন্তব্য করেছিলেন। অথচ বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক মহল হতে তেমন কোন প্রতিবাদ শোনা যায় নি। বস্তুত আমেরিকা বাংলাদেশের অর্থনীতির যে সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব করে চলেছে সে সমস্ত বিষয়ে যদি তারা কোন প্রকার জটিলতা বা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে তাহলে বাংলাদেশ প্রচণ্ড বিপাকে পড়ে যাবে। ফলে আপন জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবেই সকল মহল নিশ্চুপে সহ্য করে গেছেন।

মেরি এ্যানি পিটার্স এ দেশে অবস্থান করেই এখানকার রাজনীতিবিদদের উপদেশের সুরে বলেছেন জোট সরকারের একশ' দিনের কর্মসূচিতে কি কি করণীয়। এর সাথে তিনি কিছু পূর্বশর্তও চাপিয়ে দেন এবং ইশারা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, শর্তাদি প্রতিপালিত না হলে তারা বাংলাদেশের প্রতি অনাগ্রহ

৬৪৬. বিস্তারিত:- দৈনিক ইনকিলাব, ০৭ মে ২০১৫, পৃ.১
৬৪৭. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ১৫

প্রদর্শন করবে। এমতাবস্থায় সরকারি বা বিরোধীদল নিরুপায় চুপচাপ সময়ক্ষেপণ করে গেছেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে এমন নতজানু পররাষ্ট্রনীতিতে উন্নতি অবনতি ঘটেছে বটে, কিন্তু তার উন্নতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। এমন পরিস্থিতি থেকে বের হবার সহজ কোন পন্থা এবং নিকট ভবিষ্যতে উত্তোরণের কোন সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে।[৬৪৮]

১১.৮ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য
History and Tradition of Foreign Policy of Bangladesh

জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বিভিন্ন সময়ে সরকার প্রধান হিসেবে বিভিন্ন ব্যক্তির ইচ্ছা, আগ্রহ, ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী এ দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রণয়ন ও কার্যকরণ করা হয়েছে। নিচে বিভিন্ন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করা হলোঃ

⇨ মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি (২৬ মার্চ ১৯৭১-১৬ ডিসেম্বর-১৯৭১)

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ, পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এপ্রিলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত যে প্রতিরোধ চলছিল, তা ছিল স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এবং বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ। এ সময়ের ভেতরই ১৯৭০ নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যরা বিপুল সংখ্যক স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং পাকিস্তান বাহিনী থেকে বিদ্রোহী বাঙ্গালী সেনা, পুলিশ, ইপিআর সদস্যরা ভারতে আশ্রয় নেয়। ১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকার শপথ নেন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়, যা পরবর্তীতে মুজিবনগর নামকরণ করা হয়। একে রাজধানী ধরে স্বাধীন বাংলার যাত্রা শুরু। অবশ্য ১০ এপ্রিল-ই প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালটা ছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময়। বিশ্বের দেশগুলো দু'টি পরিষ্কার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও এর বাইরে থাকতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধ কালে বিশ্বের একভাগে ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলো এবং অন্যভাগে ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। কিন্তু চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও তার অবস্থান ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলোর পক্ষে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সময় পাকিস্তান ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলোর বন্ধু, আর ভারত সমাজতন্ত্রীদের। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সখ্য ছিল, আর ভারতের ছিল বৈরিতা। অবশ্য ভারতের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ-বৈরিতাই পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের একটা গাঢ় সম্পর্ক

৬৪৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮৫

তৈরি করে। পাকিস্তানের মাধ্যমে পশ্চিমা দুনিয়ার সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এর নেপথ্যে ছিল চীন-সোভিয়েত নীতিগত ও সীমান্ত নিয়ে দ্বন্দ্ব। পুঁজিবাদীরা চেয়েছিল, সারা বিশ্ব সমাজতন্ত্র মুক্ত হোক। আর সমাজতন্ত্রীরা সারা বিশ্বকে সমাজতন্ত্রের ছায়া তলে চেয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এ টানাপড়েনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল।[৬৪৯]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পরিণতির দিকে যেতে হচ্ছিল। সংশ্লিষ্ট পরাশক্তিগুলো এবং ভারত ওপরের সমীকরণের দিকে তাকিয়ে ভূমিকা রাখছিল। ফলে মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় প্রবাসী সরকারকে অত্যন্ত দক্ষতা ও সতর্কতার পরিচয় দিতে হয়েছিল। পররাষ্ট্র নীতির সফলতার ওপর-ই মুখ্যত স্বাধীনতা নির্ভর করেছিল । এমন কি সামরিক সাফল্যও। পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য ছাড়া সামরিক সাফল্যের প্রশ্ন খুব-ই জটিল হয়ে পড়তো। আর শুধু সামরিক সাফল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল কিনা, তা-ও বলা কঠিন।

বাংলাদেশ ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারতীয় স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ ভারত দ্বিতীয় দেশ ভূটান (৭ ডিসেম্বর ১৯৭১) প্রবাসী সরকারের কূটনৈতিক সফলতার সেটি ছিল চরম সাফল্য।

যুদ্ধের শেষ দিকে প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করার মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করা এবং বাংলাদেশের উদ্দেশ্য সফল করা। বহির্বিশ্বে এ পর্যায়ে যে অবস্থা চলছিল, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা, তা ভারতকেই সামাল দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সীমাবদ্ধতা ছিল, তবে সহায়ক শক্তি হিসেবে সে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সে ভূমিকা ছিল বিশ্বজনমত গঠন, লবিং, স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরা।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে চীন-মার্কিন অক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে পাকিস্তান রক্ষার। সে চেষ্টা তারা আগেও করেছিল। ঐ পর্যায়ে তারা চেষ্টা করছিল অন্তত পশ্চিম পাকিস্তানকে অক্ষত রাখতে।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে, তখন মার্কিনীরা সামরিক উপায়ে হলেও পাকিস্তান রক্ষার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভা ডাকা হয়। ঐদিনই চীনের বার্তাকে মার্কিনীরা ভুল মনে করেছিল, চীন ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। আর এতে করে ভারত-সোভিয়েত চুক্তির জন্য সোভিয়েত হামলার যে ভয় চীনের জন্য ছিল, তা প্রতিরোধে মার্কিনীরা পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও রাজী ছিল। কিন্তু চীনের রাষ্ট্রদূত হুয়ং হুয়া যুদ্ধ নয় বরং

৬৪৯. কাজী জাহেদ ইকবাল, e¨sj‡`‡ki পররাষ্ট্রনীতি (1971-2001), ঢাকাঃ জাতীয়, গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১১; পৃ. ১৮

জাতিসংঘের মাধ্যমে পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতির বিষয়ে আগ্রহ জানালে একটি বড় ঝুঁকি দূর হয়, যদিও ততক্ষণে মার্কিন ৭ম নৌবহর বাংলাদেশের উপকূলের দিকে রওয়ানা দিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান এবং ভারতের অনমনীয়[৬৫০] মনোভাবের কারণে ৭ম নৌবহর কোন ভূমিকা রাখার বদলে ভারত মহাসাগরে নিশ্চল অবস্থান নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য জাতিসংঘেও বাংলাদেশের পক্ষে অনমনীয় ছিল। ৪ ডিসেম্বর এবং ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ দু'দফা ভেটো দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিনী যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব ভণ্ডুল করে দেয়। ফলে পাকিস্তানের মৃত্যু অনিবার্য এবং মার্কিন-চীন কূটনীতির ভরাডুবি হয়। শ্মারন সিং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ জাতিসংঘে পাকিস্তানের পরাজয়ের সংবাদ দেন। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার শেষ দিকে এ জটিল আন্তর্জাতিক ক্ষমতার লড়াইতে ভারতের পাশাপাশি যোগ্যতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

প্রবাসী সরকার যখন নিশ্চিত হলো, স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ জরুরী এবং এক প্রকার অনিবার্য, তখনই তারা ভারত সরকারের সঙ্গে স্বাধীনতা এবং সম্ভাব্য দ্রুত ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতের সাড়া ছিল ইতিবাচক। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণেই স্বাধীনতার পর ভারতের পক্ষে দ্রুত সৈন্য ফিরিয়ে নেয়া প্রয়োজন ছিল। ভারতের সঙ্গে এমনি একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং পরবর্তীতে তা কার্যকর হওয়া প্রবাসী সরকারের ও পরবর্তী মুজিব সরকারের বড় কূটনৈতিক সফলতা ছিল।[৬৫১]

⇨ বাংলাদেশের ইসলামি সম্মেলন সংস্থায় যোগদান ও বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা

১৯৭৪ সালে মার্চ মাসে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে "ইসলামি বিশ্বের যে ভূমিকা ছিল তা যেমন একাধারে বাংলাদেশ বিরোধী তেমনি পাকিস্তানের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনমূলক।"[৬৫২] এমনি পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শেখ মুজিব ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে একটি সভার আয়োজন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ওআইসি তিউনিশিয়া, আলজিরিয়া, মালয়েশিয়া,

৬৫০. ড. মোহাম্মদ সেলিম, evsjv‡`k-fviZ m¤úK (1971-1981), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৯; পৃ.৪৮-৪৯
৬৫১. কাজী জাহেদ ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২৮
৬৫২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২৭

ইরান, লিবিয়াসহ ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন পর্যন্তপ্রতিনিধিদলের অধিকাংশ রাষ্ট্র বাংলাদেশেকে স্বীকৃতি না দেওয়ায়, বাংলাদেশ সরকার ওআইসি প্রতিনিধিদলকে গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। ভুট্টোর সঙ্গে মুজিবের বৈঠকের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছাড়াও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে অনেক প্রতিনিধি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশগুলো সফর করে বাংলাদেশ সম্পর্কে সে সব দেশে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানাতে কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে ওআইসি[৬৫৩] প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে আসে। কুয়েতী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, "We are not coming on behalf of Pakistan but on behalf of the Summit. We feel the problem between Pakistan and Bangladesh can be settle."[654] আমন্ত্রণের জবাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র, পাকিস্তান ছাড়া অন্য যে কোন দেশে সম্মেলন হতে পারতো। আমরা সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য উদ্বিগ্ন কিন্তু কোন চাপের মুখে আমরা সম্মেলনে যাব না। যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিষয়ে বাংলাদেশ এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এটি ত্রিপক্ষীয় কোন বিষয় নয় এবং এ বিষয়ে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন স্থল পরিবর্তনেও প্রস্তাব করেন। কারণ পাকিস্তানের স্বীকৃতি ছাড়া লাহোর সম্মেলনে অংশ গ্রহণকে তিনি "is an insult to me" বলে উল্লেখ করেন। ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, "It is the conditon on the 195 that Pakistan wants an assurance and this we can not give him (Bhutto)"[655] এক পর্যায়ে শেখ মুজিব বলেন, আমরা ক্ষমা এবং ভুলে যেতে পারি সার্বভৌম সাম্যের ভিত্তিতে।

ওআইসি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সফল মধ্যস্থতা করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানের ইচ্ছানুযায়ী বাংলাদেশকে বিনা স্বীকৃতিতে লাহোরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ওআইসি। কিন্তু শেখ মুজিবের

---

৬৫৩. Bmjvgx wek‡Kvl; ঢাকা: ইফাবা; ১৯৯৮, খ.২১, পৃ.১৯১

654. Fakhruddin Ahmed, Critical Times Memoirs of a South Asian Diplomate, Dhaka, 1994, P. 100

655. Fakhruddin Ahmed, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩

অনড় অবস্থানের কারণে পাকিস্তান ছাড় দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচার না করার শর্তে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ পাকিস্তান স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়। শেখ মুজিব পূর্বেই জানিয়ে দেন যে, পাকিস্তানের প্রত্যাশিত নিশ্চয়তা প্রদান সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওআইসির চাপের মুখে পাকিস্তান ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশ সরকারও পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেয় এবং লাহোর সম্মেলনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ২২ সদেস্যর প্রতিনিধিদল ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ লাহোরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতিতে এটি একটি মাইলস্টোন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিশেষ ভাবে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে। অধিকাংশ গবেষক মনে করেন যে, শেখ মুজিব ইসলামি শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেয়ার ফলে ভারত বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল।[৬৫৬] বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের বিবেচনায় ওআইসিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছিল খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ তার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ যেমন অব্যাহত রেখেছে পাশাপাশি এটাও বিবেচনার দাবী রাখে যে, দেশের সিংহভাগ জনগণ মুসলিম। উপরন্তু বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন চাহিদার জন্যও মুসলিম বিশ্বের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। ভারতও ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করেছে। বাংলাদেশের একজন সাবেক কূটনীতিক মনে করেন যে, "There was some unease in some quarters in India who perceived Bangladesh's participation in the summit diluted its commitment ot secularsim."[657] বাস্তবে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে সরে আসেনি। শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য তৎকালীন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "জনগণের প্রত্যাশা, দেশের আর্থিক অপ্রতুলতা, প্রশাসনিক শৈথিল্য, ... এ সবের সঙ্গে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ঘাপটি মেরে থাকা কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তির অপপ্রচার সব কিছু মিলে ভারত দ্রুত দোষী হয়ে পড়েছে।"[৬৫৮]

এমনি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রীসভায় দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর লাহোরে ইসলামি সম্মেলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভার এক প্রবীণ সদস্য দিল্লী হয়ে লাহোর যাবার পরামর্শ দেন।[659] শেখ মুজিব এই পরামর্শ গ্রহণ করেননি, তিনি লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে মিসেস গান্ধীকে বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত অবহিত করেন। এটা ছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

656. Bangladesh Times, 24.2.1974
657. Harun-ur-Rashi, Indo-Bangladesh Relations, an insider's view, New Delhi, 2002, P.28
৬৫৮. ড. মোহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬
৬৫৯. মফিজ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০

ঘটনা। বাংলাদেশের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব লিখেছেন, "This was the first major departure in our foreign policy naunce. From now on, we did not consult India in advance on major issues and India was merely informed after decision was taken."[660]

⇨ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন (১২.১০.১৯৭২-২৫.০১.১৯৭৫) ও

রাষ্ট্র হিসেবে দায়িত্ব পালন (২৫.০১.১৯৭৫-১৫.০৮.১৯৭৫) পর্যন্ত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বদেশের মাটিতে ফিরে এসে যদিও অত্যন্ত সফল ও স্বার্থকভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী ভারতীয় সেনাবাহিনী ও প্রশাসকদেরকে প্রত্যাবর্তন করিয়েছিলেন, তদুপরি তিনি বাংলাদেশকে ভারতীয় মডেলের একটি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেখানে ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে দলীয় কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উৎসারিত।[৬৬১]

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসন আমলে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্থাপন বেশ জটিল ছিল। স্বাধীনতার সময় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সহ বেশিরভাগ মুসলিম দেশ বাংলাদেশের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে এসব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন জরুরী ছিল। অর্থনৈতিক প্রয়োজন এতটা জরুরী ছিল যে, বাংলাদেশকে মুসলিম দেশগুলোর সন্তুষ্টির জন্য অনেক নীতিগত বিষয়ে পিছু হটতে হয়েছিল। অত্যন্ত জটিল এবং কৌশলী পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

১৯৭২ সালে আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার (AAPSO) সম্মেলনে বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার নিন্দা জানানো হয় এবং ঐ সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলোর সমর্থনে বাংলাদেশ আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয়। মূলত এ সংস্থায় যোগদানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক

660. Fakhruddin Ahmed, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৬৬১. কাজী জাহেদ ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ.১২-১৩

যোগাযোগ স্থাপিত হয় বাংলাদেশের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য হবার সময় বাংলাদেশ মিশর, ইরাক এবং দক্ষিণ ইয়েমেনের সমর্থন লাভ করে।

১৯৭২ সালের আগে কোন মুসলিম দেশ-ই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া এ প্রক্রিয়ার প্রথম স্বীকৃতি দানকারী। পরে ১৯৭৫ সালের ভেতর প্রায় সব মুসলিম দেশের-ই স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হয়। এমন কি পাকিস্তানেরও।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোর ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিয়ে, সদস্য পদ পেয়ে, বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক চূড়ান্ত আকার পায়। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময় আরব দেশগুলোর প্রতি জোর সমর্থন দিয়েছিল। এমনকি শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ যুদ্ধের সময় মিশরীয় বাহিনীর জন্য পাঠানো হয় এক লক্ষ পাউণ্ড চা। এছাড়া একটি ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছিল। স্বেচ্ছা যোদ্ধা হিসেবে যাবার জন্য ৫০০০ সদস্যের একটি দল তৈরি হয়েছিল। এরপর দ্রুতই আরব দেশগুলো বাংলাদেশের দিকে ফিরতে শুরু করে।[৬৬২]

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যকারী প্রতীক রাষ্ট্রগুলো এ দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল। আর সে জন্যই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যকারী শক্তি ভারত, গ্রেট ব্রিটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর এ সকল দেশের সাথে বঙ্গবন্ধু সরকার একটি বিশেষ সম্পর্কও গড়ে তুলেছিলেন।[৬৬৩]

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলে[৬৬৪]া হলো– ১. সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন, ২. ভারতের নির্ধারক ভূমিকা, ৩. অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, ৪. বাংলাদেশে চীনের প্রভাবকে সঙ্কুচিত করা এবং চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অনীহা প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বাংলাপিডিয়ার ৪র্থ খন্ডে বলা হয়েছে-

Apart from bilateral relations, Bangladesh got the membership in various international organizations like the United Nations, Non-Aligned

---

৬৬২. কাজী জাহেদ ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯-৩৯

৬৬৩. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, AvšÍRvwZK ivRbxwZ cwiwPwZ *(Introducation to International Politics),*প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯২-৩৯৩

৬৬৪. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ-২৪ ক) ৪৮-৫৮

Movement, Commonwealth, SAARC and Organization of Islamic Conference (OIC), and continued to associate itself with their activities. The country obtained the membership of the Non-Aligned Movement in 1973 immediately after independence. But it failed to get the membership of the United Nations in 1972 because of China's veto on the issue. However, with the normalization of relations with Pakistan, and with China's concurrence Bangladesh was granted admission to membership in the United Nations in 1974. As Bangladesh got the membership of the Commonwealth after independence, Pakistan withdrew itself from this organization. On the other hand, after Pakistan announced its recognition of Bangladesh in February 1974 Bangladesh participated in the second summit of the OIC held in Lahore and obtained the membership of the organization. In 1975 Bangladesh played its role as a founder-member of the Islamic Development Bank (1DB), an associate institution of the OIC. As the concept of SAARC was put forward by Bangladesh, it become a founder-member of the organization. As a founder member of D-8 and BIMST-EC Bangladesh brought these two regional organizations into being in 1997. Bangladesh was elected member in different organs of the United Nations. The country had been a temporary member of the Security-Council for a term of two years (1979-1980).[665]-

বঙ্গবন্ধু সরকারে প্রচেষ্টায় রাশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, ইটালি, বেলজিয়াম, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, ইরাক, ইরানসহ দুই শতাধিক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে, স্বীকৃতি দানকারী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেশ ছিল যথাক্রমে প্রতিবেশী ভারত, ভূটান ও নেপাল।[৬৬৬]

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ
বাংলাদেশ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ লাভ করে ।

665. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Banglapedia*, ibid,V.4; P.242
৬৬৬. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ-২৪ক) পৃ. ৪৫-৫৮

<table>
<tr><th>সংস্থা বা সংগঠনের নাম</th><th colspan="2">সদস্যপদ লাভের তারিখ</th><th>কত তম সদস্য</th></tr>
<tr><td>কমনওয়েলথ (Commonwealth)</td><td colspan="2">১৮ এপ্রিল, ১৯৭২</td><td>৩২</td></tr>
<tr><td>বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)</td><td colspan="2">১৭ মে, ১৯৭২</td><td></td></tr>
<tr><td>আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)</td><td colspan="2">১৭ জুন, ১৯৭২</td><td></td></tr>
<tr><td>আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)</td><td colspan="2">২২ জুন, ১৯৭২</td><td></td></tr>
<tr><td>পূনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)</td><td colspan="2" rowspan="2">১৭ আগস্ট, ১৯৭২</td><td>১১৮</td></tr>
<tr><td>আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (IDA)</td><td>১০৯</td></tr>
<tr><td>আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)</td><td colspan="2">২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২</td><td></td></tr>
<tr><td>জাতিসংঘে শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)</td><td colspan="2">২৭ অক্টোবর, ১৯৭২</td><td></td></tr>
<tr><td>জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)</td><td colspan="2">৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩</td><td></td></tr>
<tr><td>খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)</td><td colspan="2">১২ নভেম্বর, ১৯৭৩</td><td></td></tr>
<tr><td>এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)</td><td colspan="2">১৯৭৩</td><td></td></tr>
<tr><td>ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)</td><td colspan="2">২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪</td><td>৩২</td></tr>
<tr><td>ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)</td><td colspan="2">১৯৭৪</td><td></td></tr>
<tr><td>ফিফা (FIFA)</td><td colspan="2">১৯৭৪</td><td></td></tr>
<tr><td>বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)</td><td colspan="2">১ জানুয়ারি, ১৯৯৫</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">জাতিসংঘ (UN)</td><td>স্থায়ী পর্যবেক্ষক</td><td>১৭ অক্টোবর, ১৯৭২</td><td rowspan="2">১৩৬</td></tr>
<tr><td>পূর্ণ সদস্য পদ</td><td>১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪</td></tr>
<tr><td rowspan="2">আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)</td><td>সহযোগী সদস্য</td><td>২৬ জুলাই, ১৯৭৭</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>পূর্ণ সদস্য</td><td>২৬ জুন, ২০০০</td></tr>
</table>

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতিসংঘ কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ও. আই. সি-র শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। যোগদানের পূর্বে পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্যুমেদিন ঢাকায় আসিয়া বিশেষ বিমান যোগে বঙ্গবন্ধুকে লাহোর লইয়া যান। লাহোর বিমান বন্দরে বিজয়ী বেশে বঙ্গবন্ধু বিমান হইতে নামিয়া আসিলে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান পাকিস্তান সরকারের প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো। তাঁহাকে সামরিক সালাম প্রদান করেন পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল টিক্কা খান, মাত্র দুই বৎসর পূর্বে শেখ সাহেব যাহাদের হাতে বন্দী ছিলেন।[৬৬৭]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী........

প্রথম	দেশ	সময়কাল
প্রথম দেশ	ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
দ্বিতীয় দেশ	ভুটান	৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১
প্রথম ইউরোপী দেশ	পূর্ব জামানি*[ক]	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২
	পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়া	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম আফ্রিকার দেশ	সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম উত্তর আমেরিকার দেশ	বার্বাডোস	২০ জানুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম দক্ষিণ আমেরিকার দেশ	ভেনিজুয়েলা ও কলম্বিয়া	২ মে, ১৯৭২
প্রথম ওশেনিয়ার দেশ	ফিজি	২৬ জানুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ	পূর্ব জার্মানি*[ক]	১১ জানুয়ারি
	পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম মুসলিম (অ-আরব) দেশ	সেনেগাল*[খ]	১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
	মালয়েশিয়া*[গ], ইন্দোনেশিয়া	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম আরব দেশ	ইরাক	৮ জুলাই, ১৯৭২
প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের দেশ		
প্রথম উপসাগরীয় দেশ	কুয়েত	৪ নভেম্বর, ১৭৯৩

(ক) পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানি একীভূত হয়ে 'জার্মানি' গঠন করে।

(খ), (গ) সেনেগাল এবং ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যার অধিকাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও সাংবিধানিকভাবে দেশ দুটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দেশ কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতির সময়কাল

দেশের নাম	বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের তারিখ
সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়া)	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
যুক্তরাজ্য	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ফ্রান্স	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
যুক্তরাষ্ট্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪

৬৬৭. বিস্তারিত- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৬, খ.২৪ (প্রথম ভাগ), পৃ. ৪৫-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে উল্লেখিত দেশ ও সংস্থাগুলোর সদস্যপদ লাভ বঙ্গবন্ধু সরকারের কূটনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমান মিলে।

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ

সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশকে জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু অনেক কূটনৈতিক চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদের আবেদন উত্থাপন করা হলে চীন[৬৬৮] তাতে ভেটো[৬৬৯] দেয়।

বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড.কামাল হোসেনও জাতিসংঘে বাংলাদেশে সদস্যপদের অর্ন্তভূক্তির জন্য মহাসচিব ওয়াল্ড হেইমের কাছে চিঠি দিয়েছেন।[৬৭০]

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাংলাদেশ (১৮.০৯.১৯৭৪) জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য পদ লাভ করেন। এটা বঙ্গবন্ধু সরকারের অন্যতম কূটনৈতিক সাফল্য। যেমন দৈনিক বাংলা পত্রিকার শিরোনাম ছিল-

বাংলাদেশ জাতিসংঘে আসন নিয়েছে : বঙ্গবন্ধুর সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
বিশ্ব শান্তির প্রতি বাংলাদেশ নিবেদিত-
কূটনৈতিক রির্পোটার: দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেছে, বাংলাদেশ সময় বুধবার ভোর চারটায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য রাষ্ট্ররূপে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করা হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর পরই আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন জাতিসংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সদস্য দেশগুলোর বিপুল অভিনন্দন গ্রহণ করেন।[৬৭১]

---

৬৬৮. Pxb c‡k e½eÜ :নয়াদিল্লী, ১৬ মে (বাসস, পিটি আই): প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে যাওয়ার আগে সাংবাদিকরা জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তি আবেদন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আবেদন আগেই করা হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, চীন, ভেটো দিয়েছে। এটা সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবী, আশা করি চীন তা বুঝতে পারবে। বিস্তারিত:- সংবাদ, ১৭ মে ১৯৭৪, পৃ. ১

৬৬৯. ভেটো শব্দের অর্থ আমি মানি না। নিরাপত্তা পষিদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্য দেশের (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়া, ফ্রান্স এবং গণচীন) ভেটো প্রদানের ক্ষমতা আছে। কোন প্রস্তাবে এই ৫টি দেশের কোন একটি দেশ দ্বিমত পোষণ করলে সে প্রস্তাব আর অনুমোদিত হয় না।

৬৭০. Iqvì †nB‡gi Kv‡Q W: Kvgv‡ji wPwV: RwZms‡N evsjv‡'‡ki m'm¨c‡'i Av‡e'b cbi¦Ìvcb বিস্তারিত:- সংবাদ, ১৮ মে ১৯৭৪, পৃ.১

৬৭১. বিস্তারিত:- দৈনিক বাংলা ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

বাঙালী জাতির এমন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি ও ন্যায়ের ভিত্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি উদার্ত আহ্বান জানান। তদানিন্তন বহুল প্রচারিত দৈনিক বাংলা পত্রিকার শিরোনাম-

শান্তি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা গড়তে হবে- জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

জাতিসংঘ ২৫ শে সেপ্টেম্বর (এনা)।- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ জাতিসংঘ মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন যে শান্তি ও ন্যায়ের জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের আশা-আকাংক্ষা বিমূর্ত হয়ে উঠবে এমন এক নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ পূর্ণ অঙ্গীকারাবদ্ধ। আজ বাংলাদেশ সময় রাত তিন টায় সাধারন পরিষদে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন: এই মহান পরিষদে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের গভীর সন্তুষ্টির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বর্তমানে মানবজাতির এই সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে। বাঙালী জাতির জন্য এ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ।[৬৭২]

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় দেওয়া ভাষণ আমাদের ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারির দিনে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।[৬৭৩]

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের সীমান্তে তিন দিকে ভারত, আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। তাই উভয় দেশের ছিটমহল নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু তা করে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।[৬৭৪]

---

৬৭২. বিস্তারিত:- দৈনিক বাংলা, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪,

৬৭৩. ব½eÜi fvIY RwZms‡N Awfb›'Z- ভাষনের আদ্যোপান্ত দেখুন - দৈনিক বাংলা ২৭-০৯-১৯৭৪ পৃ:৩

৬৭৪. fviZ cv‡e †eiæevox, evsjv‡'k 'nMvg,Avmvjs, jvwVvUjv wQUgnj fvMvfvwM evsjv‡'k fvi‡Zi 49 eMgvBj †c‡q‡Q, fviZ †c‡q‡Q evsjv‡'‡ki 18 eMgvBj নয়াদিল্লী, ১৮ই মে (বাসস)-সম্প্রতি বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সীমান্ত চুক্তির ফলে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে লাভবান হয়েছে। ৪৯ বর্গমাইল এলাকার ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশকে দেয়া হয়েছে। আর ভারতকে দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের ১৮ বর্গমাইল এলাকার ছিটমহল। এমনিভাবে মোট ১১৪ টি ছিটমহল বাংলাদেশের ৫৪ ছিটমহলের সঙ্গে বিনিময় করে গত পঁচিশ বছরের অমীমাংসিত বিরোধের অবসান ঘটেছে। এখানকার কুটনৈতিক মহল সীমান্ত নির্ধারনের এই সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি প্রসূত বলে স্বাগত জানিয়েছেন। we¯ÍwiZ:- সংবাদ, ১৭ মে ১৯৭৪, পৃ.১

জীবনের ঝুঁকি লইয়া বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হইলেও গ্রেফতারের আগে তিনি ইপিআর-এর ওয়ারলেস যোগে স্বাধীনতা ঘোষণার নিম্নোক্ত বাণীটি চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন।[৬৭৫]

This may be my last massage, From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরিক্রমা ১৯৭১ সালের ১৬ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সূচনা। প্রকৃতপক্ষে মুজিবনগর সরকারই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বাইরের রাষ্ট্রগুলোর সাথে যোগাযোগ শুরু করে। এই পর্যায়ে পররাষ্ট্রনীতির যে কার্যক্রম তা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এই পর্যায়ে গৃহীতে পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব স্বাধীনতার পরও পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশ্ব রাজনীতিতে ইন্দো-সোভিয়েত অক্ষ এবং চীন-আমেরিকা অক্ষের মধ্যে বিরাজমান ক্ষমতার লড়াই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং পরবর্তী সময়ে গৃহীত পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি অপরিহার্য ছিল অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য লাভের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতির সংস্কার সাধন। স্বাধীনতার পর পরই সোভিয়েত ব্লক ভুক্ত কম্যুনিস্ট[৬৭৬] রাষ্ট্রগুলি থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করা হয়। কিন্তু কম্যুনিস্ট বলয় ভুক্ত পূর্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর স্বীকৃতি অনেক ধীরগতির ছিল। পশ্চিমের দেশগুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। মুসলিম বিশ্ব এবং আমেরিকা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের সুবিধামত সময় নির্ধারণ করে। একমাত্র নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে তৎকালীন বার্মা বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তী সাড়ে তিন বছরে অধিকাংশ রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারলেও সৌদি আরব, লিবিয়া, চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে অসম্মত হয়।

---

৬৭৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত Ôevsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv hy×, `wjjcÎÕ তৃতীয় খণ্ড,প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮২

৬৭৬. আবুল কালাম, Kg¨wb÷ ciivóbxwZ g‡¯‹v- †eBwRs- n¨vbq, XvKv: XvKv wekwe`¨vjq, 19৮৭, পৃ.১৮

রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের পর পরই ১৯৭২ সালে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার মাধ্যমে বামধারার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে এবং ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্রের ধারণাকে গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ যেসব রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে তাদের সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণে অপরাগতা প্রকাশ করেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি পররাষ্ট্রনীতির নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, 'বাংলাদেশ হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড'। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি ঘোষণা করেন: 'আমরা একটি ছোট রাষ্ট্র, আমাদের সকলের সাথে বন্ধুত্ব হবে এবং কারো সাথে শত্রুতা নয়'। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য তুলে ধরেন, 'বাংলাদেশ সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবে, যার ভিত্তি হবে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সমতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ'।

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার কর্তৃক গৃহীত পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশের ভাবমূর্তির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দশকেই বাংলাদেশ মূলত বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন কমনওয়েলথ, ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) এবং জোটনিরপেক্ষ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।[৬৭৭] এছাড়া বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বও দান করে। উন্নত রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে সাহায্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা লাভ এ সময়ের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম সাফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে জাপান, ব্রিটেন এবং আরো কিছু উন্নত রাষ্টের সাথে বাংলাদেশ এইড কনসোর্টিয়াম গ্রুপ গঠন করে যার যুগ্ম- সভাপতির নেতৃত্বে ছিল বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার।[৬৭৮]

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাপিডিয়ার ৭ম খণ্ডে বলা হয়েছে-

---

৬৭৭. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ-২৪ক) ৪৫-৫৮

৬৭৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৩৩

Bangladesh wanted its ideological goals to be reflected in its foreign policy through adopting the policy of non-alignment and establishing warm relations with the Islamic world. Moreover, a pronouncement supporting the principle of 'abolition of imperialism 'and colonialism' was made immediately after the independence. During his visit to the Soviet Union in 1972 Bangnbandhu Sheikh Mujibur Rahman pronounced his support to the struggle of the peoples of Laos and Cambodia for establishing their right to control their own destinies without any external interference. Besides, in his speech at COMMONWEALTH Conference held in 1973 in Canada, he demanded proper implementation of the Paris Peace Treaty on Vietnam.[679]

679. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Banglapedia, National Encyclopedia,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003,V.4; P.241

সারণি

বাংলাদেশে ভারতীয় সাহায্য ঃ মুজিব আমল[৬৮০]
(১৯৭১-৭২ হতে ১৯৭৫-৭৬) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	প্রতিশ্রুতি(commitment)							ছাড়কৃত (Disbursesment)						
	খাদ্য সাহায্য		পণ্য সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		মোট	খাদ্য সাহায্য		পণ্য সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		মোট
	অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ		অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ	
১৯৭১-৭২	১১৩.৩২৫	-	৬৭.২২৫	২২.১৬২	-	২০.০০০	২২২.৭১২	১০২.৮১৯	-	৫৩.০১৩	২২.১৬২	-	৩.৪৬৯	১৮১.৪৬৩
১৯৭২-৭৩	-	-	২.৫০০	৯.২৪৫	২.১৬৫	১.৬৬৬	১৫.৫৭৬	১০.৫০৬	-	১৪.৭২৩	-	-	৯.১৬৬	৩৪.৩৫৯
১৯৭৩-৭৪	-	-	-	৯.৪২৮	-	৩৮.৩৮২	৪৭.৮১০	-	-	-	৫.৬০০	০.১২৫	৪.২৬৯	৯.৯৯৪
১৯৭৪-৭৫	-	-	-	১২.৫০০	-	৫.০০	১৭.৫০০	-	-	০.১৭৩	১০.৯৯৫	০.০৬৩	৮.৪১৮	১৯.৬০৯
১৯৭৫-৭৬	-	-	-	৬.১৪৭	-	১.২৫০	৭.৩৯৭	-	-	০.৭৬৫	১৪.৯২৯	০.০৬৩	১.৯৫২	২৯.৭২১
মোট							৩১০.৯৯৫							২৭৫.১৪৬

উৎসা. *Flow of External Resources into Bangladesh,* Economic Relations Department, ERD, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka1991, P. 65

৬৮০. ড. মোহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৭

⇨ খন্দকার মুশতাক আহমেদের পররাষ্ট্রনীতি

(১৬.০৮.৭৫-০৬.১১.৭৫)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের বেনিফিশিয়ারী আওয়ামীলীগ মন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমেদ ১৬ই আগষ্ট ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের সাথে তার সম্পৃক্ততা রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাকে অগ্রহণ যোগ্য করে তোলে। আর তিনি ছিলেন মেজর ফারুক, রশিদ গংদের হাতের পুতুল। ফলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অসহায়ত্তের কোন উন্নতি ঘটেনি, যদিও মুশতাক দেশকে পুরোপুরি পশ্চিমা বলয়ে নিয়ে আসেন। যেদিন খন্দকার মুশতাক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেদিন (১৬ আগষ্ট ১৯৭৫) সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

After the overthrow of the government of SHEIKH MU.IIBUR RAHMAN in August 1975, the short-lived Mostaq government declared that the goal of its foreign policy would be to seek relations with the countries which had not yet recognized Bangladesh or established diplomatic relations with it.[681]

মুশতাক সরকার ভারত এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে দেশকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে আসেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক যথেষ্ট খারাপ হয়ে যায়। মাহবুব আলম চাষী মুশতাকের নির্দেশ মত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পদ ভাগ এবং বিহারীদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে দেনদরবারে আগ্রহী নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য এছিল বিরাট চাপেটাঘাত। বাংলাদেশ তখন ঐ দু'টি অতি প্রয়োজনীয় দাবি আদায়ের বিষয়ে অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থানে ছিল। এভাবে ক্ষমতায় থাকার তিন মাসে মুশতাক সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন কাণ্ড করেছে। ফলে বাংলাদেশ পশ্চিমা প্রভাবিত একটি দেশে পরিণত হয়।[৬৮২]

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ এক পাল্টা ক্যু এর মাধ্যমে মুশতাককে হটিয়ে দেন। কিন্তু ৭ নভেম্বরেই তিনি কর্নেল তাহেরের সৃষ্ট সিপাহী বিদ্রোহে ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। তাহেরের শুরু করা বিদ্রোহে নায়ক হিসেবে শেষে উত্থান ঘটে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের। তিনি সেনাপ্রধান

681. Sirajul Islam, (Chief Editor), Ibid, V.4; P. 242
৬৮২. কাজী জাহেদ ইকবাল, e৷sj৷‡'‡ki পররাষ্ট্রনীতি, প্রাগুক্ত,পৃ. 23

হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিচারপতি এ এস এম সায়েম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন ০৬.১১.৭৫-২১.০৭.৭৭ পর্যন্ত

The foreign policy of the short-lived Mostaq government, unlike other national policies, did not possess any special aspects which deserve mention.[683]

চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ৩১ আগষ্ট ১৯৭৫ যদিও এ দুইটি দেশের স্বীকৃতির বিষয়টি মুজিব সরকারে আমলে প্রায় চূড়ান্ত ছিল।

চীন	৩১ আগস্ট, ১৯৭৫
সৌদি আরব	১৬ আগস্ট, ১৯৭৫

683. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); Ibid, V.4; P.239-240

⇨ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি (21.04.1977-30.05.1981)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের সমাপ্তির পরে সৌদি আরব ও চীন প্রথমবারের মত বাংলাদেশকে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দেয়। এসব স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ 'সোভিয়েত ভারত' বলয় থেকে বের হয়ে আসতে চেষ্টা করে। জেনারেল জিয়াউর রহমান[684] রাষ্টপতির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিল।[৬৮৫]

জিয়াউর রহমান ১৯৭৪ সালের জুলাইতে সৌদি আরব সফর করেন। ১৯৮১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জিয়া নিরন্তরভাবে মুসলিম দেশগুলো সফর করেছেন। তার সফরের সঙ্গে এসব দেশের সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো দিন দিন বাংলাদেশের দিকে সাহায্যের হাত বেশি পরিমাণে প্রসারিত করছিল। মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিন সমস্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছিল আরবদের একনিষ্ঠ সমর্থক।[৬৮৬] ওআইসিতেও বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। জিয়া সরকারের সঙ্গে ভারত-সোভিয়েত অক্ষের বৈরিতা এবং পুঁজিবাদীদের সু-সম্পর্ক তার মধ্যপ্রাচ্য নীতির সহায়ক ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রয়োজন-ই ছিল মুখ্য। আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথাও জিয়া সরকার এক্ষেত্রে মনে রেখেছিলেন। ১৯৭৭ সালে প্রথমে সৌদি আরবে যাবার পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিল আভ্যন্তরীণ রাজনীতি। এদেশের ধর্মভীরু মানুষ সৌদি আরবকে ধর্মীয় কারণে মর্যাদার চোখে দেখে থাকে। সুতরাং সে দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য ঐ সফরে ছিল। ২৬ জুলাই ১৯৭৭ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর সহযোগী সদস্য পদ লাভ করে।[৬৮৭]

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাপিডিয়ায় জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বলা হয়- পরবর্তী সময়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। তিনি পূর্ববর্তী সরকারের নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখার সাথে যুক্তরাষ্ট্র এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কিছু পরিবর্তনও আনয়ন করেন। এই সরকার চীন-যুক্তরাষ্ট্র বলয়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্যোগী হয়। কৌশলগত সহযোগিতার

---

684. Major-General Ziaur Rahman (42) Chief of Army Staff and chief Martial Law Administrator was on Thursday sworn in as president of Bangladesh to succeed Mr. Justice A.M. Sayem who earlier in the day relinquished office because of failing health, Reports BBS.He is the seventh and the youngest President of Bangladesh.
Details: The Bangladesh observer, 21 April 1977, P.01

৬৮৫. কাজী জাহেদ ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪৫

৬৮৬. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ-১১) ৫৮৪

৬৮৭. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ-১১, পৃ. ৫৮৪

মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এবং চীন ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলে। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর উন্নয়নে চীনের সহযোগিতা এক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। এছাড়া চীনের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সে সময়ের বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।[৬৮৮]

জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকার সময় বার্মা (অধুনা-মায়ানমার)-বাংলাদেশ সম্পর্কে দারুণ জটিলতা সৃষ্টি হয়। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে হঠাৎ করে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশ আসতে শুরু করে। জুন মাসের ভেতর প্রায় দু'লক্ষাধিক শরণার্থী এসে আশ্রয় নেয়। তেরটি উদ্বাস্তু শিবির তৈরি করে তাদের রাখা হয়। শরণার্থীদের সবাই ছিল মুসলিম। অনুসন্ধান করে জানা যায়, মায়ানমার কর্তৃপক্ষ আরাকান অঞ্চলে অবৈধ অভিবাসী শনাক্ত করার জন্য সার্ভে করতে গিয়ে অপারেশন ড্রাগন নামের অভিযান চালিয়ে ব্যাপক অত্যাচার শুরু করার ফলে এ অবস্থা। অবৈধ অধিবাসী তাড়ানোর নামে কার্যত সকল মুসলিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাংলাদেশ-মায়ানমারের যে ২৩৩ কি. মি. সীমান্ত আছে, সেই বরাবর আরাকানের অবস্থান হওয়ায় শরণার্থী সব বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে শুরু করেছিল।

বাংলাদেশের পক্ষে এ বিপুল শরণার্থী সামাল দেয়া সম্ভব ছিল না। তারা বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাহায্য কামনা করলে UNHCR এর মাধ্যমে সাহায্য আসতে থাকে। প্রায় ১৫.৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঐতিহাসিক আমল থেকেই আরাকান এবং বাংলাদেশের ভেতর যাতায়াত, বিবাহ প্রভৃতি চালু থাকায় শরণার্থীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের পার্থক্য করা খুব-ই মুশকিল ছিল। ফলে মায়ানমার কর্তৃপক্ষ দাবি করছিল, বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ আরাকানে অবৈধ অভিবাসী হয়েছে।[৬৮৯]

বাংলাদেশের জন্য শরণার্থীদের দেশে পাঠানো খুব-ই জরুরী ছিল। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও তার প্রশাসন মায়ানমারের আন্তরিকতার বিষয়ে হতাশ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত একটি চুক্তি সম্ভব হয়। ১৯৭৮ সালের ৩১ আগষ্টের মধ্যে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন শুরুর কথা বলা হয়। সে মত কাজও শুরু হয়। UNHCR পূনর্বাসনের জন্য মায়ানমার সরকারকে সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ নেয়।[৬৯০] পুনর্বাসনের জন্য

---

৬৮৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; evsjv‡`‡ki RvZxq Ávb †Kvl, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০১১, খ.৭, পৃ.১৩৩-১৩৪

৬৮৯. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন, AvšÍRwZK ivRbwZ cwiPwZ *(Introducation to International Politics)*, পৃ. ৩৯৩

৬৯০. egx ciivógšxi XvKv Z¨vM mr cwZ‡ekx mjf m¤úK `p Kiv B"Qv cKvk বাসস ও নাসা জানায় .... আলোচনায় সফররত বর্মী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাই মউ এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর শামসুল হক নিজ নিজ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

শরণার্থীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়– এ, বি, সি। মায়ানমার সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় নিবন্ধন সনদ যাদের আছে, তারা 'এ' শ্রেণীর। 'বি' শ্রেণীর হচ্ছে, যারা মায়ানমারের নাগরিক মর্মে কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে তারা, আর বাকীরা 'সি' শ্রেণীর। এ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চলছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে।

১৯৭৯ সালের মে মাসে 'নে. উইন' মায়ানমারের রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ সফরে আসেন। তার সফরকালে দু'দেশের ভেতর সীমানা চিহ্নিতকরণ চুক্তি হয় ২৩ মে। দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা এতে স্বাক্ষর করেন। জিয়া সরকারের শেষ দিকে নে উইন এবং জিয়া পাল্টাপাল্টি সফর করেছেন। এ সফরের বাইরে মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাদের ভেতর আরো সফর হয়েছিল। বাংলাদেশ মায়ানমারের সাথে সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে পেরেছিল।

মুসলিম বিশ্ব তথা আরব বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুজিব সরকারও বিষয়টিকে এমন দৃষ্টিতেই দেখছিলেন। জিয়া সরকার আরো ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। সে ক্ষেত্রে তার কিছু সুবিধাও ছিল। ১৫ আগষ্টের পর মুশতাক ভারত-সোভিয়েত অক্ষ থেকে বেরিয়ে পাকিস্তান ও পশ্চিমা দেশগুলোর নিকটবর্তী হওয়ার উদ্যোগ নেন। এতে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে।[৬৯১] জিয়া সরকার পররাষ্ট্রনীতির ঐ ধারাটিকেই পরিশীলত রূপ দান করেন। মুশতাক সরকার সম্পত্তির ভাগাভাগিসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাকিস্তানকে যতটা ছাড় দেন, তা ছিল দারুনভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী।

জিয়া তার বৈদেশিক নীতিতে মুসলিম বিশ্বের[৬৯২] সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং চীনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

জেনারেল জিয়ার বৈদেশিক নীতিতে ভারতের প্রতি মোটামুটি কঠোর মনোভাবক পরিদৃষ্ট হয়েছিল। সোভিয়েত ধরনের সমাজতন্ত্রও জেনারেল জিয়ার মোটেই পছন্দ ছিল না। তিনি প্রায়শই 'মস্কো টাইপ সমাজতন্ত্র' কিংবা বাকশালতন্ত্র কথাগুলো উচ্চারণ করতেন, যাতে পরোক্ষভাবে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তার

বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক, ১৭ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ.১

৬৯১. bvivqbMÄ Bmjvgx m‡¤§j‡b †cÖwm‡W›U wRqv ivm‡ji (mt) Rxebv`k Abmi‡bi AvnŸvb
বাসস জানায়, নারায়নগঞ্জে খানপুর শিশু পার্কে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 'ইসলামী কাফেলা' আয়োজিত বিরাট জনসেবায় ভাষণ দিতে গিয়া প্রেসিডেন্ট জিয়া পবিত্র কুরআন হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, আমরা যদি কঠোর ভাবে ইসলামের আদর্শ মানিয়া চলি এবং যদি আমাদের ইমান থাকে তবে বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রগতির দিকে আগাইয়া যাইবে এবং কেহই সেই অগ্রগতি রোধ করিতে পারিবে না।
we¯ÍvwiZ:- দৈনিক ইত্তিফাক, ১১ মার্চ ১৯৭৮, পৃ.১ শিরোনাম

৬৯২. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ-১১) পৃ. ৫৮৪

বিরুপ মনোভাবের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ত। অপরপক্ষে, চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে জিয়া ১৯৭৬-১৯৮০ সালে বেশ কয়েকবার রাষ্ট্রীয় সফরে চীনে গিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে চীনের উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তুলেছিলেন। এটা তার পররাষ্ট্রনীতির এক বিশেষ দিক ছিল।

However, although the theoretical aspects of the foreign policies of the Mujib and the Zia governments were identical, there were differences in their ideological inclinations and in selecting their priorities. The Zia government did not abandon the policies of 'opposition to imperialism, colonialism and racialism' which were put "in the Constitution by the Mujib government as part of the country's foreign policy, but nevertheless it adopted a policy of establishing relations with the Muslim countries on the basis of Islamic solidarity through appending a new article (Article 25(2)) to the Constitution. Besides, as regards foreign relations, his government discarded the pro-Indian and pro-Soviet attitudes of the previous government and aligned itself with the United States, China and the Muslim world. [693]

সংস্থা বা সংগঠনের নাম	সদস্যপদ লাভের তারিখ	কত তম সদস্য
আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)	১৮ জুন, ১৯৭৬	১০৫
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কউন্সিল (ICC)	সহযোগী সদস্য ২৬ জুলাই, ১৯৭৭	
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC)	১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০	

The oxford Encyclopedia of the modern Islamic world গ্রন্থের সম্পাদক Jhone L. Esposito তার গ্রন্থের প্রথম খন্ডে জিয়াউর রহমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন, যা নিম্নে অবিকল বর্ণিত হল-

693. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Banglapedia, ibid*,V.4; P. 245

Against this domestic background, one should also note that Bangladesh was receiving mounting proportions of its foreign aid from the oil-rich and conservative Arab states, where Bangladeshis were working in massive members, especially in Saudi Arabia. The post coup government of Ziaur Rahman (1975-1981) become prominently active in Islamic International organizations, and increasing ties to the wider Muslim would may have prompted it in 1977 to replace the secularism clause of the constitution with a proclamation of absolute faith and trust in almighty Allah, mandating that government strengthen æfraternal ties with the Muslim states on the basis of Islamic solidarity". The Zia Government began to sponsor Islam as well, in its establishment of a cabinet level Division of RelDgious Affairs, Creation of an Islamic foundation for research, and plans for a new Islamic University, Under a separate directorate in the Ministry of Education, since 1975 the number of Madrashas, in Bangladesh has increased by 50 percent, their teachers by one third, and students by well over two thirds.[694]

২১.০৪.৭৭ মেজর জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপ্রতি হিসেবে শপথ পাঠের পর পর সংবিধান সংশোধনীর আদেশ জারি করেন। যা পত্রিকায়[৬৯৫] বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে -

সংবিধান সংশোধন আদেশের পূর্ণ বিবরণ:- নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান গত ২২ শে এপ্রিল সংবিধান সংশোধন আদেশ জারি করেন। সংবিধানের ভূমিকায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর ইমান, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মূলনীতি ভিত্তি করে সংশোধনী ওই আদেশ করা হয়েছে।

---

694. John L. Esposito (Editor in Chief) The oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world. V.1, Oxford University Press, 1995, New York, P.190

৬৯৫. বিস্তারিত:- সংবাদ, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৭,

(২) রাষ্ট্র ইসলামিক সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর সাথে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ ও জোরদার করার চেষ্টা করবে।

(৬) সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদকে ২৫(১) বলে গণ্য করা হবে এবং বিধি ১-এর পর নিম্নলিখিত বিধি ২ সংযোজিত হবে।

The governments who came-to power after August 1975 put special emphasis on establishing relations with Islamic Uinmah. Although relations with the Islamic world were opened during the period of Sheikh Mujib government, the ties were strengthened later on. With this end in view, the governments in power kept on taking steps to establish Islamic relDgious values. The Zia government repealed Article 12 of the Constitution which upheld secularism, and added instead Bismillahir Rahmanir Rahim to the Preamble of the Constitution.[696]

প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশ জাপান মৈত্রী বন্ধন খুব সুদৃঢ় ছিল। জিয়াউর রহমান যখন জাপান যেতেন সাংবাদিকরা উৎসুক হয়ে থাকত। আর ঐ নিউজ পত্রিকার শিরোনামে শোভা পেত। যেমন- প্রেসিডেন্ট জিয়া আজ জাপান যাইতেছে:[৬৯৭]

আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট জিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকাকালে ১৯৭৬ সালের মে মাসে তিনি ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এবং ঐ বৎসর আগস্ট মাসে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকরূপে ২৯ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণের পর জেঃ জিয়া ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে গণচীনে এবং মার্চ মাসে ইরানে সরকারী সফরে যান। ২১.০৪.১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বিশ্ব শান্তি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৬৯৮]

---

696. Sirajul Islam, (Chief Editor), Ibid, V.4; P242
৬৯৭. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক, ০৫ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ.১
৬৯৮. বিস্তারিত- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, খ.১১ , পৃ. ৫৮৪

১৯৮০ সালের ২৬ আগস্ট জেঃ জিয়াউর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে তিনি ৩ সদস্য বিশিষ্ট আল-কুদ্স কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ইরাক-ইরান যুদ্ধ অবসান-কল্পে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কর্তৃক গঠিত ৯ সদস্য শান্তি মিশনে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮১ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি এ ব্যাপারে একাই তেহরান ও বাগদাদ সফর করেন। বিভিন্ন দেশ সফরকালে জেঃ জিয়া যে কূটনৈতিক তৎপতা চালাইয়া যান উহার ফলে কমনওয়েলথ ইসলামী সম্মেলন ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনসহ বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু রাষ্ট্র ও জাতিসংঘ কর্মকর্তাবৃন্দ অচিরেই বাংলাদেশকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করেন। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের (১৯৭২) মাত্র ছয় বছরের মধ্যে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিশ্ব এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের ভূমিকাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি আঞ্চলিক সংস্থার যে ধারণা দান করেন তার বাস্তবতার ভিত্তিতে ১৯৮৫ সালে সার্ক গঠিত হয়। মূলত এই সরকারের উদ্যোগের ফলেই জাপানের মতো প্রতিযোগীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ ১৯৭৯-৮০ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। [৬৯৯]

মুজিব এবং জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতির তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এক থাকলেও তাদের মতাদর্শিক প্রবণতা এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ভিন্নতা ছিল। মুজিব সরকার পররাষ্ট্রনীতিতে যে 'সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ বিরোধীতার' নীতি সংবিধানে সন্নিবেশিত করে, জিয়া সরকার তা ত্যাগ না করলেও নতুন ধারা ২৫(২) যোগ করে ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকে নীতি হিসেবে গণ্য করে মতাদর্শিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটায়। জিয়া সরকার সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সংবিধানের গুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যোগ করেন।[৭০০]

Banglapedia: National Encyclopedia এর V.4-এ জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বলা হয়েছে-

৬৯৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; evsjv‡'‡ki RvZxq Ávb †Kvl, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০১১, খ.৭, পৃ.১৩৪

৭০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

The amendment to the Constitution introduced through Martial Law proclamation by ZIAUR RAHMAN, who came into power after the fall of Awami League and Mostaq government in August 1975 and November 1975 respectively, made an addition to it. A newly appended Sub-article 25(2) stated: 'The State shall Endeavour to consolidate, preserve and strengthen fraternal relations among Muslim countries based on Islamic solidarity.' The policy on declaration of war was mentioned in Article 63 of the Constitution which states that war shall not be declared and the Republic shall not participate in any war except with the assent of the JATIYA SANGSAP (Parliament). Article 145(a) on foreign treaty states: 'All treaties with foreign countries shall be submitted to the President who shall cause them to be laid before Parliament, provided that any such treaty connected with national security shall be laid in a secret session of Parliament.' As regards foreign policy it was declared at the outset that Bangladesh would be the Switzerland of the East, that is to say, it would seek friendly relations with all the states. From these statements it can be assumed that there were endeavors to build up an impartial image of the state so far as foreign relation is concerned.[701]

These pronouncements resulted from an idealistic point *of* view, and it was not possible for the post-Awami League governments to implement them. As Bangladesh could not remain as impartial as Switzerland with regard to different international issues (which is also not possible in reality), nor it could establish diplomatic relations with *the* Arab countries and Israel at the same time. Besides, such a concept of impartiality on the part of a small

[701] Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Banglapedia, Ibid,* V.4; P.239-240

and economically dependent country can be taken as a mere theoretical concept.[702]

As the goal of the foreign policy of the country the government headed by Ziaur Rahman (1977-1981) emphasized the importance of creating an environment of peace and stability as a prerequisite for improving the standard of living of the people through economic and social progress.

702. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Banglapedia ,Ibid,* V.4; P.239-240

সারণি

বাংলাদেশে ভারতীয় সাহায্য ঃ জিয়া আমল[৭০৩]

(১৯৭৬-৭৭ হতে ১৯৮০-৮১) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	প্রতিশ্রুতি(commitment)							ছাড়কৃত (Disbursesment)						
	খাদ্য সাহায্য		পণ্য সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		মোট	খাদ্য সাহায্য		পণ্য সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		মোট
	অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ		অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ	অনুদান	ঋণ	
১৯৭৬-৭৭	-	-	-	-	-	-	০.০০০	-	-	০.২১৭	১.৮৫৩	০.০৮৭	১৮.৮৮৮	২১.০৪৫
১৯৭৭-৭৮	-	-	-	-	-	-	০.০০০	-	-	০.৪৭০	০.২৮১	০.১২৫	৪.২৯৪	৫.১৭০
১৯৭৮-৭৯	-	-	-	-	-	১৫.০০০	১৫.০০০	-	-	-	-	০.১২৫	০.৮৬৮	০.৯৯৩
১৯৭৯-৮০	-	-	-	-	-	-	০.০০০	-	-	-	৩.৭০২	-	০.৮৬০	৪.৫৬২
১৯৮০-৮১	-	-	-	-	-	-	০.০০০	-	-	০.২৩৯	-	০.০৫০	২.৪৮১	২.৭৭০
মোট	-	-	-	-	-	-	১৫.০০০	-	-	-	-	-	-	৩৪.৫৪০

উৎসা. *Flow of External Resources into Bangladesh,* Economic Relations Department, ERD, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka1991, P. 73

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, মুজিব ও জিয়া আমলে ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কে চড়াই-উৎড়াই লক্ষ করা যায়। অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রদান দু'টি ক্ষেত্র যথা বাণিজ্য ও সাহায্য। এই দু'টি ক্ষেত্রে দু'দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত দু'দেশের মধ্যকার বাণিজ্যের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই দশকের বাণিজ্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল বাংলাদেশের প্রতিকূলে। সব চাইতে অধিক বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১৯৭২-৭৩ সালে ১৫০.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর সব চাইতে কম ঘাটতি ছিল ১৯৭৮-৭৯ সালে ২৭.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। স্বাধীনতার পর পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সাহায্য ও বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। যে কারণে ৭২-৭৩ সালে ভারত থেকে রেকর্ড পরিমাণ আমদানি হয়। একই কারণে বাণিজ্য ঘাটতিও বেড়ে যায়। তবে মুজিব আমলে বাণিজ্য ঘাটতি

৭০৩. ড. মোহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৪

সবচেয়ে বেশী হ্রাস পায় ৭৫-৭৬ সালে ৫১.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিয়ার সময়কালেও দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বাংলাদেশের অনুকূলে ছিল না। বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ওঠা নামা করেছে। জিয়া আমলে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি ছিল ৭৯-৮০ সালে ৪৭.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর সবচেয়ে কম বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৭৮-৭৯ সালে ২৭.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিয়া আমলে ইন্দিরা গান্ধী ও মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক যেমন শীতলতা ও উষ্ণতার বিষয় ছিল, অর্থনৈতিক সম্পর্ককেও তা প্রভাবিত করেছে। মুজিব আমলে উষ্ণ রাজনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটা সঙ্গতি লক্ষ করা যায়। তা হলো ক্রমহ্রাসমান বাণিজ্য ঘাটতি। উল্লেখ্য মুজিব আমলের তুলনায় জিয়া আমলে বাণিজ্য ঘাটতি আরও কমে এসেছিল। কিন্তু ধারাবাহিকতা ছিল না। জিয়ার শেষ বছরে ৮০-৮১তে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৪৩.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মুজিবের শেষ বছরের তুলনায় ৭.৪ মিলিয়ন মার্কি ডলার কম।[৭০৪]

৩০মে ১৯৮১, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন- পত্রিকার শিরোনামে

রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত, দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি[৭০৫]

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কতটা সফল রাষ্ট্র নায়ক ও কূটনৈতিক ছিলেন তাঁর প্রমাণ মিলে জিয়ার মৃত্যুর পর বিশ্ব নেতাদের পাঠান শোক বার্তার মাধ্যমে। যা ছিল বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রত্রিকাগুলোর শিরোনাম-

জিয়ার মৃত্যুর প্যালেষ্টাইনীদের ও ইসলামী জাতির জন্য বিপুল ক্ষতি বলে অভিহিত করেন পি এল ও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত।[৭০৬]

জিয়া ছিলেন ইসলামী বিশ্বের মহান নেতা

বাগদাদ, ৪ঠা জুন (বাসস)- ইরাকের রাজধানীতে আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনে যোগদানকারী ৩৮ জন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সকলেই জিয়া মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা ইরাক-ইরান যুদ্ধাবসানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়ার বিরাট অবদান, প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও জেরুজালেমের মুক্তির জন্য তার অক্লান্ত

---

৭০৪. ড. মোহাম্মদ সেলিম, evsj¨‡`k-fviZ m¤úK (1971-1981), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৯; পৃ.২১৫
৭০৫. বিস্তারিতঃ রোববারের সংবাদ, ৩১ মে ১৯৮১
৭০৬. বিস্তারিতঃ সংবাদ, ০২জুন ১৯৮১

প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে তাকে ইসলামী বিশ্বের একজন মহান নেতা হিসেবে অভিহিত করেন। ইরাকী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সাদুন হামাদি ব্যক্তিগত ভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের কাছে তার গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন,[৭০৭]

কুয়েতের ক্যাবিনেট বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আবদুল আজিজ হোসেন বলেছেন: ইসলামী শান্তি মিশনে তার যে বলিষ্ঠ ভূমিকা কুয়েত তা সর্বদাই স্মরন করবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি তাকে রাষ্ট্রনায়ক সুলভ দৃষ্টিভংগি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে অভিহিত করেন।[৭০৮]

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও সংবাদপত্রের মন্তব্যে তাঁহার কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করা হইয়াছে। নীচে এইসব মন্তব্যের কয়েকটি হইতে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান (Ronald Regan) বলেনঃ বাংলাদেশের জনগণের জন্য এক উন্নততর জীবন নির্মাণে জিয়াউর রহামানের ছিল গভীর দরদী অংগীকার এবং আইনের শাসনের প্রতি তিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার (Margaret Thatcher)বলেনঃ তাঁহার দিক নির্দেশনায়, নেতৃত্বে ও বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রগতি সাধন করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।[৭০৯]

⇨ বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের পররাষ্ট্রনীতি

(৩০.০৫.১৯৮১-১৯.১১.১৯৮১) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

(২০.১১.১৯৮১-২৩.০৩.১৯৮২) স্থায়ী রাষ্ট্রপতি

১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে তিন মাসের ভেতর তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। সাত্তার দেশ পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। ১৫ আগষ্টের পর থেকে সেনা শাসনের যে ভূত বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপেছিল, তা আবার আবির্ভূত হয় সাত্তারকে সরিয়ে। সাত্তার জিয়ার নীতিতেই চলছিলেন। তিনি তেমন উল্লেখ করার মত কিছু করতে পারেন নি। তালপট্টি নিয়ে উত্তেজনা এবং চীনা প্রধানমন্ত্রীর সফর এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[৭১০]

---

৭০৭. বিস্তারিতঃ সংবাদ, ০৫ জুন ১৯৮১
৭০৮. বিস্তারিতঃ রোববারের সংবাদ, ৩১ মে ১৯৮১
৭০৯. বিস্তারিত- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৬, খ.১১ , পৃ. ৫৮৭
৭১০. কাজী জাহেদ ইকবাল, পৃ. ৫১

➩ পল্লীবন্ধু হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি (10.12.1983-06.12-1990)

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ[৭১১] বাংলাদেশের তৎকালীন সেনাপ্রধান হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সরিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরশাদ প্রথমদিকে শুধু সামরিক প্রধান ছিলেন। তখন ১১তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি এ এস এম আহসান উদ্দিন চৌধুরী (২৪.০৩.১৯৮২-১০.১২.১৯৮৩)। অবিলম্বে এরশাদ (১০.১২.১৯৮৩) রাষ্ট্রপতি বনে যান।

এরশাদ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ও স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বাংলাপিডিয়ার ৪র্থ খন্ড উল্লেখ আছে-

On the other hand, after the Zia government the policies adopted by BANGLADESH NATIONALIST PARTY (BNP) with regard to foreign policy continued to be pursued by the military government of HUSSEIN MOHAMMAD ERSHAD and the government of JATIYA PARTY established by him (1982-1990). However, as regards relations with the neighboring India, the plan of regional cooperation followed under the South Asian cooperation initiative taken towards the end of the BNP regime, reduced the tension between India and

---

৭১১. সেদিনকার পত্রিকার শিরোনামগুলো ছিল-সংবিধান স্থগিত, সংসদ বাতিল, রাষ্টপতি বহাল নেই, মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়েছে, সামরিক আইন জারি

* দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ শুর হল, দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করাই লক্ষ্য, -এরশাদ

* সমগ্র দেশ ৫টি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত

* যত শিগগির সম্ভব সাধারন নির্বাচন

* রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও ধর্মঘট নিষিদ্ধ রীট আবেদন করা যাবে না।

* লে. জেনারেল এরশাদের জীবনী

* mevi ms‡M eÜZ Kv‡iv cÖwZ we‡Øl bq: প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদ বলেন, আমি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবার সংগে বন্ধুত্ব কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়। এ পররাষ্ট্র নীতিতে আমরা বিশ্বাসী। সার্বভৌম ক্ষমতা অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ব্যপারে হস্তক্ষেপ না করা, সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান, এই নীতিমালা হবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম মূল লক্ষ্য।

গতকাল বুধবার জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষনে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেনঃ বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও শুভাকাংখী সকল রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রতিবেশী দেশগুলোর সংগে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা স্থাপনের জন্য মরহুম জিয়াউর রহমান যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেন, তা বাস্তবায়নে আমরা আমাদের প্রয়াস অব্যাহত রাখবো।

we¯ÍwiZ:- সংবাদ, ২৫ মার্চ ১৯৮২, পৃ.১

Bangladesh, and the situation remained unchanged during the time of the government of Jatiya Party.

Increasing the number of allies within the international community including South Asia is regarded as one of the important goals of the foreign policy of Bangladesh. The concept of regional" stability and security was viewed in different ways by the governments before and after 15 August 1975. Bangladesh and India held the same opinion about the sources of threats to the security or stability of this region. At that time diplomatic moves were made in order to resolve bilateral problems with India for the maintenance of national security. At the same time attempts were made to dispel the fear of India through seeking close relations with other countries of this region as well as with countries outside the region.

Immediately before the emergence of Bangladesh the movement of warships of the big powers, including the superpowers, in the Indian Ocean increased, and as a result the states bordering the Indian Ocean felt threatened with the possibility of nuclear warfare in the waters of this ocean. Against this backdrop a resolution adopted in the United Nations General Assembly on 16 December 1971 urged to declare the Indian Ocean as a 'peace zone'. Bangladesh expressed its wholehearted support to it. However, as regards turning the Indian Ocean into a peace zone, there were distinct differences between the viewpoints of those who ruled Bangladesh before and after August 1975. The government that came to power after August 1975 kept on urging to regard the concept of peace zone in a broader perspective than what was in the orDginal proposal. According to the fresh explanations, in addition to preventing the military presence of the extra-regional powers and dispelling threats, the maintenance of national security of the regional

countries was also urged in order to create a peace zone. At the same time the need for destroying conventional weapons along with nuclear weapons in order to declare the Indian Ocean as a peace zone was also emphasized. Bangladesh was aware of the importance of the later against the backdrop of the increasing military activities, of India and its extensive preparations for war.

Towards the mid 1970s when Pakistan regarded itself as threatened because of the first atomic explosion by India, Bangladesh continued to support the Indian explanations and justification as to using atomic power in the South Asian region for peaceful purposes. But during the period following August 1975 Bangladesh accepted the concept of disarmament as a whole. At that time Bangladesh was of the opinion that considering arms race as the deadliest threat to world peace total disarmament (nuclear and conventional weapons) should be carried out.[712]

এরশাদের পররাষ্ট্রনীতিতে মোটা দাগে জিয়া অনুসৃত নীতির-ই প্রতিফলন বলা যায়। এর কারণগুলো ছিল এক-ই রূপ। এরশাদ ক্ষমতা সংহত করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হন। এরশাদ ব্যতিক্রমী ছিলেন একটা স্থানে। সেটি হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে। তার পূর্বসূরী জিয়ার আমলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু এরশাদ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য ক্ষমতা দখলের পর প্রথম বিদেশ সফরের জন্য তিনি ভারতকে বেছে নেন।[৭১৩]

মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে এরশাদ সরকারের সম্পর্ক জিয়া সরকারের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছিল। বিশেষ কোন জটিলতা এ সময়ের সম্পর্কের ভেতর দেখা যায় নি। তবে তার সময় কালে মুসলিম বিশ্বের দু-তিনটি সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশকে কৌশলী হতে হয়েছিল। এর ভেতর ছিল ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ফিলিস্তিন সমস্যা, আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্ব প্রভৃতি।

---

712. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Banglapedia, National Encyclopedia*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003,V.4; P.240-241

৭১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৮

ইরাক-ইরান যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষপাতিত্ব ছিল ইরাকের দিকে। মাওলানা আব্দুল মান্নানের মাধ্যমে ইরাকের সঙ্গে এরশাদ সরকারের যোগাযোগ জোরদার হয়েছিল।

ফিলিস্তিন প্রশ্নে বাংলাদেশ বরাবরের মতই সোচ্চার ছিল আরবদের পক্ষে। এ নীতিটি বাংলাদেশ শেখ মুজিবুরের সময়কাল থেকেই অনুসরণ করে আসছিল।

আফগানিস্তান নীতিটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অবস্থান ছিল সোভিয়েত বিরোধী। আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্ব ঘটার পর স্বভাবতই বাংলাদেশ জোরালো প্রতিবাদ জানায়। শুধু প্রতিবাদ-ই জানায়নি; বিভিন্ন ফোরামে এর বিরুদ্ধে সোচ্চারও ছিল। বহু বাংলাদেশী গোপনে আফগান মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ৩৯ এবং ৪০তম অধিবেশনে আফগান প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতার সময়।

এরশাদ সরকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে John L Esposito বলেন-

The subsequent government of H.M. Ershad (1982-1991) Continued in this vein; the president and members of his cabinet Publicly associated themselves with a famous and politically active pir. In 1988 the National Assembly passed a constitutional amendment declaring Islam the æState relDgion" of the country.[714]

বাংলাপিডিয়ার সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম তার গ্রন্থের ৭ম খন্ডে বলেন-

পরবর্তীকালে জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণা করেন। জনগণের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্য ছাড়াও এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রসমূহের আস্থা অর্জন। বিএনপি শাসনের শেষদিকে গৃহীত দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা উদ্যোগের আওতায় অনুসৃত আঞ্চলিক সহযোগিতার নীতি দ্বারা প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে পূর্বের উত্তেজনা হ্রাস এবং তা জাতীয় পার্টির সরকারের সময় অক্ষুন্ন থাকে। এরশাদ সরকারের

---

714. John L. Esposito (Editor in Chief) ,*The oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world.* V.1, Oxford University Press, 1995, New York, P.190

পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম একটি ক্ষেত্র হচ্ছে আশির দশকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সদস্য প্রেরণ।[৭১৫]

বাংলাপিডিয়ার ৭ম খন্ডে উল্লেখ আছে-

Next, the Ershad government declared Islam to be the "State RelDgion' through the Eighth Amendment. Apart 'from the objective of enhancing the acceptability of the government to the majority of people, the intention of attracting predominantly the Muslim countries especially the Arab states, and the attraction for petrodollar, had also been active behind these steps.[716]

সৌদি আরবের সঙ্গে এরশাদ সরকার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট করার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। আরো বেশি সাহায্য লাভ, জনশক্তি রপ্তানি এবং সৌদি আরবের রাজ পরিবারের নিরাপত্তার জন্য যে পাকিস্তানী সৈন্য নিয়োগ দেয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলাদেশী সৈন্য প্রবেশ করানো। অন্য সব উদ্দেশ্য সফল হলে ও পাকিস্তানীদের সঙ্গে বাংলাদেশী সেনা নিয়োগের বিষয়টি বেশি দূর এগোতে পারেনি।

এরশাদের শাসনকালে অন্তত তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে। প্রথমত, ঢাকায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক:১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ১৪তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদ সরকার এবং বাংলাদেশের এটা ছিল বড় ধরনের সাফল্য। সম্মেলনে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্বের আরো নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করে। তাদের সে প্রয়াস সফল ছিল। সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেমন উজ্জ্বল হয়, তেমনি নিজের অবস্থান মুসলিম বিশ্বের নিকট তার পক্ষে স্পষ্ট করা সহজ হয়।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নেতৃত্বে সার্ক গঠিত হওয়া:১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার ৭ জাতি বৈঠকের মাধ্যমে সার্ক আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। এ যাত্রা শুরুর আগে এর উদ্ভাবক এবং পরিকল্পনাকারী ছিলেন জিয়াউর রহমান। তার আমলেই প্রাথমিক সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়ে

৭১৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; evsjv‡`‡ki RvZxq Ávb †Kvl, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০১১, খ.৭, পৃ. ১৩৫

716. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Banglapedia, National Encyclopedia*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003,V.4; P.242

গিয়েছিল। প্রাথমিক সকল প্রস্তুতির পর ১৯৮৩ সালের ১-২ আগষ্ট দিল্লিতে বসে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন। উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।[৭১৭]

সাত জাতি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার ঘোষনাপত্র স্বাক্ষর

nweei ingvb wgjb: বাংলাদেশের ও দক্ষিণ এশিয়ার অপর ৬টি দেশ গতকাল (২.০৮.১৯৮৩) নয়াদিল্লীতে এক ঘোষনাপত্র স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতায় ঐতিহাসিক কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক সূচনা করিয়াছে। আর ইহার মধ্য দিয়া তিন বৎসরাধিকাল আগে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক ফোরাম গড়িয়া তোলার যে প্রস্তাব দেয়, তাহা সার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রথম বারের মতো বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।[৭১৮]

ÔKU%bwZK wi‡cvUvi: পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ আর এস দোহ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক ফোরামের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরকে নাটকীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া বর্ননা করিয়াছেন। নয়াদিল্লী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া গতকাল (০৩.০৮.১৯৮৩) জিয়া আন্তজাতিক বিমান বন্দরে জনাব দোহা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন।[৭১৯]

আরো আলোচনা এবং একটি গঠনতন্ত্র পাকাপাকি করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় সার্ক তার যাত্রা শুরু করে। সার্ক আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হিসেবে বহুমুখী কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। সার্কের যাত্রা শুরু বাংলাদেশের জন্য বিশেষ কূটনৈতিক সফলতা।

আজ প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শুরু

দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, সংঘাতে অস্থির শতকোটি মানুষের দক্ষিণ এশিয়ার সম্প্রীতি ও সহযোগিতার নূতন প্রেক্ষাপট রচনার লক্ষ্যে এ অঞ্চলের ৭টি দেশের রাষ্ট্রও সরকার প্রধানগণ আজ ৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হইতেছেন। দুই দিনের সম্মেলনের মধ্য দিয়াই দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হইবে।

---

৭১৭. কাজী জাহেদ ইকবাল, ewsjv‡`‡ki ciivóbxwZ (1971-2001), c. 42
৭১৮. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক, ০৩ আগষ্ট ১৯৮৩, পৃ. ১
৭১৯. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক, ০৪ আগষ্ট ১৯৮৩,

শেরে বাংলানগরের সুরম্য জাতীয় সংসদ ভবনে প্লেনারী হলে সম্মেলন উদ্বোধন করিবেন স্বাগতিক দেশের প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ। সকাল সাড়ে ১০ টায় সম্মেলন উদ্ধোধনের পর ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম, নেপালের রাজা বীর বিক্রম শাহ দেব, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক এবং শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধন ভাষণ দিবেন। সম্মেলন কক্ষ হইতে এ উদ্বোধনী অধিবেশন সরাসরি বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করা হইবে।[৭২০]

ভারত ও পাকিস্তানের পারমানবিক বোমা বিতর্ক যখন তুঙ্গে, যুদ্ধ বাধার উপক্রম, তখন এরশাদ উভয় দেশের সরকার প্রধানদের সাথে আলোচনা করে সংকটের সমাধান করেন। পত্রিকার শিরোনামে যা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে-

ভারত-পাকিস্তান পারমানবিক বোমা বিতর্কে এরশাদের মধ্যস্থতা[৭২১]
শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্কের যাত্রা শুরু ও ঢাকা ঘোষনা[৭২২]
ভারতীয়রা পত্রিকার দৃষ্টিতে সার্ক:
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলিয়াছে যে, সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার একশত কোটি মানুষের জীবনে নয়া অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। ৬ বছর আগে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের চিন্তাধারার বাস্তবায়ন এই সার্ক। [৭২৩]

এরশাদ জিয়া সরকারের সময় পরিকল্পিত সার্ক গঠনে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে এর সপক্ষে ভূমিকার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন।

সার্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলাপিডিয়ার সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম তার গ্রন্থের ৭ম খন্ডে উল্লেখ করেন-
In 1980, a concept of South Asian regional cooperation was put forward to six other states of this region on behalf of Bangladesh, and the SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION (SAARC) came into being in 1985. Bangladesh considered that an economic, social and cultural cooperation

---

৭২০. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক, ০৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫,
৭২১. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক, ০৮ মার্চ ১৯৮৫, পৃ.১
৭২২. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক, ০৯মার্চ ১৯৮৫, পৃ.১
৭২৩. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক, ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ.১

among the countries of this region could dispel their mutual distrust. At the time Bangladesh put forward this concept of cooperation, there were some conditions to meet in order to create an environment in favour of it in South Asia. Bangladesh aimed at directing this framework of cooperation towards a few well-defined goals through producing economic benefit. These goals included gaining of combined bargaining opportunities for the countries in South Asia, and on the other hand creating an advantageous position for the small countries of this region with regard to India. Although these goals are yet to be materialized, the establishment of SAARC can be regarded as one of the major political goals of the foreign policy of Bangladesh.[724]

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের প্রতিনিধির জাতিসংঘের সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়া:এরশাদের সময় অন্য একটি বড় অর্জন ছিল, তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতিসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া। সফলতাটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য হলেও প্রকৃতপক্ষে এর নেপথ্যে ছিল অন্য ঘটনা। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের প্রার্থী, রাষ্ট্রদূত কে. এম কায়সার ইরাকের প্রার্থীর সঙ্গে সমান ভোট পেয়ে লটারিতে হারেন। তখন এশীয় দেশগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পরে যখন সভাপতি পদে আবার এশীয় প্রতিনিধিত্বের সময় আসবে, তখন বাংলাদেশকে সুযোগ দেয়া হবে। সুতরাং ১৯৮৬-৮৭ সালে এশীয় কোটা থেকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সভাপতি পদে বিজয়ী হতে বেগ পেতে হয়নি।[৭২৫]

724. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); V.4; P.241

৭২৫. মোঃ আবদুল হালিম, AvšÍRwZK m¤úú‡Ki gjbwZ (*Principles of International Relations*), ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩, পৃ. ৩৯৭

⇨ বেগম খালেদা জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি

৯ম প্রধানমন্ত্রী (২০.০৩.১৯৯১-১৪.০২.১৯৯৬)

১০ম প্রধানমন্ত্রী (১৭.০২.১৯৯৬-২০.০৩.১৯৯৬)

১২তম প্রধানমন্ত্রী (১০.১০.২০০১-২১.১০.২০০৬) পর্যন্ত

১৯৯১ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারির[৭২৬] নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতাসীন হয়। এই সরকার তার পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে জিয়া সরকারের গৃহীত নীতিই অনুসরণ করেন। এই সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে চীন এবং পশ্চিমের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক তৈরি এবং স্নায়ু-যুদ্ধ পরবর্তী ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্বকে উপলব্ধি করার প্রবণতা দেখা যায়। উদারীকরণ, বিশ্বায়ন এবং বেসরকারীকরণের যুগে বাংলাদেশও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উদারীকরণের পথে এগিয়ে চলে।[৭২৭]

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশে চালু হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। এক দীর্ঘ সময় পর বাংলাদেশ সত্যিকারের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। খালেদা জিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করে তার সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তিনটি মূলনীতির কথা বলেন।

প্রথমত, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মুসলিম উম্মার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং

তৃতীয়ত, দেশের প্রয়োজনে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়নি। বলা যায়, অনেকটা গতানুগতিক ধারায় পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকেছে। ভারত এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অনেকটা শীতল।

---

৭২৬. mvi¦‡`‡k AfZce kvwšÍcY© cwi‡e‡k wbevPb AbywôZ
গতকাল (বুধবার) অন্তবর্তীকালীন নির্দলীয় সরকারের অধীনে সারাদেশে এক অভূতপূর্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। দেশের ২৯৮টি নির্বাচনী এলাকায় ২৩ হাজার ৯৬২টি ভোট কেন্দ্রে সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহন করা হয়।
বিস্তারিত: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

৭২৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; evsjv‡`‡ki RvZxq Ávb †Kvl, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০১১, খ.৭, পৃ.১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

চীনের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন, সার্ককে কার্যকরকরণ, সৌদি আরবের সাথে সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, ভারতের সাথে সমঝোতা প্রভৃতি। এতে তিনি ভারত সফর করলেও এরশাদের ন্যায় ব্যর্থতার পরিচয় দেন, গঙ্গার পানি বণ্টন ও উপজাতি শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে। উপরন্ত এ সময় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অনেক অবনতি ঘটেছিল। ভারত বাংলাদেশকে পানি প্রদান করে নি উপরন্ত গ্যাস ও ট্রানজিট সুবিধা আদায়ের দাবি করে বসে।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বরাবর-ই ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য, মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা। এ উদ্দেশ্যের নেপথ্যে মুখ্যত অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান। মুসলিম দেশগুলোর গুরুত্ব বোঝা যায় খালেদা জিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম বিদেশ সফরের জন্য সৌদি আরবকে বেছে নেয়ার ভেতর। ১৯৯১ সালের ২৫ মে তিনি সৌদি আরব যান। এ সফরের সময় তিনি কুয়েতও যান।

মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিএনপি আমলে বিশেষ কোন উত্থানপতনের শিকার হয়নি। বাংলাদেশ তার চিরাচরিত নীতি অনুসারে বিভিন্ন ইস্যুতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে সমর্থন জানিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের সৈন্যদের অবস্থান বহাল ছিল বিএনপি আমলে জুড়ে। হজ্জযাত্রী নিয়ে সৌদি সরকারের সঙ্গে সামান্য মতবিরোধ ছাড়া বিশেষ কোন সমস্যা ৫ বছরে দেখা যায় নি। ফিলিস্তিন সমস্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার অকুণ্ঠ সমর্থন ফিলিস্তিনীদের প্রতি বহাল রেখেছিল।

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিস্তিন-ইসরাঈল চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশ তাকে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানায়।[৭২৮]

মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ এ সময় ভাল ভাবে সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হয়। বিএনপি সরকারের শাসনামলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ বাংলাদেশী বিভিন্ন মুসলিম বিশ্বে কর্মরত ছিল। তাদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। বিএনপি সরকার শেষ পর্যন্ত আরো শ্রম রপ্তানির জন্য মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তাতে ফলও পাওয়া গেছে।

নিকট প্রতিবেশীদের ভেতর বিএনপি আমলে মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক হঠাৎ করেই অবনতি ঘটেছিল রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এমন কি যুদ্ধাবস্থারও উদ্ভব হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তেমনটি আর

৭২৮. কাজী জাহেদ ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯-৬১

Dhaka University Institutional Repository

ঘটেনি। দু'দেশের ভেতর আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হয়। জিয়াউর রহমানের সময়ের ঘটনাটিও অনেকটা এমন ছিল।[৭২৯]

খালেদা জিয়ার কূটনৈতিক সাফল্যের উল্লেখযোগ্য দিক- যা ছিল ঐ সময় পত্রিকাগুলোর শিরোনাম

কক্সবাজার সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম উদ্বোধন

"কক্সবাজার থেকে শামসুল হক শাকের: শহরতলীর ঝিলংজাস্থ ল্যান্ডিং স্টেশন মাঠে .... বেগম জিয়া বলেন, এই সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমে যোগদানের ফলে ভয়েস এবং ডাটা ট্রান্সফার অনেক দ্রুততর হবে। আন্তর্জাতিক সার্কিট বৃদ্ধি পাবে ফলে সরকারের আয় বাড়বে। ই-গভর্ন্যান্স, ই-কমার্স, টেলিমেডিসিন চালু হলে বাংলাদেশে ডাক্তারগণ রোগ নির্ণয় ও অপারেশনে বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তারদের শরনাপন্ন হতে পারবে। সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ১৪টি দেশের ১৬টি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ কোম্পানির সাথে এক হয়ে গেল।"[৭৩০]

২০০১ সালে খালেদা জিয়া সরকার দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় আসে। এই মেয়াদে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে 'পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি' গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়াও চীন, মায়ানমার, থাইল্যান্ডের সম্পর্ক তৈরি করার প্রবণতা দেখা যায়। এই সরকার মুসলিম বিশ্বের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়।[৭৩১]

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাপিডিয়ার ৪র্থ খন্ডে খালেদা জিয়ার শাসন আমল সম্পর্কে উল্লেখ করেন-

BNP government, according to its own judgment, considered the United States, China and the Muslim world to be important with regard to foreign policy. Its foreign policy makers endeavored to develop dynamic relations with the industrialized countries considering the possibility of getting increasing economic assistance, and with the predominantly Muslim countries in order to bring about better balance in foreign relations. Despite China's opposition to War of Liberation, the Zia government, was

---

৭২৯. মোঃ আবদুল হালিম, AvšÍRwZK m¤ú‡Ki gjbxwZ (*Principles of International Relations*), cv¸ 3,
c.398-399

৭৩০. বিস্তারিত: দৈনিক ইনকিলাব, ২২ মে ২০০৬, পৃ.১

৭৩১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; evsjv‡`‡ki RvZxq Ávb †Kvl, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৩৪

interested in winning friendship of the country on account of its cold relations with India. Although Pakistan recognized Bangladesh during the term of the previous government, diplomatic relations between the two countries were opened during the rule of the Zia government.[732]

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত ১০ মে ২০১৭ ভিশন ২০৩০ ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে পররাষ্ট্রনীতি হলো 'বিএনপি অন্য কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং অন্য কোন রাষ্ট্রের জন্য নিরাপত্তার সমস্যা সৃষ্টি করবে না। একইভাবে অন্যকোন রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় হুমকি সৃষ্টি করলে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে'।[৭৩৩]

732. Sirajul Islam, (Chief Editor), Shajahan Miah, (Managing Editor); *Ibid,* V.4; P.242
৭৩৩. দৈনিক প্রথমআলো, ১১ মে, ২০১৭, পৃ.৪

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্রনীতি: একটি সাফল্যময় অধ্যায়

১১তম প্রধানমন্ত্রী (২৩.০৬.১৯৯৬-১৫.০৭.২০০১)

১৩ তম প্রধানমন্ত্রী (০৬.০১.২০০৯-২৪.০১.২০১৪)

১৪তম প্রধানমন্ত্রী (২৫.০১.২০১৪-বর্তমান)

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামীলীগ দীর্ঘ একুশ বৎসর ক্ষমতার বাইরে ছিল। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং এককেন্দ্রিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা জরুরী। উদীয়মান পরাশক্তি চীন বাংলাদেশের অন্যতম সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী, তাকে ইচ্ছা করলেই পাশ কাটানো সম্ভব নয়। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ১৯৭৫ সালের পর থেকেই সম্পর্ক শীতল। শেখ হাসিনা সরকার এ বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়। এ উদ্যোগ-ই ছিল পররাষ্ট্রনীতির একটি মৌলিক পরিবর্তন। রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার নিকট থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় একটি বড় পরিবর্তন।

মধ্যপ্রাচ্যের তথা মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকার তার পূর্বসূরীদের মতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। দু'পক্ষের সম্পর্ক ছিল স্থিতিশীল। শুধু পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ কিছুটা জটিলতায় পড়ে পাকিস্তানে সেনাশাসন জারির পর। এছাড়া দু'দেশের সম্পদ ভাগ এবং আটকে পড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যাবাসন নিয়ে জটিলতার সুযোগ তো ছিলই। জাতিসংঘে শেখ হাসিনা তার ভাষণে সেনাশাসনের কঠোর সমালোচনা করলে ঐ জটিলতার সূত্রপাত হয়। সেনাশাসক পারভেজ মোশাররফ বিষয়টিকে সহজভাবে নিতে পারেন নি। যদিও বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের অবস্থান নৈতিকভাবে সমর্থিত হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত তেমন মারাত্মক কোন কূটনৈতিক সমস্যা দুই দেশের ভেতর তৈরি হয়নি।[৭৩৪]

১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি ঘটে। ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে শেখ হাসিনা ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বন্টনের[৭৩৫] জন্য এবং বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা

---

৭৩৪. কাজী জাহেদ ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭২

৭৩৫. M½vi cwib e›Ub Pw³i GK eQi:

কূটনৈতিক রিপোর্টার: বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তির এক বছর পূর্ণ হইল, গত বছর নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে নিজ নিজ দেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। ত্রিশ বছর মেয়াদী এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ফারাক্কা হইতে পাইবে প্রতি সেকেন্ডে ৩৫ হাজার কিউসেক

আদায়ের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেন।[৭৩৬] নতুনভাবে ঐ দিন এক ঐতিহাসিক পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি দেব গৌড় এবং শেখ হাসিনার মধ্যে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৭৩৭]

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ১৬ মে যে স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তার বাস্তবায়ন করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কূটনৈতিক সাফল্যের পরিচয় দেন। পত্রিকার শিরোনাম হলো-[৭৩৮]

ভারতের সীমান্ত বিল পাস সরকারের কূটনৈতিক সাফল্য ----- শেখ হাসিনা

বাংলাদেশি ছিটমহলগুলোতে জনসংখ্যা রয়েছে প্রায় ১৪ হাজার। আর ভারতীয় ছিটমহলগুলোর জনসংখ্যা প্রায় ৩৭ হাজার। শেখ হাসিনা বলেন, 'ল্যান্ড বাউন্ডারি, সমুদ্রসীমা আর দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য কোন সরকার কোন উদ্যোগ নেয়নি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ফেনীতে সাড়ে ছয় কিলোমিটার সীমান্ত চিহ্নিত করনের বিষয় চুক্তি স্বাক্ষরের কথা স্বরণ করেন তিনি। ২০09 এ ক্ষমতায় আসার পর সেটা সমাধান হয়ে গেল। আমাদের ওই জায়গাটা আমরা পেয়ে গেলাম।

"ছিটমহল বিনিময়: 'খুশি ১৬২টি ছিটমহলের মানুষ'

রাজ্যসভায় স্থলসীমান্ত বিল পাস বাংলাদেশের অভিনন্দন[৭৩৯]

কূটনৈতিক সংবাদদাতাঃ ভারতের রাজ্যসভায় মুজিব-ইন্দিরা স্থলসীমান্ত চুক্তি অনুমোদনে ১১৯ সংবিধান সংশোধনী বিল সর্বসম্মত ভাবে পাস হয়েছে। দু'দেশের মধ্যে কতিপয় ছিটমহল বিনিময়ের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্থলসীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে। গতকাল ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বিলটি পাশের জন্য রাজ্যসভায় উত্থাপন করেন ১৮১ জন সদস্য পক্ষে ভোট দেন। বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি।"

পানি। গত শুষ্ক মওসুমে উজানে পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়া চুক্তিটি পুরো বাস্তবায়ন হয় নাই। গত শুষ্ক মওসুমে পানি চুক্তি বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল দিল্লীর রাজনৈতিক সংকট। এই সংকটের ফলে প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া সরকারের পতন ঘটে। ফলে ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর বাতিল হইয়া যায়।

৭৩৬. ড. মোহাম্মদ সেলিম, evsjv‡`k-fviZ m¤úK (1971-1981), প্রাগুক্ত, পৃ.117

৭৩৭. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন,, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৭

৭৩৮. বিস্তারিত:- দৈনিক ইনকিলাব, ০৮ মে ২০১৫, পৃ.১

৭৩৯. বিস্তারিত:- দৈনিক ইনকিলাব, ০৭ মে ২০১৫, পৃ.১

এই লোকসভায় সীমান্ত বিল পাস ছিটমহলগুলোতে আনন্দের ঢেউ[৭৪০]

১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ত্রিশ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি শেখ হাসিনার আরেকটি কূটনৈতিক সাফল্য।

কূটনৈতিক সাফল্য সহ অন্যান্য কর্মসূচীর জন্য শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতাদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়ান।

বিশ্ব নেতাদের মুখে শেখ হাসিনার প্রশংসাঃ

তেহরানে প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ততা,[৭৪১]

শেখ হাসিনার শাসন আমলের উল্লেখ যোগ্য দিক ভারত-বাংলাদেশের ট্রেন চলাচল পত্রিকার শিরোনামে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে-

আজ বেনাপোল দিয়া ভারত-বাংলাদেশ ট্রেন চলাচল শুরু হইতেছে[৭৪২]

ফারাজী আজমল হোসেন/আইয়ুব হোসেনঃ এ উপলক্ষ্যে নো-ম্যান্সল্যান্ডের ওপারে হরিদাশপুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন এবং ভারতের পক্ষে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী উপস্থিত থাকিবেন। ১৯৮৪ সালে কলিকাতা-যশোর রেলপথে ট্রেন

---

৭৪০. বি এন পি ও লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থলসীমান্ত বিল পাসে ভারত সরকারের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন।
বিল পাসের খবর জানিয়ে হাসিনাকে মোদির ফোন, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এ কে এম শামীম চৌধুরী সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান।
evsjv‡'‡ki Af¨šÍ‡i 111wU wQUgn‡j mvR mvR ie, AvR ga¨iv‡Z Do‡e evsjv‡'‡ki cZvKv
শফিকুল ইসলাম বেবু, কুড়িগ্রাম থেকে- বহুল প্রত্যাশিত ছিটমহলের মানুষেরা দীর্ঘ ৬৮ বছরের অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পাচ্ছে আজ শুক্রবার মধ্যরাতে। নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার আনন্দ ঘরে ঘরে। এ নিয়ে চলছে ছিটমহলগুলোতে সাজ সাজ রব। তারপর ও অজানা আশংকায় দেখা দিয়েছে বিষাদ। আজ (৩১ জুলাই ২০১৫) মধ্যরাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১১১ টি ছিটমহল বাংলাদেশে এবং ৫১ টি ছিটমহল ভারতের সাথে একীভূত হবে। বিস্তারিত:- দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ জুলাই ২০১৫, শেষের পাতা

৭৪১. KU‰bwZK cwZ‡e'K: evmm :জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান এবং ও আই সির মহাসচিব লারাকি বাংলাদেশে নারী অধীকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা, ভারতের সাথে পানি চুক্তি, সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।
বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ১৫
নমপেন হইতে শাহজান সরদারঃ
শান্তি অর্জন করিতে হইলে গণতন্ত্রকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে হইবে। নমপেনে (কম্বোডিয়া) এ এ পিপি (এ সোসিয়েশন অব এশিয়ান পার্লামেন্ট ফর পিস) সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জানুয়ারী ২০০১

৭৪২. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৬

চলাচল প্রথম শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ১৩২ কি.মি দীর্ঘ এই রেলপথে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। দীর্ঘ ২৬ বছর পর পুনরায় এই রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু।

ভারত বাংলাদেশ পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু[৭৪৩]

গতকাল (২১.০১.২০০১) অনুষ্ঠানে বক্তব্য কালে মমতা ব্যানার্জী ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর লিখিত বাণী পাঠ করিয়া শুনান। তিনি বলেন বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষের মধ্যে নাড়ীর সম্পর্ক রহিয়াছে। আমরা একই ডিমের দুইটি কুসুম। পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথার মাধ্যমে দুই দেশের মানুষের দীর্ঘকালের সর্ম্পক বাধিয়া রাখা যাইবেনা। প্রতিবেশী হিসেবে নয় বাংলাদেশকে আমি নিজের দেশ বলিয়া মনে করি।

গ. পরীক্ষামূলকভাবে চলল খুলনা-কলকাতা রুটে ট্রেন

৫২ বছর পর আবার হুইসেলের শব্দ

উত্তম মণ্ডল, খুলনা- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ের জন্য কনে খুঁজতে তার পরিবার কলকাতা থেকে যশোর হয়ে খুলনা এসেছিল নৌপথে। অন্য কোনো পথ ছিল না। সেটা ১৮৮৩ সালের কথা।

এর পরের বছর স্থাপিত হয়ে খুলনা- কলকাতা রেলপথ। এরপর প্রায় আট দশক এপথে টানা ট্রেন চলেছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর এ পথে ট্রেনের হুইসেল থেমে যায়। অবশেষে ৫২ বছর পর ০৮.০৪.২০১৭ বুধবার আবারও সচল হলো পরিত্যক্ত এই রেলপথ।[৭৪৪]

এরশাদ সরকার ক্ষমতায়, সামরিক শাসক। তিনি সার্কের নতুন রূপ দিতে যাচ্ছেন। সার্ক উপলক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরা বাংলাদেশে। সামরিক শাসককে উৎখাত করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনের জন্য তিনি উদাত্ত ভাষায় আহ্বান যানান।

আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখিতে হইবে -শেখ হাসিনা

ইত্তেফাক রিপোর্ট: বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন, আমরা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা চাই। কিন্তু সামরিক শাসন এই অঞ্চলের সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তারে প্রধান বাধা

৭৪৩. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ জানুয়ারি ২০০১, পৃ.১
৭৪৪. দৈনিক প্রথম আলো ০৯এপ্রিল, ২০১৭

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আসন্ন সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে সমুন্নত করা না হইলে এ অঞ্চলের শান্তি ও প্রগতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার উন্নয়ন আশা করা যায় না।[৭৪৫]

মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র বিজয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উল্লেখ যোগ্য কূটনৈতিক সফলতা।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রবিজয়

বাংলাদেশ পক্ষে সমুদ্রসীমার রায় ৩৮ বছরের বিরোধের অবসান

কূটনৈতিক রিপোর্টার: বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমারের বিপক্ষে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক এলাকার আইনগত অধিকার লাভ করেছে। এছাড়া মহীসোপানের ৪৬০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত দাবির সপক্ষেও একটি সুযোগ তৈরি হল। বুধবার হামবুর্গে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় ঘোষনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমায় নিজেদের সেই নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করে। জনসমক্ষে ১৫১ পৃষ্ঠার এই রায় ঘোষণা করেন বিচারক জোস লুই জিসাস, এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ও সমুদ্র সীমাবিষয়ক বিভাগের প্রধান কমোডর (অব.) খুরশিদ আলমসহ উভয় পক্ষের আইনজীবী, দেশী বিদেশী কূটনীতিক, সাংবাদিক সহ সংশ্লিষ্টরা। মিয়ানমারের দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের ১৩০ নটিক্যাল মাইলের বেশি যাওয়ার সুযোগ ছিলনা। সেখানে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় অনুযায়ী এখন ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ভেতরে যাওয়ার আইনগত অধিকার পেল বাংলাদেশ।[৭৪৬]

সমুদ্রসীমা: বাংলাদেশের জয়

শুধু তেল গ্যাস নয় অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ আহরণেও আইনগত কোন বাঁধা থাকল না বাংলাদেশের সামনে। মিয়ানমার এ সমুদ্র অঞ্চলকে নিজেদের বলে দাবী করায় বাংলাদেশ এত দিন এর সম্পদ আহরণে ব্যর্থ হয়েছে।[৭৪৭]

‘এ রায় বাংলাদেশের জন্য একটি বড় বিজয়’- তারেক সামসুর রহমান তার কলামে উল্লেখ করেন - ধারণা করা হয়, গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের এলাকায় ১৮ বিলিয়ন ব্যারেল তেল ও ২০০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট

৭৪৫. বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক, ০৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫,
৭৪৬. বিস্তারিত:- দৈনিক যুগান্তর, ১৫ মার্চ ২০১২, পৃ.১
৭৪৭. বিস্তারিত:- দৈনিক যুগান্তর, ১৬ মার্চ ২০১২, সম্পাদকীয় পাতা, পৃ. ৪

প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ রয়েছে। বাংলাদেশ যে বড় ধরনের জ্বালানী সংকটের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এ রিজার্ভ আমাদের জন্য একটা সমাধান বয়ে আনতে পারবে।[৭৪৮]

এই মানচিত্রটি নেওয়া হয়েছে[৭৪৯]

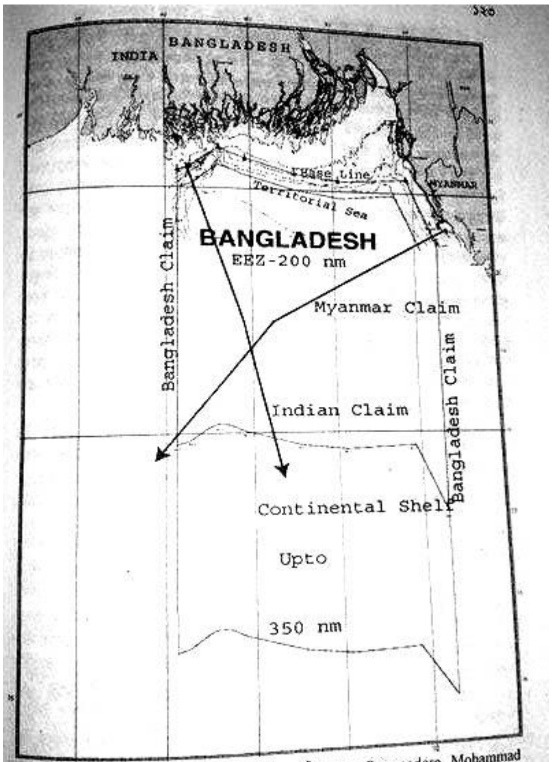

ভারত ও মায়ানমারের পরস্পর বিরোধী সমুদ্রসীমা দাবী। সূত্র : Commodore Mohammad Khurshed Alam, Bangladesh's Maritime challenges in the 21th Century, Dhaka. 2004. P.258

---

৭৪৮. বিস্তারিতঃ- দৈনিক যুগান্তর, ১৬ মার্চ ২০১২, সম্পাদকীয় পাতা, পৃ. ৪

৭৪৯. ড. মোহাম্মদ সেলিম, evsjv‡'k-fviZ m¤úK (1971-1981), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৯, পৃ.১২৩

বাংলাদেশ ভারত সমুদ্র সীমা নির্ধারণের রায় আজ[৭৫০]-

ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমার রায় বাংলাদেশ পেল সাড়ে ১৯ হাজার বর্গকিলোমিটার-এ বিজয় বন্ধুত্বের বিজয়-দু'দেশের সাধারন মানুষের বিজয়[৭৫১]

সমুদ্রসীমা জয়ে আরেকটি সাফল্য[৭৫২]

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে এবং পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করে। এই সরকার অর্থনৈতিক কূটনীতির সূচনা করে। আওয়ামী শাসনামলে ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিশেষ করে ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে আঞ্চলিক চুক্তির উপর জোর দেয়া হয় এবং আঞ্চলিক বিভিন্ন ফোরামে (বিমসটেক,ডি-এইট) কার্যকরভাবে বাংলাদেশে অংশগ্রহণ করে। এ সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম সফলতা হচ্ছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে দ্বিতীয়বারের মতো সদস্যপদ লাভ।[৭৫৩]

---

৭৫০. বিস্তারিত:- সংবাদ, ০৭ জুলাই ২০১৪, পৃ. ১৫

৭৫১. ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিরোধের মামলায় বড় মাপের বিজয় অর্জন করেছে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক শালিসি আদালত (পিসিএ) এক ঐতিহাসিক রায়ে বাংলাদেশ সংলগ্ন সমুদ্রে নতুন ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এছাড়াও রায়ে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রানিজ ও প্রানিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ ও সার্বভৌম অধিকার অর্জিত হয়েছে।
বিস্তারিত:- সংবাদ, ০৯ জুলাই ২০১৪, পৃ.১

৭৫২. মায়ানমারের পর ভারতের সঙ্গেও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হলো। বঙ্গোপসাগরে এই দুটো দেশের বিরোধপূর্ণ এলাকা ছিল ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটার নেদারল্যান্ডসের স্থায়ী শালিসি আদালতের রায়ে বাংলাদেশ পেল ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার। বাকি ৬ হাজার ১৩৫ বর্গকিলোমিটার পেয়েছে ভারত। দীর্ঘ ৪ বছর ৯ মাস আইনি প্রক্রিয়া শেষে গত মঙ্গলবার এই রায় প্রকাশিত হয়। আশির দশকে বঙ্গোপসাগরে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের মালিকানা ঘিরে দুই দেশের মধ্যে সমুদ্র বিরোধের শুরু। এই রায় প্রকাশের মধ্যদিয়ে তার অবসান হলো। শুধু তাই নয়, ঘোষিত রায়ে বিরোধপূর্ণ দক্ষিণ তালপট্টি বাংলাদেশে না পেলেও বঙ্গোপসাগরে ১লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিরোধ নিষ্পত্তির আগে বাংলাদেশ অংশের ১০টি তেল গ্যাস ব্লক নিজেদের বলে দাবি করে ভারত। রায়ে ১০ টি ব্লকই বাংলাদেশ পেয়েছে। বিস্তারিত:- সংবাদ, ১০ জুলাই ২০১৪, সম্পাদকীয় কলাম, পৃ. ৬

৭৫৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; evsjv‡`‡ki RvZxq Ávb †Kvl, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০১১, খ.৭, পৃ.৩৩৪

এই মানচিত্রটি নেওয়া হয়েছে[৭৫৪]

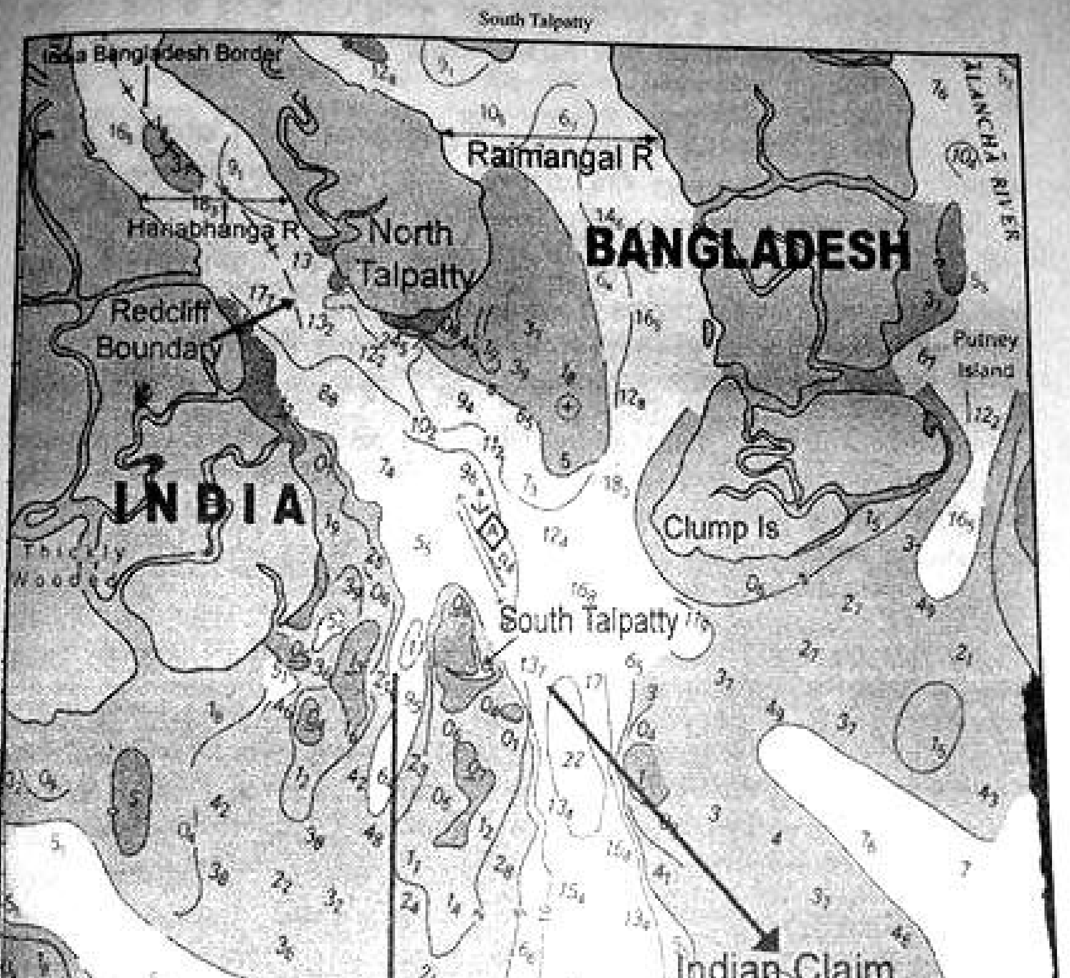

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের মালিকানা নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিপরীতমুখি দাবী। সূত্র : Commodore Mohammad Khurshed Alam, Bangladesh's Maritime challenges in the 21^{th} Century, Dhaka. 2004. P.265

৭৫৪. ড. মোহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৭

২০০৯ সালে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়নের কথা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের নিরাপত্তা ধারণা বিবেচনায় রেখে প্রায় তিন দশক পর ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা ঘোষণা করা হয়। সম্প্রতি সরকার রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাশিয়ার সাহায্যে দেশে পারমাণবিক প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।[৭৫৫]

Later on, the governments of Jatiya Party and BNP basically retained the preferences of the Zia government with regard to foreign relations. After Awami League came into power for the second time in 1996 it gave priority to strengthening relations with India. The meeting of the Foreign Ministers of four countries (Bangladesh, India, Nepal and Bhutan) held in April 1997 in Kathmandu resolved to form South Asian Growth Quadrangle (SAGQ). The concept was supported by Bangladesh. In the Ninth SAARC Summit held in Male on 12 May 1997, a resolution in support of this concept was also adopted in favor of regional cooperation between two or more SAARC countries.[756]

সময়ের পরিবর্তনের সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যত অর্জনের সম্ভাবনা অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ তার প্রতিবেশী এবং আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে এবং বিশ্বের আরো কিছু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' এটি সত্তরের দশকের ধারণা, যা প্রায় ৪০ বছরের পুরনো। বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে পুরনো ধারার পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত তার অর্জনের সম্ভাবনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সুতরাং পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য নিয়ে নতুন কৌশল-পরিকল্পনা করা উচিত, যার মাধ্যমে পরিবর্তিত বিশ্বে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে।

৭৫৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), evsjv wcwWqv; evsjv‡`‡ki RvZxq Ávb †Kvl, প্রাগুক্ত, ২০১১, খ.৭, পৃ.৩৩৫

756. Sirajul Islam, (Chief Editor), *Banglapedia, National Encyclopedia*, ibid, 2003,V.4; P.242

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৭, ০৮ ও ০৯ এপ্রিল ২০১৭ ভারত সফর করেন। শেখ হাসিনার সফরে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে, এমনটা বললেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি।[৭৫৭]

এই সফরে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে ২২টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেমন- "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরের প্রথম দিন, গত ৭ এপ্রিল ২০১৭ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৬টি চুক্তি ও ১৬টি সমঝোতা স্মারক সই হয়। ৮ এপ্রিল ২০১৭ শনিবার ভারতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ২২টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারকের একটি তালিকা প্রকাশ করে।

১৬ টি সমঝোতা স্মারক

১. প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কাঠামো
২. বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের ৫০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ
৩. তামিলনাড়ুর ওয়েলিংটন (নিলগিরিস) ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ এবং মিরপুরের ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের মধ্যে কৌশলগত ও অপারেশনাল স্টাডিজ বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি
৪. বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকারের দেওয়া ঋণ
৫. ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, ঢাকা এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, নয়াদিল্লির মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও কৌশলগত বিষয়ে সহযোগিতা জোরদার করা
৬. মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা
৭. তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে সহযোগিতা
৮. সাইবার নিরাপত্তা
৯. 'সীমান্ত হাট' স্থাপন
১০. বিচার বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা
১১. বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ভারতে প্রশিক্ষণ
১২. নৌচলাচল বিষয়ে সহযোগিতা
১৩. ভূবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন
১৪. উপকূলীয় ও প্রটোকল রুটে যাত্রী ও জাহাজ চলাচল
১৫. সিরাজগঞ্জ থেকে দইখাওয়া এবং আশুগঞ্জ থেকে প্রটোকল রুটে চলাচলের সুবিধা।
১৬. গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে সহযোগিতা

---

৭৫৭. দৈনিক প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০১৭

৬ টি চুক্তি

1. পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে সহযোগিতা
2. পারমাণবিক নিরাপত্তা ও তেজস্ক্রিয়তা রোধে কারিগরি তথ্য ও বিধিবিধান প্রণয়ন
3. বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা
4. অডিও ভিজ্যুয়াল যৌথ প্রযোজনা চুক্তি
5. মোটরযান যাত্রী চলাচল (খুলনা- কলকাতা রুট)
6. বাংলাদেশে ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণে অর্থায়ন[৭৫৮]

৭৫৮. দৈনিক প্রথম আলো, ০৯ এপ্রিল ২০১৭

দ্বাদশ অধ্যায়

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা

১২.১: বিশ্বায়ন (Globalisation)

আমাদের বিশ্ব ছোট হয়ে গিয়েছে। আজ মুসলমানগণ সব মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আলোচনার বর্তমান সূত্র ধরে আমাদের এমন একটা নাম দেয়া দরকার যেখানে ইসলামী সূত্র ও আমাদের বর্তমান অবস্থাকে বিদ্যমান দেখতে পাই। ধারণার কঠিন অর্থে বা তাদের ব্যবহৃত শর্তের নিরিখে আমাদের বাস্তবতার সাথে পুরনো ধারণা মিল খায় না। এটি আসলে পুরোপুরি একটি নতুন অবস্থা। এ অবস্থায় সমসাময়িক আলেমদেরকে বিভিন্ন ধরনের বিবেচনায় কাঁচের ভেতর দিয়ে পুরো বিষয়টিকে দেখতে হয়েছে। এ বিবেচনাগুলো তাদের কাছে মৌলিক মনে হয়েছে।[৭৫৯]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক বছর পর ইউরোপের পুনঃনির্মাণে অনেক অনেক সস্তা শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে। এর মধ্য দিয়েই পুরাতন ইউরোপ বিশেষ করে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সে, আরও পরে জার্মানীতে (১৯৫০ এর দিকে) প্রথম অভিবাসনের ঢেউ এসে লাগে।

১৯৫০ ও ১৯৭০'র মাঝামাঝিতে ইউরোপীয় দেশসমূহে মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা তিনগুণে পৌঁছায়। অভিবাসন প্রদানকারী জাতিগুলো যে হাজার হাজার মুসলমানকে নিয়েই সমস্যায় ছিল তা নয়, এসব জাতির সিদ্ধান্তেও হাজার হাজার মুসলমান বসবাস করে আসছিল। পরিবারগুলো এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়, শিশু জন্মলাভ করে আর নিজ দেশের গৃহে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে। ১৯৭০ ও ১৯৮০'র সময় মুসলিম মনমানসিকতার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। তারা এখন বেশী বেশী করে বিশ্বাস করতে থাকে যে, পশ্চিমা বিশ্বেই তাদের ভবিষ্যৎকে ভাবতে হবে আর গড়তে হবে। নতুন এ অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে আর তাদের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে মুসলমানরা তাদের সম্প্রদায়কে

---

৭৫৯. ফ্রান্সের স্কুলে স্কার্ফের (হিজাব) বিষয়। স্টেট কাউন্সিলের মতে, স্টেট স্কুলে মেয়েদের স্কার্ফ নিষিদ্ধের বিষয়টি অযাজকীয় (Laicite) মতবাদের ভুল ধারণা। বিশেষ করে ফরাসী সংবিধান সম্পর্কেও এটি ভুল ধারণা। অনেক প্রশাসনিক কোর্টেও মুসলিম মেয়েদেরকে হিজাব বা স্কার্ফ পরার অনুমতি দিয়েছে।
স্কার্ফ বা মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন সমস্যা ফ্রান্স বা সুইজারল্যান্ডের মতো জায়গার কোন বিষয় নয়, এসব দেশে জনসমাজে এগুলো আইনগত বা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কোন বিষয় নয়। আজ বা আগামী দিনগুলোতে কোন স্পর্শকাতর ও জাতীয় সত্তার বৈশ্বিক প্রশ্নের বিষয়ও এখানে কোন সমস্যা নয়। তাহলে এখন প্রশ্ন হলো: 'এসব সমাজ একীভূত হলে কোন ধরনের সত্তার জন্ম হবে আর এ নতুন আচরণ ও গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন পরিচয়ে তারা পরিচিত হবে? এরূপ পরিবর্তন কখনো কখনো আশ্চর্যজনকভাবে ও দৃশ্যমান অবস্থায় দেখা যায়। we¯ÍwiZ: তারিক রমাদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

সংগঠিত করতে লেগে যায়। বেশী বেশী মসজিদ গড়া শুরু করে। তাদের বিভিন্ন সংগঠনকে আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে আসতে দেখা যায় যাতে সাধারণ মানুষও এসব সংগঠনে এসে সালাত আদায় করে, একত্রিত হয়, জ্ঞান চর্চা করে আর সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শরিক হয়।[৭৬০]

এখন ১৯৯০'র দিকে এসে কয়েক দশক আগের অবস্থাটা কল্পনাও করা যায়না। আজ দেখা যায় পশ্চিম ইউরোপে ২০ থেকে ২৫ মিলিয়ন মুসলিমের বসবাস, তারা আজ সমাজের অংশ, তারা ইউরোপীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে। তারা এখন অংশত ইসলামী ইবাদত বন্দেগী করে, তারা তাদের সংগঠনের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ে ব্যস্ত, অনেক নওমুসলিম এখানে তরুণ প্রজন্মের মুসলমানদের সাথে সাথে ইউরোপীয় হয়ে গিয়েছে, তারা এখন ইউরোপের বাসিন্দাঃ তারা ইউরোপীয় নাগরিক; ইউরোপীয় ও মুসলিম।

মুসলমানদের ইউরোপে উপস্থিতির বাস্তবতার পেছনে অন্তঃত পাঁচটি উদ্দেশ্য রয়েছেঃ

১. ইউরোপে বসবাসরত বা ইউরোপে জন্মগ্রহণকারী বহু তরুণ মুসলিমের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ববোধের সৃষ্টি, ইসলামী আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনের পুনর্জীবন ঘটেছে।

২. দেশীয় ইউরোপীয় মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে ইসলাম গ্রহণ বা জন্মসূত্রে।

৩. নামাযের জায়গা আগের তুলনায় চার-পাঁচগুণ বাড়লেও যথেষ্ট নয়। এখানে মসজিদের অবস্থান ভূ-গর্ভস্থ কোন স্থানে বা মাল গুদামের মধ্যে।

৪. প্রত্যেকদিন ইউরোপে ইসলামী সংগঠনের সংখ্যা বাড়ছে। কোন কোন দেশে (যেমন ফ্রান্স, বৃটেন বা জার্মানী) হাজারেরও বেশী সংগঠন সরকারী খাতায় রেকর্ডভুক্ত (মসজিদ, কেন্দ্রসমূহ বা বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান) হয়েছে। ইউরোপের সর্বত্রই একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

৫. ৮০% মুসলমান রীতিমত তাদের ধর্মচর্চা করে না, এমনকি তারা দৈনিক নামাযও আদায় করে না, ৪০% এরও কম মুসলমান জুমআর নামাযে যায়। রমযান মাসে ৭০% মুসলমান রোযা রাখে।[৭৬১]

উপরে যে উপাত্ত দেয়া হয়েছে তা সাদামাটা ধরনের। এ উপাত্ত থেকেই আমরা বুঝতে পারি ইউরোপের মুসলমানরা কোন বাস্তবতার মোকাবেলা করে আসছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতেই ইউরোপে মুসলমানদের

---

৭৬০. তারিক রমাদান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭০
৭৬১. তারিক রমাদান, (অনু. এম রুহুল আমিন), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪

বর্তমান অবস্থার ওপরে কিছু মৌলিক মন্তব্য ও ধারণার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। এ প্রেক্ষিতে তিনটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য:

১. প্রায় পঁঞ্চাশ বৎসরের বেশী সময় মুসলমানদের ইউরোপে অবস্থানের পরই তাদেরকে শান্তির সাথে তাদের ধর্ম চর্চার সুযোগ দেয়া হয়েছে, মসজিদ (কখনো কখনো প্রশাসনিক বাধা সত্ত্বেও) ও ইসলামী সংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছে। ইউরোপীয় সংবিধান ও আইন যে ইসলামকে দীন হিসাবে সম্মান করে আর মুসলমানদেরকে ঈমানদার হিসাবে গণ্য করে এগুলো তারই প্রমাণ। অন্যদের ন্যায় মুসলমানদেরও এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। এটি অকাট্য সত্য। এসব ইসলামী সেন্টার, বর্ধিষ্ণু মসজিদ বা বিভিন্ন ধরনের মুসলিম সংগঠনের সৃষ্টি এ সত্যেরই প্রমাণ বহন করে।

২. ধর্মীয় ব্যাপারে ইউরোপে বসবাসকারী মুসলিম নিরাপত্তা ও শান্তিতে রয়েছে। বেকারত্ব, দারিদ্র, বহিষ্কার, বর্ণবাদকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে গুলিয়ে ফেলতে পারি না, কারণ এগুলো হলো পুরো জনগোষ্ঠীরই সমস্যা, এগুলো কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বৈষম্যের বিষয় হতে পারে। কোন কোন সময় কোন বিশেষ ইস্যুতে আইনের অপব্যাখ্যার কারণে[৭৬২] বৈষম্যেপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বহু মুসলমান তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের আবেদন করলে, সুবিচার পেয়েছে। এভাবে আমরা দেখি মুসলমানরা সংগঠন করতে পারে, আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, তাদের ধর্মীয় সম্প্রদায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোর সমাধানে যথাযথ পন্থা অবলম্বনের সুযোগ পায়।

৩. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাধারণতঃ শিল্পোন্নত ও আধুনিক সমাজে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন ও অনুসরণ কঠিন হয়ে পড়েছে। ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা বা ঈমানের অন্য যেকোনো দায়িত্ব পালন জনগণের মধ্যে থেকে একেবারে উঠে গিয়েছে। অনেক নারী-পুরুষ আল্লাহর বিশ্বাস করে কিন্তু কাজকর্ম, বিনোদন আর অন্যবিধ ব্যস্ততায় জীবনের প্রকৃতপক্ষে সামান্যই আল্লাহর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য ধর্মীয় বিধি পালনে তাদের স্থানের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি ইবাদত বন্দেগী ও চর্চার জন্যও স্থানের সংকুলান পাওয়া যায় না। ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুসলমান সবারই এ সমস্যা। মুসলিম যুবকদের মধ্যে কোন স্পষ্ট পুনর্জাগরণের অবস্থা পরিলক্ষিত হলেও বা পবিত্র মাসে

৭৬২. তারিক রমাদান, (অনু. এম রুহুল আমিন), gm‼j‡gi BD‡ivc ; ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামি থ্যট (BIIT) , ২০০৮, পৃ. ১৩৯

> (রমযান) আন্তরিকভাবে কেউ ধর্ম অনুশীলন করতে চাইলেও নিষ্ঠুর সত্য হলেও সেগুলো আমরা নিজেরা পালন করতে পারি না। এ বাস্তবতার কারণে মুসলমানরা যেসব সংগঠনের সাথে জড়িত মুসলমানদের জন্য সে সব সংগঠনকে শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের কোর্স, লেকচার ও অন্যান্য বিষয়ের আঞ্জাম দিতে হয় যাতে তারা ধর্মকে অনুসরণ করতে পারে ও তাদের দায়িত্বসমূহ পালন করতে পারে। আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি ইউরাপে মুসলমানদের এভাবে কাজ করার জন্য কোন আইনগত বা দাপ্তরিক বাধা নেই। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ জায়গায় জঙ্গি হামালায় পশ্চিমা মিডিয়াগুলো মুসলমানদেরকে অভিযোগ করার ফলে, অন্যেরা মুসলামনদেরকে বাকা দৃষ্টিতে দেখে অপরপক্ষে এটি স্বীকার করতেই হবে যে, অবস্থা যখন খারাপ ছিল তখন অভিবাসনের প্রথম ধাক্কায় ইউরোপে, আমেরিকায়, এশিয়ায়, অস্ট্রেলিয়ায় ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালনে যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। সমাজের চাহিদা পূরণে যে সুযোগ ছিল তা ছিল প্রচুর। এ বিষয়ে তখনই বুঝা যাবে যখন আনুপাতিক হারে মুসলিম নারী-পুরুষের প্রকৃত অঙ্গীকারের চেয়েও এ সুযোগ সুবিধাগুলো আরো বেশী হবে। আমরা যেমন বলেছি ধর্ম সম্পর্কে শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল কিন্তু মুসলমানরা তাদের অবস্থার উন্নয়নে ফরযে কেফায়ার ন্যায় দায়িত্বও পালন করতো না।[৭৬৩]

এ প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিলে একটি নতুন বাস্তবতা হিসাবে এর যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে, প্রয়োজনীয় ইসলামী ধারণা ও রূলিং-এর জন্যই এটি করতে হবে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান বিশ্বের বিভিন্ন জায়াগায় বসবাস করছে। তাদের অনেকেরই ইবাদতের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, বিভিন্ন সংবিধানের অধীনে থেকে ইচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতা ও অধিকার রয়েছে। এসব সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মুসলমানের আজ তাদের ধর্ম বা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে বা উভয়টির সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাহলে আমরা নতুন এ প্রেক্ষাপটটিকে কি বলতে পারি?

- ইসলামী রেফারেন্স অনুযায়ী আজ পশ্চিমা দেশ বিশেষ করে ইউরোপের অবস্থা কি হতে পারে?
- তাহলে কি আমাদের আলেমদের অনুসৃত পুরনো ধারণা বর্তমান প্রেক্ষাপটের জন্য প্রযোজ্য?
- বিশ্বটা যখন একটা গ্রামে রূপ নিয়েছে তখন পরস্পরবিরোধী ও দ্বিমুখী অভিধায় অভিহিত দারুল ইসলাম ও দারুল হারব এর বিষয়গুলো কি চলতে পারে?
- বিশ্ব যখন ভৌগোলিক-রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক জটিল এবং বহুবিধ ক্ষমতা ও প্রভাব বলয়ের দিক থেকে পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করেছে তখনও কি এরূপ ধারণা চলতে পারে?

---

৭৬৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, (অনু. মাও. মুহাম্মদ শামাউন আলী), †RiæRv‡jg wek gmwjg mgm¨v, ঢাকাঃ আল-ফুরকান প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ.৯১

- এ প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে গেলে আমাদেরকে জবাব দিতে হবে 'আমরা এখন কোথায় আছি'? ইসলামী প্রেক্ষাপট থেকে এর জবাব দান আবশ্যিক।

এ উত্তর পাওয়া গেলে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মুসলমানেরা কি বিদেশী হিসেবে না নবাগত হিসাবে বাস করছে?

আগ্রাসী পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য তারা কি বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে?

- অপর পক্ষে তারা কি এসব দেশের কথা ভাবতে পারছে, তারা কি তাদেরকে নির্দিষ্ট আইন-কানুনের অধীনে স্বগৃহে বসবাস করছে বা তারা কি তাদেরকে সে দেশের সত্যিকারের নাগরিক হিসাবে ভাবছে?
- তারা তাদের ঈমানের অংশ হিসাবে, তাদের বিবেক আর নাগরিকত্বের দায়িত্বের অংশ হিসাবে ন্যায় বিচার, সংহতি ও মূল্যবোধ রক্ষায় কি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছে?[৭৬৪]

শ্রমিকের প্রয়োজনে অভিবাসনকে স্বাগত জানানো হয়, আর যখন কোন অর্থনৈতিক সংকট আসে তখন তারা প্রত্যাখ্যাত হয়। কি ইউরোপ, কি আমেরিকা, কি অস্ট্রেলিয়া, কি এশিয়া (ফ্রান্সের ন্যাশনাল ফ্রন্ট সৃষ্টির পর যা দেখা গেছে) আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সর্বত্রই তারা বলির পাঁঠা। সে যাই হোক, ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকার অর্থেই সংহতির নমুনা দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত সফলতার জন্য চরম ডানদের শ্লোগান প্রত্যাখ্যান করার নিমিত্ত আর মানুষের স্বার্থে ইসলামের সরল মতামতকে পরিহার করার ব্যাপারে সরকারের সচেতন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

মধ্যযুগের ইউরোপে, আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া যুক্তিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পশ্চিমা দর্শনের আধুনিকতায় ইসলাম বিরাট ভূমিকা রাখে। জাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যাগুলোর সূত্রপাত হয় (যেমন ইহুদী বা অর্থোডক্স খ্রিষ্টান-এর ন্যায় দু'টো গ্রুপ), শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ বিতর্ক আর সংঘাত চলতে থাকে, নতুন দেশে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা থাকে। এক বা দু'প্রজন্মের সময়ের ব্যবধানে মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের জন্য কী যৌক্তিক হবে? এছাড়াও মুসলিম অভিভাসীদের প্রথম ঢেউটি আসে শ্রমিকদের মধ্য থেকে। তারা আসে উত্তর আফ্রিকা, তুরস্ক, ভারত,পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে। এ অভিবাসিরা গরীব, তারা অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই আসতে থাকে। তাদের শিক্ষার অবস্থা আর নিম্ন পর্যায়ের পদমর্যাদার কারণে তারা ইউরোপীয় ইসলামের কথা ভাবতেও পারেনি। অভিবাসিত দেশে তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফ্রান্সে এ অবস্থাটা স্পষ্ট বুঝা যায়। বৃটেনে অভিবাসিরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করলেও অভিবাসিত দেশে তারা কিছু কিছু

৭৬৪. তারিক রমাদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬

কাঠামো গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে নিজে দেশের কিছু কিছু কাঠামো তারা এখানে তৈরি করে। আরেকটা বিষয় আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রভাব।[৭৬৫] ১৯৭৯ সালের ইরান বিপ্লবের পর ইউরোপে ইসলামের ব্যাপারে, মানুষের মতামতে বিরাট প্রভাব পড়ে। এগুলো এখানে ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। রুশদীর ঘটনা থেকে তালিবানদের অতি বাড়াবাড়ি, মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাস আর হত্যাযজ্ঞ থেকে আলজেরিয়ার ভয়াবহ ঘটনা, আইএস সবই একটা আতংকজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এগুলো বেকার সমস্যা, বহিষ্কার, শহুরে সন্ত্রাসের ন্যায় সামাজিক সংকটের সৃষ্টি করেছে। এসব বিতর্ক ইসলামের উপস্থিতিকে কঠিন করে তোলে, কারো কারো মতে অসম্ভব করে তোলে। এসব সংকটের কারণে অভিবাসনের সমস্যা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। কেউ কেউ এ অবস্থাকে 'ইসলামী ফোবিয়া' নামে অভিহিত করে। ১৯৯৭সালে[৭৬৬] বৃটেনের রাণীমিড ট্রাস্ট পরিচালিত গবেষণায় এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানদের অবস্থা এখানে যেন দানবিয় রূপ ধারণ করে। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়গুলোতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার আর মারাত্মক কোন মূল্যায়ন হয়নি। সে যাই হোক, বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের চিন্তা মূল্যায়নে যেগুলোকে প্রথম দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হতো দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মানুষেরা সেগুলোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তরুণ মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের হার অপেক্ষাকৃত কম। এর অর্থ হলো সংহতি বিধানের ধারায় তারা অভিবাসিত দেশে প্রকৃত অর্থেই আত্মীকৃত হয়ে গেছে। এ প্রজন্মের তরুণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের হার কমে যাওয়ায় প্রথম প্রজন্মের মসজিদ নেতা ও বিভিন্ন ইসলামী সংস্থার নেতাদেরকে তাদের কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। সরকার বা নির্বাসিত ইসলামী জঙ্গীদের পৃষ্ঠপোষকতাকারী ধর্মীয় নেতারা তাদের তরুণ প্রজন্মের মানুষদের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তাদের ভাষায় কথা বলেছে, ধর্মীয় শিক্ষার কাঠামো পরিবর্তন করেছে আর তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের অবয়বের নতুন সংজ্ঞায়ন করেছে। অপরপক্ষে সংখ্যালঘু তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিপালনের নতুন ফ্যাশন অনেকগুলো নতুন ইসলামী এসোসিয়েশনের জন্ম দিয়েছে। মাত্র ১৫ বৎসরের মধ্যে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে এ সংখ্যা তিনগুণে পৌঁছেছে। এর কারণ মুসলিম যুবশক্তি।

৭৬৫. বৃটিশ মুসলিমেরওপর গঠিত কমিশন। প্রফেসর গরডন কনওয়ে এর সভাপতি ছিলেন। Islamophobia: A challenge for us all, রানীমিড ট্রাস্ট, অক্টোবর, ১৯৯৭। we¯ÍwiZ- তারিক রমাদান, অনু. এম রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৭৬৬. তারিক রমাদানের লিখিত আর্টিকেল, (অনু. এম রুহুল আমিন), মাসিক Le Monde Diplomatique, ফরাসী পত্রিকা, ১৯৯৮, gmwj‡gi BD‡ivc (BIIT), ২০০৮, পৃ.২২৪

তারা অনেক অনেক বেশী সক্রিয়। তাদের চিন্তা চেতনা অনেকের চিন্তা চেতনায় বিরাট ধরনের পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাদের বসবাসকে তারা অধিকার বলে মনে করে, তারা তাদের নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি চায়। এ অবস্থায় প্রজন্মগুলোর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। প্রথম প্রজন্ম না পারলেও পরবর্তী প্রজন্মগুলো বুদ্ধিজীবী ও সামাজিক পর্যায়ে তাদের ভূমিকা ঠিক করে নিয়েছে।[৭৬৭]

১৯৯০ এর দশকে ধর্মীয় ও আইন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ইসলামী বিশ্বের আলেমগণ অনেকবার বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।[৭৬৮] ইমাম ও বুদ্ধিজীবীগণের সাথে অনেক মৌলিক বিষয় এ বৈঠকে আলোচিত হয়। ইসলামী আইন বিষয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়। আলোচনায় পাঁচটি মৌলিক নীতি নির্ধারিত হয়। এ নীতিগুলো মুসলিম সমাজ[৭৬৯] এবং ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথার্থ ঐকমত্য সৃষ্টি করে :

১. কোন মুসলমান সে অভিবাসিত নাগরিক বা জন্মসূত্রে নাগরিক যাই হোক, তাকে নৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক চলতে হবে।

২. সংবিধান (যা প্রকৃতিতে ধর্মনিরপেক্ষ) মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের অন্ততঃ মৌলিক বিষয়গুলোকে অনুশীলনের সুযোগ দেয়।

৩. দারুল হারব[৭৭০] এর পুরনো ধারণা আজ অচল। এটি কুরআন বা হাদিস থেকে নেয়া কোন বিষয় নয়। ইউরোপে মুসলমানদের উপস্থিতির কারণে আরো বেশী ইতিবাচক অর্থে নতুন ধারণার বিষয় গ্রহণ করা হয়।

---

৭৬৭. প্রাগুক্ত

৭৬৮. জুলাই ১৯৯২-এ ইসলামী বিশ্বের দশ উলামা, জুলাই ১৯৯৪ এ আবার তারা চটৌ-চিনেন অবস্থিত ইউরোপীয়ান ইনষ্টিটিউট অব হিউম্যান সায়েন্সে বৈঠকে মিলিত হন। ইউরোপের মুসলমানদের জন্য একটি আইনী কাঠামো তৈরির জন্যই তারা বৈঠকে মিলিত হয়েছিল। বৃটেনে ১৯৯০ হতে এ উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মার্চ ১৯৯৭ সালেও লন্ডনে European Council for Judicial Opinions and Research নামের একটি সংগঠন গড়ে উঠে। দেখুন Sawt Uruba শীর্ষক বুলেটিন (The Voice of Europe), আরবিতে প্রকাশিত। প্রকাশনায় Federation of Islamic Associations of Eurpoe,Milan, মে, ১৯৯৭।
we¯ÍwiZ- তারিক রমাদান, (অনু. এম রুহুল আমিন), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৭৬৯. হিজবুত তাহরির, আল মুয়াহ্যিদুন এবং আল মুহাজিরুন এর ন্যায় সংগঠন ইউরোপে হ্রাসমান হারে শরীয়া আইন প্রয়োগের কথা প্রচার করতে থাকে। তাদের ব্যাপারে প্রচার মাধ্যমে বেশী বেশী প্রচার হলেও আসলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। we¯ÍwiZ- তারিক রমাদান, (অনু. এম রুহুল আমিন), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

৭৭০. Bmjvgx wek‡Kvl; ঢাকা: ইফাবা; ১৯৯৮, খ.১৩, পৃ.২৯২

৪. মুসলমানরা পুরো অর্থেই নিজেদেরকে নাগরিক মনে করে আর বসবাসকারী দেশের সামাজিক, সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে।

৫. ইউরোপীয় সংবিধানে মোটের ওপর এমন কিছু নেই যা মুসলমানদেরকে বা অন্য নাগরিকদেরকে তাদের ধর্ম অনুযায়ী কোন কিছু করতে বাধা দিয়ে থাকে।[৭৭১]

আলেমদের ব্যবহৃত পুরনো ধারণার কথা এখন বাদ দিলেও সমসাময়িক অবস্থার আলোকে ইসলামী সূত্রের অনুসরণ করে পশ্চিমা দেশসমূহে মুসলমানরা নিজের বাড়িতে বসবাস করছে এমন ধারণা পোষণ করতে পারে। বিশ্ব অনেক রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে চলছে। পশ্চিমা দেশে শাহাদা এখন প্রচারিত হতে পারে, শাহাদার প্রতি সম্মান জানানো যেতে পারে ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। এর দ্বারা শুধু যে অনুমতি বা বৈধতার কথাটি বলা হয়েছে তা নয়, দায়িত্ববোধের কথাও বলা হয়েছে। আবাসিক বা নাগরিক হিসাবে শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাসের সাথে সাথে মুসলমানরা তাদের নিজের সত্তা রক্ষা করবে, আর একই সাথে সাথী নাগরিকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেবে। শাহাদা আল ইসলামের দ্বিবিধ প্রেক্ষিতকে একাকী বসবাস করে অর্জন করা যাবে না। পারিপার্শ্বিক সমাজ হতে দূরে থেকে আর মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেও তা অর্জন সম্ভব হবে না। আসলে যা হচ্ছে তা প্রয়োজনের বাইরেই হচ্ছে (স্থানীয় হতে জাতীয় এমনকি মহাদেশও এর সাথে জড়িত)।[৭৭২]

পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম সমাজের তারুণ্য গত দু'তিন দশক ধরে তাদেরকে পরিচালিত করে আসছে। মুসলিম তারুণ্য সমস্যার সমাধানে তাদেরকে সাহায্য করে আসছে। এ সম্প্রদায়ই এক সময় ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে ভিনদেশী, আগ্রাসী মনে করতো। মুসলমানরা এ অবস্থায় কোন কিছু করতে চায়নি বা এ অবস্থার সাথে নিজেদেরকে জড়াতে চায়নি। এ অবস্থাটাকে পুরোপরি সাধারণ হিসাবে দেখা হলেও ইতিহাসের এক পর্যায়ে নতুন দেশে মুসলিম বসবাসকে নতুন করে আর দেখা হয়নি। ইসলামের শিক্ষা মুসলমানদেরকে সব সুযোগ এনে দেয়। এ ব্যাপারে তাদের ধর্মে কোন বিরোধ নেই। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থাকে অবশ্যই মূল্যায়ন করে দেখতে হবে আর সমাজের মধ্যে তাদের অঙ্গীকারের প্রাধিকার নির্ণয় করতে হবে।

৭৭১. আইনের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে ইসলামী নীতির মতবিরোধ, অগ্রাধিকার নীতি সনাক্তকরণের নিমিত্ত আর খাপ খাওয়ানোর নীতি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণার প্রয়োজন। বিস্তারিত- প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯

৭৭২. তারিক রমাদান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৫

পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলমানরা যেসব সমস্যার মোকাবেলা করে আসছে সেগুলো সত্যি করে বলতে গেলে ধর্মীয় বা আইনের বিষয় নয়। সেজন্য মুসলমানদের অবস্থানের বিভিন্ন দিক আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। তরুণ ও বয়স্কদের মধ্যেকার বহু সমস্যার কথা চিন্তা করতে গেলে অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে বের করতে হবে। মানসিক সমস্যা এখানে শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে জড়িত। সব সমস্যাগুলোর সমাধান পদ্ধতিগত ও ইসলামী নীতির মধ্যে থেকে করতে হবে।[৭৭৩] তবে এগুলো করার সময় মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সব বিশেষজ্ঞের গবেষণাকে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। কারণ, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সমস্যার সমাধানে যথাপদ্ধতি কি হবে তাদের গবেষণা থেকে তা জানা যাবে। পশ্চিমা দেশে সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার জন্য আমাদেরকে এভাবেই কাজ করতে হবে।

এখানে আমরা অর্থনৈতিক দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। এ দিকটিকে এতদিন তেমন গুরুত্বই দেয়া হতো না বা এ জাতীয় কোন সমস্যা নেই বলেই মনে করা হতো। কিছু কিছু উলামা ও মুসলিম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ইসলামী রুলিং, বিধিবিধান, বৈধ-অবৈধ বিষয়ের ওপর কথা বলে যাচ্ছিলেন কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলমানদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে কোন কথা বলেছিলেন না। তারা তাত্ত্বিক ও কঠোর পন্থায় 'সংহতির' কথা বলতেন। তাদের বক্তব্যে ইসলামকে আদর্শ ইসলাম হিসাবে উপস্থাপনের কথা বলা হতো যা বাস্তবে ছিল না। পশ্চিমা 'মুক্ত সমাজে' মুসলমান হওয়ার জন্য, শান্তিতে প্রশান্তিতে, পবিত্র মনে বেঁচে থাকার জন্য উপায় বের করতে হবে। আর এটিই মুসলমানদের জন্য বাস্তবতা।

ইসলামী শাস্ত্র ও বিধিবিধান মু'মিনের অন্তরের সেবায় নিয়োজিত আছে। সেজন্য মু'মিনের অন্তরের কারণে ইসলামী শাস্ত্রের বিধিবিধানকে উপেক্ষা করা যাবে না। অন্তরটা হলো আমাদের সবকিছুর চাবি:

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ (٨٨)اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (٨٩)

Ò†hw‘b abm¤ú‘ I mšÍvb-mšwZ †Kvb Kv‡R Avm‡ebv, †m w‘b DcKZ n‡e †Kej †m-B †h Avjøvni wbKU Avm‡e weï× AšÍtKiY wb‡q|Ó[৭৭৪]

এ বিষয়টিকে আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ, সত্যিকারের রক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ অন্তর আর মনের শান্তির জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ দরকার। তাত্ত্বিক ও আদর্শ রুলিং এর চেয়ে এগুলোই বেশী প্রয়োজনীয়। কথার ওপর নির্ভর না করে মুক্ত সমাজে সত্যিকারের সংহতির বিষয়টি একান্ত জীবনের

---

৭৭৩. তারিক রমাদান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮

৭৭৪. আল-কুরআন, ২৬ : ৮৮-৮৯

সংহতির বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের এটিই বড় চ্যালেঞ্জ। মুসলমানরা অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উপায় বের করতে ভুল করবে না। তারা তাদের হৃদয়ের চাহিদা আর আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে কোন অবস্থাতেই বিধি বিধান বা ইসলামী সংগঠনের বাইরে কিছুকে অগ্রাধিকার দিবে না।

অনেকেই ইসলামকে আরব, ভারত আর পাকিস্তানীদের সাথে যুক্ত করে ভাবে। কিন্তু তারা একটি কথা একবারও চিন্তা করেনা যে, তাদের সাথী বন্ধুটিও মুসলমান হতে পারে। এমন করে ভাবা হয় যে, ইসলামের সাথে ‘ভিনদেশী’ ভাবধারা যুক্ত থাকায় মুসলিম হওয়ার কারণে তাকে খাঁটি নাগরিক বিবেচনা করা গেলো না। ইতিহাস এখনো ইউরোপীয় মন-মানসিকতার কথা আর মুসলমানদেরকে কিভাবে দেখা হয় তার কথা বলে। পশ্চিমের নতজানুধরনের সংস্কৃতি ও স্মরণশক্তি প্রাচ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ সংস্কৃতি দূরের কোন বিষয় নয়, এটি উদ্ভূত ধরনের, তবে বন্ধুত্বের চেয়ে এটি বেশী বিরোধী ভাবধারাসম্পন্ন। ইউরোপে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ পুরাতন ও গভীরে প্রোথিত অনুভূতিকে সংশোধন করতে পারেনি। এর বিপরীতও কিন্তু শোনা যাবে। এখানে সেখানে যে কেউ দেখতে পাবে যে, ইউরোপীয় সীমানার ভিতরে বহু বিদেশী বসবাস করছে। ইসলামকে এখানে একটি সমস্যা হিসাবেই দেখা হয়, অভিবাসনের ক্ষেত্রে ইসলাম এখনো সমস্যা,[৭৭৫] ইউরোপীয় বাস্তবতা হিসাবে ইসলামকে মেনে নেয়া খুবই কষ্টকর।[৭৭৬]

মুসলমানদের সত্যিকারের আনুগত্যের ক্ষেত্রে এখনো সন্দেহ বিরাজ করছে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে একটি অপবাদ শোনা যায় যে, তারা পশ্চিমা দেশে এসেছে টাকাকড়ি ও বস্তুগত সমৃদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে, তাদের হৃদয়টা অন্যত্র। তারা ‘মুনাফাভোগী’। ইহুদীদের বেলায়ও আমরা এখন একই অপবাদ শুনি। ইউরোপের বহু দেশেই এ ধারণা গভীরভাবে বিরাজ করছে। এটি সেখানেই দেখা যায় যেখানে অনেক মুসলমানের বসবাস আর বেকার সমস্যা প্রকট।

---

৭৭৫. সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে লাখ লাখ অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কারের পরিকল্পনা প্রকাশ করল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন । এ-সংক্রান্ত কঠোর নির্দেশনায় ওই অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার আওতা যেমন প্রশস্ত হবে, তেমনি এ প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে। কার্যত যুক্তরাষ্ট্রে থাকা ১ কোটি ১০ লাখ অবৈধ অভিবাসীর সবাই এর আওতায় পড়তে পারে।
we¯ÍvwiZ-দৈনিক প্রথম আলো, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১
ågY wb‡lavÁv wb‡q Uv‡¤úi bZb Av‡'k, Qq †'k wbwl×B _vKj ev' coj BivK|নতুন আদেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছয় দেশ হলো– ইরান, লিবিয়া, সিরিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন। দেশগুলোর নাগরিকদের ওপর ৯০ দিনের জন্য ভ্রমন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তবে দেশগুলোর যেসব নাগরিক এরই মধ্যে ভিসা পেয়েছেন, যেসব অভিবাসীর গ্রিন কার্ড রয়েছে, যাঁরা কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যাঁদের আগে রাজনৈতিক আশ্রয় বা শরনার্থী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁদের প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা শিথিল রাখা হয়েছে। we¯ÍvwiZ-দৈনিক প্রথম আলো, ৭মার্চ, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৭]

৭৭৬. তারিক রমাদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

এ চিত্রের সাথে আরেকটি প্রেক্ষাপট যোগ করার আছে। এটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, যেগুলো আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রচার করা হয়েছে। এ জাতীয় প্রচারগুলো পশ্চিমাদের মনে অত্যন্ত কঠিন রেখাপাত করে। আন্তর্জাতিক চাপটা এত বেশী যে, বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। আলজেরিয়া, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিনি, সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, পাকিস্তান বা মুসলিম বিশ্বের কোন স্থানে সংঘটিত কোন ঘটনাতে সন্ত্রাস বা দাঙ্গা হিসাবে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। অথবা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে অতি বিশ্বাসী কোন মুসলিম নেতার ঘৃণা মিশ্রিত বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের কাছে একটি বার্তাই পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে যে, ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই আগ্রাসী, সন্ত্রাসী ও যুদ্ধংদেহী। এ ধারণাই পশ্চিমারা পোষণ করে থাকে। আর এ ধারণাকেই সঠিক মনে করা হয়। সাধারণ মুসলমানরাও আজ অনুশীলনকারী মুসলিম আর 'চরমপন্থী বা গোঁড়া মুসলিমের' মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। মুসলমান যখন খোলামেলাভাবে তার ইসলাম পালনের কথা দৃঢ়তার সাথে বলে তখন সেটিকে টিভিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রচার করা হয়, এর ফল যা হওয়ার তাই হয়। যথার্থ অর্থেই প্রত্যাখ্যান। ইসলামের বিরুদ্ধে সন্দেহ অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। 'ইসলামী হুমকির' ধারণা প্রতিদিনই যুক্তিসিদ্ধ হচ্ছে। এভাবে ইউরোপে আজ মুসলমানদেরকে 'ভেড়ার পোষাকে নেকড়ে' বা 'ট্রোজানের ঘোড়া' মনে করা হয়। অর্থাৎ শত্রুদের অগ্রবর্তীদলের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ইউরোপীয় দেশের প্রতিটি হৃদয়ে। ঐ সংস্কারগুলোর জন্যই তৃণমূল পর্যায়ে দেশী ও মুসলিমদের মধ্যে ইউরোপীয় সমাজ কোন সাদৃশ্যপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। এখন এ অবস্থার মূল্যায়ন জরুরী হয়ে পড়েছে। এ ক্ষতিকর অবস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আজকের দিনে ইউরোপের কোন মুসলিম নেতা এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে, তারা তাদের বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ বাণীটুকু পৌঁছিয়ে দিচ্ছে না বা স্পষ্টভাবে তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করা হয় তার কোন স্পষ্ট জবাব দিচ্ছে না। এটা বলতে হবে না যে, তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করা হয় তার জবাব তাদেরকে দিতে হবে। তাদের অবস্থানকে মূল্যায়ন করতে হবে, আর তাদেরকে বিশ্বের কোথাও কোন কিছু ঘটে গেলে এর বিরুদ্ধে বিশেষ অবস্থান নিতে হবে। ক্ষতিকারক বিষয়গুলোকে তাদের পরিহার করতে হবে। এর কারণ এরূপ কোন নেতিবাচক ও রক্ষামূলক অবস্থাকে তারা গ্রহণ করতে পারে না। ইউরোপে অনেক বেশী ইতিবাচক উপস্থিতি নির্ভর করে স্পষ্ট ও ইতিবাচক আত্ম-উপলব্ধির ওপর। এর সাথে প্রয়োজন স্থায়ী আত্ম-মূল্যায়নের বিষয়টিকে পরিহার করে সংহতিপূর্ণ আলোচনা। এ জাতীয় মনোভাব ইতিবাচক ও গঠনমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবে। আবার ইসলামী অগ্রাধিকার যেমন

বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা ও ন্যায়বিচারের মত বিষয়গুলোও সমস্যার সমাধানে সহায়তা করবে। এর অর্থ এ নয় যে, কোন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে এখানে সমর্থন করা হবে। কোন কোন বিষয়ে নিষ্ঠাবান লোকজন ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য এসব প্রশ্ন করে থাকতে পারে। কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে জানতে চাওয়ার অর্থ শত্রুতা করা নয়। এটি বন্ধুত্ব সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ। বাস্তবে এ পদ্ধতি আলোচনার পথকে খুলে দেয়। [৭৭৭]

পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম উপস্থিতিতে ইসলামের আইনগত কাঠামোর কথা উল্লেখের পূর্বে আমরা এখানে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়ের অবতারণা করবো যাতে ইউরোপসহ সারা বিশ্বে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার একটা সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। এরূপ বাস্তবতাই আমরা চিন্তা করতে পারি। এর মধ্য দিয়ে আমরা ইসলামী রেফারেন্সের দিকে ফিরে গিয়ে সঠিক জবাব প্রস্তুত করতে পারি। এ প্রেক্ষিতে মোটের ওপর তিনটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে:

১. প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব আইনগত কাঠামো আছে। এ আইন জাতীয় আইন, মৌলিক আইন। এ আইন কতকগুলো বিধানের সমষ্টি ও বিশেষ আইন। দেশের সংবিধান ও আইন উভয়ে রেফারেন্স ও কাঠামো হিসাবে কাজ করে। এগুলো জাতি ও রাষ্ট্রের মেরুদন্ড হিসাবে কাজ করে। এ আইনগত কাঠামোই নাগরিক, অভিবাসী, বিদেশী বা পর্যটকদের বিশেষ ধরনের মর্যাদা নির্ধারণ করে থাকে।

২. শ্রমিক, ছাত্র, শরণার্থী বা পরিবারের সদস্যবৃন্দ হিসাবে যখন লক্ষ লক্ষ মুসলমান এসব দেশে আসে তখন তারা প্রকাশ্যে বা নিরবে যে কোনভাবেই হোক যেখানে এসেছে সে দেশের আইন কানুন মেনে নিয়ে বাস করে। কর্মচুক্তি বা ভিসার আবেদন করার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধান, আইন ও সে দেশেকে স্বীকার করে থাকে।[৭৭৮]

   অভিবাসী ও দেশান্তরগামী শ্রমিকদের জন্য বিষয়টি স্পষ্ট। যারা দেশের মৌলিক আইন মানার ব্যাপারে শপথ নিয়েছে তাদের জন্য আরো বেশী স্পষ্ট। দ্বিতীয় প্রজন্ম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের পরের তরুণ মুসলমান নাগরিক হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই সংবিধানের অধীন। অথবা যারা সংশ্লিষ্ট দেশের অধিবাসী তারা তাদের পিতা-মাতাকৃত পূর্বের চুক্তিতে আবদ্ধ।

---

৭৭৭. তারিক রমাদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৭৭৮. "দু'রাষ্ট্রের মধ্যে বৈধ চুক্তি থাকার কারণে ভিসার প্রয়োজন না হতে পারে। আইনগত দিক থেকে বলতে গেলে ফলাফল একই। এরূপ অবস্থায় মুসলমানরা বিনা বাধায় প্রবেশ করে চুক্তিকে ধন্যবাদ দিয়ে থাকে আর রাষ্ট্র ও স্বাগত জানানো দেশকে স্বীকার করে থাকে।"

৩. অনৈসলামিক পরিবেশে সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলমানগণ বিচিত্র ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করে। সারা বিশ্বব্যাপী সকল সংখ্যালঘুর জন্যই এটি স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত। সতর্কতার সাথে শ্রেণীকরণের কাজে অগ্রসর হতে হবে। কারণ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যা একই প্রকৃতির বা একই পর্যায়ের নয়। আইন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোকে সংস্কৃতি ও খাপ খাওয়ানো থেকে আমাদের আলাদা করে চিন্তা করতে হবে। এ সমস্যাগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত। মুসলমানগণ সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়টিকে সংস্কৃতির সাথে গুলিয়ে ফেলে। তবে দেশীয় সম্প্রদায়ও কখনো কখনো উদ্ভুত ধরনের মুসলমান অধিবাসীদেরকে ভয়ের মধ্য দিয়ে দেখার কারণে বিষয়গুলোকে গুলিয়ে ফেলে। আর যা সংবিধানসম্মত নয় তাই তারা করে থাকে। এ তিনটি পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলো আরো স্পষ্টতর বাস্তবতার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে ইসলামী সূত্রের দিকে ফিরে যেতে সাহায্য করে। এটিই সূচনাবিন্দু যেখান থেকে আমরা ইসলামী শিক্ষার কথা বলবো।

১২.২ পশ্চিমা আইন ও ইসলামী চেতনাবোধ

আমরা দেখলাম কিভাবে উম্মাহর আনুগত্য গঠিত হয় আর চুক্তির ধারণা কিভাবে উম্মাহ ও দেশের মধ্যকার অনৈক্য দূর করে দেয়। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় এও দেখতে পাই যে, মুসলমানগণ যে পর্যন্ত তাদের ধর্ম, ঈমান আকীদা ও পরিচয় রক্ষা করে চলতে পারবে সে পর্যন্ত অনৈসলামিক দেশে বসবাস করতে কোন বাধা নেই। অভিবাসী বা নাগরিক হিসাবে মুসলমানরা সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধানকে সম্মান করবে।

সুতরাং মুসলমানদেরকে নাগরিক হিসাবে পশ্চিমা দেশসমূহে তাদের পথ নিজেদেরকেই খুঁজে নিতে হবে। পশ্চিমা সমাজে যা করা যায় তার ভিত্তিতে মুসলমানগণকে সৎ বিশ্বাসে কী করা যাবে আর কী করা যাবে না তা ঠিক করে নিতে হবে। কী করা যাবে না'র বিষয় অনেকগুলোই স্পষ্ট। অনেক বিষয় আছে ইসলামে যা নিষিদ্ধ পশ্চিমা আইনে তা বৈধ। যেমন, উত্তেজক (এলকোহল, এটিকে কখনো কখনো হালকা ড্রাগ বলা হয়), বিবাহ বহির্ভূত যৌন সংসর্গ ইত্যাদি। মুসলমানের নিজের পছন্দ থাকবে, যা তার পরিচয়ের সাথে বেমানান তা সে পরিহার করে চলবে আর সঠিক ইসলাম চর্চা করবে।

অন্যভাবে বলতে গেলে জাতীয় সংবিধানের আওতায় কি করা যায় এটি এক বিষয় আর মুসলমানরা তাদের বিশ্বাসের মধ্য থেকে এবং সংবিধানের আওতায় কি করতে পারে সেটি আরেক বিষয়। পশ্চিমা দেশে শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মুসলমানদেরকে দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ ক্ষেত্রগুলোতে সবচেয়ে উত্তম আচরণটা কি হবে আর বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সেগুলোর যথোত্তর কি হবে তাও মুসলমানদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।

আসলে এখানে বুঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেক দেশেই মুসলমানদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, মসজিদের ন্যায় নামাযের স্থান গড়ে তোলার ব্যাপারে অংশীদার ভিত্তিতে ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় তাদের প্রচেষ্টার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে। দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবেই তারা এগুলোা করবে। এগুলো করার ব্যাপারে নাগরিকত্ব আর মুসলিমত্বের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। দেশের প্রচলিত আইনের মধ্য থেকেই তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তারা এগুলো করতে পারে।

নাগরিক হিসাবে তাকে যদি কোন অন্যায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বলা হয়, যে যুদ্ধ শুধুই ক্ষমতা আর নিয়ন্ত্রণ দখলের জন্য হয়, সে যুদ্ধে কোন মুসলমান সরল বিশ্বাসে শরিক হতে পারে না। মুসলমান কখনো যুদ্ধ করতে পারে না, অর্থের জন্য কাউকে হত্যা করতে পারে না, ভূমি বা ক্ষমতা দখলের জন্য কোন মুসলমান যুদ্ধে জড়াতে পারে না। উপনিবেশীকরণ বা নির্যাতনের যুদ্ধে মুসলমানকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় বক্সার মোহাম্মদ আলী ও অনেক খ্রিষ্টানও ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় 'বিবেকের আপত্তি'র পরিচয় দিয়েছেন। এগুলো আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে রাষ্ট্র ও সামরিক আইন পালন করতে আপত্তি করেছেন বিধায় তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে : এসব পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে হবে। অন্যায় করার চেয়ে কারাগারই উত্তম। হযরত ইউসুফ (আ.) কে যখন অন্যায় করতে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন :

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ ۚ

"হে আমার পালনকর্তা, এ নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়।"[৭৭৯]

ইসলামী রেফারেন্সের ভিত্তিতে এ রুলিংগুলো জারি করা হয়েছে। ইতিহাসে এরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে দেখা যায় মুসলিমরা অমুসলিম দেশে ছিলেন, যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) শুধু যে মিশরে বসবাসই করেছেন তা নয়, তিনি অমুসলিমের জন্য কাজও করেছেন এবং বহু ঈশ্বরবাদী রাজার জন্য তার সেবার প্রস্তাবও করেছিলেন।

৭৭৯. আল-কুরআন, ১২ : ৩৩

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖۤ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ
اَمِيْنٌ (৫৪)قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ (৫৫)

রাজা বলল, 'ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে আস; আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত কর।' অতঃপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল তখন বলল, 'আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হলে।' ইউসুফ বললেন, 'আমাকে দেশের ধনসম্পদের ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।[৭৮০]

এ আয়াতে দু'টো বিষয় লক্ষ্যণীয়। ঘটনাটা হলো প্রথমত হযরত ইউসুফ (আ.) রাজার আবেদন গ্রহণ করলেন, অথচ হযরত ইউসুফ (আ.) তখন মুক্ত ছিলেন, নির্যাতিত অবস্থায় ছিলেন না। আহল আল কিতাবের বাইরের লোকের অধীনে কাজ করতে চাইলেন, এ লোক মানুষের কোন প্রতিনিধি ছিল না। তাদের সম্পর্কটা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। রাজা মনে করেছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মত একজন সত্যবাদী ও সৎ লোকের কাছ থেকে তার ভয়ের কোন কারণ নেই।

হযরত ইউসুফ (আ.) রাজার সাথে কৃত চুক্তির শর্তাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন আগামীর দিনগুলো হবে প্রাচুর্যের, এতবেশী খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হবে যা থেকে আগে বর্ণিত বৎসরগুলোর জন্য তিনি অনেক খাদ্য এবার মওজুদ করে রাখতে পারবেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটা মিশন ছিল তার ভাইয়ের ব্যাপারে তার মিশন সফল করা। তবে সেটি হবে তার দেশের মধ্য থেকেই। তিনি যখন কারাগারে ছিল তখন তার সাথীদের আল্লাহর কথা এবং সৃষ্টিকর্তা, ইব্রাহিম (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.) নবীদের কথা বলতেন। মিশরে অবিশ্বাসীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে হযরত ইউসুফ (আ.) নবী সাধারণভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন তাওহিদের বাণী কি? ইউসুফের পিতা আর কুরআনে বর্ণিত তার পরিবার মিশরে বসবাস করতেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বাবার সিদ্ধান্তক্রমেই ইসরাইলীবা মিশরে বসবাস করছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) এ দেশে বিদেশী হিসাবেই এসেছিলেন।

হযরত মুসা (আ.) ও হারুন (আ.) এক আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ছিলেন। তারা মানুষ ও ফেরাউনের কাছে আল্লাহর কথা বলতেন।

ফেরাউন যখন তাদেরকে নির্যাতন করেছিল তখন ঐ দেশের লোকদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

৭৮০. আল-কুরআন, ১২ : ৫৪-৫৫

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَہْلَہَا شِیَعًا یَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَۃً مِّنْہُمْ یُذَبِّحُ اَبْنَآءَہُمْ وَ یَسْتَحْیٖ نِسَآءَہُمْ ؕ اِنَّہٗ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ (۴)وَنُرِیْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَی الَّذِیْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَہُمْ اَئِمَّۃً وَّ نَجْعَلَہُمُ الْوٰرِثِیْنَ ۙ(۵)

Ò†divDb †‘‡k civµgkvjx n‡qwQj Ges Z_vKvi Awaevmxe›‘‡K wewfb †kYx‡Z wef³ K‡i Zv‡‘i GKwU †kYx‡K †m nxbej K‡iwQj| Zv‡‘i cÎMY‡K †m nZ¨v Ki‡Zv Ges bvix‡‘i‡K †m RxweZ ivLZ| †m †Zv wQj wechq mwóKvix| Awg B"Qv Kijvg, †m †‘‡k hv‡‘i‡K nxbej Kiv n‡qwQj, Zv‡‘i cwZ AbMn Ki‡Z, Zv‡‘i †bZZ ‘vb Ki‡Z I †‘‡ki AwaKvix Ki‡Z|Ó[৭৮১]

এখানে 'তাদের দল' বলতে সাধারণভাবে ইসরাইলীদেরকেই বুঝানো হয়েছিল। তাদেরকে দেশের অংশ মনে করা হয়েছিল, তাদের প্রতি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে বৈষম্য করা হতো।[৭৮২]

বিদেশী থেকে শুরু করে হিব্রুরা এবং ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র সন্তানগণ ঐ দেশের অধিবাসী হয়েছিলেন, নির্যাতনের কারণে তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। এ অবস্থা কিন্তু অর্থহীন ছিল না। ইহুদীদের এভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে।

রাসূল (সা.) এর এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। তিনি রাসূল হিসাবে যথাসম্ভব মক্কায় থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি বহুত্ববাদীদের সমর্থন পেয়েছিলেন। বিশেষ করে, এখানে আবু তালিবের নাম উল্লেখ করা যায়। আবু তালিব কখনো আরবদের পুরনো বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেন নি। নির্যাতন সহ্যের বাইরে চলে গেলে তিনি কিছু নওমুসলিমকে সরিয়ে ফেলার জন্য আল্লাহর অনুমতি পেলেন যাতে তারা নির্যাতন থেকে বাঁচতে পারেন। তারা আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান রাজা নাজ্জাসী[৭৮৩] নেগুসের কাছে গেলেন। নেগুস নিজে মুসলমান না হয়েও তাদেরকে গ্রহণ করেছিলেন। নেগুসের লোকজনও মুসলমান ছিল না। মুসলমানগণ একটা অনৈসলামিক পরিবেশে বসবাস করেছিলেন। তারা শ্রদ্ধাবান, সাধু, বিশ্বাসযোগ্য ও উদার একজন নেতার অধীনে ছিলেন। উম্মে সালমা অনেক বৎসর ছোট্ট একটা মুসলিম অভিবাসীর মধ্যে বাস

---

৭৮১. সূরা ২৮ : কাসাস্, আয়াত ৪-৫

৭৮২. মুহাম্মদ আসাদের, *The Message of the Qur'an* (দার আল আন্দালুস, জিব্রাল্টার, ১৯৮০)-এ আয়াতে তাফসীরের বিষয় দেখুন। পৃষ্ঠা. ৫৮৯।

৭৮৩. Bmjvgx wek‡Kvl; XvKv: Bdvev; 1998, খ.১৩) ৬৬৯-৬৭১

করেছিলেন। নেগুস সম্পর্কে এ অধিবাসীরা ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। রাজা ও রাজার সৈন্যবল অমুসলিম হয়েও মুসলমানদের প্রতিরক্ষায় তাদের শত্রুদের পরাজিত করতে পিছপা হতেন না।[৭৮৪]

রাসূল (সা.) এরপর মু'সআব ইবন উমায়েরকে অমুসলিম শহর মদীনায় প্রেরণ করেন। যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন মু'সআব তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছিলেন আর মদীনার লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এ সময়ে পরিবেশ ইসলামিক ছিল না। কখনো কখনো পরিবেশ শত্রুভাবাপন্ন ছিল। বিভিন্ন গোত্রীয় নেতারা তাদের নেতৃত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে মনে করতো। কুরআনের ওপর বর্ণনা দেবার সময় এক নগরীর শাসক তাকে তার দাওয়াতী কাজটা বন্ধ করতে বললে ইবনে উমায়ের এ সময় বলেছিলেন[৭৮৫] : 'আমার কথা কি মেহেরবানী করে তোমরা শুনবে, যদি শুনতে চাও আমি বলবো। যদি শুনতে না চাও আমি বলবো না।' কথা বলার স্বাধীনতার কথা বললেও উমায়ের যে কর্তৃপক্ষের অধীনে ছিলেন তার সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়েছিলেন আর নগরী যে নিয়ম কানুনের অধীনে চলতো তা মানতে তিনি বাধ্য ছিলেন।

রাসূল (সা.) অমানবিক নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মক্কা ত্যাগের (২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.) সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ এক বৎসর ধরে তিনি মদীনায় হিজরতের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। শেষমেষ তিনি আবু বকর (রা.) কে সাথে নিয়ে মদীনায় পাড়ি জমান। এ জাতীয় কঠিন সময়ে রাসূল (স.) একজন সুযোগ্য ও বহু দেব-দেবী পূজারী আবদুল্লাহ ইবনে উরাকাতকে গাইড হিসাবে নিলেন।[৭৮৬]

এ ঘটনা থেকে দু'টো শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করা যায়। প্রথম শিক্ষাঃ রাসূল (সা.) নিজেই মক্কা ত্যাগ করেছিলেন আর সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত একটি শহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দশ বৎসর পর (৬৩২ সালে) তার নিজ শহর বিজয়ের পর তিনি সেখানে মসজিদুল হারামে প্রবেশের অধিকার লাভ করেন।

---

৭৮৪. কুরআনের এক জায়গায় বাইজেন্টাইন ও পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যকার লড়াই সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাইজেন্টাইনীদেরকে পরাজিত করা হয়। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে 'কয়েক বৎসরের মধ্যে' তারা 'বিজয়ী হবে।' আরো বলা হয়েছে : ঐদিন বিশ্বাসীগণ (কারণও থাকতে পারে) আল্লাহর পরিত্রাণ লাভ করবে : যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সাহায্য দেন, তিনিই একমাত্র সর্ব শক্তিমান, দয়ালু ও দাতা' (৩০ : ৩০)। এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, অমুসলিমদের ওপর বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দিত হয়, আল্লাহ মুসলমানদেরকে সমর্থন করেন। মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে, বাইজেন্টাইনদের খ্রিষ্টানরা বিশ্বাসের দিক দিয়ে কাছাকাছি ছিল, সাধুতা ও ন্যায়বিচারের প্রস্তাব করা নেগাসের সাথে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল।

৭৮৫. আল্লামা শিবলী নুমানী (রহ.) অনু. এ কে এম ফজলুর রহমান মুন্সী, **mxivZb bex (mv.)** খ. ৭, ঢাকাঃ বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি. ১৯৯২,

৭৮৬. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসুল (স) এর সরকার কাঠামোঃ প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭

এরপর তিনি মদীনায় ফিরে এলেন। মদীনা এখন তার নিজের শহর। মদীনা মদীনাতুন নাবি (স.) হয়ে গেল। মদীনাতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আশা করেছিলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষাটি আরো অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে দেখা যায় রাসূল (সা.) অমুসলিমদের সাথে থাকতে দ্বিধা করেননি। তিনি যখন দেখলেন তারা সৎ ও যোগ্য তখন তিনি তাদের সাথে মিলেমিশেই ছিলেন। তাদের সেবাসমূহও তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে অনেক বেশী বিশ্বাস করতেন। তখন এক অমুসলিমকে তিনি তার গাইড নিযুক্ত করেছিলেন। এ গাইডের সাথে তাঁর নিজ শত্রুরও সম্পর্ক আছে। হাদিসে উলামার বর্ণনা থেকে এরূপ অসংখ্য ঘটনা জানা যায়। রাসূল (সা.) যুদ্ধের সময় বা রাষ্ট্র পরিচালনায় এরূপ অনেক সেবা গ্রহণ করেছিলেন। যোগ্যতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাসূল (সা.) অমুসলিমদের সাথে কাজ করেছেন। রাসূল (সা.) ও তাঁর সম্প্রদায় সংখ্যালঘু ছিল শুধু এ ধারণা থেকে তিনি তাদের সেবা নেন নি। মুসলিম ও অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নই ছিল এর লক্ষ্য। অমুসলিমদের কাজের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাদের ন্যায়বিচারবোধ ও সাম্যতাবোধকে তিনি সম্মান করতেন। কোন অমুসলিমের মৃত্যুর পরও রাসূল (সা.) তাদের গুণাবলীর মানবিক স্বীকৃতির কথা বলতেন।

মদীনায় একবার ইহুদীরা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। রাসূল (সা.) এ সময় ইহুদীদের পক্ষই নিয়েছিলেন। একবার এক শবযাত্রীদল রাসূল (সা.) এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি (সা.) সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়েছিলেন। রাসূল (সা.)-এর এ কাজ দেখে তাঁর সাহাবীগণ হতভম্ব হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এটা তো একটি ইহুদী শবযাত্রীদল', তাদের এ কথা শুনে রাসূল (স.) কড়াভাবে উত্তর দিরেন, 'মৃত ব্যক্তিটি কি মানুষ নয়? [৭৮৭]

এটিই ছিল রাসূল (সা.) এর শিক্ষা। মুসলিম বিশেষ করে যারা পশ্চিমা বিশ্বে বসবাস করছে তাদের এ শিক্ষা মনে রাখতে হবে। রাসূল (সা.) এর কাজের গভীরতর অর্থকে আমাদের অনুধাবন করতে হবে, স্মরণে রাখতে হবে।

সংক্ষিপ্তাকারে হলেও একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে হবে : 'মুমিনরা তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে ইসলামী সূত্রের ওপর ভিত্তি করে অমুসলিম পরিবেশের দেশেও বাস করতে পারে : ১. ধর্ম

---

৭৮৭. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী:mnxûj eLvix, দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তাবি. হাদিস নং- ২৯৮৬

অনুশীলনের স্বাধীনতা থাকতে হবে। ২. আল্লাহর বাণী প্রচারের স্বাধীনতা থাকতে হবে, ৩. মুসলিম সমাজ ও সবার নিকট কল্যাণকর বিবেচিত হতে হবে। অমুসলিমদের সম্পর্কের ভিত্তি হবে ন্যায়বিচার, বিশ্বাসযোগ্যতা ও সততা। সামাজিক, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ধর্ম কোন যোগ্যতার মাপকাঠি হবে না। মুসলমানরা সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু যাই হোক মানুষের দক্ষতা বিচারের বেলায় তাদেরকে সৎ হতে নির্দেশ করা হয়েছে। একসাথে কাজ করার জন্য ও তাদের কাছ থেকে শিক্ষার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

মুসলিম আর অমুসলিমের মধ্যকার সম্পর্ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এ শর্তগুলো ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায় যেসব সমস্যার মোকাবেলা করে আসছে সেগুলোঃ যেমন, ইসলামী রুলিং মানে না এমন মুসলিম একনায়কত্বের অধীনে বসবাস বা অমুসলিম পরিবেশে সংখ্যালঘু অবস্থায় বসবাস। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হলো, ইসলামী ধারণার নীতি নির্ধারকের বিষয়টিকে অসাধারণ বা অস্বাভাবিক হিসাবে গণ্য করা। আলেমদের মতে মুসলমানরা কুরআন ও সুন্নাহর অধীনে, মুসলিম নেতৃত্বে ইসলামী সমাজে ইসলামী বিধিবিধান দ্বারা শাসিত হবে। মুসলমানরা বেশী বেশী ন্যায়বিচার ও কল্যাণের লক্ষ্যে রাসূলের বাণীর মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন আনয়নে আরো বেশী উদ্যোগী হবে এমনটিই কামনা করা হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

عَنْ اِبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ ﺻ قَالَ مَنْ رَاَئى مِنْكُمْ مُنْكَرًا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَبِقَلْبِه ذَالِكَ آضْعَفُ الْاِيْمَانُ ـ (مُسْلِمْ)

"রাসূল (সা.) বলেছেন : 'কোন মন্দ কাজ হতে দেখলে তোমরা হাত দিয়ে তার পরিবর্তনের চেষ্টা করবে, এটি করতে না পারলে কথা দিয়ে চেষ্টা করবে, তাতেও যদি না হয়, তোমার অন্তর দিয়ে চেষ্টা করবে আর এটি সবচেয়ে দুর্বলতম ঈমান।"[৭৮৮]

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্ক নির্ভর করে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির ওপর। এ চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির শর্তাবলী পালন মুসলমানদের জন্য অগ্রাধিকারস্বরূপ। ফয়সাল মওলবীর বক্তব্য অনুযায়ী অনেক আলেমের মতে বিপথগামী বা একনায়ক শাসকের সিদ্ধান্ত মানতেও মুসলমানরা বাধ্য 'যে পর্যন্ত সে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কিছু করে না থাকে।[৭৮৯]

---

৭৮৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, mwnn gmwjg, বাব- বায়ানু কাওনুন নাহিউ আনিল মুনকার, খ. ১, পৃ.৫০, হাদিস নং-১৮৬
অনুরূপ- gmbv' j Rv‡g, খ.১৩, পৃ. ৪৩৮, হাদিস নং-১২৮৪

৭৮৯. ফয়সল মওলবী, Avj Dmj Avk kixq¨v wjj BjvKvZ ev‡qb Avj gmwjwgb I qv Mv‡qe Avj gmwjwgb, পৃষ্ঠাঃ ১০১।

এরূপ পরিবেশে ইসলামী বিধি-বিধানগুলো তার কাজের মধ্যে পড়তে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলামী সূত্রের প্রেক্ষিতে সে যদি কোনরকম চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করে সেখানে সে তার নিজের প্রতি ও নিজের মানুষদের প্রতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ন্যায় কাজই করলো। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের দায়িত্ব হবে সব রকমের বৈধ পন্থায় তার কাছ থেকে অধিকারগুলো আদায় করে নেয়া।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মুসলমানরা তাদের দেশের দুর্নীতিবাজ নেতা বা একনায়কতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতিকে পছন্দ না করলেও ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু চাপিয়ে না দিলে অন্য দেশের সাথে কৃত চুক্তি মানতে বাধ্য। এসব আন্তর্জাতিক চুক্তিও কিন্তু দেশ সফরের ভিসা চুক্তির মত অভিবাসী মুসলিমের (resident) জন্য অনুসরণ বাধ্যতামূলক। এ নিয়ম জাতীয় সংবিধানের অধীনে বসবাসকারী অন্যান্য নাগরিকের জন্যও প্রযোজ্য। এখানে নির্দেশ হলো মুসলমানরা তাদের চুক্তি অনুযায়ী চলতে বাধ্য। তবে এখানে মুসলমানের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে হলে তা হবে ব্যতিক্রম। এখানে কিছু দ্রুত পরিবর্তনকামী মুসলমান এ শর্তগুলোকে সংবিধানের আওতায় পালনযোগ্য নয় বলে মনে করেন। তাদের মতে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক রিবা, মদ (এলকোহল) সংবিধান দিয়ে কাউকে অনুসরণ করতে বলা যায় না। তবে ইউরোপীয় সংবিধানে এ জাতীয় আচরণ বা লেনদেনের বিষয় থাকলেও মুসলমানদেরকে সেগুলো বাধ্যবাধকতার সাথে পালনের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয় না। সেজন্য চুক্তি মোতাবেক মুসলমানদেরকে বিদ্যমান সংবিধান বা আইনকে মানতে হবে কেননা আইন মানার ব্যাপারে মৌন প্রতিশ্রুতি মুসলমানদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রকে দেয়া হয়েছে। তবে মুসলমানদের ঈমান আকীদার বিরোধী বিষয়গুলো পরিহার করে চলতে হবে। কেউ এ কথা বলতে পারে যে, শরীয়ার ইসলামী শিক্ষা ও ফিকহর মধ্য থেকে মুসলমানগণ পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাস করতে পারে। সে হিসাবে বসবাসকারী দেশের আইন কানুনকে সম্মান করা তাদের দায়িত্ব।[৭৯০]

অন্যভাবে বলতে গেলে মুসলমানরা যে দেশে বসবাস করছে সে দেশে বিদ্যমান ইতিবাচক বিধিবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে। সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাস করার ব্যাপারে যে ধরনের মৌন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি দেয়া আছে তার ভিত্তিতে মুসলমানগণ অনুগত্য করবে। ইসলামী আইন ও বিধি-বিধান তাই নির্দেশ করে।

তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে:

---

৭৯০. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, (অনু. শরীফ আব্দুল্লাহ্ হারুন ও অধ্যাপক গোলাম রসুল), gmwjg ivó cwiPvjb e¨e¯v, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮১, পৃ.২২২

প্রথমত, উল্লেখ করতে হয় যে, ইসলামী সূত্রই পশ্চিমা দেশে মুসলমানদেরকে বসবাসের সুযোগ করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান যে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির আওতায় বসবাস করছে। সমস্যা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত সেগুলোকে মেনে চলতে হবে।

তৃতীয়ত, কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, মুসলমানদের সমাধান বের করার জন্য ধর্মভীরু মুসলিম আর দেশের অভিবাসী বা নাগরিক হিসাবে বিশেষ ধরনের গবেষণা করে দেখতে হবে। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহে দেখেছি পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী মুসলমানগণ ইসলামী রেফারেন্সের আলোকে সে দেশের আইনের অপব্যবহার বা আইনের ব্যাপারে কোন রকম প্রতারণা করতে পারে না।[৭৯১]

কোন চুক্তি করা হলে তা পালন করা হবে ইবাদতের শামিল। আবু হানিফাও অমুসলিম দেশগুলোর সাথে রিবার ভিত্তিতে ব্যবসাকে জায়েয বলেছেন, (দার আল হারব এর বেলায় এ কথা বলা হয়েছে)। বিধিবিধান অনুসরণের মাধ্যমেই এরূপ ব্যবস্থা চলতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই মুসলিমরা প্রতারণার আশ্রয় নেবে না।

রাসূল (স.) বলেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ)

অর্থ: "যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৭৯২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (۴۲)

অর্থ: "তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।"[৭৯৩]

মুসলিম হিসাবে নিজের পরিচয় করার উপায় হলো সততা, সাধুতা ও সম্মানের সাথে দায়িত্ব পালন করা আর নাগরিক প্রতিবেশীদের মাঝে ন্যায় বিচারের ইসলামী বাণী প্রচার করা।

ইসলামে সাধারণভাবেই কোন যুদ্ধ করতে বা নিজের মুসলিম ভাইকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছ। এ রুলিং সবসময় আমাদেরকে মেনে চলতে হবে।[৭৯৪]

---

৭৯১. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, Bmj‡g cwZiÿv †KŠkj ('হাদীসে দেফা' নামক বিখ্যাত উর্দু গ্রন্থের বাংলা তরজমা), ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮৪, পৃ.৩৮৭

৭৯২. মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী :Avj-RwgÕAvZ-wZiwghx, দেওবন্দ: দারুল কিতাব, তাবি.হাদিস নং-২৫৮৬

৭৯৩. আল-কুরআন, ২ : ৪২

Dhaka University Institutional Repository

কোন পশ্চিমা দেশের মুসলমানকে যাতে এ জাতীয় কোন বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয় সেজন্য তাকে বিবেকের আপত্তি'র আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কোন কোন মুসলিম নেতার মনোভাব অন্যায্য ও ভুল হতে পারে। তখন পুরো পরিস্থিতির ওপর নিবিড় পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৭৯৪. এক বা একাধিক গ্রুপের অবিচারের বেলায় এটি হতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে: মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন; (৪৯ : ৯)। ন্যায়বিচারের নীতিকে ধ্রুবক হিসাবে ধারণ করতে হবে।

১২.৩: সনাতন চিন্তাভাবনা

ইসলামের প্রথম তিন শতকের সময়ে বিশ্বের ভৌগোলিক বিভক্তি, ধর্মীয় বিবেচনা ও মিত্র শক্তির প্রভাবের কারণে আলেমরা তাদের চার পার্শ্বের বিশ্বকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে ও সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করেন। এ ভাগগুলো অন্ততঃ দু'টো কারণে আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল:

প্রথমত ইসলামী ভূ-খন্ড নির্ধারণ করে তারা এটি ঠিক করতে চেয়েছিলেন যে কোন জিনিসটা একটা স্থান বা জাতিকে ইসলামী করেছে, আর রাজনৈতিক ও কৌশলগত কোন রুলিংগুলো অন্য জাতি বা সাম্রাজ্য থেকে একটা স্থান বা জাতিকে আলাদা করে দিয়েছে?

দ্বিতীয়ত, ইসলামী বিশ্বে বসবাসকারী মুসলমান আর যারা এর বাইরে বসবাস করছে বা ব্যবসায়িক কারণে ইসলামী বিশ্বের বাইরে (যাদের বিশেষ রুলিং প্রযোজ্য হয়) ভ্রমণ করে থাকে আইনগত বিষয় তাদের একটা স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দিয়েছে।

হুদায়বিয়া শান্তি চুক্তির পর (সুল্‌হ আল হুদায়বিয়া) দীর্ঘ পাঁচ[৭৯৫] বৎসর ধরে বিভিন্ন রাজা বাদশার কাছে দূত প্রেরণ ও প্রতিবেশী দেশের সাথে ব্যবহারিক সম্পর্ক দেখে বিশেষ এ ইস্যুর ব্যাপারে ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতগণ চারটি উপকরণের কথা বলেছেন:

১. দেশে বসবাসরত জনসংখ্যা

২. দেশের মালিকানা

৩. সরকারের প্রকৃতি

৪. শাসিত দেশের আইন-কানুন

ওহির আলোকে রাসূল (সা.) নিজকে সমগ্র বিশ্বের বার্তাবাহক হিসাবে ভেবে, ইবনে হিশামের মতে প্রতিবেশী দেশগুলোতে অন্যূন্য নয়জন প্রতিনিধি (দীর্ঘ পাঁচ বৎসরব্যাপী) প্রেরণ করেন। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতো না, বা তাদের নেতারা নতুন ধর্মের বাস্তবতা সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ, তারা অসুষ্ঠু বিধিবিধানের ভিত্তিতে তাদের রুলিং দিতেন। দু'টো অতি পরিচিত ঘটনায় রাসূলের দূতদের প্রতি

৭৯৫. হিজরীর ৬ষ্ঠ বৎসর (সুলহ্ আল হুদায়বিয়্যা) ও দশম হিজরীতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর মধ্যকার সময়।

নেতাদের মনোভাব যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয় (এ দু'টো কারণের কোনটির প্রতিনিধি দলের লক্ষ্য বা প্রতিবেশী জাতিসমূহের শাসন সম্পর্কিত কোন বিষয়ও ছিল না।[৭৯৬]

প্রথম ঘটনাটি ছিল বায়জেন্টাইন সম্রাট আমর আল গাস্সানীর বিরুদ্ধে। আমর আল গাস্সানী রাসূল (সা.) এর দূত হারিস ইবনে উমায়েরকে হত্যা করে।

দ্বিতীয়টি ছিল রাসূলের সামনে পার্সিয়ান রাজা কর্তৃক কুরআনকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা। এ দু'টো ঘটনা যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। অন্য ঘটনাগুলো কোন যুদ্ধ বা বাধাবিপত্তি ছাড়াই নিস্পত্তি হয়। রাসূল (সা.) এর এসব কাজের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। এ যুগে নেতারাই মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে একমাত্র মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। শাসকদের কাছে দিক নির্দেশনা পৌঁছানোর পূর্বে ইসলামের দাওয়াতের কাজ এভাবেই করা হয়ে আসছিল।

রাসূল (সা.) এর তখনকার কাজকর্ম দেখে এটিই প্রতীয়মান হচ্ছিল, তাঁর উদ্দেশ্য জনগণের কাছে যাওয়া। বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ ইসলাম কবুল না করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি, বরং লড়াই করেছেন নির্যাতনের বিরুদ্ধে। জনগণ ইসলাম সম্পর্কে জানবে রাসূল (সা.) এটিই চেয়েছিলেন। এসব ঘটনার পর রাসূল (সা.) তাদের পছন্দকেই গ্রহণ করেন আর তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে দিলেন আর তাদের নিজ নিজ ধর্মকর্ম পালনের সুযোগ দিলেন। নিরাপত্তা দেয়ার বিনিময়ে তাদের রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটা কর (জিযিয়া[৭৯৭]) দিতে হতো।

---

৭৯৬. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৭৯৭. বহুবচনে জিযা, ইমাম রাগীব (মুফ্‌রাদাতুল'র কু'রআন, ঐ শব্দের অধীন)-এর মতেও শব্দটি জাযা' হইতে নির্গত: জিয্‌য়াঃ নামকরন এই জন্য হইয়াছে যে, ইহা হইল যি'ম্মীদের প্রাণরক্ষার বিনিময়। তাফসীরকারদের মধ্যে 'আল্লামাঃ যামাখ্‌শারীর মতে শব্দটির মূল হইল জাযা' এবং ইহাকে এইজন্য জিয্‌য়াঃ বলা হয় যে, যিম্মীদের কর্তব্য সমূহের একটি কর্তব্য যাহা তাহারা পালন করে (আল-কাশ্‌শাফ কায়রো ১৯৪৬ খ.২, পৃ.২৬২), বিস্তারিত- Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৬, খ. ১১, পৃ.৫৭৭

১২.৪: সমস্যাসমূহ

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ দু'রকমের দৃশ্য দেখা যায়: অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো (প্রথম প্রজন্মের জন্য) প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের ইন্ধন যুগিয়ে থাকে। মুসলমানদের স্বকীয়তা রক্ষার জন্য একটি স্বাভাবিক আকাংখার সাথে সাথে মুসলমানগণ পশ্চিমা দেশসমূহে যেসব সমস্যার মোকাবেলা করে আসছে সেগুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় অতি বাড়াবাড়ির সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিমের বর্তমান সামাজিক সমস্যার আয়নায় আধুনিক সামাজিক বিশ্লেষণ, ধ্যান-ধারণার দিক দিয়ে ঔপনিবেশিক প্রচার মাধ্যম, পশ্চিমের দেশগুলোতে ইসলামকে একটি সমস্যা হিসেবে বিবেচনা, উন্নয়ন গণতন্ত্র ও আধুনিকতাকে সমস্যা হিসাবে মনে করা হয়ে থাকে।

গত ২৫ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে মুসলমান সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এর বেশীরভাগ কারণ পশ্চিমা দেশগুলোতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মুসলমান বৃদ্ধি। তাদের অনেকেই স্বকীয়তা ও ইসলামী শিক্ষার আলোকে বাঁচতে চায়। কঠিন শৈশব অবস্থা অতিক্রমের পর তারা তাদের মূল আর তাদের ধর্ম সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শিখেছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে এটি বিরাট এক প্রক্রিয়ার ব্যাপার। প্রায় সব পশ্চিমা দেশেই মুসলিম যুব সমাজের মধ্যে তাদের ইসলামী স্বকীয়তার প্রবণতা এবং গভীর আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম অনুশীলনের ক্ষেত্রে পুনর্জাগরণের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এ ধারণার দ্বারা এটি বুঝায় না যে, মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশীলন পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। যুব মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণাগুলো ইতিবাচক আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। ইউরোপে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য এটি একটি নির্ণায়ক উপাদানের ন্যায় কাজ করে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে, যুব সম্প্রদায় মান্ধাতার আমলের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের অবস্থা থেকে পরিশুদ্ধ ইসলামের দিকে ফিরে আসছে। যারা বেশী শিক্ষিত তাদের জন্য মরক্কো, আলজেরিয়া বা পাকিস্তানী গ্রামাঞ্চলের ইসলাম আর ইসলাম নয়। তারা আজ ইসলামের সূত্র কুরআন ও সুন্নাহর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর দিকে ফিরে আসছে। এটি মৌলিক এক পরিবর্তন। এর কারণ, এটি একদিকে উত্তর আফ্রিকা বা এশিয়ায় ইসলাম ও এর বাস্তবায়নের ওপর এবং অন্য দিকে পশ্চিমা দেশে ইসলামকে বাস্তবে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে, খাপ খাওয়ায়ে নিতে হবে এবং ইসলামের ওপর বাঁচতে হবে-এ দু'য়ের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করে দিয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভর করার জন্য ইসলামের মৌলিক নীতিগুলো জানতে হবে, পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষভাবে ও যথাযথভাবে ইসলামের বাস্তবায়ন করতে হবে। বয়সে তরুণ জনগোষ্ঠী আজ এ বার্তাটিই স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানান দিচ্ছে। নেতিবাচক ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবভঙ্গী দূরীকরণে প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছা থাকলে

এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটলে ইউরোপীয় মুসলমানগণ উলামাকে সাথে নিয়ে গঠনমূলক ও দৃঢ়সংকল্পিত মন নিয়ে নতুন বাস্তবতার মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। এর ফলে পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানগণ ভারসাম্যপূর্ণ সত্তার উন্নয়নে স্পষ্ট নির্দেশনা ও একগুচ্ছ সহজ সরল ইসলামী শিক্ষা লাভে সমর্থ হবে। ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী সত্তা নিশ্চিতকরণ পশ্চিমা মুসলিম সমাজের ভবিষ্যতের অংশ বিশেষ।

এসব উন্নয়ন সত্ত্বেও পরিস্থিতি জটিল এবং আসল চিত্র এতবেশী ইতিবাচক নয়। পশ্চিমা বিশ্বের মুসলিম তরুণরা আরেক নতুন ও সমস্যাপূর্ণ অবস্থার জন্ম দিয়েছে। তাদের নিজেদের মাতৃভূমি থেকে দূরে শিল্পোন্নত দেশে আসা এসব তের হতে উনিশ বছর বয়সী ছাত্ররা মুসলমান হওয়ার একান্ত ইচ্ছা পোষণ করে আসছে আর সঠিক ও সাদাসিধে ইসলামী জবাব ও রুলিং এর গভীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। পটভূমির কারণে তাদের আনুষ্ঠানিক কোন ধর্মীয় শিক্ষা নেই, তারা আরবিতে কথা বলে না, তাদের মধ্যে এসব কারণে একটি ধারণার জন্ম হয়েছে যে, তারা ইউরোপে মুসলমানদের সম্প্রসারণে কোন অবদান রাখতে পারছে না। তারা বিভ্রান্তিমূলক চিন্তার অংশ হিসাবে মনে করে থাকে যে, আইনের মাধ্যমেই সব জবাব দেয়া সম্ভব, আর এ ক্ষেত্রে ফিকহই এসব সমস্যার একমাত্র সমাধান দিতে পারে। ইউরোপীয় তরুণ মুসলমানদের মধ্যে ইদানিং একটি অসুস্থ প্রগতির ছোঁয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এ তরুণরা তাদের নিজেদের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। তারা মনে করছে সঠিক জবাবটা দেশের বাইরের ইসলামী দেশের বড় বড় উলামার কাছ থেকে আসবে।

প্রথম প্রজন্ম বা নবাগত ছাত্র-ছাত্রী বা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের আসার পর গড়ে ওঠা কিছু কিছু মুসলিম সংগঠন এ বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে আসছে যে, ইসলামী রুলিং প্রণয়নে তাদের কোন ক্ষমতা নেই, আর সেইজন্য ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যাবে তা তারা ঠিক করতে পারে না। তাদের এরূপ বক্তব্য প্রকাশ্যে হোক অপ্রকাশ্যে হোক একটা দ্ব্যর্থবোধক সরলীকরণ ও বিকৃত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রথমতঃ এ অবস্থার কারণে তরুণরা মনে করে যে, ইসলামী সত্তা হলো শীতল ইসলামী রূলিং-এ নিজেদের আবদ্ধ রাখা আর কোনটা হারাম আর কোনটা হালাল শুধু তা মেনে চলা। এ ধারণা ভুল। দ্বিতীয়ত, শিশু ও বালকসুলভ ধারণার কারণে ইউরোপীয় সমাজে বসবাস করা ও বড় হওয়া সত্ত্বেও ভাল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে না পারায় এ প্রজন্ম নিজেদের কূপমণ্ডুকতার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। এরূপ অবহেলা অপরাধজনক অবহেলার শামিল।

১২.৫ সম্ভাবনা

আমরা কঠিন ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ একটা সময় পার করছি। চল্লিশ বৎসর পর ইউরোপে মুসলমানদের নতুন উপস্থিতি একটা স্বাভাবিক পরিবর্তনের ফল। যার কারণে স্থানীয় ইউরোপীয় ও মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা টেনশন থাকতেই পারে। তবে সেগুলো লাঘবের লক্ষ্যে ইতিবাচক সহাবস্থানের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবোধ অর্থাৎ সময় ও সহনশীলতার।

আপাত সময়ের জন্য হলেও ইসলামের আবশ্যকীয় শিক্ষাগুলোকে ব্যাখ্যা করা উচিত। এ শিক্ষাগুলোকে প্রয়োগের জন্য এগুলোর বিশ্লেষণ ও শ্রেণীকরণ করা উচিত। মানুষের জীবনে যখন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তখন আমাদের ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কি তা স্মরণ করা উচিত আর এ কঠিন পরিবেশের ধোঁয়াটে আলোতে ইসলামকে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না।

পূর্বে বা পশ্চিমে, উত্তরে বা দক্ষিণে ইসলামের আবশ্যকীয় শিক্ষাই হলো এক আল্লাহয় ঈমান (তাওহিদ) রাসূল (সা.) ও তার পরবর্তীতে কুরআন ও মুহাম্মদ (স.) নিয়ে সমাপ্ত 'আর রাসায়েল আস সামাবিয়্যাতে' বিশ্বাস। মুসলমানদের বিশ্বাস এ জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে, ঐ জীবনে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামের বাণী হলো মহান বাণী আর এর মধ্যে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিকতা।

মুসলমানগণ এর মধ্যেই বাঁচতে চায় আর নিজেদেরকে রক্ষা করতে (protect) চায়। এ আধ্যাত্মিকতা কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। আমরা দেখি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে: কালেমা, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ। রাসূল (সা.) এরশাদ করেন-

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ۔

এ কাজগুলো করার জন্য নিরাপদ স্থানে মুসলমানদের বসবাস করতে হবে, যেখানে ইবাদত করার পুরো স্বাধীনতা আছে আর এ স্বাধীনতা সুনির্দিষ্ট স্বাধীনতা। এটি হলো মুসলমান আর ইসলামের সর্ব প্রথমকার পদক্ষেপ: তাওহিদ, আধ্যাত্মিকতা, ইবাদত। এরূপ ঈমানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আর ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নতুন পরিবেশে মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন।

এগুলোর পরও ইউরোপে মুসলমানদের উপস্থিতির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার আরো অনেক বিষয় রয়েছে। অনৈসলামিক সমাজে থাকার শর্ত ও ইসলামী বিধির একটা স্পষ্ট উত্তর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও

Dhaka University Institutional Repository

এগুলো যথেষ্ট নয়। নতুন সমাজে মুসলমানদের দায়িত্ব ও অধিকার কী তাও নির্ধারণ জরুরী। মুসলমানদের ধর্মকে যেহেতু সম্মানের চোখে দেখা হয় আর তাদের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করা হয়েছে, সেজন্য তারা আজ সমাজের অংশ বিধায় বসবাসকারী দেশের সংবিধান ও আইনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝতে হবে অর্থাৎ পশ্চিমা সমাজের ভূমিকা কি তা বুঝতে হবে। বসবাসকারী দেশের সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোন সীমা বা ব্যতিক্রম কিছু আছে কি না?

পশ্চিমা আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও কুরআন সুন্নাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্যে কোন ভেদ বৈষম্য আছে কি না? একজন মুসলমান কি পশ্চিমা দেশের সত্যিকার ও বিশ্বস্ত নাগরিক হতে পারে?

বা সে কি পশ্চিমা নাগরিকতার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে?

ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানভিত্তিক সে যা-ই হোক এসব দেশের স্কুল ও শিক্ষা, ধর্মীয় ও নৈতিকতার অবস্থা কি হবে?

সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তি, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও অন্যান্য বিষয়গুলোর বিচারে মৌলিক বিভিন্ন প্রশ্নের ব্যাপারে বর্তমানের এ তালিকা আরো দীর্ঘ হবে।

১২.৬: ইসলামী সূত্রসমূহ

পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, যারা ইউরোপে বা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে তাদেরকে কি সেখানে বসবাস করতে দেয়া হবে? যেহেতু এ স্থানগুলো দারুল হারব, অন্ততঃপক্ষে এগুলো দারুল কুফর। এ শব্দের অর্থ অনুসারে পশ্চিমা দেশে বসবাস করা যেতে পারে। এরপরও এ প্রশ্নটিকে আমাদের রেফারেন্সের মর্মে অধ্যয়ন করে দেখতে হবে। এরূপ আলোচনার মাধ্যমে ইউরোপের অবস্থা সম্পর্কে আবার দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১. মুসলমানদেরকে অনৈসলামি দেশে বসবাস করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল কিনা এ জাতীয় প্রশ্ন ইসলামী ফিকহর ন্যায় শুনতে হয়। ইমাম আবু হানিফা (র.) থেকে সমসাময়িক সময়ের উলামা তাদের জবাবে সর্বসম্মত অবস্থায় ছিলেন না। উলামা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, তিনটি ক্ষেত্রের বেলায় মুসলমানরা অমুসলিম পরিবেশে বসবাস করতে পারে না। (১) নির্দিষ্ট কোন প্রয়োজন বা কোন দেশে থাকার জন্য স্পষ্ট কোন সাক্ষ্য না থাকলে (২) থাকার বিষয়টা যখন একেবারে কোন স্বার্থবাদীকারণে হয়ে থাকে, যেমন ভাল একটা চাকুরী বা অনেক টাকা-পয়সা পাওয়ার জন্য বা ইসলামী জীবন ধারাকে

অবজ্ঞা করে শুধুমাত্র পশ্চিমা জীবনধারা অনুসরণের জন্য (৩) মুসলিম যদি অমুসলিম বা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য অমুসলিম দেশের সাথে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়।

অন্যসব ক্ষেত্রে যেমন, কাজ, অধ্যয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য বা নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য কোন মুসলিম অমুসলিম পরিবেশে দু'টো শর্তাধীনে থাকতে পারে : (১) তার শাহাদা অনুশীলনের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকতে হবে; (২) তার অধ্যয়ন ও কাজ দ্বারা তাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রয়োজনীয় হতে হবে। এ বিশ্লেষণের সাথে আমরা আরো একটি শর্ত জুড়ে দিতে পারি। পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী মুসলমান আল্লাহর বাণী আর আধ্যাত্মিকতা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেবে আর অধিক ন্যায়বিচার ও সম্মানের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা করবে।

১২.৭: মুসলমানদের যা করা প্রয়োজন

জ্ঞানের উন্নতি সাধন

অজ্ঞতার কালো আধারে যখন সমগ্র পৃথিবী নিমজ্জিত, মানবতা চরম ভাবে ভূলুণ্ঠিত, ত্রাহি ত্রাহি রবে নিরবে নিভৃত্যে কাঁদছে সভ্যতা। তখন বিশ্ব মানবতার মুক্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই অসভ্য বর্বর জাতিকে সভ্যতার সুশৃংখলে আবদ্ধ করার জন্য মক্কায় অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় ৪০ দিন ধ্যামগ্ন থাকার পর জ্ঞানের উন্নতি সাধন কল্পে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ (١)

অর্থ: "পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[৭৯৮]

ইসলাম জ্ঞানার্জনের জন্য এত বেশি উৎসাহিত করেছে যে, মহিমান্বিত আল-কোরআনের অবতীর্ন প্রথম শব্দটি হলো 'ইকরা' যার অর্থ পড়। অতএব আজ প্রয়োজন হলো মুসলমান ও তাদের সমাজের মধ্যকার পারস্পরিক মৌলিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন।

জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَرْفَعِ اللّٰهُ .يْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (١١)

৭৯৮. আল-কুরআন, ৯৬ : ১

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় সমুন্নত করবেন, তোমরা যাহা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"[৭৯৯]

জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا
اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (١٢٢)٪

অর্থ: "উহাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাহাতে তাহারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করিতে পারে এবং উহাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পারে, যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে যাহাতে তাহারা সতর্ক হয়।"[৮০০]

রাসূল (স.) বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ . (رَوَاهُ اِبْنِ مَاجَةْ)

অর্থ: "ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।"[৮০১]

ঐতিহাসিক ভাবে চলে আসা দায়বদ্ধতা আর বিরাট সংস্কারের কাজ শুধুমাত্র বক্তৃতা আর 'শুভেচ্ছার' একনিষ্ঠ প্রমাণ দিয়ে হবে না। সংঘাতের ধরণ এতবেশী গভীর ও তীব্র যে, মুসলমান ও দেশীয়দের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপনে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এর জন্য দরকার ভাল ধরনের উপলব্ধি, এটি আবার সঠিক আলাপ আলোচনা থেকেই আসতে পারে। যৌথ কর্মকাণ্ড আর আবশ্যকীয় গতিশীল সহাবস্থান এ বোঝাপড়ায় সহায়তা করতে পারে। মুসলিম প্রেক্ষাপট থেকে তারা নিজ দেশে বসবাস করছে এরূপ অবস্থান তাদেরকে অর্জন করতে হবে। তাদেরকে ইউরোপীয় সমাজে বেশী বেশী যুক্ত হতে হবে। ধর্মীয় প্রেক্ষাপট থেকে সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই তাদেরকে নিজের মত করে ভাবতে হবে।

ইসলাম হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মৌলিক অভিব্যক্তি। এখানে আল্লাহর সাথে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আজ ইসলামের এ নেতিবাচক চিত্র মুসলমান ও ইসলামের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য করে ফেলেছে। তাদের নির্ভেজাল আবেগ, ধর্ম অনুযায়ী জীবনযাপন এ আবেগ প্রকাশ থেকে তাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। ইসলাম হলো জীবনের এক ধারণা, ইসলামে আছে বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিকতা

---

৭৯৯. আল-কুরআন, ৫৮ : ১১

৮০০. আল-কুরআন, ৯ : ১২২

৮০১. আবু 'আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজিদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযবীনী, mbv‡b Be‡b gvRvn, বাব-ফাদলুল উলামা ওয়াল
হাছসু আলা তালাব, খ.১ম, পৃ.৮১, হাদিস নং-২২৪

আর জীবনের অর্থের ওপর অনুধ্যান। এটি এক সহজ জীবনের দাবি। মুসলমানেরা আজকের চেয়ে আগামীকাল আরো ভাল থাকবে আর যেকোন মূল্যে তার উদার, সৎ আর ন্যায়বান হবে। এশিয়া ও আফ্রিকায় মুসলমানরা যেভাবে তাদের ধর্মের নীতিগুলোকে পালন করে সেভাবে ইউরোীয় মুসলমানরাও এসব মৌলিক শিক্ষাগুলোর দিকে ফিরে আসবে আর শিল্পোন্নত সমাজে সেগুলোর বাস্তবায়ন করবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজিদে বলেন,

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ

Ò†n gvbl Avwg †Zvgv‡'i‡K mwó K‡iwQ GK ciæl Avi GK bvix n‡Z| c‡i †Zvgv‡'i‡K wef³ K‡iwQ wewfbœ RvwZ I †Mv‡Î, hv‡Z †Zvgiv G‡K Ac‡ii mv‡_ cwiwPZ n‡Z cvi|Ó[৮০২]

এ আয়াতের স্পষ্ট অর্থ অনুযায়ী দেখা যায় বিশেষ জাতির আর বিশেষ গোত্রের লোকদেরকে তাদের সাথী অন্য গ্রুপের লোকদের মধ্য থেকে চিনে নেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে আয়াতের অস্পষ্ট অর্থ হলো, একই জাতির লোকজন নিজেরা নিজেদেরকে চিনে আর এটিকেই স্বাভাবিক হিসাবে ধরে নেয়া হয়। তবে আজ অবস্থা ভিন্ন। পশ্চিমা বহুভিত্তিক জাতির মুসলিম আর অমুসলিম জনগণকে আজ অবস্থাটা বুঝতে হবে আর আবশ্যকীয় একটা অবস্থায় পৌঁছাতে হবে।

আইন-কানুন আর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাদেরকে উদাসীন মনে হয়। তাদের অনেকেই ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট বসবাসকারী দেশের নাগরিক হয়ে গেছে। বছরের পর বছর ধরে তারা সেখানে বসবাস করলেও সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে কিছুই জানে না। আর সে কারণে তারা তাদের অধিকারও ভোগ করতে পারে না। আমরা উপরে ইসলামী রেফারেন্সের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) ইউসুফ (আ) ও হযরত মুসা (আ) এর কথা বলছি, তারা এমন সমাজের অধিবাসী ছিলেন যেখানে সংখ্যাগুরুই ছিল অমুসলিম। এ জাতীয় ভাবধারাকে পশ্চিমা দেশে উৎসাহিত করতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের মধ্যে আমরা সব ধরনের নাগরিক আইন-কানুন উন্নয়ন করবো। এ আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও রাজনৈতিক বিষয়, প্রতিষ্ঠানের কার্যবিধি, ঝুঁকি এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক ভূমিকার

৮০২. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

আমরা উন্নতি ঘটাবো। আর এর মূলে রয়েছে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা-দিক্ষা ও গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

পরামর্শভিত্তিক কার্য-সম্পাদন

ইসলাম সমাজের লোকদের জন্য নিজেদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পন্ন করণে ও নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক পরামর্শ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট লোকদের মত প্রকাশের সুযোগ দান ও উত্তম মতটি গ্রহণের নীতি অনুসরণ জরুরী করে দিয়েছে। জীবন-জীবিকা আহরণ ও উৎপাদন এবং জীবনধারা গ্রহণেও তাই করা কর্তব্য। পরামর্শের গুরুত্ব এত বেশি যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজিদের একটি সূরার নাম রেখেছেন 'সূরা আশ শুরা' । শুর শব্দের অর্থ পরামর্শ করা পরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَشَاوِرۡهُمۡ فِى الۡاَمۡرِ‌ۚ فَاِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُتَوَكِّلِيۡنَ (১৫৯)

অর্থ: "এবং হে নবী! আপনি লোকদের (সাহাবীগণের) সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি যে সংকল্প করবেন, তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেই করে ফেলুন। আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাওয়াক্কুল কারী লোকদের পছন্দ করেন, ভালোবাসেন।"[৮০৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(2) وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

অর্থ: "নিজেদের সামগ্রিক ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে।"[৮০৪]

পরামর্শ সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেছেন,

(৩) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ (اَلْمُعْجَمُ الصَّغِيْرُ)

অর্থ: "হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স.) বলেছেন, যে এস্তেখারা করলো, সে কোনো কাজে ব্যর্থ হবে না, যে পরামর্শ করলো, সে লজ্জিত হবে না আর যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলো, সে দারিদ্রে নিমজ্জিত হবে না।"[৮০৫]

---

৮০৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৫৯
৮০৪. আল-কুরআন, ৪২ : ৩৯
৮০৫. সুলায়মান ইব্নে আহমাদ ইবনে আইয়ুব আবূল কাশেম আত-তাবারানী, Avj-gRvgm mMxi wjZZveivbx, বাব-

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) আরো বলেন,

(4) عَنْ اِبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُ كُمْ وَاَغْنِيَاؤُ كُمْ سَمَحَاؤُ كُمْ وَآمَرُ كُمْ شُوْرَاى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرُؤْ كُمْ شَرَارَ كُمْ وَاَغْنِيَاؤُ كُمْ بُخَلَاءُ كُمْ وَاَمْرُ كُمْ اِلى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ـ (تِرْمِذِى)

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভাল মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরের ভাগ নীচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম।"[৮০৬]

প্রাথমিক যুগের মুসলিম সেনাপতিগণ দাওয়াতনামা পাঠানোর পর তিনদিন অপেক্ষা করতেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হত। অন্তবর্তীকালীন সময়ে শত্রুপক্ষ আলাপ-আলোচনা চালাতে প্রস্তুত থাকলে মুসলমানগণ তাতে সম্মত হতেন। এসব আলাপ-আলোচনার ফলে অনেক সময় শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হত, কিন্তু মতবাদের বিভিন্নতার ফলে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেত এবং তার অব্যবহিত পরেই লড়াই শুরু হয়ে যেত। এসব আলোচনার প্রকৃতি সম্পর্কে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে কাদেসিয়ার যুদ্ধের (৬৩৭ খৃষ্টাব্দ) পূর্বে মুসলমান ও তাঁদের শত্রুপক্ষের পরস্পর আলাপ-আলোচনার মধ্যে। এ আলোচনা আরবসেনাপতি সা'দ বিন ওয়াক্কাস ও পারস্যসেনাপতি রুস্তমের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আল-মুগীরা বিন শু'বার নেতৃত্বে সা'দ বিখ্যাত যোদ্ধাদের একটি দলকে রুস্তমের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য পাঠিয়ে দেন।

তাবারীর বর্ণনায় পারসিক ও বাইজান্টীয়দের সাথে আলোচনার যে বর্ণনা রয়েছে, ওপরের আলোচনা থেকে তা খুব আলাদা নয়। মিসর বিজয়ের সময় মুসলামানদের সঙ্গে মিশরীয়দের যে আলাপ-আলোচনা হয়, তাও প্রায়ই একই ধরনের্ ইবনে আবদুল হাকামের বর্ণনায় জানা যায় যে, মিসরের প্রধান খৃষ্টান যাজক মুসলিম সেনাপতি আমর বিন আসের কাছে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার আহ্বান জানিয়ে এক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে দেন। আমর ওই আহ্বানে সাড়া দেন। যদিও গোড়ার দিকে আলাপ-আলোচনা সফল হয় নি, তবু পরিশেষে কপটগণ মুসলমানদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছেছিল। দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিকরা চুক্তির

মিন ইসমুহু মুহম্মদ, খ.২, পৃ. ১৭৫, হাদিস নং-৯৭৯

৮০৬. জামে তিরমিযী, বাব- সা-ইয়াকুনু আলাইতু, আয়িম্মাহতুন তা'আরিফুনা, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.১৬, হাদিস নং-২৪৩৫

ধারাগুলো ছাড়া আর কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নি। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আলাপ-আলোচনার কথোপকথনের ধারা সম্পর্কে কোন বর্ণনাও তারা দেন নি।

আরবের বাইরে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাইজান্টীয়দের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ব্যাপারেও বার বার আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রুসেডের সময় প্রাক-যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা সাফল্যজনকভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। এ সব আলোচনার মধ্যে যুদ্ধবন্ধীদের মুক্তি, যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের জোট অথবা মুসলমান ও ফরাসী শাসনকর্তাদের সঙ্গে সম্মিলিত জোট প্রভৃতি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। কখনও কখনও এ সব আলোচনার ফলে হয়ত বহুদিন অবরোধের পর বা শান্তি চুক্তি সম্পাদনে যুদ্ধের আংশিক পরিসমাপ্তির পর একটি শহরের ওপর দখল ছেড়ে দেয়া হত।

মুসলমানদের পালনীয় বিষয়

সহাবস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অর্থ ‘বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শান্তি’ না হয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একত্রে বসবাসের মধ্যে হবে। এর অর্থ ইউরোপীয় মুসলিম সমাজ নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বেশকিছু সংস্কারের কাজ করবে, এ কাজগুলোর জন্য অনেক কিছু করার আছে। এটি একটি চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর অংশগ্রহণ করতে হবে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। এটি যে ইউরোপ মহাদেশে মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্যই শুধু প্রয়োজন তা নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাথে আলোচনার পূর্ব শর্তগুলোকে প্রকৃত আলোচনার স্বার্থে সামনে নিয়ে আসাই এর লক্ষ্য। ইউরোপীয় মুসলিমের অঙ্গীকারের কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হবে।

আন্তঃসাম্প্রদায়িক আলোচনা

যুদ্ধমান পক্ষের সঙ্গে অবৈরীমূলক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আন্তঃ সাম্প্রদায়িক আলোচনা একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয়। ইউরোপের মুসলমানদের জন্য বহুত্ববাদী সংস্কৃতির পথ অনুসন্ধান করা জরুরী হয়ে পড়েছে। ইসলামের প্রথম থেকেই বহুত্ববাদী সমাজে মুসলিম সমাজের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। মুসলমানদের মধ্যকার একত্ববোধের যে ধারণা তাদেরকে জড়িয়ে আছে তা যথেষ্ট নয়। একতাবদ্ধ হয়েও তারা প্রতিদিনই অনুভব করছে আলোচনা শুরু করা কত কঠিন বা পরস্পর সহযোগিতা করা কত অসম্ভব। আসল ব্যাপার হলো শান্তির সময়ের চেয়ে বিবাদের সময়ে একতাবদ্ধ হওয়া অনেক বেশী সহজ। এত

কিছুর পরও দেখা যায় সমাজ বা রাষ্ট্র আমাদেরকে আপেক্ষিক সামাজিক শান্তি দিয়েছে। এরপরও আমরা বিভাজনের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, ক্ষমতা আর আনুগত্য প্রদর্শনের ব্যাপারে সীমাহীন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছি।

তবে আমাদেরকে এতবেশী সহজ সরল হলে চলবে না। ইউরোপীয় সমাজের সব নেতার উদ্দেশ্য যে খাঁটি ও নির্ভেজাল তা কিন্তু নয়। এদের কেউ কেউ ক্ষমতার ভালোবাসা আর সম্মানের লোভে আচ্ছন্ন আবার অন্যরা বিদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৮০৭]

চর্চাকারী মুসলিম আর অচর্চাকারী মুসিলমের পার্থক্য বা যথার্থ অর্থে ইসলামী আর অনৈসলামিক সংঘের মধ্যেকার পার্থক্য অর্থহীন। এখানে নীতি স্পষ্ট, কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম মনে করলে তাকে আমাদের মুসলিম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরুর পক্ষ হয়ে কথা বলতে পারে। সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে। কারো সাথে আলোচনা বা কারো কথা শুনে যে তা করতে হবে তা নয়। পরের কথা হলো, প্রদত্ত মতামতকে মতামত হিসাবেই নিতে হবে। কেউ কথা বলতে চাইলে তাকে বলতে দিতে হবে। রাসূল (সা.) ই আমাদেরকে এটি শিখিয়েছেন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা সংগঠনে সংগঠনে আর আন্তঃসম্প্রদায়ের মধ্যেকার বৃহত্তর পরিসরে আলোচনা শুরু করা আজ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ আলোচনায় সবার সাথে একমত হওয়া স্পষ্টতই অসম্ভব। এরপরও পরস্পরের সাথে আলোচনা শুরু করা আমাদের দায়িত্ব। আল্লাহ্‌ পবিত্র কোরআন মাজিদে[৮০৮] এবং রাসূল (সা.) হাদিস শরিফে পরস্পর পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করার আদেশ দিয়েছেন।

অর্থনৈতিক নির্ভরতা

উন্নত দেশে বিশেষ করে ইউরোপে মুসলিম গমনের একটি বিবর্তন চলছে। প্রথম বৎসরগুলোতে এ ধারা স্বাভাবিক ছিল। এ সময়ে মুসলমানদের নিজ দেশে নিজেদের আর কখনো কখনো সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সক্ষমতা দেখানোর প্রশ্ন জড়িত ছিল। বর্তমানে আর তেমনটি নেই। এখন দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মের মুসলিম সংগঠনগুলো নিজেদের অর্থেই সংগঠিত হচ্ছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সময়ে, সভা-সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খরচ মেটানোর লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রবেশ ফি বাবদ চাঁদা আদায় করা হয়। সরকারের বড় বড় প্রকল্প এখন আর গ্রহণ করা হয় না। এরপরেও বিভিন্ন মসজিদ, ফাউন্ডেশন বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোন কোন রাষ্ট্র ইউরোপে ইসলামী কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

৮০৭. তারিক রমাদান, (অনু. এম রুহুল আমিন), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
৮০৮. আল-কোরআন, ৩: ১৫৯, ৪২:৩৯

মসজিদ বা মাদরাসার বিষয়টি সুপরিচিত বিষয় হলেও এখন ইউরোপে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করে না। সৌদি আরব, মরক্কো, আলজেরিয়া বা তুরস্কের ন্যায় তহবিল দাতা অন্যান্য দেশ ধীরে ধীরে প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। বছর বছর এ প্রথা চলে আসছিল। অনেক মসজিদ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থে পরিচালিত হতো। এভাবে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ছিল বিরাট। বিরাট অংকের অর্থের কারণে এ সংগঠনগুলো ছিল স্বাধীন। সংগঠনগুলো বর্তমানে মসজিদের মালিকানা পেয়েছে। অতএব, মুসলমানদের ভিত অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য অর্থনৈতিক নির্ভরতার কোন বিকল্প নাই।[৮০৯]

সঠিক পদমর্যাদা নির্ধারণ

বিদেশী আধিপত্য বা প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার পরপরই মুসলিম ব্যবস্থাপনার আওতায় যতটুকু সম্ভব ইসলামী নীতিমালার দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। শূরা বিষয়টি মুসলিম সমাজে যথেষ্ট মাত্রায় আলোচিত হলেও দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এর তেমন একটা ব্যবহার হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে এখানো একটা সংগ্রাম চলে আসছে 'শীর্ষ' পদে থেকে তাদেরকে পরিচালনার দায়িত্ব কে নিবে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বিভাজনের ঝুঁকি এসে যায়। আমরা আজ কি করবো এটি নির্ধারণ করাই আমাদের জন্যে দুর্ভাগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা বারবার বলেছি, মুসলিম প্রসঙ্গটা ইদানিংকার। একনায়কত্ব বা বহুত্ববাদ ছাড়া দু'বা তিন প্রজন্মের মধ্যে মুসলমানরা সংগঠিত হয়ে যাবে তা আমরা আশা করতে পারি না। সংগঠিত হওয়ার জন্য সবার কথা বলে একা একা সিদ্ধান্ত নেয়ার ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ না করলে তা হবে না। ইসলামে ইমাম হিসাবে যিনি সামনে দাঁড়াবেন তাকে পেছনে দাঁড়ানোদের দ্বারা পছন্দকৃত হতে হবে। এ অবস্থায় সামনেরদেরকে যোগ্য হতে হবে। কাউকে পছন্দ করতে হবে আবার কেউ পছন্দকৃত হবে। তাই মুসলমানদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় নিজেদের শানিত করে নিজেরদ পদমর্যাদা নিজেদেরকে ঠিক করে নিতে হবে।[৮১০]

যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন

আমরা যখন স্বীকার করি যে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাস করলেও আমরা স্বদেশে আছি তখন যথার্থ অর্থে আমাদের অবস্থানের কর্মপদ্ধতিগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সমাজ ও নগর জীবনের মুসলমানদের আরো বেশী অংশগ্রহণকে ভেবে দেখতে হবে। অন্যসব 'জাতীয় নাগরিকের' ন্যায় মুসলমানদেরকে নাগরিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রমের সংজ্ঞায়িত বিষয়ের সাথে আরো বেশী সম্পৃক্ত হতে হবে। বর্তমানের

---

৮০৯. ড. মুহম্মদ হামিদুল্লাহ, অনু. শরীফ আব্দুল্লাহ্ হারুন ও অধ্যাপক গোলাম রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
৮১০. শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫, পৃ. ১৬১

শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোর নাগরিক দায়িত্ববোধ ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি মারাত্মক ও প্রাসঙ্গিকভাবেই উদ্বেগের কারণ। মুসলিমদের মধ্যে নেতিবাচক অনুভূতির ঝুঁকিটা বেশী দেখা যায়। মুসলিমদেরকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। বসবাসকারী দেশের ইতিহাস বিষয়ে মুসলমান নারী-পুরুষদেরকে আগ্রহী হতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে তার ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে স্থানীয় ও শহরসহ জাতীয় ও সরকারী পর্যায়ে মুসলিম নারী-পুরুষকে অংশগ্রহণ করতে হবে। গভীর দায়িত্ববোধে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণের অধিকার বিষয়ে আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি করাই হবে এ মুহূর্তের কাজ।

এসব সুশীল প্রশিক্ষণ ও নাগরিকের দায়িত্ববোধের কিছু ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে। এগুলো এতই মারাত্মক ধরনের যে, আমরা যথেষ্ট পরিমাণ মনোযোগ না দিলে ভবিষ্যতের বহুত্ববাদী কার্যক্রমে এগুলো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে যেমন বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তেমনি নির্বাচনের সময় খাঁটি নাগরিকের সঠিক মানদণ্ডের প্রয়োজন হয়। নির্বাচনে প্রার্থীর জন্য প্রয়োজন তার সততা ও যোগ্যতা। প্রার্থী মুসলিম হোক আর না হোক সবার জন্যই এ মানদণ্ড প্রযোজ্য। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে যেখানে নিজেদের মধ্যে বা অন্যের বিরুদ্ধে অভিব্যক্তি প্রকাশের স্থান বা সাম্প্রদায়িক আশা আকাংখা প্রকাশের সুযোগ হিসাবে মনে করি আমরা এরূপ আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবকে পরিহার করে চলবো।[৮১১]

১২.৮: একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য বর্তমানে যা প্রয়োজন

বর্তমান বিশ্বে একান্ত প্রয়োজন এমন এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবে ন্যায় এবং স্থায়ী শান্তি। এ ব্যবস্থায় থাকবে না জুলুম, থাকবেনা অত্যাচার। এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে। এ ব্যবস্থা পৃথিবীর মানুষের নিজেদের ন্যায়সংগত ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনকে ঢেলে সাজাবার সুযোগ দেবে। এ ব্যবস্থা সমগ্র পৃথিবীতে একটি ফেডারেল অথবা কনফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। যে সরকারের থাকবে একটি নির্বাহী ও নীতি প্রণয়নকারী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার উপর ন্যাস্ত থাকবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব। এটাকে সাহায্য করবে প্রণীত আন্তর্জাতিক আইন। এ ব্যবস্থায় থাকবে বিচারের পদ্ধতি। এ বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় এবং ব্যক্তি যাতে ন্যায় বিচার পেতে পারে-তা নিশ্চিত করা হবে। এরূপ একটি ব্যবস্থা ছাড়া পৃথিবীতে কখনো শান্তি আসতে

৮১১. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, রাসুল (স) এর সরকার কাঠামো: প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

পারে না। ফেডারেল বিশ্ব সরকারের স্বার্থে জাতি রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ সার্বোভৌমত্বের দাবী ত্যাগ না করলে ন্যায় বিচার এবং শান্তির ব্যাপারে কখনো আশ্বস্ত হওয়া সম্ভব হবে না।

গঠন কাঠামো যাই হোক না কেন, একটি বিশ্বসরকারের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান পৃথিবীতে অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে আনবিক অস্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনসংখ্যার ঘটেছে বিস্ফোরণ। আণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডারের মওজুদ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে পরাশক্তিবর্গের পৃথিবীর সম্পদ গ্রাস করার লোভ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মানব জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ঘৃণা এবং অসন্তোষে হচ্ছে বিক্ষুব্ধ যা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্যের দ্বারা আনীত এবং বিগত দুই শতাব্দী যাবত তাদের দ্বারা ঠেকিয়ে রাখা এ বিশ্ব ব্যবস্থা আর টিকে থাকতে পারে না। এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হবে। অথবা শান্তিপূর্ণ এবং যৌক্তিকভাবে ঘটাতে হবে এতে পরিবর্তন। আর এ পরিবর্তন অনিবার্যভাবে প্রয়োজন মানবতার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য।

আর্নোল্ড টয়েনবির রূপক উপমা দিয়ে বলা যায়, পৃথিবী নামক এ গ্রহের অধিবাসীবৃন্দ কাজ করে ভেড়ার মত এবং লাফ দিয়ে বাঁধ পার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুর কোলে। এটা করার পেছনে এমন কোন যুক্তি সংগত কারণ নেই। এটা করে শুধু তাদের নেতাদের অনুসরণের জন্য। আর যদি বিবেকবান সৃষ্টি হিসাবে তারা কাজ করতে চায় তাহলে তাদের জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা পরিত্যাগ করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং বিনির্মাণ করা এবং এর বাস্তবায়ন সম্প্রসারিত করাই হল মানবতার প্রথম কর্তব্য। কিন্তু ইসলাম ব্যতীত মানবতার কাছে বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য অন্য কোন উত্তরাধিকার নেই।

কেবলমাত্র অতি সাম্প্রতিক কালে জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য এরূপ একটি আইনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। এ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হল বিশ্ব মানবাধিকার বিল। এ বিলটিতে এমন অনেক কল্যাণকর দিক রয়েছে যেগুলোর আবেদন সত্যিকার অর্থে বিশ্বজনীন এবং যেগুলো প্রকৃত অর্থেই মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলো কাঙ্ক্ষিত আদর্শ হতে এখনো রয়েছে অনেক দূরে। এ বিলে যেসব মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার কিছু অংশ হল সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত। এগুলো ঐ সমস্ত সাক্ষী গোপাল রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে যে সমস্ত রাষ্ট্র তাদের জনগণ বা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। মানবাধিকারের সনদ তার প্রবক্তাদের দ্বারাই হয়েছে পদদলিত। তারা এটাকে তাদের শত্রু বা প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা যুদ্ধের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছে। এটা কখনো আদালত পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করেনি যার আওতায় ভুক্তভোগীরা তাদের দুঃখ দুর্দশার আওয়াজ তুলে মানবাধিকার

লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার অর্জন করতে পেরেছে। এভাবে সনদটি আজ পর্যবসিত হয়েছে নিছক কাগজের লেখায় ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে, যখন মানবাধিকারের লংঘন পরাশক্তি এবং তাদের মিত্রগোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে। এ সনদ আজ শুধু প্রচারণার কৌশল বলেই মনে হয়।

ইসলাম এবং এর অনুসারীবৃন্দ একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ বলে নিজেদেরকে মনে করে। বর্তমান সংকটের প্রেক্ষিতে এ অঙ্গীকারকে স্মরণ করে যাওয়া যথাযথ বলে গণ্য করে। কারণ এরই মাধ্যমে আমরা ঐ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারি যিনি সমগ্র মানবজাতিকে শান্তির রাজ্যে প্রবেশের নির্দেশ প্রদান করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন মানবজাতির জীবন ও কার্যাবলীকে ন্যায়নীতি এবং দায়িত্বশীল ভ্রাতৃত্বের অমীয় ধারায় বিন্যাস করার জন্য।

দ্বিতীয়ত মানব জাতিকে বর্তমান কালের সীমাহীন প্রতিযোগিতা এবং নিরর্থক দুঃখ দুর্দশার কবল এবং ভবিষ্যতের অনিবার্য ধ্বংসলীলার হাত হতে রক্ষা করার এটাই একমাত্র উপায়। সুতরাং শান্তি-সুবিচার এবং ভ্রাতৃত্বের এক বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতি মুসলমানদের এ অঙ্গীকার একাধারে ধর্মীয় এবং একান্ত প্রয়োজনীয়।[৮১২]

৮১২. এ.জে. এম শামসুল আলম, Bmjvgx iv6, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পররাষ্ট্রনীতি বর্তমান সময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি দেশ কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একা পথ চলতে পারে না। দেশটিকে অবশ্যই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা, ঋণ সংস্থার সদস্য, চুক্তি, আত্মারক্ষা, নিজের দেশের স্বাধীনতা-স্বকীয়তা রক্ষা, আত্মমর্যাদাকে সমুন্নত করা প্রভৃতির মাধ্যমে চলতে হয়। আর ইসলামে এসব বিষয় অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম সার্বজনীন বিশ্বধর্ম। ইসলাম তার অনুপম আদর্শ ও যুগোপযুগী বিধানকে জয় করে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যার কারণে ইসলামের সম্পর্ক মানব জীবনের সর্বত্র। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষকে ইসলামের বিধি বিধান পালন করতে হয়। ইসলাম এমন একটি জীবন বিধানের নাম যার শুরুটা বিশ্বাস দিয়ে এবং যার বাস্তবায়ন হৃদয়ের ঐকান্তিক একাগ্রতা দিয়ে।

ইসলামে তথা কুরআন সুন্নাহে অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হয়েছে, পররাষ্ট্রনীতি দুইটি রাষ্ট্রের পরস্পরিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, রাষ্ট্রদূতদের গুণাবলী ও কার্যাবলী দুইটি রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, শান্তিপূর্ণ আলোচনা, সন্ধি-চুক্তি, সনদ প্রণয়ন, বন্দী বিনিময়, যুদ্ধ বন্দীদের সাথে আচরণ, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। এ কারনেই ইসলামের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ ইসলামের প্রচ্ছন্ন ভাবধারা ও প্রভাব সঞ্চারিত হয়ে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি অঙ্গীভূত হয়ে যেতে দেখা যায়। বস্তুত: ইসলাম একটি অনুপম জীবনাদর্শের নাম। ইসলাম তার অপূর্ব আদর্শিক ও দার্শনিক রূপরেখা নিয়ে সব জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের হৃদয় জয় করতে যেমন সক্ষম হয়েছে তেমনি পররাষ্ট্রনীতির সঠিক রূপরেখা প্রনয়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে ইসলাম বিশ্ব মানবতাকে অনন্তকাল সঠিক ও যথাযথ পথ দেখিয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যে বৈরী সম্পর্ক বিরাজ করছে তাতে বিশ্ব আজ এক অগ্নিগর্ভের দ্বারপ্রান্তে নিপতিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্তনাদ, বীভৎস মৃত্যু, বিশেষ করে অগণিত মাসুম শিশু, অসহায় নর-নারী ও প্রবীণদের মৃত্যু, শহর-বন্দর, লোকালয়, বনভূমিসহ সর্বত্র যে নিষ্ঠুর ধ্বংস লীলা চলছে তা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব বিনির্মাণে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করা অতি জরুরী সময়ের দাবী।

বক্ষমান অভিসন্দর্ভ ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রকে শান্তিময় বিশ্ব গঠনে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি কার্যকরের প্রেরণা যোগাবে-এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আরো বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। মহান আল্লাহ্ আমাকে ও অভিসন্দর্ভের পাঠককুলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআন ও তাফসীর			
১	আল-কুরআনুল কারীম		
২	আল কুরআনুল কারীম (অনূদিত)	:	সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ২০০২
৩	Avj-KziAvb cwiwPwZ	:	সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকাঃ ইফাবা১৯৯৫ খৃ.
৪	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল আনসারী আল কুরতুবী	:	Avj-Rwg wj AvnKvg Avj-KziAvb Kvq‡iv: দার আল-কুতুব আল'আরাবী, ১৯৬৭ খৃ. ২য় খণ্ড
৫	আশরাফ আলী থানবী (র.)	:	evqvbj KziAv‡bi সরল অনুবাদ, ৬ষ্ঠ পারা, ঢাকাঃ এমাদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ১৯৯৬
৬	ইবন কাছীর	:	তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম, বৈরুত দার-উ-এহইয়াইত তুরাস আল-'আরাবী, ১৯৯৭ খৃ.
৭	হাফেজ আল্লামা ইমামুদ্দিন ইবনু কাসীর (র.), অনু. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান	:	Zvdwm‡i Be‡b Kwmi, ঢাকাঃ ১৯৯৬
৮	কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) অনু. মাওলানা এ.বি.এম মাঈনুল ইসলাম	:	Zvdmx‡i gvhnvix, ঢাকাঃ সেরহিন্দ প্রকাশন, ১৯৯৯
৯	মাহমুদুল হাসান (র.) ও শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) অনু. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম	:	Zvdmx‡i Dmgvbx, খ.২, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৭
১০	নাসির উদ্দীন আল-বায়যাভী	:	AvbIqviæZ Zvbhxj Iqv AvmiviæZ Zvôexj, বৈরুত:দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খৃ.
১১	মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.): অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান		Zdmx‡i gvôAv‡idj-†KviAvb, খ. ৪, ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৬

১২	মুফতী মুহাম্মদ শফী	:	Zvdmx‡i gvÔAwidj KiAvb: অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহীউদ্দিন খাঁন, মদিনা মোনাওয়ারা; বাদশা ফাহাদ কুর'আন প্রকল্প ১৪১৩ হি.
১৩	স্যাইয়েদ কুতুব শহীদ: অনু. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ	:	Zvdmxi dx whjwjj †KviAvb, খ. ৯, আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ কার্যালয়, মগবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮
১৪	Muhammad Asad	:	*The Message of THE QUR'AN* Gibraltar: Dar Al-Andalus, 1980
	আল-হাদীস ও হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ		
১৫	আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ	:	mbvbb-bvmvC, দেওবন্দ: দারুল কিতাব, তাবি.
১৬	আবুল কাসেম আত-তাবারানী	:	Avj-gÔRvgj Kvexi, বাগদাদ: মাকতাবুল উম্মাহ, তাবি.
১৭	আহমদ বিন হুসাইন আল-বায়হাকী	:	ïÔAvej Cgvb, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি.।
১৮	আবু আবদুল্লাহ আল হাকিম	:	Avj-g¯Ív'ivK Avjv mwnnvCb, বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, তাবি.
১৯	আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বাল	:	gmbv‡' Avngv', বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৬৯ খৃ.
২০	আলাউদ্দীন আলী আল-মুত্তাকী	:	Kvbhj D¤§vj, বৈরুত: মুআসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি.।
২১	ইবন হিব্বান	:	mnxm Beb wneŸvb, বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১২ হি.
২২	ওলীউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ওরফে খতিব তাবরেযী	:	wgkKvZj gvmvexn, বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, ১৯৮৫ খৃ.

২৩	বদরুদ্দীন 'আইনী		Dg'vZj Kvix, শারহু সহীহুল বুখারী, মিসরঃ মাকতাবাতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৯২ হি. ১৯শ খন্ড
২৪	মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী	:	mnxûj eLvix, দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তাবি.
২৫	মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ	:	mnxm gmwjg, দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তাবি.
২৬	মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী	:	Avj-RwgÔAvZ-wZiwghx, দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তাবি.
২৭	মুহাম্মদ ইবন মাজাহ	:	mbvb Beb gvRvn, দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তাবি.
২৮	মাজিদুদ্দীন আবু সাআদাত আল মোবারক ইব্নে মুহাম্মদ আল জাজরী ইবনুল আছির, (মৃ. হি. ৬০৬)	:	RwgDj Dmj wd Avnw'wmi ivmj (mv.)
২৯	সম্পাদনা পরিষদ	:	nv'xm I mvgwRK weÁvb, ঢাকাঃ ই.ফা.বা.২০০৪ খৃ.
৩০	আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস	:	mbvb Avex 'vD', দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, তাবি.
৩১	হাফিজ আলী ইবন উমর	:	mbv‡b 'v‡i KZbx, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৮৬ হি.
			আল-আকাঈদ
৩২	আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	:	Avgv‡'i mdx-mvaK, ঢাকাঃ মডার্ণ লাইব্রেরি, ১৯৭৪ খৃ.
৩৩	ইমাম গাযালী	:	GnBqvD Djg Ïxb, কায়রো, লুজনাতুস সাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ ১৩৫৭ হি. ২য় খণ্ড
৩৪	রশীদ আহমদ	:	evsjv‡'‡ki mdxmvaK, ঢাকাঃ মডার্ণ লাইব্রেরী, ১৯৭৪ খৃ.
৩৫	ড. রশীদুল আলম	:	gmwjg 'k‡bi fwgKv; ঢাকাঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৯
৩৬	সম্পাদনা পরিষদ	:	‰'bw›'b Rxe‡b Bmjvg, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ৯ম সংস্করণ, ২০১০ খৃ.

আল-ফিকহ			
৩৭	মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-হাসকিফী	:	Av‘-‘iiæj gLZvi kviû Zvbfxwij AveQvi, মিসরঃ মাকতাবাতুল বাবী আল-হালাবী, ১৯৬৬ খৃ. ৫ম খণ্ড
৩৮	বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী	:	Avj-wn‘vqvn, দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে থানুবী, তাবি), ১ম খণ্ড
সিরাত গ্রন্থ			
৩৯	আকরাম ফারুক (অনু.)	:	mxiv‡Z Be‡b wnkvg, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮ খৃ.
৪০	ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ	:	nhiZ ivm‡j Kwig (mv.) Rxeb I wkÿv, ঢাকাঃ ইফাবা ১৯৯৭ খৃ.
৪১	শায়খুল হাদীস মাও. তফাজ্জল হোসাইন ও ড. এ এইচ এম মুজবতা হোসাইন (সম্পা).		nhiZ gnv¤§‘ g¯Ídv (mv.) mgKvjxb cwi‡ek I Rxeb, ইসলামিক রিসার্চ ইনিস্টিটিউট বাংলাদেশ ১৯৯৮ খৃ.
৪২	আল্লামা শিবলী নুমানী (রহ.) অনু. এ কে এম ফজলুর রহমান মুন্সী	:	wmivZb bex (mv.) খ. ৭, ঢাকাঃ বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি. ১৯৯২ খৃ.
পররাষ্ট্রনীতি ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর লিখিত গ্রন্থ			
৪৩	আবু সাঈদ মুহাম্মদ উমর আলী	:	Bmjv‡g cwZiÿv †KŠkj (‘হাদীসে দেফা’ নামক বিখ্যাত উর্দু গ্রন্থের বাংলা তরজমা) : ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮৪ খৃ.
৪৪	ড. আব্দুল হামিদ আহম্মদ আবু সুলাইমান, অনু. অধ্যাপক মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার,	:	Bmjvg I AvšÍRwZK m¤úK : ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (BIIT),২০০২ খৃ.
৪৫	মোঃ আবদুল হালিম	:	AvšÍRwZK m¤ú‡Ki gjbxwZ (*Principles of International Relations*), : ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩ খৃ.

৪৬	মো. আবদুল হালিম	:	AvšÍRvwZK m¤úK (msw ÿß BwZnvm) *A Short History of International Relations*: ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩ খৃ.
৪৭	মো. আকরামুজ্জামান	:	AvšÍRvwZK mgm¨v I wek¦ ivRbxwZ (*International Issues & The World Politics*) : ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন, ১৯৯৬ খৃ.
৪৮	সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	:	ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ : ঢাকা, ১৯৮৫ খৃ.
৪৯	আবুল কালাম	:	Kg¨wb÷ ciivóbxwZ g‡¯‹v- †eBwRs- n¨vbq, : XvKv: Xwe, 19৮৭ খৃ.
৫০	মো. আবদুল হালিম ও ফেরদৌস হোসেন	:	¯vq-h‡×vËi AvšÍRvwZK ivRbxwZ; ঢাকা: বুকস্ ফেয়ার, ২০১১ খৃ.
৫১	আবুল কালাম	:	BD‡ivcxq ivRbxwZ I KUbxwZ (1815-1871) : ঢাকা: ঢাবি, ১৯৮৮ খৃ.
৫২	ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী	:	ivmj (mv.) Gi miKvi KvVv‡gv, : ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪ খৃ.
৫৩	কাজী জাহেদ ইকবাল	:	evsjv‡`‡ki ciivóbxwZ (1971-2001),: ঢাকাঃ জাতীয়, গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১১ খৃ.
৫৪	নির্মলকান্তি ঘোষ	:	AvšÍRvwZK m¤úK : Qvqv cKvkbx, (কলিকাতা: ১৯৯০ খৃ.
৫৫	তারিক রমাদান	:	অনু. এম রুহুল আমিন,gmwj‡gi BD‡ivc : ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামি থ্যট (BIIT), ২০০৮ খৃ.
৫৬	মজিদ কাদ্দুরী অনু. অধ্যাপক হাসান জামান,	:	Bmjv‡gi ‘wó‡Z kwšÍ I h×, ঢাকাঃ জ্ঞান বিতরণী প্রকাশনী, ২০১০ খৃ.
৫৭	মফিজুল্লাহ কবীর	:	Bmjvg I wLjvdZ, : নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা: ১৯৭৪ খৃ.
৫৮	মফিজ চৌধুরী	:	বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভায়.....ইউপিএল, : ঢাকা:১৯৯১ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

৫৯	রতন লাল চক্রবর্ত্তী	:	evsjv‡'k-evgv m¤úK ; ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪ খৃ.
৬০	ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী	:	evsjv‡'k fviZ m¤úK I cveZ¨ PÆMvg; ঢাকা:সূচীপত্র প্রকাশনী, ২০০৪ খৃ.
৬১	শামসুল আলম	:	Bmjvgx ivó, : ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫
৬২	সম্পা. জেড এম শামসুল আলম অনু. মনঞ্জুর আহসান,	:	nhiZ Avjx (iv.) Gi GKwU ¸iæZcY ckvmwbK wPwV, ঢাকা: ইফাবা, ২০০৮ খৃ.
৬৩	এ.জে. এম শামসুল আলম,	:	Bmjvgx ivó, : ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৬ খৃ.
৬৪	ড. মোহাম্মদ সেলিম	:	evsjv‡'k-fviZ m¤úK (1971-1981), : ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৯ খৃ.
৬৫	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	:	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৬তম সংশোধনী অক্টোবর ২০১১, ঢাকা)
৬৬	হ্যারল্ড নিকোলসন অনু. আরশাদ আজিজ	:	KUbxwZi e¨v, (*Diplomacy*)-ঢাকাঃ সূচীপত্র প্রকাশনী, ২০১২, ১ম সং.
৬৭	ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, অনু. শরীফ আব্দুল্লাহ্ হারুন ও অধ্যাপক গোলাম রাসুল	:	gmwjg ivó cwiPvjb e¨e¯v: ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮১ খৃ.
৬৮	Akram Diya al Umari, Translated by: Huda Khattab	:	*Madinan Society at the time of the Prophet*, International islamic Publishing House and the international institute of Islamic thought, Herndon, Virginia U.S.A. 1995 A.D
৬৯	Altaf Ahmed Kherie	:	*Islam a comprehensive Guide-book,* Pakistan : Royal Book Company, P.O Box 7737 SADDAR, Karachi-74400
৭০	C. V. Crabbe,	:	*American Foreign Policy in the Nuclear Age* (New York : Macmillan Publishing Co, Third edition, 1976,)

৭১	Fakhruddin Ahmed :	:	Critical Times Memoirs of a South Asian Diplomate, Dhaka, 1994 AD
৭২	Harun-ur-Rashid,	:	Indo-Bangladesh Relations, an insider's view, : New Delhi, 2002 AD
৭৩	M. Asad	:	*Principles of State and Government in Islam*: : University of California Press, Berkeley, 1967 AD
৭৪	Norman J. Pedelford, George A. Lincoln and Lee D. Olvey, *s*	:	*the dynamics of International Politic* (New York : Macmillan Publishing Co, Third edition, 1976 AD
৭৫	C. B. Marshall,	:	*The Limits of Foreign Policy, in Michael Curtis (ed.), The Nature of Politics,* (New York : Macmillan Publishing Co, Third edition, 1976,) AD
৭৬	Joseph Frankel	:	*The making of Foreign Policy,,* (New York : Macmillan Publishing Co, Third edition, 1976 AD
৭৭	K.J. Holsti,	:	*International Politics : A Frame-work For Analysis,*
ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ			
৭৮	সৈয়দ আমীর আলী, অনু. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ, সম্পা. ড. মফীজুল্লাহ কবীর,	:	Avie RwZi BwZnvm *‘A Short History of the Saracens’* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫খৃ.
৭৯	মুহাম্মদ আলী আসগর খান	:	AvawbK Zi‡¯‹i BwZnvm; ঢাকা :বাংলা একাডেমি, ২০০৭ খৃ.
৮০	মো. আছাদ পারভেজ	:	evsjv‡`‡ki mxgvbvq c‡Z¨‡KB Avgiv evsjv‡`wk ev½vwj; : ঢাকা: A peace Press Book 2017AD

৮১	মো. আছাদ পারভেজ	:	c¨v‡j÷vB‡bi e‡K BRivBj; : ঢাকাঃ A peace Press Book 2017AD
৮২	আবু বকর মো. জাকারিয়া মজুমদার ও মো. আ. কাদের,	:	Zjbvgj K ag I gmwjg gbxlv, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১১ খৃ.
৮৩	প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ, রাখী বর্মন	:	AvšÍRwZK ivRbxwZ cwiwPwZ *(Introduction to International Politics)*, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো; তা.বি,
৮৪	মুহাম্মদ আবদুল মালেক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ড. মোহাম্মদ ইউছুফ প্রমুখ	:	Bmjvg I ˆbwZK wkÿv, নবম-দশম শ্রেণি, ঢাকাঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,
৮৫	ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, অনু. মোহাম্মদ এনামুল হক	:	ga¨cvP¨ AZxZ I eZgvb, ঢাকাঃবাংলা একাডেমি,১৯৯৪ খৃ.
৮৬	ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, অনু. মাও. মুহাম্মদ শামাউন আলী	:	†RiæRv‡jg wek gmwjg mgm¨v, : ঢাকাঃ আল-ফুরকান প্রকাশনী, ২০০৬ খৃ.
৮৭	বদরুদ্দিন আহমদ,	:	Dcgnv‡`‡ki ivRbxwZ I mv¤cÖwqKZv, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক ডিপো,২০০৬ খৃ.
৮৮	সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	:	D"P gva¨wgK Bmjv‡gi BwZvnm, প্রথম পত্র, : ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ২০০৩, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৮৯	মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, মুহাম্মদ আনসার আলী, লুৎফর রহমান, নাজনীন বেগম	:	: mvgvwRK weÁvb, সপ্তম শ্রেণী, ঢাকাঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০০৯ খৃ.
৯০	জিতেন্দ্র লাল বাড়ুয়া,	:	†eŠ× `k‡bi i~c‡iLv (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০১ খৃ.

৯১	মুহাম্মদ রেজা-ই- করীম	:	Avie RvwZi BwZnvm, : ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮ খৃ.
৯২	প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত	:	ag'kb (কলিকাতা : ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯ খৃ.
৯৩	মোহাম্মদ রেজাউল করিম	:	wdwjw¯Íb mgm¨vi µgweeZb, : ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫ খৃ.
৯৪	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত	:	Ôevsjv‡`‡ki ¯vaxbZv hy×, 'wjjcÎÕ তৃতীয় খণ্ড,প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮২ খৃ.
৯৫	হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.)	:	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, খ. ১-১৫ (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২-১৯৮৫)
৯৬	ড. সাউদ ইবন্ আব্দুল আযীয আল-খালাফ্	:	w`ivmvZb wdj Av`Bqvb, Avj-Bqvûw`q¨vn Iqvb bvmiwbq¨vn (রিয়াদ: মাকতাবাতু আদওয়াইস সালাফ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি)
৯৭	ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল-জুহানী	:	Avj-gvIgAvZj gqvmmvivn wdj Av`Bqvb Iqvj gvhv‡ne Iqvj Avnhve Avj-gAvmvivn (রিয়াদ : দারুন নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ হি)
৯৮	BEVERLEY MILTON EDWARDS	:	*islamic politics in Palestine,* London, New Yorik: Tauris Academic Studies
৯৯	DONALD EDGAR PITCHER	:	*An Historical Geography of the TTOMAN EMPIRE, from earliest times to the end of the sixteenth century* : Jordan: Leiden E.J. BRILL, 1972
১০০	L. Massignon, *Fatima bint al-Husayn et l'orDgine du nom dynastique 'Fatimi-tes*	:	মিউনিখ ১৯৫৭

১০১	Yehuda Lukacs (Edi*).* *The Israeli-Palestinian Conflict*	:	*A Documentary Record*, Cambridge, New York, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, 1992
বিশ্বকোষ ও অভিধান গ্রন্থ			
১০২	আল কামুসুল মুহীত, মাওকাউ ইয়াসুব,	:	মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব আল ফিরোজাবাদী, খ.৪
১০৩	Bmjvgx wek‡Kvl;	:	ঢাকা: ইফাবা; ১৯৯৮, খ.১-২৬)
১০৪	evsjv wcwWqv; evsjv‡'‡ki RvZxq Ávb †Kvl:	:	সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; ২০১১, খ.১-৭,
১০৫	e¨enwwiK evsjv Awfavb :	:	ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি
১০৬	সিহাহ তাজুল লুগাত,	:	ইসমাইল ইবন হাম্মদা আল-জাওহারী, বৈরুত: দারুল ইলম, ১৯৮৭, ৪র্থ সংস্করন, খ.৭
১০৭	*Banglapedia, National Encyclopedia*	:	Sirajul Islam, (Chief Ediotr), Sjahan Miah, (Managing Editor);, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003,V.1-7
১০৮	*Compiled from the Encyclopedia of Islam,*	:	E.Van Donzel, : *Islamic Desk Reference,* New York 1994
১০৯	*The oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world.*	:	John L. Esposito (Editor in Chief): V.1, Oxford University Press, 1995, New York
১১০	The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World	:	: (London Oxford University press, 1995), V-2
১১১	*A dictionary of Islam*	:	Thomas Patrick Hughes, V.1 Cosmo Publications New Dellhi, 2004
১১২	*Encyclopedia Islam,*	:	Wilferd Madelung, Farhad Doftary, : Brill in association with the Institute of Islamic Studies London 2008

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী			
১	সংবাদ	:	১৭ মে ১৯৭৪, ১ম পাতা
২	সংবাদ	:	১৭ মে ১৯৭৪
৩	সংবাদ	:	১৮ মে ১৯৭৪, ১ম পাতা
৪	দৈনিক বাংলা	:	১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
৫	দৈনিক বাংলা	:	২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪,
৬	দৈনিক বাংলা	:	২৭-০৯-১৯৭৪ পৃ:৩
৭	সংবাদ	:	২৪ এপ্রিল ১৯৭৭
৮	দৈনিক ইত্তিফাক	:	১১ মার্চ ১৯৭৮, ১ম পাতা
৯	দৈনিক ইত্তিফাক	:	০৫ এপ্রিল ১৯৭৮, ১ম পাতা
১০	দৈনিক ইত্তিফাক	:	১৭ এপ্রিল ১৯৭৮, ১ম পাতা
১১	রোববারের সংবাদ	:	৩১ মে ১৯৮১
১২	সংবাদ	:	০২জুন ১৯৮১
১৩	সংবাদ	:	০৫ জুন ১৯৮১
১৪	সংবাদ	:	২৫ মার্চ ১৯৮২, ১ম, পাতা
১৫	বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক	:	০৩ আগষ্ট ১৯৮৩, পৃ. ১
১৬	বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক	:	০৪ আগষ্ট ১৯৮৩,
১৭	বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক	:	০৮ মার্চ ১৯৮৫, ১ম পাতা
১৮	দৈনিক ইত্তিফাক	:	০৯মার্চ ১৯৮৫, ১ম পাতা
১৯	বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক	:	০৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫, ১ম পাতা
২০	দৈনিক ইত্তিফাক	:	০৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫,
২১	বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তিফাক	:	১১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, ১ম পাতা
২২	বিস্তারিত: দৈনিক ইত্তেফাক	:	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
২৩	বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তেফাক	:	১২ ডিসেম্বর ১৯৯৭, ১ম পাতা
২৪	বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তেফাক	:	১২ ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ১৫

২৫	দৈনিক ইত্তেফাক	:	২১ জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৬
২৬	বিস্তারিত:- দৈনিক ইত্তেফাক	:	২২ জানুয়ারি ২০০১, ১ম পাতা
২৭	দৈনিক ইনকিলাব	:	২২ মে ২০০৬, ১ম পাতা
২৮	বিস্তারিত:- দৈনিক যুগান্তর	:	১৫ মার্চ ২০১২, ১ম পাতা
২৯	বিস্তারিত:- দৈনিক যুগান্তর	:	১৬ মার্চ ২০১২, সম্পাদকীয় পাতা, পৃ. ৪
৩০	সংবাদ	:	০৭ জুলাই ২০১৪, পৃ. ১৫
৩১	সংবাদ, ১০ জুলাই ২০১৪	:	সম্পাদকীয় কলাম, পৃ. ৬
৩২	দৈনিক ইনকিলাব	:	০৭ মে ২০১৫, ১ম পাতা
৩৩	দৈনিক ইনকিলাব	:	০৮ মে ২০১৫, ১ম পাতা
৩৪	দৈনিক ইনকিলাব	:	৩১ জুলাই ২০১৫, শেষের পাতা
৩৫	দৈনিক প্রথমআলো	:	০৯ এপ্রিল ২০১৭
৩৬	দৈনিক প্রথমআলো	:	০৯এপ্রিল, ২০১৭
৩৭	দৈনিক প্রথমআলো	:	১০ এপ্রিল ২০১৭
৩৮	দৈনিক প্রথমআলো	:	১১ মে, ২০১৭, পৃ.৪
৩৯	দৈনিক নয়া দিগন্ত	:	৩০ মে ২০১৭, পৃ. ১
৪০	দৈনিক প্রথম আলো	:	২ জুন ২০১৭, পৃ.০২
৪১	দৈনিক প্রথম আলো	:	১০ জুন ২০১৭, পৃ.০১
৪২	দৈনিক প্রথম আলো	:	১১ জুন ২০১৭, পৃ.১৩
৪৩	The Bangladesh observer	:	21 April 1977, P.01
৪৪	মাসিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স	:	বর্ষ২২, সংখ্যা ২৫২, জুন ২০১৭

ওয়েব সাইট

১	https://en.m.wikipedia.org
২	www.islamictourism.com
৩	www.iasworld.org
৪	www.mofa.gov.bd
৫	www..oic-oci.org
৬	www.worldbank.org
৭	www.wikipedia.org/wiki/Mohammad_salim_Al-Awa

Dhaka University Institutional Repository